"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com
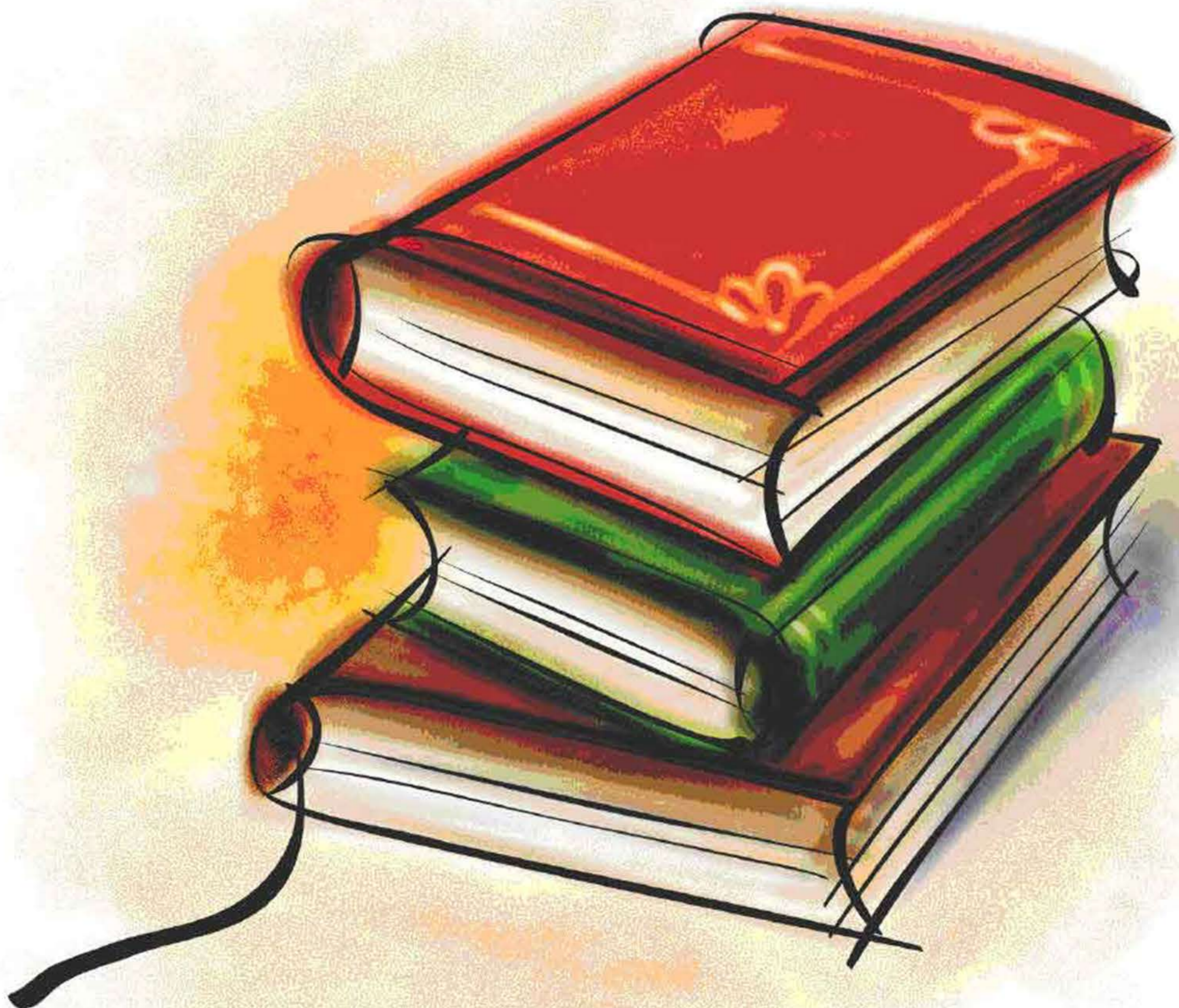
অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

প্রথম বর্ষ } বৈশাখ—১৩৩৭ { সপ্তম সংখ্যা

সাধনার পথে

নব বর্ষ

'নিউ-ইয়ার্স ডে' বলিয়া বৎসরের একটী দিন আজ আসমুদ্র-হিমাচল ভারতভূমির সর্ব্বত্র বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও এবং 'হলি ডে' বা ছুটীর দিন বলিয়া ঐ দিনে সর্ব্বত্র অবকাশ ও নানা আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিলেও, বৎসরের আর একটী দিন আছে, যাহা ভারতের প্রকৃত নববর্ষের সূচনা করে। ঐ দিন প্রকৃতির যাবতীয় নিয়মের—ভূলোক ও দ্যুলোকের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে—ভূমির প্রকৃতি, ঋতুর বিকাশ ও দেশের অধিবাসিগণের মানসিক অবস্থার সহিত সমীকরণে উহার গণনা হইয়াছে—কেবল কোনও আকস্মিক ঘটনা হইতে ইহার পরিকল্পনা হয় নাই।

বৈশাখের প্রথম দিন এদেশে গ্রীষ্মের সূচনা করিলেও বসন্তের পূর্ণতার মুখে তার শোভা ও সমৃদ্ধি অসাধারণ। কাল-বৈশাখীর ভীষণ আবর্ত্ত পূর্ব্বেই পুরাতনের হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া দিয়া নব বর্ষের স্নিগ্ধ শয্যা রচনা করিয়া গিয়াছে। উষর ভূমিতে নূতন শস্যের বীজ বপিত হইয়াছে; মলয় বাতাস গ্রীষ্মের উত্তাপ উল্লঙ্ঘন করিয়া দিগদিগন্ত বহিয়া ভূতাপ হরণ ও শরীর মন শীতল করিয়া চলিয়াছে। এরূপ সময়ে নববর্ষের আগত দিবস উপস্থিত যেমন শোভা ময়, ভবিষ্যত তেমনই আশা ও উৎসাহের আধার—প্রকৃতি ইহাকে সত্য সত্যই নবীনের বাহ্যিক অবয়ব ও আন্তরিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে

কিন্তু দৈব-বিপাকে প্রকৃতির এই সু-শোভন ক্ষেত্রে আজ বিষম বিকৃতি উপস্থিত। 'নিউ-ইয়ার্স-ডের' বাহ্যিক চাকচিক্য ও প্রবল প্রতাপ লোকের মন এমনই অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, নব-বর্ষের শুভ দিনের গণনায় আর কাহারও প্রবৃত্তি যায় না; অবকাশও নাই। বিজাতীয় বর্ষ ও দিনের গণনা এবং তাহার কার্য্য তালিকার চাপে ও ভিড়ে আজ উহাকে অনেকে ভুলিয়াই গিয়াছে। মহা-বিষুবের সংক্রমনে জাগতিক ব্যাপারে যে স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার সহিত নিজের জীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা মিলাইয়া লইয়া সুবিচারে জীবন-যাত্রায় অগ্রসর হইবে—এ প্রবৃত্তি আর কাহারও নাই। সে বুদ্ধি বিচার লোপ পাইয়াছে।

নব বর্ষের ফলাফল শ্রবণের আর কাহারও অবসর নাই—আজ কালকার 'নূতন পঞ্জিকা' হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। 'নিউ-ইয়ার্স-ডের' উপঢৌকন প্রদানে লোকের সমুদায় সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। মোট কথা লোকে আপন মূল ভিত্তি ছাড়িয়া দিয়া পর-গাছার ডালে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ 'নব বর্ষ' দেশের কাছে যে সম্মান ও আদর পাইতেছে, মৌলিক স্থিতি ও প্রকৃতি হারাইয়া জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটী দিক্ সেরূপই বিভ্রান্ত ও বিকৃত ভাবে চলিয়া আসি-তেছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলও অবশ্য সর্ব্বত্র ফলিতেছে।

বর্ষের পর বর্ষ যতই অগ্রসর হইতেছে, সঙ্কট ততই গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া উপস্থিত। নব বর্ষের ফলাফল আর কেহ মঙ্গল বা কল্যাণের কামনায়, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের সমন্বয়ে গণনা করিতে পারে না—শাসন ও শোষণ, পর পীড়ন দুর্ব্বলের নির্য্যাতন, আর্থিক লাভালাভের বিচার, ভোগ বিলাস মহামারী, মহাসমর, ভীতি, দ্বেষ, আতঙ্ক ও বিপ্লবের অঙ্কে তাহার হিসাব নিকাশ হয়। বর্ত্তমান নব বর্ষ এ দেশের যে অবস্থা লইয়া অবতরণ করিয়াছে, তাহা কি সঙ্কটের কারণ হইয়া পড়িয়াছে তাহা সকলেই বুঝিতেছে। এ অবস্থা অবশ্যই এক দিনে সৃষ্টি হয় নাই। এক বিকৃত অবস্থা হইতে বিকৃততর অবস্থায় আসিয়াই এর পরিণতি ঘটিয়াছে—সে শোচনীয় অবস্থায় আজ রাজাকে রাজধর্ম্ম ভুলিতে হইয়াছে, প্রজাকে আপন অধিকার অতিক্রম করিয়া যাইতে হইতেছে; ধর্ম্মে অবিশ্বাস ও গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে; প্রবীণ জড়তা-প্রাপ্ত; নবীণ উদ্ভ্রান্ত; নারী তার মর্য্যাদা বিকাইয়া দিতে চলিয়াছে,—আরও কত কি ঘটিতেছে! বর্ত্তমান নব বর্ষকে ইহার হিসাব লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হইবে। যতদিন প্রকৃত 'নব বর্ষের' মর্য্যাদা না রক্ষিত হইবে—দেশের প্রকৃতি ও লোকের প্রকৃত অভাব ও আবশ্যকতার দৃষ্টিতে—সর্ব্বোপরি দেশজাত মানবীয়তার প্রকর্ষের (culture-এর) মহান্ আদর্শে রাষ্ট্র ও সমাজসংস্থা নিয়ন্ত্রিত না হইবে, তত দিন ইহার বিরাম নাই।

ব্যক্তি ও নীতি

এ জগত বৈচিত্র্যের লীলাভূমি—বিরোধের ক্ষেত্র—এ সুখ্যাতি বা অখ্যাতি চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। সুখ্যাতি—এই জন্য যে, ঐ বিচিত্রতার মধ্যে জীবের প্রাণশক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে, জ্ঞানের উৎস খুলিয়া গিয়াছে, নানা কলার সৃষ্টি হইয়াছে; অপবাদ—এই জন্য যে, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে যে অনৈক্যের বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাহাই সকল সংঘর্ষ, ভীতি ও বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে। কবি

ও বিজ্ঞানবিদের কাছে এই বৈচিত্র্য যত আরাধনার বিষয়, সমাজ নীতিজ্ঞ ও বস্তুবাদীর নিকট উহা তেমনই বিভীষিকার যন্ত্র। জগতের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে যত প্রকার সংঘর্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যক্তি ও নীতির বিরোধ তাহার মধ্যে আরও বিচিত্র।

তত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া কেহ কেহ (দার্শনিক মতে) বলিয়াছেন—নীতি বা জগত্তত্ত্বের কোনও মূল-সূত্র হইতে পৃথক হইয়াই ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভ হইয়াছে—ব্যক্তি নীতির বিকার মাত্র। জগতের মৌলিক নীতিতে যেমনি অহং ভাবের বিকার প্রবেশ করিল, অমনি এই বিশ্ববৈচিত্র্যের স্রোতে ব্যক্তিত্বের লহরী ক্রীড়া করিতে থাকিল। আজ ব্রহ্মাণ্ডে এই ব্যক্তিত্বের তরঙ্গ এতই প্রবল যে ইহার মধ্যে মৌলিক নীতি সূত্রটী খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

তথাপি এই নীতি ও ব্যক্তির—সমগ্র ও অংশের—সম্বন্ধটী কখনও চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায় না। সত্তার দিক দিয়া জাতি ও ব্যক্তির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে উহা যেমন সূচিত হয়, কর্ম্ম বা ব্যবহারের দৃষ্টিতে ঐ সম্পর্ক তেমনই কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিস্ফুরণে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শুধু ইহাই নয়—ঐ নীতিকে অনুসরণ করিয়া চলাই ব্যক্তির জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বাহ্যিক জগতে ব্যক্তি জাতিকে অনুসরণ করিতে গিয়া বিশ্বপ্রেম ও পরহিতে-রতি প্রভৃতি মহান্ গুণের অধিকারী হইয়া বসে, আর অন্তর্জগতে ব্যক্তি সত্য নীতির অবলম্বনে আপন খণ্ড জীবনের পূর্ণ স্বার্থকতা লাভ করিতে পারে। ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ নীতি অনুসরণকেই সাধনা নামে অভিহিত করা যায়। মানব জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত এই সাধনার পরীক্ষা ক্ষেত্র—ব্যক্তিত্বকে ভুলিয়া কত খানি নীতির অধিগম হইল, ইহাই সেই সাধনার সমীক্ষা।

আজ জগতের সাধনার ধারায় এক প্রকারের ব্যক্তি ভুলিবার রব উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে উহা চিরকালই ছিল, এবং পূর্ব্বকালে তাহা বোধ হয় আরও অধিকতরই ছিল; এক্ষণে সামাজিক জীবনে উহাকে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। তাই রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রজাতান্ত্রিকতার কথা ও সমাজ-তত্ত্বে সমানাধিকারবাদ এমন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বের অবহেলা নীতির প্রতিষ্ঠামূলে হয় না—অপর কোনও ব্যক্তিরই সুবিধা বা অসুবিধার বিবেচনায় হইতেছে। সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে লোকের লাভালাভের গণনাই অগ্রকার এই সমাজতান্ত্রিকতা বা জনসাম্যবাদের মূল কারণ; অন্য কোনও উচ্চনীতির বলে নয়, যাহার দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও জাতি—লোক ও সমাজ—উভয়েই নত শিরে আপন ভুলিয়া ধন্য হইতে পারে। বর্ত্তমান এই সাম্যবাদের আর এক কারণ—ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের বিভিন্ন দেশের রাজ-তান্ত্রিকতার ও ধনিকতার আধিপত্য! রাজশক্তি ও ধনিক আভিজাত্যের প্রতি-ক্রিয়ারূপে পাশ্চাত্যে যে সমাজ বিপ্লব আরম্ভ হয়, তাহাই আজ দেড় শত বৎসরে, বর্ত্তমান যুগের জড়বাদ মূলক সমাজতত্ত্ব ও ভোগবিলাসপ্রধান কর্ম্মতন্ত্রের সাহায্যে, আজিকার এই নব বিপ্লবকারী সাম্যবাদে পরিণত হইয়াছে। উচ্চ কোনও মৌলিক নীতির সহিত সম্বন্ধ থাকিলে, ব্যক্তিপ্রাধান্য বা জাতি স্বাতন্ত্র্য—একাধিপত্য বা সমাজসাম্য এতদুভয়ই সার্থকতা লাভ করিতে পারিত। তাহার অভাবে বর্ত্তমান যুগের এই কর্ম্মধারা বা সাধনা ব্যর্থই হইবে ও হইতেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে নীতির সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ ও বাস্তবিক। কোন না কোনও নীতি অবলম্বন করিয়া সকলেই চলিতে চাহে। নীতিকে অনুসরণ করা বা জীবনে উপলব্ধি করিয়া চলা উচ্চ মনুষ্য-

ত্বের আদর্শ। এবং যিনি যে পরিমাণে তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই জীবনে ততটা কৃতকার্য্য হ'ন—সমাজে পূজা ও অনুসরণ পান—সমাজ তাঁহাকে অনুসরণ করে না, তাঁর অন্তরের উপলব্ধ নীতিকেই নতশিরে পূজা করে। এবং এই দৃষ্টিতে যিনি যত উচ্চ নীতি নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই তত মহানতার উচ্চ স্তরে অধিরূঢ়—সমাজের ভক্তি শ্রদ্ধার অধিকারী হন।

আজ যে ভারতের একজন ক্ষীণকায়, নিঃস্ব, নির্য্যাতিত নিম্নবর্ণের লোক সমুদয় দেশের নেতৃত্বের সম্মান লাভ করিয়াছেন, ও জগতের শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া পূজিত হইতেছেন, নীতির সহিত তাঁহার ব্যক্তিত্বের একীকরণ বা সমন্বয় সাধনই তার একমাত্র কারণ। সে নীতি অতি উচ্চ কি নীচ, মৌলিক কি কৃত্রিম, সে কথা এখানে উঠিতেছে না; কিন্তু তিনি যাহা ধরিয়াছেন, তাহার কাছে যে ব্যক্তিত্বের সমুদয় অস্তিত্ব বিকাইয়া দিয়াছেন,—সেজন্য যে ত্যাগ—সাধনা আবশ্যক তাহাতে যে মহাত্মা গান্ধী সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহাতে কেহ সন্দিহান হইতে পারে না। নীতির কাছে ব্যক্তিত্বের বলিদান করিতে পারিলে, সে ব্যক্তি নীতিতেই পরিণত হয়; তাই মহাত্মাজী আজ সেই নীতির প্রতীক।

জাগতিক ব্যাপারে ব্যক্তিত্বের বিলোপ অহরহ প্রতি মুহূর্ত্তে হইতেছে। কিন্তু নীতির কখনও বিলয় নাই। উহা চিরন্তন সনাতন সত্য—অমর দেবতা বলিয়া পূজিত। ব্যক্তির বিলোপ হইলেও নীতির ক্রিয়া চির কাল চলে—দেবশক্তির কার্য্য বন্ধ হয় না।

আদর্শে গোল

স্যার আবুস্নাট্ ক্রথার ফোর্ড বিলাতের একজন কৃতবিদ্য পুরুষ—মনীষী সমাজে অগ্রগণ্য। কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন—'Our Universities do not seek to produce mere book-worm, but Governors able to rule an empire,, তাৎপর্য্য—বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গণকে গ্রন্থ-কীট হইয়া কেবল অধ্যয়নে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া থাকিলে চলিতে পারে না; তাহাদিগকে এমন শিক্ষা পাইতে হয়, যাহাতে তাহারা এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসনে সক্ষম শাসনকর্ত্তা বনিতে পারে।

অধ্যাপক সার সি, ভি, রমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ কৃতী পুরুষ; দেশ বিদেশে তাহার গবেষণার খ্যাতি প্রসারিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে 'ছাত্র দিবস' উপলক্ষে একদা তিনি 'নিখিল বঙ্গীয় ছাত্র সমাজ' কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—'We in India have no empire or colonies to govern, but we inherit from our forefathers a cultural domain whose boundaries we may legitimately seek to extend and make fresh annexation thereto.' অর্থাৎ—ভারতে ছাত্রদের কোন সাম্রাজ্য বা উপনিবেশ শাসন করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতে যে সভ্যতা-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছে, তাহার সীমানা অতিশয় সঙ্গত ভাবেই বৃদ্ধি সাধন করিতে এবং নূতন নূতন দেশ তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে তাহারা প্রয়াস করিতে পারে।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থায় অধ্যাপকেরএই উক্তির কোন সমর্থন পাওয়া যায় কিনা

তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যে জাতীয় সভ্যতা বা সাধনা ভারতীয় যুবক দিগের প্রধান সম্পদ্, তাহার আদর্শে জীবন গঠিত হয়, অথবা সেই আদর্শকে উপলব্ধি করিতে পারে, এদেশের শিক্ষা-শৈলীতে তাহার কোন ব্যবস্থা আছে কি না? পক্ষান্তরে উক্ত অধ্যাপকের কথাতেই —The Indian Universities are producing steriotyped graduates devoid of interest in wide spheres of life outside the college curriculum with the result that in practical life their contribution is not commensurate with their potentialities—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রকার এক ঘেয়ে রকমের গ্রাজুয়েট্ সৃষ্টি হয়; বহির্জগতের সহিত ইহাদের সম্পর্ক থাকে না; ব্যবহারিক জগতে ইহাদের শক্তির সামঞ্জস্য হয় না!

ভারত-সমস্যা কি জগৎ-সমস্যা

যে কারণেই হউক্ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে আজ যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আজ কেবল মাত্র ভারতীয় লোক ও ইংরেজের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে এদেশের শাসক ও শাসিত উভয় শ্রেণীই বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে; সকলেই চাহে, যে সমস্যা তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত তাহার সুমীমাংসা হয়। এজন্য যে যে উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, তাহাতে ভুল প্রমাদ থাকিতে পারে; কিন্তু লক্ষ্যে কোনও সন্দেহ নাই। মানুষের কার্য্যে ভুল ভ্রান্তি হইয়াই থাকে,—উপায়ের সঙ্গতি-অসঙ্গতি সংরক্ষণ করা অনেক সময়ই কঠিন হয়; কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ ও মহান এবং স্থিরতর হইলে, উপায়ের ত্রুটী ক্রমশঃ কাটিয়া যায়। বর্ত্তমান ভারতে যে বিষম সমস্যা উপস্থিত, তাহার সমাধান কল্পে লক্ষ্য বা আদর্শের খর্ব্বতা লইয়া চলিলে হইবে না, দৃষ্টির ক্ষীণতায় উপায়ের প্রতি স্তরে নানা দোষ আসিয়া বর্ত্তিবে—অনেক স্থলেই তাহা দেখা যাইতেছে। ভারতের-সমস্যা যে কোন ক্ষীণ-দৃষ্টির সীমানার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না, তাহা এই কয়টী কারণে সহজেই বুঝা যাইতে পারে—(১) ভারতের আজ যে জাগরণ, তাহা সমুদয় প্রতীচির উন্মেষের প্রতীক মাত্র; সমুদয় প্রতীচ্য জগতের উত্থান-পতন ভারত-সমস্যার সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রাচীন মানবের প্রায় সমগ্র সভ্যতা ও বর্ত্তমান জগতের অদ্ধাংশের স্বার্থ ও সুবিধা ইহার সহিত বিজড়িত। (২) ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে আজ যে বিবাদ উপস্থিত, প্রকৃত পক্ষে তাহা আর একটী বৃহত্তর বিবাদের অংশ মাত্র—সে বিবাদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনাদর্শের। প্রাচ্যের অনেক মণীষী ব্যক্তিকেও এই বিবাদ বা পার্থক্যকে স্থিরতর করিতে ব্যস্ত দেখা গিয়াছে—East হয় East আর West West.—ভারত ও বৃটনের মধ্যে আজ যে বিকৃত পার্থক্যের সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহাই এই বিবাদের প্রধান কারণ। মানব সভ্যতার এই বিকৃত ব্যাধির অপনয়ন করিতে হইলে, সেই মৌলিক নিদান খুঁজিতে হইবে। (৩) বর্ত্তমান জগতের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভারত অপর সমুদয় দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। আজ ভারতের সহিত বিলাতের যে একান্ত সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহা মাত্র রাখিয়া উপস্থিত বিবাদের কোনও রফা হইলে, কালে জগতের অন্যান্য শক্তির সহিত ইহার নূতন সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। বর্ত্তমান মানবের

জাগতিক সম্বন্ধের দৃষ্টিতে প্রত্যেক জাতি বা দেশকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, বিশ্বের দরবারে তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পরে সভ্য জগত যে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহাতে এই উদ্দেশ্যেই জাতি-সঙ্ঘ বা League of Nations এর সৃষ্টি হইয়াছিল। সে উদ্দেশ্য যদি সঙ্গত হইয়া থাকে, অথবা উহাকে যদি সফল করিতে হয়, তবে ভারত-সমস্যার মত গুরুতর প্রশ্নের সমাধান কেবল মাত্র কোনও 'রাউণ্ড-টেবল কনফারেন্সের' দ্বারা না হইয়া, 'লীগ-অব-নেশন' বা তদনুরূপ কোনও বিশ্বদরবারে হওয়া আবশ্যক। (৪) এ সকল লক্ষ্য অপেক্ষা আরও গুরুতর এক আদর্শ আছে, তাহা ভারতের স্বকীয়—ভারতের নিজ সাধনার আদর্শ। ভারত নানা দুঃখ দারিদ্র্য, উৎপীড়ন, নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া চলিয়াও যুগ যুগান্তর ধরিয়া সেই মহান্ আদর্শ নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। কোনও দুঃখ-দুর্দ্দশা, অভিযোগ অভাবের শান্তি বা পরিপূরণ হইবে না, যে পর্য্যন্ত তাহার সেই স্বকীয় স্বভাব-গত প্রকর্ষের (Culture) মহান্ দাবী পরিপূর্ণ না হয়। কেবল মাত্র রাষ্ট্রাধিকার লাভে নয়, লবণ আইন ভাঙ্গিয়াও নহে, ইংরেজের সহিত সমকক্ষতা করিয়া নহে, হিন্দু মুসলমানের মিলনের দ্বারাও নয়—পূর্ণ মনুষ্যত্বের যে দাবী তাহা যতদিন না পরিপূর্ণ হয়, ততদিন ভারতের অন্তরাত্মা তৃপ্ত হইবার নয়। ভারতের সমস্যার সমাধানে এ সকল দিকে লক্ষ্য রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

চিকিৎসাবিদ্যায় অভিশাপ

ভারতীয় পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ্‌গণের এবং তাহাদের অভিভাবক গবর্ণমেণ্টের বাহ্যিক ব্যবহারে এক চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। বিলাতে 'ব্রিটিশ ম্যাডিক্যাল কৌন্সিল' নামক চিকিৎসা মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত আছে। সমগ্র দেশের চিকিৎসা বিষয়ে ইহার ক্ষমতা অসাধারণ, সিদ্ধান্ত চরম। সম্প্রতি এই কৌন্সীল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, অতঃপর ইহারা আর ভারতীয় চিকিৎসকদিগের অভিজ্ঞতা, নিপুণতা, উপাধি, সার্টিফিকেট প্রভৃতির উপর কোনও আস্থা রাখিবেন না—ইহাদের গুণপনা মানিয়া লইবেন না। এই ব্যবস্থা কাজে আসিলে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ডাক্তারগণ চিকিৎসা বিষয়ে বিলাতী উপাধির অধিকারী হইবে না। এখান হইতে উপাধি লইয়া সেই উপাধির জোরে বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষা পাইতে পারিবে না এবং চাকুরী ক্ষেত্রে কোন আই-এম-এস বা ইণ্ডিয়ান ম্যাডিক্যাল সার্ভিসের অধিকারী হইবে না; ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যে এ সংবাদ পাইয়া এ দেশের বিভিন্ন স্থানের চিকিৎসাব্যবসায়ী ও চিকিৎসা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা নানা কল্পনা জল্পনা, সভা সমিতি ও বাদ প্রতিবাদ, অভিমতাদি প্রকাশ করিতেছেন। দক্ষিণ ভারতে বে-সরকারী চিকিৎসকগণের এক মণ্ডলী আছে—"সাউথ-ইণ্ডিয়ান ম্যাডিক্যাল-ইউনিয়ান্"; তাহারা বিলাতী এই "জেনারেল ম্যাডিক্যাল কৌন্সিল-অব গ্রেট্‌ব্রিটেনের" সিদ্ধান্তে হর্ষ প্রকাশ করিয়াছন। বলেন, ইহারা যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাডিক্যাল ডিগ্রি গুলিকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করিতেছেন, তাহাতে সুফলই ফলিবে—এক্ষণে ভারতের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ভারতীয় অবস্থার অনুসারে করিয়া উহার আরও উৎকর্ষ সাধন করা যাইবে। এক্ষণে বিলাতের মুখাপেক্ষী হইয়া উহাতে যে খর্ব্বতা আনয়ন করা যাইতেছে, তাহা আর হইবে না!

এক্ষণে ভারতের সরকারী-বেসরকারী সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য আর কোনও বিষয়ে বিলাতী চিকিৎসক মণ্ডলের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, যাহাতে এদেশের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার আরও সুন্দর ব্যবস্থা হইতে পারে—দেশের প্রকৃতি ও লোকের অবস্থানুসারে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন হয়—তাহার ব্যবস্থা করা।

সুখের বিষয় চিকিৎসা-বিষয়ে এদেশ কখনও পশ্চাদ্‌পদ রহে নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালীতে প্রথম প্রথম অনেক বৈদেশিক লোক সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া থাকিলেও এবং তাহাতে বৈদেশিক প্রভাব এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার নানা সুবিধা করিয়া দিয়া থাকিলেও, দেশের প্রায় সর্ব্বত্র এক্ষণে দেশীয় ডাক্তারগণই এই বৈদেশিক চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়া খ্যাতিতে ও অর্থোপার্জ্জনে বৈদেশিক চিকিৎসকগণকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন। এতদ্ভিন্ন দেশীয় প্রণালীর চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ ও হাকিমী চিকিৎসকগণ—বৈদেশিক চিকিৎসার প্রতিযোগিতায় আপনাদের খ্যাতি ও দক্ষতা সম্পূর্ণরূপেই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইহা কেবল মাত্র তাহাদের সমকক্ষতার পরিচায়ক নহে, উৎকৃষ্টতারও সমর্থক।

ইংরেজ মহিলার ভক্তি

মিস্ মেডিলীন শ্লেড্ একজন ইংরেজ মহিলা। ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি সার এড্‌মাণ্ড শ্লেডের কন্যা; তিনি একসময় "ইষ্টইণ্ডিস্ স্কোয়েড্রনের অধিনায়ক ছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন মিস্ শ্লেড্ প্যারিসে বাস করিতে ছিলেন, তখন তিনি মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আদর্শবাদী ইউরোপীয় লেখক রোমেণ রোল্যাণ্ডের গ্রন্থ পাঠ করিয়া গান্ধী-ভাবে অভিভূত হন। তখনই তিনি গান্ধীজীকে পত্র লিখেন যে, তিনি তাঁহার আশ্রমে স্থান পাইতে পারেন কি না। মহাত্মা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন; কিন্তু এদেশে আসিবার পূর্ব্বে আর একবার তাহাকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করেন। অতঃপর এই মহিলা কতক সময় খদ্দরের পোষাক ইত্যাদি জোগাড় করিতে অতিবাহিত করেন, পরে ভারতে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে মহাত্মার ভক্ত শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। গান্ধীজীর কন্যা বলিয়া অনেকে তাহাকে অভিহিত করিয়া থাকে। এদেশে তাঁহার নাম হইয়াছে মীরা।

শক্তির সন্ধানে

"স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এ যুদ্ধে জয় লাভের বড় একটা আশা হয় না, অবসাদ ও নৈরাশ্য আসিয়া হৃদয় অভিভূত করিয়া ফেলে। ধর্ম্ম ভণ্ডামীতে সমাচ্ছন্ন, সমাজ ক্রয়-বিক্রয়ের আদর্শে কলুষিত, নীতি বিলাস লালসায় অভিভূত, এমন কি রাষ্ট্র ক্ষেত্রও আত্মকলহে জর্জ্জরিত। কি দেখিয়া মহাত্মাজীর বাক্যে বিশ্বাস আসিবে? বহির্দৃষ্টিতে ভারতের অবস্থা যেমনই মনে হউক না কেন, একটু বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়, বাহিরের দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা ও অজ্ঞানতার অন্তরালে ভারতীয় সভ্যতার এমন একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, যাহা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এই অন্তর্নিহিত শক্তি সাধারণের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেও ভস্মে আচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় তাহা এখনও আপন প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

এই অন্তর্নিহিত শক্তির প্রথম সন্ধান দিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার পরে আশার বাণী শুনিতে পাই মাতৃসাধক অরবিন্দের নিকট। ভারতের জাতীয় জীবন সম্বন্ধে বৈরাগ্যোজ্জ্বল স্বামীজীর হৃদয়ে যে সত্য প্রতিভাত হইয়াছিল, সাধনাপূত অরবিন্দের মনোমধ্যে যে নিগূঢ় তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মবীর মহাত্মা গান্ধীও কর্ম্মক্ষেত্রে সেই একই সত্য প্রত্যক্ষ করিলেন।"

—এই কয়টী কথা বলিয়া একজন কর্ম্ম-সাধক ভারতীয় সাধনার গূঢ় তথ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং ইতিহাসের ইঙ্গিতে তাহার সুস্পষ্ট দিগ দর্শন করাইয়াছিলেন।

ভারতের যেখানে এই শক্তি, সেখানেই তাহার মুক্তি—শুধু ভারতের নহে, সমুদায় মানবের। আজ যে নানা ভোগ-বিলাস-চাকচিক্যের মধ্যে কোন্ অভিশপ্ত মানব প্রবৃত্তিতে হিংসা-দ্বেষ-দম্ভ-পরপীড়নের পাপক্রীড়ার নৃত্য চলিতেছে,—উচ্চনীচ কেহ তাহা হইতে অব্যাহতি পাইতেছে না—এবং তাহাতে বিভিন্ন স্বার্থ, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন মতের একত্র সম্মিলনে যে মহা অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে সেই শক্তি ও মুক্তির দৃষ্টিতেই পরম কল্যাণ সাধিত হইতে পারে—ঘরে ঘরে ভ্রাতৃবিরোধ—কুরুপাণ্ডবের বিবাদ—প্রশমিত হইবে, বৈদেশিক শক্তিনিচয় সেই মৈত্রীবন্ধনে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইবেন, ধরণী শাপমুক্ত হইয়া ধন্য হইবে। বর্ত্তমান ভারত সেই অষ্ট-বজ্র মিলনের ফল প্রতীক্ষা করে।

কিন্তু এক্ষণে ভারতের আপন লোকেরাই তাহার এই 'অন্তর্নিহিত শক্তিতে' বিশ্বাস হারাইয়া বসিয়াছে। বাহিরের শিক্ষা ও দীক্ষার প্রভাবেই যে তাহাদের এই মতি-ভ্রম ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি এ যুগেও স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর নামে যে কেহ মস্তক অবনত না করিয়া পারে না, ইহাই ঐ শক্তির পরীক্ষাস্থল।

বাণিজ্যে ভারত

বর্ত্তমান জগতের বাণিজ্য ও ধনার্জ্জনের ক্ষেত্রে ভারতের মত নিঃস্ব দৈন্য দশাপন্ন দেশ নাকি আর নাই—বর্ত্তমান অর্থনীতিবিদ্‌গণের আক্ষেপ এই যে, জগতের ধন সমাগমের সম্ভাবনা ভারতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; কিন্তু তার মত দরিদ্র দেশও এখন আর কোনও নাই। ভারতকে এই দারিদ্র্য দশায় পৌছাইবার প্রধান কারণ বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি। সে নীতি যে কত ভাবে কি প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা পাওয়া কঠিন। এদেশের সাধারণ লোকেত তার কোনও সংবাদই রাখে না ; অনেক ব্যবসায়ী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত পণ্ডিতেরাও তাহা বড় বোঝেন না। একজন জাপানী ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেশের কোন পাঠশালার বালক বাঙ্গলার পাট বা আসামের চা'র যে সংবাদ রাখে, এদেশের অর্থশাস্ত্রে অতি উচ্চ উপাধি ধারীরা তাহা রাখেন না। আর এদেশের যাহারা এক্ষণে ব্যবসায়ে উন্নতিশীল—ধন উপার্জ্জন করে—তাহারাত কেবল মাত্র বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়ক মাত্র, জানিয়া শুনিয়াই দেশদ্রোহিতা করে। বাণিজ্যে দেশের অবস্থা এমনই হতাশা-জনক যে, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার তীক্ষ্ণ ও সুদূরগামী দৃষ্টিতে চরকাকে তার একমাত্র প্রতীকারের উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। চরকা অনেকের নিকটই অসম্ভব প্রস্তাব সন্দেহ নাই ; কিন্তু অন্য উপায়ে প্রকৃত কল্যাণ আরও অসম্ভব।

প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে সমুদ্রযাত্রার কাহিনী

শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র দাস এম্-এ, বি-এল্, পি-এইচ্-ডি

বহু সংস্কৃত এবং পালি গ্রন্থে ও কথা-সাহিত্যে প্রাচীন কালে আর্য্যগণের সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী ও উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। "মহাবংশ" নামক পুস্তক পালি ভাষায় লিখিত; তাহাতে সিংহলের প্রাচীন রাজ-বংশ সমূহের বিবরণ লিপি-বদ্ধ আছে। অনেকে বলেন, ইহা সিংহল দ্বীপেই রচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে বঙ্গদেশ হইতে বিজয়নামক এক রাজপুত্রের সিংহলদ্বীপে গিয়া রাজ্য স্থাপনের বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

বঙ্গের "লাল" বা রাঢ় দেশে সিংহপুর নামক নগরে সিংহবাহু নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার বত্রিশটি পুত্র ছিল; তন্মধ্যে বিজয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং সুমিত্র বিজয়ের কনিষ্ঠ ছিল। বিজয় প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, রাজা তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিজয় সাতিশয় দুশ্চরিত্র ছিল। সে ও তাহার সহচরগণ নানাবিধ দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া প্রজাবর্গকে উৎপীড়িত করিত। প্রজাবর্গ নিরুপায় হইয়া রাজার নিকট বিজয়ের নামে অভিযোগ করিলে, রাজা তাহাকে ও তাহার সহচরবর্গকে অত্যন্ত ভৎসনা করিয়া তিন তিন বার সতর্ক করিয়া দিলেন। কিন্তু তথাপি তাহাদের চৈতন্য হইল না। তখন প্রজাপুঞ্জ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া রাজাকে বলিল, "মহারাজ, রাজপুত্র বিজয়ের প্রাণসংহার করুন।"

অগত্যা রাজা সিংহবাহু রাজপুত্র বিজয় ও তাহার সাতশত সহচরগণের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ও তাহাদিগকে একটি পোতে আরোহণ করাইয়া সমুদ্রে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাহাদের স্ত্রীপুত্র কন্যাগণকেও ঐ সঙ্গে নির্ব্বাসিত করা হইল। মহিলাগণকে ও বালক বালিকাগণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পোতে স্থাপন করা হয়। কিন্তু ইহাদের পোত গুলি ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে উপনীত হইয়াছিল। বালক বালিকারা যে দ্বীপে উপনীত হইল, তাহার নাম হইল "নগ্নদ্বীপ"। মহিলারা যে দ্বীপে উপনীত হইলেন, তাহার নাম হইল "মহিলা দ্বীপক।" বিজয় প্রথমে "সুপ্পারক" নামক পত্তনে উপনীত হইলেন ১। কিন্তু সেখানেও তাঁহার অনুচরেরা নানাবিধ উৎপাত ও অত্যাচার করিতে থাকায়, বিজয় সেই স্থান হইতে সমুদ্র যাত্রা করিয়া লঙ্কাদ্বীপের অন্তর্গত তাম্রপর্ণী নামক স্থানে উপনীত হইলেন। কথিত আছে যে তিথিতে তথাগত বুদ্ধ মহানির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, সেই দিনেই বিজয় লঙ্কাদ্বীপে পদার্পণ করেন।

১। অনেকে অনুমান করেন এই 'সুপ্পারক' (সং 'শূর্পারক') বোম্বাইয়ের উত্তরে থানা জেলার অন্তর্গত 'সোপার' নামক প্রসিদ্ধ বন্দর। সম্ভবতঃ ইহাই 'সোফার বা 'ওফার' (Ophir) নামে প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলোনিয়াতে পরিচিত ছিল।

বিজয় লঙ্কাদ্বীপবাসিনী এক যক্ষীকে বিবাহ করিলে, তাহার গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। বিজয় যক্ষদের রাজাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাঁহার রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, এবং তাম্রপর্ণী প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। বিজয়ের পিতা সিংহবাহু এক সিংহকে স্বহস্তে হনন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি "সিংহল" হইয়াছিল। বিজয় পিতার উপাধি গ্রহণ করিয়া ঐ নামেই পরিচিত হইলেন। কথিত আছে, এই উপাধি হইতেই লঙ্কাদ্বীপের নাম 'সিংহল' হইয়াছিল। বিজয়ের মন্ত্রিগণ স্ব স্ব নামে এক একটী গ্রাম বা নগর স্থাপন করিয়া কোনটির অনুরাধ গ্রাম, কোনটির উপতিস্য গ্রাম, কোনটির উজ্জেনী, কোনটির উরুবেলা এবং কোনটির বিজিত নাম রাখিলেন।

বিজয়ের মন্ত্রিগণ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি বলিলেন, "কুলেশীলে আমার যোগ্যা মহিষী না হইলে, আমি অভিষিক্ত হইব না।" তখন মন্ত্রিগণ দক্ষিণ ভারতের মধুরা নগরীর (Madura) পাণ্ডুরাজের নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহার কন্যাকে বিজয়ের মহিষীরূপে প্রার্থনা করিলেন। পাণ্ডুরাজ তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহার কন্যাকে এবং নগরবাসিগণের আরও কতিপয় কন্যাকে মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার ও যৌতুক দিয়া হস্তী অশ্ব ও রথ সহ, সিংহলদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা পোতযোগে সিংহলে উপস্থিত হইলে, বিজয় মধুরাপতি পাণ্ডুরাজকন্যাকে রাজমহিষী রূপে গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার মন্ত্রী ও অমাত্যেরা অন্য কন্যাদের পাণিগ্রহণ করিলেন ২।

পাণ্ডুরাজকন্যা রাজমহিষী হইলে, বিজয় তাঁহার পূর্ব্বপরিণীতা যক্ষীর ও তাহার গর্ভজাত পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহাদিগকে যক্ষদের দেশে পাঠাইয়া দিলেন, এবং পাণ্ডুরাজের দূত ও অমাত্যগণকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন। তিনি প্রতিবৎসর পাণ্ডুরাজকে লক্ষমুদ্রা মূল্যের একটী শাঙ্খমুক্তা উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিতেন। এইরূপে সিংহলদ্বীপে রাজ্যস্থাপন করিয়া তাম্রপর্ণী নগরীতে বিজয় ৩৮ বৎসর রাজ্যসুখ ভোগ করিয়াছিলেন।

বিজয় অপুত্রক থাকায়, তাঁহার ভ্রাতা সুমিত্রকে সিংহলদ্বীপে আসিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু রাজা সিংহবাহুর মৃত্যুর পর, সুমিত্র সিংহপুরের রাজা হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি বিজয়ের পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার পুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। অতএব তোমাদের মধ্যে কেহ লঙ্কাদ্বীপে গিয়া আমার ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য গ্রহণ কর।" সুমিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডুবাসুদেব লঙ্কায় যাইতে সম্মত

২। অজন্তাগুহার অঙ্কিত একটী চিত্রের প্রতিলিপি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার "Indian Shipping" নামক গ্রন্থে মুদ্রিত করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন সেই চিত্রটি বিজয়ের লঙ্কাদ্বীপের প্রথম অবতরণ সম্বন্ধে। কিন্তু আমার মনে হয়, তাহা মধুরার রাজকন্যা প্রভৃতির লঙ্কাদ্বীপে আগমন সূচিত করিতেছে। বিজয় যখন প্রথম লঙ্কায় উপনীত হন, তখন তাঁহার সহিত কোনও মহিলা বা হস্তী অশ্ব ছিল না। কিন্তু অজন্তাগুহার চিত্রে বহু মহিলা এবং হস্তী অশ্ব রথও দেখিতে পাওয়া যায়।

হইলেন এবং সঙ্গে বত্রিশজন মন্ত্রী ও অমাত্য লইয়া সমুদ্রপথে লঙ্কাযাত্রা করিলেন। তাঁহারা লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হওয়ার একবৎসর পূর্ব্বে বিজয় স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর মন্ত্রিবর্গই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। সানুচর বাসুদেব লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন ৩।

খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে বিজয় লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন। সেই সুদূর অতীতকালে শত শত অনুচরবর্গের সহিত তিনি যে পোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার আকার যে প্রকাণ্ড ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। মধুরাধিপ পাণ্ডুরাজ পোতযোগে স্বকীয় কন্যা ও অন্যান্য কন্যাদিগের সহিত অমাত্যবর্গ এবং হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতিও লঙ্কাতে পাঠাইয়াছিলেন। অতএব, প্রাচীনকালের পোতগুলি অশ্ব ও হস্তীর ন্যায় বৃহৎ জন্তুদিগকেও যে বহন করিতে পারিত, তাহা দেখা যাইতেছে।

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত "বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতার" ৭৩ পল্লবে মগধের সম্রাট্ অশোক সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। অশোক তাঁহার রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে একদিন রাজসভায় সমাসীন ছিলেন, এমন সময়ে সমুদ্রযাত্রায় সর্ব্বনাশ হেতু শোকার্ত্ত কতকগুলি বণিক্ আসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক রাজাকে বিজ্ঞাপন করিল "হে দেব, আপনার ভুজচ্ছায়ায় পৃথিবীর সকল লোকই বিশ্রান্ত রহিয়াছে। আপনার রাজ্যে কেহই চিন্তা-সন্তপ্ত-চিত্ত নহে। পরন্তু আমাদের প্রবহনটি (সমুদ্র গামী পোত) ভগ্ন হওয়ায়, যাহা কিছু ধনরত্ন ছিল, তৎসমুদায়ই সাগরবাসী নাগগণ হরণ করিয়াছে। আমাদের সর্ব্বস্ব নষ্ট হওয়ায় সমুদ্রযাত্রার উচ্ছেদ হইয়াছে। হে বিভো, আপনি এ বিষয়ে উপেক্ষা করিলে, আমাদের আর জীবিকার উপায় নাই।" অর্থাৎ, আমাদিগকে অন্যবিধ জীবিকোপায় অবলম্বন করিতে হইবে, এবং আপনার উপেক্ষার জন্য রাজকোষেও আর অর্থ-সমাগম হইবে না ৪। রাজা তাহাদের এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন ও চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী ইন্দ্র নামক জনৈক ভিক্ষু বলিলেন "রাজন্, রত্নচোর নাগগণের নিকট আপনার প্রতাপাগ্নিসূচক তাম্রপট্টে লিখিত পত্র প্রেরণ করুন।" রাজা তাহাই করিলেন, কিন্তু নাগগণ তাঁহার আদেশ অমান্য করিল। তখন তিনি ভগবান্ বুদ্ধদেবের উপাসনা করিলেন। বুদ্ধদেবের কৃপাবলে নাগগণ তাঁহার বশীভূত হইল এবং অপহৃত সমস্ত রত্নভার স্কন্ধে বহন করিয়া রাজার নিকট আনয়ন করিল। রাজা সেই অপহৃত ধনরত্ন বণিক্‌গণকে প্রদান করিয়া নাগগণকে বিদায় করিলেন। সম্ভবতঃ এই নাগগণ জলদস্যু ছিল।

৩। মহাবংশ (ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়)

৪। বয়ংস্বত্র জীবাম ত্বদুপেক্ষাভুতে বিভো।

সমুদ্র-যাত্রা-বিচ্ছেদাৎ কোশশেষ বিধায়িনী॥

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতার" বঙ্গানুবাদ ৺শরচ্চন্দ্রদাস মহাশয় করিয়াছিলেন। কিন্তু উদ্ধৃত অনুবাদের শেষাংশটি যথাযথ হয় নাই।

বৌদ্ধগ্রন্থ "বিনয়পিটকে" পুন্ন বা পূর্ণনামধারী জনৈক বণিকের উল্লেখ আছে। এই বণিক ছয় বার সমুদ্র যাত্রা করিয়া সপ্তম বার সমুদ্র-যাত্রার উপলক্ষে শ্রাবস্তী-নগর-বাসী কতিপয় বৌদ্ধের সহিত মিলিত হন, এবং তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের সঙ্কল্প করেন। কথিত আছে যে, পূর্ণ স্বয়ং শ্রাবস্তীনগরে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণ করেন, এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অন্যান্য বণিক্‌গণকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বণিকেরা সুপ্পারক পত্তনে একটী বৌদ্ধ বিহারও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। "দীঘনিকয়" নামক পুস্তকে (১।২২২) লিখিত আছে যে, সমুদ্রগামী বণিকেরা তাঁহাদের পোতে এক জাতীয় পক্ষী লইয়া যাইতেন। সমুদ্রের কূল কতদূরে আছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহারা এই পক্ষী গুলিকে উড়াইয়া দিতেন। যদি নিকটে সমুদ্রকূল থাকিত, তাহা হইলে তাহারা আর পোতে ফিরিয়া আসিত না; কিন্তু কূল দেখিতে না পাইলে, তাহারা পোতে প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

বৌদ্ধ "জাতক" সমূহেও সমুদ্র যাত্রার বহু উল্লেখ দেখা যায়। "বভেরু জাতকে" অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ভারতবর্ষের সহিত বভেরু (ববিরু) বা বাবিলনের বাণিজ্য-সম্বন্ধ থাকার উল্লেখ আছে। হিন্দু বণিকেরা বভেরু দেশে বহু ময়ূর রপ্তানী করিতেন। অধ্যাপক বুলার (Bühler) বলেন যে খৃঃ পূঃ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে এইরূপ বাণিজ্য-সম্বন্ধ থাকিলেও, তাহা যে বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। "সমুদ্র বণিজ্য-জাতকে" এইরূপ একটী গল্প আছে যে, বারাণসী নগরের অনতিদূরে একটী গ্রামে এক হাজার ঘর সূত্রধর বাস করিত। তাহারা কাষ্ঠের কতক গুলি আসবাব প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য অগ্রিম দাদন লইয়া যথাসময়ে সেগুলি দিতে অসমর্থ হওয়ায় সঙ্গোপনে একটী পোত প্রস্তুত করিয়াছিল, এবং সেই পোতে তাহাদের পরিজনবর্গকে আরোপিত করিয়া গঙ্গাপ্রবাহ অনুধাবন করিতে করিতে মধ্য সমুদ্রে আসিয়া উপনীত হয়; পরে সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী একটী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। "বাল-হস্‌স-জাতকে" লিখিত আছে যে একটী পোতে পাঁচ শত বণিক ছিলেন; কিন্তু পোতটি সমুদ্র-জলে নিমগ্ন হওয়ায়, তাঁহারা এক ভয়াবহ স্থানে নিক্ষিপ্ত হন। "সুপ্পারক জাতকে" এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, ভারুকচ্ছ বা বরোচ বন্দর হইতে সাত শত বণিক্ একটী পোতে আরোহণ করিয়া দূর সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছিলেন; আর এই পোতের কর্ণধার ছিলেন একজন সুদক্ষ, অথচ অন্ধ নাবিক! "মহাজনক-জাতকে" লিখিত আছে যে, একজন রাজপুত্র চম্পা নগরী হইতে কতক গুলি বণিকের সহিত পোতে আরোহণ করিয়া "সুবন্ন ভূমি" (সুবর্ণ-ভূমি) অর্থাৎ ব্রহ্ম-দেশাভিমুখে গমন করিতে করিতে পোত-সহ সমুদ্রজলে নিমগ্ন হন; কিন্তু দৈব-ক্রমে রক্ষা পান। "সাঙ্খ জাতকে" লিখিত আছে যে বারাণসী নগরে এক দান শীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দানের পরিমাণ প্রত্যহ ছয় লক্ষ মুদ্রা ছিল। তাঁহার সঞ্চিত ধন এইরূপে ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হইতে থাকায়, তিনি সুবর্ণভূমিতে গিয়া অর্থসংগ্রহের বাসনা করিলেন। তদনুসারে তিনি একটী সমুদ্রগামী পোত নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ করিলেন, এবং একদিন স্ত্রী ও পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া

সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সপ্তম দিবসে তাঁহার পোত মধ্য সমুদ্রে উপনীত হইলে, তাহার তলদেশ ভগ্ন হইল, এবং পোতের মধ্যে সমুদ্র জল প্রবেশ করিতে লাগিল। পোত মগ্নপ্রায় হইলে, কোনও কৃপাময়ী দেবীর অনুকম্পায় তাঁহার উদ্ধারের জন্য একটী রত্নময় পোত সেই স্থানে আবির্ভূত হইল। ইহা দৈর্ঘ্যে ৮০০ হাত ও উচ্চতায় ২০ হাত ছিল। ইহার তিনটি মাস্তুল মাণিক্য নির্ম্মিত, ও ইহার রজ্জুসমূহ স্বর্ণ-তার হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং ইহার পালসমূহ রজতময় ও ক্ষেপণী ও কর্ণ (হাল) স্বর্ণময় ছিল। অধিকন্তু এই পোতটি স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মুক্তা ও প্রবাল প্রভৃতি রত্নে পূর্ণ ছিল। "সুসোন্দি জাতকে" লিখিত আছে যে, ভারুকচ্ছ পত্তন হইতে কতিপয় বণিক্ সুবর্ণ-ভূমি অভিমুখে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। এই জাতকসমূহে সুবর্ণ-ভূমির উল্লেখ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় বণিকেরা পোতারোহণ করিয়া ব্রহ্মদেশ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন। তাঁহাদের পোতগুলির আকারও যে বৃহৎ ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আরও জানা যাইতেছে যে, সেই প্রাচীনকালে বারাণসী, পাটলীপুত্র এবং চম্পা (ভাগলপুর) হইতেও পোতসকল সমুদ্রযাত্রা করিত ৫।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠশতাব্দীতে বঙ্গদেশ হইতে বিজয় ও তাঁহার অনুচরবর্গ লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন। মহাবংশে লিখিত আছে যে, ইঁহাদের পূর্ব্বেও স্বয়ং বুদ্ধদেব লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন। "জাতক" সমূহ পাঠ করিয়াও দেখা যাইতেছে যে, বুদ্ধদেবের সময়েও কিম্বা তাঁহার পরবর্ত্তীকালে বণিকেরা সুবর্ণভূমি প্রভৃতি দেশে গমন করিতেন। সুবর্ণভূমির (ব্রহ্মদেশের) দক্ষিণ দিকে সুমাত্রা যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপও যে রামায়ণ-রচনার সময়ে আর্য্যবণিকগণের সুপরিচিত ছিল, তাহা রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায় ৬। মহাভারতেও বণিকগণের সমুদ্র হইতে ধন আহরণের এবং সমুদ্রমধ্যে নৌকা-নিমজ্জনের বহু উপমা দৃষ্ট হয় ৭। পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয় কালে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত কতিপয় দ্বীপও যে স্বাধিকারে আনিয়াছিলেন, মহাভারতে তাহারও উল্লেখ আছে। (সভাপর্ব্ব ২৯।৩০ অধ্যায়)। মন্বাদি স্মৃতিসমূহেও সমুদ্রযাত্রী বণিকগণের উল্লেখ আছে :—

> সমুদ্রযান-কুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
> স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং স তত্রাধিগমং প্রতি ॥ (মনু ৮।১৫৭)

অর্থাৎ সমুদ্রযান-কুশল দেশকালার্থদর্শী ব্যক্তিগণ সুদপ্রাপ্তি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই পাইবে।

> দীর্ঘাধ্বনি যথা দেশং যথাকালং তরোভবেৎ।
> নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্ ॥ (মনু ৮।৪০৬)

অর্থাৎ "দেশ ও কালানুসারে দীর্ঘপথে তর-পণ্য (বা নৌকাভাড়া) স্থিরীকৃত হইবে ; কিন্তু তাহা নদীবিষয়ে জানিবে, সমুদ্র-গমনে কোনও নিয়ম নাই।"

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "Indian Shipping" (P P. 71—78) পাঠ করুন।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় সমুদ্রযাত্রী বণিকদিগকে ঋণদানের ব্যবস্থা এইরূপ লিখিত আছে :—"যে সকল সমুদ্রগামী বণিক ঋণগ্রহণ করিয়া বাণিজ্যে লাভ করিবার নিমিত্ত প্রাণ-ধন- বিনাশ-শঙ্কা-স্থান সমুদ্রে গমন করিবে, তাহাদিগকে মাসে মাসে শতকরা কুড়ি মুদ্রা সুদ দিতে হইবে ৮।"

মনু সমুদ্র-যাত্রী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (৩।১৫৮) সম্ভবতঃ মনুর সময় হইতেই ব্রাহ্মণের পক্ষে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বৌধায়ণ ধর্ম্মসূত্রেও (২।২।২) নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকে সমুদ্রযাত্রা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে (১।২ ৪) আরও উক্ত হইয়াছে যে উত্তরাপথের, অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণেরা এই নিষেধ মানেন না। উক্ত ধর্ম্মসূত্রে এবং গৌতম ধর্ম্মসূত্রেও (১০।৩৩) সমুদ্রযাত্রী বণিককে কত পোতকর দিতে হইত, তাহা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

এই সমস্ত প্রমাণের আলোচনা করিয়া বুঝা যাইতেছে যে বৌদ্ধযুগে এবং তাহারও বহুপূর্ব্ব হইতেই আর্য্যবণিকগণ ভারত হইতে সমুদ্রযাত্রা করিতেন। ঋগ্বেদের মন্ত্ররচনাকালেও আর্য্য-বণিকগণ (পণিগণ) ধনার্জ্জনার্থ যে সমুদ্রযাত্রা করিতেন, ঋগ্বেদের বহুমন্ত্রে তাহার উল্লেখ দেখা যায় ৯।

কাশ্মীরীয় কবি সোমদেব প্রণীত "কথাসরিৎসাগর" নামক সংস্কৃত কাব্যে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় বহু প্রাচীন উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এইস্থলে দুই একটী উপাখ্যানের উল্লেখ করিব। উক্ত গ্রন্থের নবম লম্বকের প্রথম তরঙ্গে অলঙ্কারবতীর উপাখ্যান মধ্যে রাজা পৃথ্বীরূপের কাহিনী আছে ১০। তাহা এইরূপ :—

৬। রামায়ণ, কিষ্কিন্ধা, ৪০ সর্গ পাঠ করুন :--

সমুদ্রমবগাঢ়াংশ্চ পর্ব্বতান্ পত্তনানি চ।

* * * * *

যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্।

সুবর্ণরূপ্যকদ্বীপং সুবর্ণকর-মণ্ডিতম্॥ ইত্যাদি

সুবর্ণদ্বীপ ও রূপ্যকদ্বীপ যেখানে সুবর্ণকর বা স্বর্ণোত্তোলনকারিগণ বাস করিত।

৭। বণিক্ যথা সমুদ্রাদ্বৈ যথার্থং লভতে ধনম্। তথ মর্ত্ত্যার্ণবে জন্তোঃ কর্ম্মবিজ্ঞানতো গতিঃ॥ (শান্তিপর্ব্ব)

ভিন্ননৌকা যথা রাজন্ দ্বীপমাসাদ্য নির্বৃতাঃ। ভবন্তি পুরুষব্যাঘ্র নাবিকাঃ কালপর্য্যয়ে॥ (দ্রোণপর্ব্ব)

বণিজো নাবি ভিন্নায়ামগাধে হ্লবা যথা। অপারে পারমিচ্ছন্তো হতে দ্বীপে কিরীটিনা॥ কর্ণপর্ব্ব) ইত্যাদি

৮। "যে সমুদ্রগা বৃ [illegible] ধনং গৃহীত্বা অধিলাভার্থং প্রাণধনবিনাশ শঙ্কা-স্থানং সমুদ্রং গচ্ছন্তি, তে বিংশং শতকং মাসি মাসি দদ্যুঃ।"

(মিতাক্ষরা, ব্যবহা ধ্যায়, ঋণদানপ্রকরণ)

৯। লেখক রচিত "বৈদিকযুগে সমুদ্রযাত্রা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করুন। ("ভারতের সাধনা" মাঘ সংখ্যা ১৩৩৬)

১০। রাজার নাম পৃথ্বীরূপ ; কিন্তু ৺অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত "প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা" নামক পুস্তকে এবং অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "Indian Shipping" নামক পুস্তকে তাঁহার নাম "পৃথ্বীরাজ" দেওয়া হইয়াছে।

দক্ষিণাপথে প্রতিষ্ঠান নামে এক বৃহৎ জনপদ ছিল; তাহার রাজার নাম পৃথ্বীরূপ। একদা দুইজন বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁহার রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মহারাজ, আমরা সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছি; কিন্তু কোথাও আপনার তুল্য সুরূপ পুরুষ বা আপনার যোগ্যা সুরূপা নারী দেখি নাই। কেবল মুক্তিধর দ্বীপের রাজা রূপধর ও রাণী হেমলতার একটী কন্যা দেখিয়াছি, যিনি সৌন্দর্য্যে আপনার সমকক্ষা ও যোগ্যা হইতে পারেন। এই কন্যাটির নাম রূপলতা। আপনারা উভয়েই পরস্পরের যোগ্য, এবং আপনারা উভয়ে পরস্পরে উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইলে আপনারা সুখী হইবেন ও আপনাদের প্রভূত মঙ্গল হইবে। পৃথ্বীরূপ ভিক্ষুদ্বয়ের এই বাক্য শুনিয়া রূপলতাকে লাভ করিবার জন্য সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন, এবং চিত্রকর কুমারীদত্তকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন "তুমি আমার একটী চিত্র অঙ্কন কর, এবং তাহা লইয়া ভিক্ষুদ্বয়ের সহিত মুক্তিপুর দ্বীপে গমন কর। তথায় উপনীত হইয়া কৌশলক্রমে আমার চিত্রটি রাজা রূপধর ও তাঁহার কন্যা রূপলতাকে দেখাও। রাজা আমাকে তাঁহার কন্যাটি দান করিতে সম্মত আছেন কি না, তাহাও জানিয়া আইস, এবং রূপলতারও একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া আন।" কুমারীদত্ত অবিলম্বে পৃথ্বীরূপের একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়া, ভিক্ষুদ্বয়ের সমভিব্যাহারে সমুদ্রতটবর্ত্তী পুত্রপুর নামক স্থানে উপনীত হইলেন, এবং সেই স্থানে একটী পোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রে পাঁচদিন সঞ্চরণপূর্ব্বক মুক্তিপুর দ্বীপে উপনীত হইলেন। মুক্তিপুরের রাজপ্রাসাদের বহির্দ্বারে কুমারীদত্ত এই মর্ম্মে একটী বিজ্ঞাপন লিখিয়া দিলেন যে, তাঁহার মত চিত্রকর পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। রাজা এই বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম অবগত হইয়া চিত্রকরকে তাঁহার সমীপে আহ্বান করিলেন। চিত্রকর বলিলেন "রাজন্, আমি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি যে, কোথাও আমার সমকক্ষ চিত্রকর নাই। দেবতা, অসুর বা কোন মনুষ্যের চিত্র অঙ্কিত করিতে আমাকে আদেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" রাজা তাঁহার কন্যা রূপলতাকে সমীপে আহ্বান করিয়া চিত্রকরকে বলিলেন "তুমি আমার এই কন্যার একটী চিত্র অঙ্কিত কর।" রাজাজ্ঞা পাইয়া কুমারীদত্ত কতিপয় দিবসের মধ্যে রূপলতার এক মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিলেন। রাজা তদ্দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া চিত্রকরকে বলিলেন "তুমি সমগ্র পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়াছ; রূপলতার তুল্য সুন্দরী নারী বা তাহার সমকক্ষ সুন্দর পুরুষ আর কোথাও দেখিয়াছ কি?" কুমারীদত্ত বলিলেন, "প্রতিষ্ঠানের রাজা পৃথ্বীরূপ ব্যতীত ইঁহার সমকক্ষ রূপবান্ কোনও পুরুষ দেখি নাই এবং ইঁহার তুল্যা রূপবতী নারীও নাই। আমি পৃথ্বীরূপের সৌন্দর্য্য দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, আমি স্বহস্তে তাঁহার একটী চিত্র অঙ্কিত করি। সেই চিত্রটি আমার নিকটেই আছে; ইচ্ছা হইলে, তাহা দেখিতে পারেন।" রাজা রূপধর পৃথ্বীরূপের চিত্র দেখিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইলেন। রাজকন্যা রূপলতাও কেবল যে বিস্মিতাই হইলেন, তাহা নহে; পরন্তু পৃথ্বীরূপকে স্বামীরূপে লাভ করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুলাও হইলেন। পৃথ্বীরূপ তাঁহার যোগ্যা সুরূপা নারীর অভাবে এখনও অবিবাহিত আছেন, কুমারীদত্তের নিকট এই কথা শুনিয়া, রাজা রূপধর তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি এই ভিক্ষুদ্বয় ও আমার দূতসহ অদ্যই যাত্রা কর, এবং প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া আমার কন্যার এই চিত্র রাজা

পৃথ্বীরূপকে প্রদর্শন কর। যদি রাজা আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই দ্বীপে শীঘ্র শুভাগমন করিতে অনুরোধ ও আমন্ত্রণ কর।" যথাসময়ে কুমারীদত্ত এবং রাজা রূপধরের দূত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে উপনীত হইয়া পৃথ্বীরূপকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং রাজকন্যা রূপলতার চিত্রও দেখাইলেন। রাজা সেই চিত্রদর্শনে রাজকন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র ও ব্যাকুল হইয়া একটী শুভদিনে সৈন্য সামন্ত ও হয়হস্তীসহ মুক্তিপুর দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা পুত্রপুরে উপনীত হইয়া তথায় পোতারোহণ পূর্ব্বক অষ্টম দিবসে মুক্তিপুরদ্বীপে অবতরণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, রাজা রূপধর তাঁহার যথোচিত সম্মান ও সমাদর করিয়া তাঁহার হস্তে রূপলতা কন্যাকে সম্প্রদান করিলেন। পৃথ্বীরূপ মুক্তিপুরে আমোদ প্রমোদে দশটি দিন অতিবাহিত করিয়া, রাজা রূপধরের অনুমতি লইয়া, পত্নীসহ পোতারোহণ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

"কথা সরিৎসাগরের' নবম লম্বকের দ্বিতীয় তরঙ্গে বণিক্ হিরণ্যগুপ্তের কাহিনী আছে। হিরণ্যগুপ্ত নামে এক ধনবান্ বণিক্ অনঙ্গপ্রভা নাম্নী একটী রূপবতী ও বিলাসপরায়ণা নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই নারী ভোগ-বিলাসে সাতিশয় আসক্ত থাকায়, ইহার ভোগবিলাস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য হিরণ্যগুপ্তের সঞ্চিত ধনসম্পত্তির ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে লাগিল। অগত্যা হিরণ্যগুপ্ত বাণিজ্যার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। অনঙ্গপ্রভার প্রতি তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত আসক্ত থাকায়, তিনি তাঁহাকেও সঙ্গে লইলেন। পণ্যদ্রব্যদ্বারা পোত পূর্ণ করিয়া তিনি সমুদ্রপথে সুবর্ণভূমি নামক দ্বীপে উপনীত হইলেন। ঐ দ্বীপের সাগরপুর নামক নগরে ধীবরগণের রাজা সাগর-বীর নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। সাগর-বীরের একটি পোতে আরোহণ করিয়া, তাহার ও স্বীয় পত্নী অনঙ্গপ্রভার সহিত, তিনি সমুদ্র-যাত্রা করিলেন। কতিপয় দিবস জলপথে নির্ব্বিঘ্নে ভ্রমণের পর, একদিন আকাশে প্রলয়কালের ন্যায় ভয়ঙ্কর মেঘ উঠিল এবং মেঘে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সমুদ্রে ভয়ানক বাত্যা উত্থিত হইল, এবং ঝটিকার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে বারি-বর্ষণও হইতে লাগিল। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার দ্বারা প্রতিহত হইয়া পোতখানি সমুদ্র জলের মধ্যে নিমগ্ন হইতে লাগিল। এই বিপৎকালে নাবিকগণ প্রাণরক্ষার উপায় না দেখিয়া করুণ স্বরে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্থিত হাহাকার ধ্বনির মধ্যে হিরণ্যগুপ্ত অনঙ্গপ্রভাকে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়াও দেখিতে না পাইয়া শেষ মুহূর্ত্তে নিজ প্রাণরক্ষার জন্য উত্তাল তরঙ্গসমূহের মধ্যে ঝম্পপ্রদান করিলেন। বহুক্ষণ সমুদ্রের মধ্যে সন্তরণ করিতে করিতে তিনি অদূরে একটী বাণিজ্যপোত দেখিতে পাইয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নাবিকেরা বহুকষ্টে এই জলমগ্ন বণিককে তাহাদের পোতে তুলিয়া লইল। বাত্যা-তাড়িত হইয়া এই পোতখানি ভীষণ তরঙ্গমালার সহিত পাঁচদিন যুদ্ধ করিতে করিতে অবশেষে সমুদ্রকূলে উপনীত হইল। হিরণ্যগুপ্ত তটে অবতীর্ণ হইয়া অনঙ্গপ্রভার জন্য শোক করিতে করিতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

এদিকে পোত মগ্ন হইতে দেখিয়া সাগরবীর কতকগুলি কাষ্ঠফলককে সুদৃঢ় রজ্জুদ্বারা একত্র

বন্ধন করিয়া তাহার উপর অনঙ্গপ্রভাকে আরোপণ পূর্ব্বক নিজেও তাহাতে আরোহণ করিল। সে সাতিশয় কষ্টে উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে সেই ক্ষুদ্র উড়ুপটকে চালিত করিয়া একদিন পরে নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্রতটে উপনীত হইল। অনঙ্গপ্রভা তাহার স্বামীর সহিত সঙ্গত হইবার আর কোনও উপায় না দেখিয়া, এবং তাহার নিশ্চিত মৃত্যু হইয়াছে ইহা মনে করিয়া, সেই ধীবর-রাজের গৃহেই বাস করিতে লাগিল।

"কথাসরিৎসাগরে" সমুদ্রশূর নামক বণিকের কাহিনীতে দেখা যায় যে, এই বণিক সুবর্ণ ভূমিতে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্রে ভয়ঙ্কর ঝটিকা উত্থিত হইলে, তাঁহার পোতখানি জলমগ্ন হয়। তখন তিনি জলমধ্যে সন্তরণ করিতে করিতে একটি শবদেহ দেখিতে পাইয়া তাহার উপর আরোহণ পূর্ব্বক কোনওরূপে তীরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে এই সমস্ত প্রাচীন কাহিনী পাঠ করিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে যে ভারতীয় বণিক্‌গণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, ভারতমহাসাগর, ও আরবোপসাগর অতিক্রম পূর্ব্বক একদিকে বাভেরু (ব্যাবিলন), মিশর ও আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে, এবং অপরদিকে সুবর্ণভূমি ও ভারতমহাসাগরান্তর্ব্বর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে গিয়া স্বদেশে বহু ধনরত্ন লইয়া আসিতেন। সেই প্রাচীনকালে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সামুদ্রিক পোত গঠনের ও সমুদ্রে পোত পরিচালন-পদ্ধতির সবিশেষ উন্নতি হয় নাই। তথাপি নির্ভীক ভারতীয় বণিক্‌গণ সমুদ্র-যাত্রা করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না। স্মরণাতীত বৈদিক যুগ হইতে আর্য্য পণিগণ যে সমুদ্র যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের বংশধরগণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। আর এই সুদীর্ঘকালের মধ্যেই ভারতবর্ষ শৌর্য্য, বীর্য্যে, ধনসম্পত্তিতে ও সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যে দিন ভারতীয় স্মৃতিকারগণ হিন্দুর পক্ষে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ করিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। কিন্তু এই নিষেধ সত্ত্বেও ভারতীয় নাবিক্‌গণ পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ বহু শতাব্দী ধরিয়া সমুদ্র যাত্রা করিতেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফা-হীয়ান তাম্রলিপ্তিতে (তমোলুকে) ও সিংহলদ্বীপের পত্তনসমূহে হিন্দু বণিকগণের বহু বাণিজ্যপোত দেখিয়াছিলেন, এবং এইরূপ একটী হিন্দুপোতে আরোহণ করিয়াই তিনি সিংহল হইতে যবদ্বীপে এবং যবদ্বীপ হইতে চীন দেশে গমন করিয়াছিলেন। সেই পোতে যে অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ফা-হীয়ান্ তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলাদেশের প্রাচীন কাব্য সমূহে ধনপতি সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগর, এবং চাঁদসদাগর প্রভৃতি হিন্দু বণিকগণের সমুদ্র-যাত্রার কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইঁহারা খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীর লোক ছিলেন। তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, কোন্ সময় হইতে হিন্দু সাধারণের পক্ষে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল?

---

১১ "সদাগর" "বা সওদাগর" আরবী শব্দ। সম্ভবতঃ আরবদেশীয় প্রসিদ্ধ বণিকগণের উপাধির অনুকরণেই ইঁহাদিগকে "সদাগর" বলা হইয়াছে।

জয় পরাজয়।

'ওপারের কথা'র লেখক'

খেয়ালই বিরাট প্রকৃতির ধারা। তাঁর চিরকালের খেয়াল—গড়া-ভাঙ্গা ও ভাঙ্গা-গড়া! এই খেয়ালের ঝোঁকটা যখনই যে দেশের ঘাড়ে চাপে তখন সেই দেশে মার্ মার্ কাট্ কাট্ রব বিছিয়ে পড়ে। এই ক-বছরের মধ্যে এই খেয়াল জার্ম্মাণী, রুসিয়া, আয়রলণ্ড, মিশর, ইতালী, ও চীনদেশকে নূতন ক'রে গড়ে তুলতে উঠে প'ড়ে লেগে গেছে। গড়তে গেলেই ভাঙ্গতে হয়—তাই হুলস্থুল ও বেঁধে যায়।

বিরাট প্রকৃতির খেয়ালি-নজরটা এবার ভারতের দিকে প'ড়েছে। পড়া ব'লে পড়া—বিষম খেয়ালি ও অভিনব ভাবে পড়েছে। ঢাল নেই, তরোয়ার নেই নিধিরাম সর্দ্দার ক'রে ভারতকে নামিয়েছে এক প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে! বিরাট প্রকৃতিই তাঁর খেয়াল বজায় করবার জন্যে ভর করেছেন একজনের উপর। এই একজনের এক ডাকে সাড়া দিয়েছেন যারা ভারতের শত শত কর্ম্মবীর ও অগণন সৈনিক। তাঁরা জনে জনে জানেন যে হয় রক্তারক্তি হ'তে হবে, নয় জেলে প'চে ম'রতে হবে, আর না হয়, এই বড় সাধের প্রাণটাকে সস্তায় বিলিয়ে দিতে হবে। তবুও কি তাঁদের হুস আছে—কি-যেন-কি-এক টানে গা ঢেলে দিয়ে--সবাই হা'সতে হা'সতে বলির চোপ খেতে ছুটেছে। এই লোকগুলোর মাত্লামি বা পাগ্লামি দেখে প্রবল শক্তির পৃষ্ঠপোষকরাও 'চাচা আপনার বাঁচা' ধরণের জীবগুলো কেন না বেঁকে দাঁড়াবে বা টিট্‌কিরি দেবে বা বাগে পেলে জয়চাঁদ উমিচাঁদ সেজে ইতিহাসে নাম উঠাতে সচেষ্ট হবে! তাতেও কি পাগল দলের মত্ততা ঘুচেচে! বরং খোদ পাগলের সঙ্গে বড় ছোট পাগলদের মত্ততার মাত্রাটা বেড়েই যাচ্চে! তাই মাথায় ছাতা ধরার দল বল'বে না কেন—"পিঁপড়ের পালক উঠে মরিবার তরে।" আমরা কিন্তু বলি 'ফলেন পরিচীয়তে'।

বাদীপক্ষ হচ্চে নগণ্য প্রজাশক্তি তা আবার সমগ্র ভারতের মাত্র চার আনা অংশ। কিন্তু এই নগণ্য শক্তির পশ্চাতে আপাততঃ অলক্ষিতভাবে বিদ্যমান আরো ছয় হ'তে আট আনা মাত্রার প্রজাশক্তি যাদের কতকটা বদ্ধমূল ধারণা যে তাদের মধ্যে প্রবল শক্তিই নানাভাবে অবজ্ঞা, বিতৃষ্ণা, ও বিশেষ মর্ম্মদাহ অনেককাল হ'তেই জাগিয়েছে ও এখনও জাগাচ্ছে। প্রতিবাদী পক্ষ প্রতাপশালিনী রাজশক্তি ও উহার পৃষ্ঠপোষক হাড় গোড় ভাঙ্গা 'দ' গণ! বাদীপক্ষের দাবী—ওগো প্রবলশক্তি! তোমরা রাজার মত রাজা হ'য়ে থাক, খুব থাক। কিন্তু ভারতের শোষণ পন্থাগুলি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন কর, কালা ধলার বিচারগুলো যথাসম্ভব একই ভাবে কর, ভারতে শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সুব্যবস্থা কর ও বাদীপক্ষকে এই মহাদেশের যাবতীয় কর্ম্ম সুসিদ্ধ ক'রতে সুস্পষ্ট অধিকার তোমাদের সঙ্গে দাও।"

বাদীপক্ষের প্রাপ্য আদায় করবার যোগ্যতা কি? এই পক্ষ বা কিছু খুদ কুঁড়া লাভ ক'রলেও উহা যথাবিহিত রক্ষা করবার শক্তি ধরেন কি? বাদীপক্ষের শ্রেষ্ঠতম নেতা মহাত্মা গান্ধী তাঁর সহকর্ম্মীবর্গ—মহানুভব প্যাটেল, মালব্য, নেহেরু প্রভৃতি শত শত সংযত কর্ম্মবীর। মহাত্মার পুঁজি অদম্য উত্তম, অমূল্য সৎসাহস, দুর্লভ অকপটতা, পূজার্হ নিস্পৃহতা ও বরেণ্য স্বদেশ প্রেমিকতা; তাঁর দীক্ষা ও শিক্ষা—বাক্য, কার্য্য ও চিন্তায় তাঁর প্রত্যেক সহকর্ম্মী কা কথা সমগ্র ভারতবাসী যেন রাজশক্তির প্রতি কোন প্রকার অহিতাচরণে, এমন কি নিদারুণভাবে নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত হ'লেও, প্রবৃত্ত না হন। কথায় কথায় এই দীক্ষা শিক্ষা বেশী কিছু নয়, কিন্তু কার্য্যতঃ এইভাবে চলা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। 'মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন' এই উচ্চতম আদর্শ নিয়ে যাঁরাই অগ্রসর হবেন তাঁরা মুষ্টিমেয় হ'লেও অতি অল্পকালে—অনুমান এক বৎসরের মধ্যে—কিছু না কিছু সুফল লাভ ক'রবেনই করবেন। শান্তং শিবং সুন্দরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং মন্ত্রের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী মহাযোগী ও মহাতপস্বী ব্যতীত এ ধরায় ও এ যুগে যার তার দ্বারা এই মহান তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। ধন্য মহাপুরুষ! তোমার সাধনাও তোমার স্বদেশ প্রেম---শুধু অ কেন তোমার বিশ্বপ্রেম বাস্তবিকই অমূল্য! হে মুক্তজীব! যে প্রেমের আকর্ষণে ও যে অসাধ্য সাধন বলে তুমি শুধু ভারতের নয় সমগ্র মেদিনীর বাদী প্রতিবাদী পক্ষদিগকে এক ক'রতে প্রয়াসী ও তুমি যে মহাশক্তির, মহালক্ষ্মীর ও মহাআনন্দের যাহা কিছু সন্ধান পেয়েছ সমগ্র মানবজাতি উহার সত্যতা বুঝবে, জানবে ও এমন কি প্রত্যক্ষ ও উপভোগ করবে যদি কোন দিন তাদের হীনতম স্বার্থান্ধ ভাব অন্ততঃ চার আনা মাত্রার হ্রাস হয়। এই শান্তিময় ও মঙ্গলময় দান বা অভিনব শিক্ষার জন্য তোমার ও তোমার অধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তির শ্রীচরণে এ দাসের বার বার বিনীত প্রণাম। ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে প্রমাণিত করে যে এ ধারায় কোন বাস্তবিক কল্যাণকর কর্ম্ম বা উদ্ভাবনা নানা নির্ম্মম ঘাত প্রতিঘাত শিরে বহন করেই পরিশেষে বিজয় পতাকা বহন করেছে।

আমরা মানি যে সত্ত্ব রজো ও তমো এই তিন উপাদানে প্রত্যেক জীব গঠিত, কিন্তু প্রত্যেক জীবে এই তিনগুণের মাত্রার পার্থক্য আছে। আধুনিক প্রবল শক্তিসম্পন্ন জাতি প্রায়শঃই আট আনা মাত্রায় তমো, ছয় আনা মাত্রায় রজো ও দুই আনা মাত্রায় সত্ত্বগুণে পূরিত। ভারতের পুঁজি বহুদিন যাবৎ আট আনা মাত্রায় তমো, দুই আনা মাত্রায় রজো ও ছয় আনা মাত্রায় সত্ত্ব। অবশ্য মোটা মুটিভাবে এ কথা বলা হ'ল। রজোগুণের মাত্রার বেশী কম ধ'রে একপক্ষ কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন ও অন্য পক্ষ কতকটা উত্তমশূন্য। তমো ও রজোগুণের প্রভাবে এক পক্ষ মহা স্বার্থপর, লোভী ও দেহবুদ্ধি—অহংবুদ্ধি সম্পন্ন। অপর পক্ষ তমো ও সত্ত্বগুণের প্রভাবে উচ্ছ্বাস ও ভেদাভেদ বুদ্ধি সংযুক্ত। মনে হয়, মহাত্মাজীতে সত্ত্ব ও রজোগুণেরই প্রভাব বেশী।

হিন্দুদিগের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ কালীন দান, ধ্যান, কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম প্রচলিত। গ্রহণের সময় ধরায় অন্ধকারঅর্থাৎ তমোগুণ প্রধান হয়। তমোগুণ প্রাধান্যের সময় তমোগুণ উৎপাদক যা কিছু কর্ম্ম সাধন ক'রলে জীবের প্রাণে, মনে ও অহংবুদ্ধিতে তমোগুণই প্রধান হয়। কিন্তু তৎকালে রজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণের কর্ম্ম সাধিত হ'লে, সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণরূপ বিশাল তমো জীব—দেহস্থিত যৎকিঞ্চিৎ তমো যথাসম্ভব হরণ করে এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রত্যেকের কর্ম্ম ও আধার

অনুসারে রজো সত্ত্বগুণ সঞ্চারিত হয়। ভারতের প্রতিবাদী পক্ষ ও উহার পৃষ্ঠপোষকগণ নিতান্ত স্বার্থান্ধ হয়ে কপটাচরণে বা পাশবকর্ম্ম সাধনে (অন্ততঃ আপাততঃ) পশ্চাৎপদ নন সুতরাং উহাদের এবম্বিধ আচরণ একমাত্র তমোগুণ প্রাধান্য নির্দ্দেশক। প্রতিবাদীপক্ষের এই হীনতর অবস্থায় উহার প্রতি বাক্য কার্য্য ও চিন্তায় প্রতিহিংসা ক্রোধ বা যে কোন অহিতাচরণ অনুমাত্রায় ক'রলে বাদীপক্ষ নিজের পদে নিজেই কুঠার প্রয়োগ ক'রবেন। সুতরাং যা কিছু ভোগ ভুগেও ভারতে সুদিন আনতে তাঁরা সক্ষম হবেন না বা এই শুভদিন আসতে সুনিশ্চিত বিলম্ব হবে। কিন্তু সুদিনের অপেক্ষায় যা কিছু নির্য্যাতন হাসি মুখে সহ্য করলে, প্রতিবাদীপক্ষের সত্ত্ব ও রজোগুণ নির্য্যাতিত ব্যক্তিতে নিঃসন্দেহ সঞ্চারিত হবে ও তৎপরিবর্ত্তে প্রতিবাদীপক্ষ লাঞ্ছিত মানব কুলের যাবতীয় তমোগুণে অধিষ্ঠিত হবেই হ'বে। তমোগুণ প্রধান্যই মৃত্যু বা উচ্ছেদ নির্দ্দেশক। সুতরাং এই বিধানে কর্ম্ম সাধিত হ'লে ভারতের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই তত্ত্ব সম্যকভাবে ধারণা না করে অন্য পন্থা ধরে কর্ম্ম সাধনে সচেষ্ট হলে কেবলমাত্র 'হায়' 'হায়' ভারতে বিছায়ে পড়বে।

ধর্ম্ম ও কর্ম্মে পূর্ণতালাভে বাস্তবিক প্রয়াসী হলে একমাত্র উচ্চ উচ্চতর বা উচ্চতম ধারণা—তা কিন্তু বদ্ধমূল ধারণা—পোষণকরা নিতান্ত আবশ্যক। তা হলেই ঐকান্তিকতা, সাহসিকতা ও কর্ম্মপটুতা লাভ হয়ে সফলতা লাভের পন্থা টুকু সরল হয়ে যায়।

বল শ্রেষ্ঠতম, মানসিক বল
অভাব, অশান্তি, ঘুচে এই বলে
চৈতন্য সঞ্চয়, যে মাত্রায় হয়
মাত্র হাসি খুসী চোখে মুখে খেলে।
চৈতন্যের বীজ জেনো তুমি পাথী
চৈতন্যের তরে এত বড় হলে,
আরো বড় তুমি হবে, ধ্রুব হবে
চৈতন্যই তব ভোজ্য সেবা হলে।
মাত্র চৈতন্যের তুমিরে সন্তান
চৈতন্যই জেনো প্রাণের দোসর,
জড় যাহা কিছু রহে ধরা পুরী
তোমারই তারা কিঙ্করী কিঙ্কর।
'আত্মা' কাছা কাছি 'মন' যবে হয়
লাভ হয় বল আত্মার সমান,
পাশব করমে সে বল খাটালে
পশু হয়ে যায় তেমতি অজ্ঞান।
দেহে রহে 'আত্মা' কাঞ্চনের মত

রহে শিরোপরে সৌধ শশধর
এমতি বিধানে, করিলে সাধন
মিলনের সুখ পাবে নিরন্তর।

উক্তভাবে কর্ম্ম সাধন ক'রতে যে পক্ষই সক্ষম হবেন তিনি মিত্র বা শত্রু হন না কেন, মহাত্মাজীর দীক্ষা শিক্ষায় কৃতার্থ হবেন তাতে সন্দেহ নাই।

ভিক্ষুকের ভিক্ষুকতা ঘুচিবার নয়। শিব ঠাকুর স্বয়ং বিশ্বেশ্বর হয়েও শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার সমীপে ভিক্ষার্থী হওয়াতে মহাদেবী আপন স্বামীকেও হাঁড়ি হাঁড়ি, গামলা গামলা বা ওড়া ওড়া ক'রে না দিয়ে কেবলমাত্র চাম্‌চে করে যা কিছু দেবার দিলেন।

সুতরাং জীব মাত্রেরই সম্যক বুঝা দরকার যে—

"যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা
জান নারে মন, আমি পুত্র তাঁর,
সামান্য-ত নই, রাজপুত্র হই
পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার।"

মহাশক্তি, মহালক্ষ্মী ও মহানন্দ এই দেহের মধ্যে সর্ব্বত্র আছেন, এই ধারণা বদ্ধমূল ক'রে তোমার আমার প্রত্যেক ভাবনায় বা প্রত্যেক বাসনায় বা প্রত্যেক নির্য্যাতনে যদি স্ব স্ব মন ও অহংবুদ্ধিকে দেহের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে প্রাণ খুলে ব'লতে পারি "এটি তাঁরই ভাবনা বা বাসনা বা জ্বালা" তা হ'লে এবম্প্রকার কর্ম্ম দ্বারা মানসিক বলের সহিত কর্ম্মে সাফল্য লাভ করা নিতান্ত সম্ভব। কিন্তু 'আমার ভাবনা' বা 'আমার বাসনা' ব'লে যা-কিছু পোষণ ক'রলে আমার অসম্পূর্ণতার জন্যে সাফল্যের পরিবর্ত্তে আমার জ্বালার মাত্রাই বৃদ্ধি পাবেই পাবে।

অতিমাত্রায় দেহ ও অহংবুদ্ধি সম্পন্ন জীবই অসুরবাচ্য। জীব নিজ সাধন বলে বিরাট প্রকৃতির প্রসাদ লাভ ক'রে আয়ত্ত ক'রলে-দেহ বল, বুদ্ধি বল, ধন বল ও জন বল—তখন আর তাকে পায় কে! তার প্রেসটিজ-দম্ভটা পাহাড়ের মত উচু হওয়াতে সে ধরা খানাকে সরার মত দেখতে লাগলো ও যা করবার নয় তাই ক'রে পাশবাচারের চরম সীমায় গিয়ে দাঁড়ালো! তখন জগন্মাতা চৈতন্যদায়িনী ভাবে সেই অসুরবৎ জীবের চৈতন (শিখা) ধরে তাকে বল্লেন "ওরে আমার অবোধ ছেলে—তুই এত কিছু পেয়ে থুয়ে এতদিন কি কল্লি ও এখনও কি কচ্চিস বল্‌শুনি! ছি-ছি-তুই স্বার্থান্ধ হ'য়ে-তা আবার দু-দশ বছরের জন্যে-এমন মানব জন্ম ডিমটাকে একেবারে গেঁজিয়ে ফেল্লি। বাছা—একটু ঠাণ্ডা হ' তোর অহংবুদ্ধিযুক্ত মনের যাবতীয় গরল গুলো আমিই সাপ হয়ে তুলে নিচ্চি"। অহংবুদ্ধিযুক্ত মনচোরা কোন্ কালে ধর্ম্মের কাহিনী কাণে তুলে? তাই সে বিশ্বজননীর ডাকগুলাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে নিজের প্রেসটিজ—দম্ভটা রক্ষা ক'রতে প্রয়াসী হয়ে পাশবাচারে আরো মেতে উঠলো। মায়ের প্রাণত, তাই তিনি অসুরকে বুঝালেন "শোন্ বাছা, নগণ্য গন্‌শা ছোঁড়া, আপন দেহ অহংবুদ্ধিকে মূষিকের মত খাটো ক'রে ও উহাকে নিজের পায়ের তলায় রেখে অর্থাৎ নিজ বুক ও মাথা ঐ দুই

বুদ্ধির দ্বারা ভক্তি না ক'রে আমার প্রসাদ পেয়ে গেল"। সেই প্রসাদ লাভ করে গনেশ হলেন সুক্ষ্মদর্শী, শ্রুতিধর, রেচক, পূরক, কুম্ভক সাধনাকারী ষট্‌চক্রভেদী, কাম, ক্রোধ, লোভ বিজয়ী (নিম্নগামী হস্তিদন্ত ধারী), বই পড়া বিদ্যা না অর্জ্জন ক'রেও মহাপণ্ডিত ও পরিশেষে জগন্মা-তার ষোলকলাপূর্ণ শ্রীশ্রীর অধিকারী, কলাবধূ ঠাকুরাণীর। তখন গণেশ শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বর ব'লে আখ্যাত হলেন। একে একে শ্রীশ্রীকার্ত্তিকেয় ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মী সরস্বতী ঠাকুরাণীদের তত্ত্বও মহাদেবী অসুরকে বুঝালেন। কিন্তু হায়! দেহ ও অহংবুদ্ধির প্রেসটিজ-দন্তটা যার ধাতে ব'সে যায় তার মায়ের ডাক শুনা কি কখনও সম্ভব! বিরাট প্রকৃতি তখন বিক্রমসিংহাকারে অসুরকে দমিত ক'রে তার প্রেসটিজ দন্তটাকে শোক-তাপ, জরা মৃত্যু প্রভৃতি বর্শা দ্বারা দফা রফা ক'রলেন।

তখনকার কালে জীব স্ব স্ব সাধন বলে দেহ, বুদ্ধি, ধন ও জন বল পেতেন। তারপর তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ দেহ ও অহংবুদ্ধিতে মাতোয়ারা হতেন। একালে রাজাই বল, রাজ-প্রতিনিধি বল আর রাজকর্ম্মচারীগণই বল, সকলেরই এক বাক্যে সাধন—দেহবুদ্ধির ও অহং-বুদ্ধির অতিমাত্রায় ও সর্ব্বতোভাবে পরিচালনা। সুতরাং সত্ত্ব প্রধান রজোগুণের আধার শ্রীশ্রীগান্ধী-মহারাজের দীক্ষা ও শিক্ষা না মেনে চলাই তাঁদের পক্ষে নিঃসন্দেহ অমঙ্গলসূচক।

পাশ্চাত্যের মূলনীতি

অধ্যাপক শ্রীসঞ্জীব চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, নেপাল।

আধুনিক জগতে যে কয়েকটি চিন্তাস্রোত ও কর্ম্মস্রোত তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতেছে এবং মানুষের জীবনকে পরিচালিত করিতেছে তাহাদের সংখ্যা অত্যধিক নহে। ভাবিয়া দেখিলে তাহাদিগকে এক একটি করিয়া গণনা করা যায় এবং চিন্তা ও বিচারের তুলাদণ্ডে তাহাদিগকে ওজন করাও যে নিতান্ত দুঃসাধ্য তাহা নহে। সমুদ্রবক্ষে জাহাজে শান্তি সময়ে ভাসিয়া বেড়ান এক কথা; আর ভাসিতে ভাসিতে যে সমুদ্রে ভাসিতেছি তাহার চিন্তা এবং ক্ষুদ্র জাহাজ খানার মূল্য ও স্বরূপ চিন্তা আর এক কথা। পাশ্চাত্যের মূলনীতিও তেমনই একটি জাহাজ। সময়-সমুদ্রের বক্ষে উহাকে ভাসমান দেখিলে এবং উহার মূল্য ও শক্তি চিন্তা করিলে কতকগুলি সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমরা সেই ইঙ্গিতের দিক হইতে পাশ্চাত্য মূলনীতির মূল্যের বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

পাশ্চাত্যের একটি মূলনীতি Evolution বা ক্রম-পরিণতি। পাশ্চাত্যের Darwin ইহার প্রধান কর্ত্তা। মানুষ ক্রমশঃ পশুত্বের দিক হইতে দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সময়ে

ও অভিজ্ঞতায় মানুষের বদ্ধ চিত্তবৃত্তি গুলি প্রসারিত হইয়া মানুষের ক্রমোন্নতি ঘটাইতেছে; আইন, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল স্রোতেই ক্রমোন্নতির বিকাশ দেখা যায় এবং যখনই ইহার সুরু হোক্ না কেন, ইহা চলিত অবস্থায়ই আবহমান কাল আছে, এগুলিই Evolution এর মূলমন্ত্র। ইহার প্রমাণ স্বরূপ—এবং অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ—ভাষার ইতিহাস, আইনের ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাসকে দেখান হয়। কিন্তু বর্ত্তমাণ বিজ্ঞান, বর্ত্তমান ভাষা ও বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রকৃত মূল্য কি মনোজগতের দিক্ হইতে দেখতে গেলে ইহারা যে পথে চলিতেছে সে পথ ঠিক কিনা—ইহাদের প্রতি যে আমাদের শ্রদ্ধার ভাব তাহা আমাদের হৃদয়ের কোন শ্রেণীর প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত এবং সর্ব্বোপরি Evolution এর ভাবটি মানুষের চিন্তা ও কর্ম্ম শক্তির কোন ক্ষেত্রে এবং কি রকমের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ—এ সমুদয় বিষয় চিন্তা করিতে গেলে বেশ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে আমরা যে জাহাজে চড়িয়া সময়-সমুদ্রের বুকে হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছি—সাময়িক তুফানকেও তুফান মনে করিতেছি না—তাহা একদিন স্বপ্নের ন্যায় বিলীন হইতে পারে—মরীচিকার ন্যায় উড়িয়া যাইতে পারে, কিম্বা মহাসমুদ্রের জলবিম্বের ন্যায় তাহা ক্ষণিকের হাওয়ায়ও লুপ্ত হইতে পারে। পাশ্চাত্য এখনো বুঝে নাই যে তাহার Evolution যে সমুদয় প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষের চিত্তে সে সমুদয় প্রবৃত্তির পরপারেও একটি রাজ্য আছে। ভারতের সাধনা সে সমুদয় উচ্চতর প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং পাশ্চাত্য যদি অতীত ভারতের নির্দ্ধারিত পথে চলে এবং চলিবার শক্তি সঞ্চয় করে, তবে সেও বুঝিতে পারিবে যে তাহার মূলনীতি Evolution (যাহা আজ জগতের সকল ভাবও চিন্তা ক্ষেত্রে বেশ রাজার মতন হইয়া রাজত্ব করিতেছে) এর মূল্য তেমন বেশী নয়।

পাশ্চাত্যের আর একটি মূলনীতি 'জড়বাদ'। প্রবৃত্তির তৃপ্তি, দেহের বিলাস, প্রকৃতি হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া মানুষের সুখবৃদ্ধি, সাহিত্যে ইন্দ্রিয় বাসনার ক্রীড়া ও লীলায় তৃপ্তি-প্রবৃত্তি—এই জড় বাদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা। আবার বহু চিন্তা ও বহু অভিজ্ঞতার পর বর্ত্তমান আইনতত্ব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে আইনের লক্ষ্য অধিকতর জড় স্বার্থ ও জড়-সুখোপায়ের পথকে সংযত করা। শ্রেষ্ঠতর প্রবৃত্তির ও চিন্তা- শক্তির তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিলে পাশ্চাত্যের এ মূলনীতিকে সত্যই হেয় বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না, কারণ সে জন্মান্তর চর্ম্মচক্ষে দেখে না; পাশ্চাত্য আধ্যাত্ম জগতে বিশ্বাস করে না, এমন কি প্রাণ চিত্ত আত্মা প্রভৃতিকে কোন সময় বা Soul কোন সময় বা heart কোন সময় বা mind নাম দিয়া অভিহিত করে। ইহাদের মধ্যে কাহার স্থান কোথায় এবং কাহার সঙ্গে কাহার কি সম্বন্ধ কাহার কতটুকু Significance এবং কাহার রাজত্ব কতটুকু পাশ্চাত্য সাধনার সাধ্য হয় নাই তাহা দেখে। ভারতের সাধনা অভ্যন্তর জগতে প্রবেশ করিয়া মানুষের শক্তিসমুদ্রে জড়বাদের প্রকৃত মূল্য প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। অপর পাশ্চাত্য এখনো সে জড়বাদে খণ্ড হইয়া ছুটিতেছে এবং সে বাদের

আদর্শে কত অপদেবতাকেই যে প্রাণরূপ মহাবলি দিয়া পূজা করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আদর্শেই জগতের শক্তির ও ভাবের মূল্যের প্রমাণ হয়। পাশ্চাত্যের আদর্শ এত ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র যে উহাকে মূলনীতি করিয়া পাশ্চাত্য জগত সমাজে অজ্ঞাতে মহাপ্রলয়ের বীজ রোপন করিয়া চলিতেছে মাত্র।

পাশ্চাত্যের আর একটি মূলনীতি জনবাদ। বহু রক্তপাতের পর এই নীতি কোথাও Democracy কোথাও বা Constitutional Monarchy তে পরিণত হইয়াছে। 'জনবাদ' জড়বাদেরই একটী বিশিষ্ট শাখা। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে উহার প্রাধান্য এত অধিক হইয়াছে যে উহাকে একটি মূলনীতি বলা চলে। এই মূলনীতি Monarchy হইতে Democracy এবং Democracy হইতে Socialism এর দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু জড়লীলার স্রোতের এমনই অদ্ভুত বৈষম্য যে, উহাদের পরস্পরের প্রতি এমনই অসদ্ভাব যে, জনবাদের মূলনীতি উহার স্বাভাবিক (Natural) পরিণতিও প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না। জনবাদের স্বাভাবিক পরিণতি Socialism, অথচ এ Socialism এর রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিতে যে কত রক্তপাত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এবং কত নিন্দাবাদই যে উহার ভোগ করিতে হইতেছে তাহারও সীমানায় উপস্থিত হওয়া সুকঠিন। আমরা রাজতন্ত্রের অত্যধিক প্রশংসা করি না, গণতন্ত্রেরও অত্যধিক নিন্দা করি না। শুধু বলিতে চাহি যে, যে স্তরের প্রবৃত্তি হইতে উহাদের মূল্যের বিচার হইতেছে সে স্তরের প্রবৃত্তি রাজবাদ ও প্রজাবাদের প্রকৃতির মূল্য বুঝিতে অক্ষম। উন্নত ভাবে উন্নততর প্রবৃত্তির চর্চ্চা না হইলে পাশ্চাত্য জগতের জনবাদ সর্ব্বত্র Socialism এ পরিণত হইলেও জগতে শান্তি আনিতে পারিবে না। এবং উন্নততর প্রবৃত্তির ধারাবাহিক চর্চ্চার চেষ্টা পৃথিবীতে এক ভারতের সাধনাতেই আছে।

প্রকৃতি হইতে শক্তি আহরণ করিয়া মনুষ্যের কাজে লাগান পাশ্চাত্যের আর এক মূলনীতি। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উন্নতি এই মূলনীতির ফল। বিজ্ঞানের উপস্থিত ফল চর্ম্মচক্ষে এবং ভোগচক্ষে বেশ ভালই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতি হইতে আহৃত শক্তির ব্যবহারে যে সংযমের প্রয়োজন পাশ্চাত্য শিক্ষার সাধ্যে হয়তো সে সংযমযোগাড় কুলাইবে না। একখানা Electric তার পৃথিবীর ১৮০ কোটি লোককে এক সেকেণ্ডে হত্যা করিতে পারে, ভোগলুব্ধ মানব সে শক্তিকে হাতে রাখিয়াছে অথচ তাহার উচিত সংযম শিক্ষা আদৌ নাই। সাধারণ একটি বিষয়েই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজ্ঞান Submarine সৃষ্টি করিয়াছে অথচ Submarine এর সংখ্যা কমাইবার জন্য পৃথিবীর মহাসভা হয়রাণ হইয়া যাইতেছে। মূলনীতিতে ভ্রম থাকিলে তাহার বাহ্য প্রকাশকে সংযমও করা অসম্ভব। বিজ্ঞানের শক্তিকে প্রকৃত সীমাবদ্ধ রাখিতে হইলে ভারতীয় সাধনার শক্তি ব্যয়ের দরকার। পাশ্চাত্য তাহা কবে বুঝিবে এবং কোনও কালে বুঝিবে কিনা তাহাও সন্দেহ।

পাশ্চাত্যে দর্শন নাই বলিলেও চলে। দর্শন যে স্তরের প্রবৃত্তির culture হইতে উদ্ভূত পাশ্চাত্য সে স্তরের প্রবৃত্তির মূল্য বুঝে না। ধর্ম্মসম্পর্কবিহীন দর্শন প্রাণহীন

দেহের ন্যায় নিতান্ত হেয়। ভারতীয় দর্শন মানুষকে সাধনার পৃথক পৃথক পথ দেখাইয়া দিয়াছে—ধর্ম্ম পথে মানুষের অগ্রসরের স্তর এবং নীতি ভারতীয় দর্শনেই আছে। পাশ্চাত্য শুধু বিশ্বাসকে ধর্ম্মমূল মনে করে এবং বিশ্বাসই খ্রীষ্টের ধর্ম্ম। বিশ্বাসকে মূলভিত্তি করিয়াও যে সাধনার কতগুলি স্বতন্ত্র পথ ও স্তর আছে পাশ্চাত্য উহা বুঝে নাই—পাশ্চাত্যের মন সত্যের পথে ততটুকু অগ্রসর হয় নাই। সুতরাং ধর্ম্মের হিসাবে পাশ্চাত্যের সত্যদর্শীদের ভারতীয় সাধনার কাছে চিরকাল খাট ও অবনত হইয়া থাকিতে হইবে। যে মূলনীতি লইয়া পাশ্চাত্যের ধর্ম্ম—বর্ত্তমান জড়লীলার জগতে তাহার উচ্ছেদ হইবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং দর্শনে এবং ধর্ম্মে পাশ্চাত্যের মূলনীতি অত্যন্ত ক্ষীণ।

সাহিত্যের দিকে পাশ্চাত্যের ঝোঁক দেখা যায় এবং সাহিত্যিকের আদর পাশ্চাত্য জগতে অত্যন্ত অধিক। ইহার কারণ অধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য মানুষের সাধারণ আপাত সুখপ্রদ প্রবৃত্তিগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করে। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য এখনও বুঝে নাই। প্রীতিপ্রদ Sensation দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করাই ভারতীয় সাহিত্যের মূলমন্ত্র ছিল। ভারতীয় সাধনা চিরকালই সাহিত্যশক্তির সীমানা নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছে। সাহিত্য ভগবানের দিকে চোখ ফিরায়, কিন্তু সাধনা ভগবানের দিকে অগ্রসর করিয়া নেয়। পাশ্চাত্য সাধনার মূল্য জানে না। ভগবানের দিকে (এবং আজকাল কখনো কখনো শয়তানের দিকে) চক্ষু ফিরাইয়া কখনো কখনো আপাতমধুর সুখ পায় মাত্র। সুতরাং পাশ্চাত্যে সাহিত্যের মূলনীতিও ক্ষীণ। যে স্তরের শক্তিসাধনায় মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের উৎপত্তি পাশ্চাত্য সে স্তরের শক্তি দু' একটা গ্রহণ করিয়া থাকিলেও অধিকাংশকে Mystic আখ্যা দিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে সরাইয়া রাখে।

আমাদের বিশ্বাস পাশ্চাত্যের মূলনীতির ক্ষীণতা ও ভ্রমের কারণ প্রধানতঃ দুইটি—প্রথমতঃ পাশ্চাত্য আর্য্যসম্ভূত হইলেও সম্পূর্ণ আর্য্য শক্তি ও আর্য্য tradition বর্জ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যে স্তরের প্রবৃত্তি লইয়া পাশ্চাত্য লীলাখেলা করিতেছে, সে স্তরে প্রকৃত মূলনীতির সন্ধান পাইবার পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব। পাশ্চাত্যে বিভিন্ন স্তরের প্রবৃত্তির যে Confusion বা গোলমাল তাহাকেই বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রকারেরা এক কথায় "কলি" আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য এখনো মনুষ্যত্ব চিনে নাই। মানুষের শক্তির স্তর বুঝে নাই; অন্তর জগতে সাধনা বলে প্রবেশ করিয়া তাহার গূঢ়তত্ত্ব দেখিতে পারে নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য সাধনার মূলনীতি ভারতের সাধনার মূলনীতি ন্যায় স্থির অচঞ্চল সত্বের অটল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান ভারতের এ সত্যটি উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

———

সত্যের পথে

শ্রীমৎ স্বামী যোগজীবানন্দ

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

কোনও নগরের পণ্যবীথিকায় যখন আকস্মিক অগ্নিসংযোগ ঘটে, তখন প্রতিযোগী সহযোগী নির্ব্বিশেষে সকলেই যেমন সমভাবে চেষ্টা করে,—প্রবল অগ্নিদাহ হইতে নগরটীকে রক্ষা কর্ত্তে, সাম্প্রদায়িক মত-বৈষম্য, জয়-পরাজয়ের অভিমান, সমাজ বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিস্মৃত হয়ে, প্রচলিত প্রথার গণ্ডী লঙ্ঘন করে বিনা আহ্বানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চিত্তে প্রত্যেকেই আত্মনিয়োগ করে এক মহান কর্ত্তব্যে, আমাদেরও আজ সেই অবস্থা সেই একই কর্ত্তব্য বলে বিবেচিত হচ্চে। আমাদের গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে সর্ব্বত্রই অসহ্য উৎপাত, অসীম গ্লানি, বহুবিধ উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদিগকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট—চঞ্চল করে তুলেছে। আমাদের সম্পদে অশান্তি, অভাবে হাহাকার; এই দারুণ দুঃখের নিষ্ঠুর কষাঘাতে ক্ষিপ্তপ্রায় ভারতবাসী আজ বাধ্য হয়েছে তাদের বিধিবদ্ধ সামাজিক আবেষ্টনী লঙ্ঘন কর্ত্তে। তারা মর্ম্ম পীড়িত, তাই শাস্ত্রবিধান উপেক্ষিত—তারা বড় দরিদ্র, তাই হয়ত বিবেকবিহিত সত্যপথভ্রষ্ট। বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লব খুবই স্বাভাবিক। যেহেতু অপ্রত্যাশিত উপদ্রবে যখন স্বভাবের সাম্য ভেঙ্গে যায়, আদব কায়দার বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন করা তখন মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে, মানবের অন্তর্নিহিত প্রতিকারপ্রবৃত্তি তখন একাগ্র উদ্যম একমাত্র প্রত্যক্ষ সত্যকেই উপলব্ধি কর্ত্তে চায়,—সমগ্র কল্পনাকে উড়িয়ে দিয়ে, বাস্তবকেই ধর্ত্তে চায়। তখন তারা পুরাতন জীর্ণ সমাজের দুঃসহ বন্ধন ছিন্ন করে—অতীত সুখের দিনে প্রচলিত আচার আচ্ছাদন উন্মুক্ত করে, স্বীয় অবস্থানুকূল সত্যমূর্ত্তি প্রকাশ কর্ব্বেই কর্ব্বে। সমাজের প্রতি এ বিদ্রোহ নৈসর্গিক বিধান। লৌকিক কপট সভ্যতা,—মৌখিক শিষ্টাচার আর যখন তাদের যথার্থ অভাব মেটাতে পারে না, মানব তখন অন্তরে অন্তরে বুঝতে পারে যে, সত্যপথ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই—এবং ধর্ম্মই যথার্থ মানবীয় শক্তি—প্রত্যক্ষ ফলে তখন এমন আকস্মিক প্রয়োজন বোধ হয় যে ক্রীড়াঙ্গণের প্রলোভনকে কার্য্য ব'লে—পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তির কল্পনাকে আখাম্ব ব'লে—আর তারা বিশ্বাস কর্ত্তে পারে না—চায় শুধু উলঙ্গ উজ্জ্বল সত্য; আর এই সত্যই আজ বিশ্ব-মানবের কাম্য।

দুঃখ মানবকে দেবতা করে; আবার দুঃখের দহনে পরেই মানব পিশাচেরও অধম হয়ে যায়। দুঃখই যথার্থ তপস্বীর হোমাগ্নি শিখা, এর দহনই কর্ম্মযোগ, নির্ব্বাণই মুক্তি। দুঃখই মনুষ্যত্ব পরীক্ষার কষ্টিপাথর। কিন্তু সে দুঃখ নিজের অভাবের জন্য যে দুঃখ—অক্ষমতার জন্য যে দুঃখ—তাহা নয়। প্রেমের জন্য শক্তিমান যে দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করে লয়, পরার্থে, বিশ্ব কল্যাণে আত্মোৎসর্গকারী যে দুঃখকে দেবতার আশীর্ব্বাদ ব'লে গ্রহণ করে, তাহাই সাধকের চিরবাঞ্ছিত দুঃখ;—এই

দুঃখই দেবযান-পথের আস্তরণ। আমরা আজ যে দুঃখ সহ্য করিতেছি, তাহা প্রেমের জন্ত নয়—বিশ্বকল্যাণের জন্য নয়, মুক্তির জন্যও নয়,—সে কেবল অপারগতার জন্য, অজ্ঞতার জন্য মিথ্যাচার প্রসূত কর্ম্মভ্রান্তির দুঃখ; -এ শুধু নিঃসহায় শিশুর আর্ত্তনাদ সদৃশ, প্রতিকারক্ষম শক্তি মানের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস নয়! এই দুঃখেই মানুষ দানব হয়ে যায়। এই মনুষ্যত্বলাঞ্ছন অবমাননার দুঃখ আমরা আর সহিতে চাহি না। এ দুঃখের প্রতিকার প্রয়োজন। তাই চাই আমরা নিরাবরণ সত্যকে— আর তার দারিদ্র্যকে বীরের ন্যায় সর্ব্বান্তকরণে স্বীকার করে নিতে, সে যতই কঠোর যতই নির্ম্মম যতই দুর্ব্বহ হউক্ না। আমরা সত্যসমাজ গঠন কর্ব্বো। এই বিরাট ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে গিয়ে যদি খেলা ঘরের জীর্ণ প্রাচীর ভেঙ্গে যায়, যাবে। মর্ম্মস্পর্শী হলেও আমরা সে আঘাত সহ্য কর্ব্বো, বিদ্রোহের মত দেখালেও তাকে শান্তি বলে স্বীকার কর্ত্তে হবে, ধ্বংসমূলক বোধ হলেও এ প্রচেষ্টাকে যথার্থতঃ সংগঠনের দৃঢ় ভিত্তি বুঝ্‌তে হবে। আমরা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কচ্ছি, মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য সত্যের দারিদ্র্য; আমরা সে অপার্থিব অক্ষয় সম্পদ অর্জ্জন কর্ব্বই, এজন্য আমরা প্রস্তুত হতে চাই। আমাদের শিখতে হবে, সত্যের প্রতি অটল ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিষ্ঠা, সত্যের জন্য সর্ব্ব প্রকার দুঃখ লাঞ্ছনা প্রফুল্ল চিত্তে সহ্য কর্‌বার সহিষ্ণুতা। এই জন্য আমাদের প্রয়োজন হয়েছে পার্থ সারথীর মত আচার্য্যের - যাঁহার কাছে পাব আমরা সেই মহান্ কর্ম্মলিপ্ত অবস্থার নৈষ্কর্ম্ম্য দীক্ষা, অজেয় শক্তিসাধনের উপদেশ—অদম্য সাহসের বর - যার প্রভাবে চিরন্তন অভ্যাসের প্রহরা উপেক্ষা করে, জন্ম জন্মান্তর সঞ্চিত দৃঢ় সংস্কারের দরজা ভেঙ্গে, সম্পূর্ণ অভিনব, সম্পূর্ণ অপরিচিত মূর্ত্তি সত্যকেও আমরা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে প্রাণের পূজা সমর্পণ কর্ত্তে পার্ব্ব।

চাই সেই শিক্ষা, যাতে আমরা প্রাণে প্রাণে পরম সত্যকে উপলব্ধি করে আমাদের অন্তরের স্বাধীন শ্রদ্ধা, সহজ ভক্তি, সত্য দেবতার পাদপদ্মে নিঃশেষে ঢেলে দিতে পার্ব্ব, আমরা চাই সেইরূপ উদার উন্মুক্ত স্বাধীন প্রেমের আদর্শ যাহা প্রচলিত তথাকথিত শাস্ত্রীয় প্রথার গণ্ডিকে অতিক্রম ক'রে, স্বার্থান্ধ অন্যায় শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্য মহিমা প্রকাশ কর্ত্তে তিলমাত্র সঙ্কুচিত হয় না।

আমরা চাই অমৃতের সন্ধান, যাহা মৃত্যুর আনন্দে আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়া, অত্যাচারের দহনে আপনাকে দ্রবীভূত করিয়া, অহিংস বিশ্ব মানবতার ছাঁচে, মনুষ্যত্বকে অচল সহিষ্ণু করে তোলে। আমাদের আবশ্যক সেইরূপ বিক্রম—যাহা কেবল মাত্র নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্যই আত্মত্যাগে উন্মুখ করে। পরের জন্য নিজকে যে কোনও শুভ প্রয়োজনে অকুণ্ঠিত চিত্তে উৎসর্গ কর্ত্তে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখে। আমরা চাই শুভেচ্ছা পূরণের অবাধ অধিকার—অসঙ্কুচিত স্বাধীনতা—যাহা লৌকিকতাকে কোনও মতে সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিতে কদাচ বাধ্য হয় না।

আমরা শিক্ষা কর্ব্বো সেই সেবাব্রত, সেইরূপ পূজা পদ্ধতি, যাহা প্রাণহীন জড়ের সেবা নয়, দম্ভের পূজা নয়, স্বার্থের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত কল্পিত শাস্ত্রাচারের অচল বিগ্রহার্চ্চনা নয়, যাহা দুঃখ দৈন্য পীড়িত সজীব মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে বিরাট ভগবানের নিকট পৌঁছায়, যাহার আচারে সাম্য, ব্যবহারে মৈত্রী, লক্ষ্য মুক্তি। আমরা চাই আর্য্যঋত্বিক প্রবীণ ব্রাহ্মণের জ্ঞান সম্পন্ন তরুণ

পুরোহিত, যাহার তন্ত্র সার্ব্বজনীন—মন্ত্র সার্ব্বভৌম, যিনি বিশ্ববাসী নর নারীর একই আচার্য্য - এক মহান্ সত্যের উপদেষ্টা।

আজ সমগ্র ভারতের আকাঙ্ক্ষিত সেই তপস্যা, যাহাতে যথার্থ মনুষ্যত্ব প্রবুদ্ধ হয়—প্রতি মানব চিত্তে প্রসুপ্ত আধ্যাত্ম শক্তিকে উদ্বোধিত করে। আধ্যাত্মিকতাই আত্মার সমগ্র শক্তির মূল কেন্দ্র। ভারতের শেষ প্রয়োজন সেই আধ্যাত্মিকত', যার স্পন্দনে জড়ত্বের সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে মানবের পাপবিদ্ধ সংশয়ী আত্মা পরিণামে পূর্ণ নিরঙ্কুশ জ্ঞানৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সচ্চিদানন্দে সম্পূর্ণতা লাভ কর্ব্বে।

হে মনীষিবৃন্দ, বর্ত্তমান ভারতের ঋষিসঙ্ঘ, কপিল কণাদের বংশধরগণ, আজ বিপন্ন ভারতকে সেই পথ দেখান! আমরা সত্য সন্ধানের মুক্তি-তীর্থ-যাত্রী, কোন পথে গেলে আমরা সর্ব্বপ্রকার অসত্যকে উপেক্ষা করে, অনন্ত বিঘ্নের মধ্য দিয়েও অশেষ দুঃখে চির সহিষ্ণু থেকে, আত্ম গৌরব অক্ষুন্ন রেখে, লাভ কর্ত্তে পার্ব্ব এই তীর্থ যাত্রার সাফল্য! আপনারা শিক্ষা দিন আমাদের তদনুকূল আত্মা মনঃ ও কলেবরের শুদ্ধ সত্যানুশীলন। ইহাই আমাদের প্রথম প্রার্থনা।

শাস্ত্র সাক্ষ্য দিতেছেন—

"এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ
স্বং স্বং চরিত্র শিক্ষেরণ্ পৃথিব্যাং সর্ব্ব মানবাঃ।"

আজিও সেই ব্রহ্মর্ষি দেশে সেই অগ্রজন্মা বিশ্বগুরু ব্রাহ্মণের লক্ষ লক্ষ বংশধর বিরাজিত—যাঁহারা ছিলেন পৃথিবীর সমগ্র মানবের চরিত্র শিক্ষার আদর্শ। তথাপি কেন এ অধঃপতন! যে দেশের ভূদেব ব্রাহ্মণগণ বিশ্বের নর নারীকে এক সাম্য সূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন "সহৃদয়ং সাং মনস্যং অবিদ্বেষং কৃনোমিবঃ" * * * সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি। * * * সম্যঞ্চোঽগ্নিং সপর্য্যতারা না'ভিমিবাভিতঃ॥"—তোমরা রথ নাভিতে মিলিত অর সমূহের ন্যায় পাপ রহিত চিত্তে এক অগ্নির সেবায় মিলিত হও, সমান ভাবে জল পান কর, সমান অন্নভাগ গ্রহণ কর। আমি তোমাদিগের মধ্যে একপ্রাণত্ব আধিদ্বেষ প্রতিষ্ঠা করিয়া তোমাদিগকে এক সাম্য সূত্রে বন্ধন করিব। এরূপ ছিল যাঁহাদের উদ্দেশ্য—যে ব্রাহ্মণ দেশে বিদেশে সুদূর সাইবিরিয়া বা উত্তর কুরুবর্ষ হইতে আমেরিকা বা নাগলোক পর্য্যন্ত বর্ষার জলদের মত সর্ব্বত্র সমভাবে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সামগাঁথার প্রচার করে ছিলেন, যাঁহারা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক, বিজ্ঞানরহস্যের প্রথমাচার্য্য, নীতির বিধাতা, বিশ্বপ্রেমের অবতার, স্বাত্বিকতার প্রতীক, ত্যাগের প্রথমাদর্শ, মুক্তি পথের আদি গুরু, আজ তাঁহারা কোথায়? আর কোন্ মূর্ত্তিতে, কি বৃত্তিতে, কি অবস্থায় অবস্থিত! আজিকার অধিকাংশ আভিজাত্য গর্ব্বিত বৃথাভিমানী ব্রহ্মণ্যের কঙ্কাল দাস্যজীবি ব্রাহ্মণ, গুণ ভুলে বংশ দাবীতে প্রতিষ্ঠা লাভের কাঙ্গাল, পরের দেহের ছায়া, পরের সুরের অর্থ হীন প্রতিধ্বনি মাত্র! এ বেদনা কি সত্যই মর্ম্মস্পর্শী নয়? আর কোথায় বা সেই অতীত দিনের সত্য গৌরব মণ্ডিত মার্ত্তণ্ডতেজা প্রদীপ্ত ভারতবর্ষ? সারা বিশ্বে যার জ্ঞান জ্যোতি বিকীর্ণ হয়ে ছিল? যে জ্ঞানগুরুর পদতলে বিশ্বের অন্যান্য মহাদেশসমূহ ভিক্ষুকের মত কৃপাকাঙ্ক্ষী ছিল। আর দেখুন, কোথায় বর্ত্তমান India (ইণ্ডিয়া)—চির বিষাদ মণ্ডিত—ঘনকৃষ্ণান্ধকারে নিমজ্জিত।

"যতো অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" যে কার্য্য পরম্পরার অনুষ্ঠানে মানব সর্ব্ব প্রকারে উন্নত হ'তে পারে, চিরশান্তিময় মুক্তিলাভ কর্ত্তে পারে তাহাই ধর্ম্ম। এই মুক্তি দ্বিবিধ—ঐহিক ও পারত্রিক। ব্যক্তিগত, সমাজগত, কর্ম্মজাত স্বাধীনতা ঐহিকমুক্তি, আর জন্মমৃত্যুরূপ বিবর্ত্তন রহিত আনন্দস্বরূপতাই পারত্রিক মুক্তি বা মোক্ষ। আত্মোন্নতি বল্‌তে এই দুই অবস্থাই বুঝায়। এই আত্মোন্নতি সাধক কর্ম্ম-প্রণালী অভ্যাস করার নাম সাধনা। আত্মোন্নতি ভিন্ন সুখ লাভ অসম্ভব। অতএব সুখ লাভ কর্ত্তে হলে সুখের প্রতিবন্ধক, দুঃখ হেতুর নিরোধ এবং প্রাপ্ত দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করা চাই। এই প্রকার নিবৃত্তি ও নিরোধের জন্য যে একাগ্র প্রচেষ্টা তাকেই বলে তপস্যা, দুঃখাগমের বহুকারণ আছে বটে কিন্তু তন্মধ্যে মূল কারণ অজ্ঞতা বা ভ্রান্তি। যাহার নামান্তর অবিদ্যা বা মায়া। ভ্রান্তি বিনষ্ট হলেই অন্যান্য দুঃখহেতু বিনষ্ট ও বিরুদ্ধ হয়। এই ভ্রান্তিবশতঃই জীব আপনাকে চির মুক্ত স্বাধীন আত্মাকে বদ্ধ মনে করে। তাই সে দুর্ব্বল। তাই সে ক্লান্ত। কর্ষণ নিরত কৃষক, আর কর্ম্মত্যাগী বনচারী পরমহংস উভয়ই সমভাবে ভগবানের পূজা কচ্ছেন। বিশ্বহিত ব্রতী মহামানবের কর্ম্ম আর ঐ কৃষকের কর্ম্ম উভয়ই একমাত্র বিশ্বপ্রেমের ছবি। শুধু অজ্ঞানতা নিবন্ধন ভাব বৈষম্যে কৃষক মনে করে, "আমি কর্ম্ম কচ্ছি আমার নিজের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থে" জ্ঞানী মনে করেন তাঁর কর্ম্ম বিশ্ব কল্যাণহেতু। তাই কৃষক হয় ক্লান্ত দুঃখী আর ব্রতী অক্লান্ত সহিষ্ণু ও সুখী। এইরূপ একটা নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তির মধ্য দিয়াই এই বিরাট জীব জগৎ অন্ধবৎ পরিচালিত হচ্ছে। অথচ তারা বুঝতে পারে না যে তারা বিষম ভুল কচ্ছে বিরাটকে ক্ষুদ্র ভেবে, অসীম কে সীমার গণ্ডিতে বেঁধে, মিথ্যাকে সত্য আর সত্যকে মিথ্যা জ্ঞান ক'রে। প্রকৃতি আমাদের পশ্চাতে, বিস্মৃতির গাঢ় মসিলেপ এবং সম্মুখে ভবিষ্যের অনভিজ্ঞতারূপ প্রহেলিকা রচনা কর্ত্তে কর্ত্তে বিশ্বসংসারটাকে প্রবলবেগে প্রতিনিয়ত আবর্ত্তিত কচ্ছেন। এই দুই দিকের অনভিজ্ঞতাই মানবের অদৃষ্ট ব'লে কথিত হয়। বিস্মৃত ও অজ্ঞাত অদৃষ্টের মধ্যে আমরা অবস্থার তাড়নে পরিচালিত হচ্ছি পুতুলের মত। জানি না তথাপি অনুমান কর্ত্তে হয়, মনে হয় না তবু মেনে নিতে হয়। এক পলকও দাঁড়াবার উপায় নাই। প্রবল প্রবাহ বেগে ছুটতেই হবে। এই রহস্যময় গতিই নিরঞ্জনের কালচক্রবেষ্টন, যাহা জন্ম ও মৃত্যুর মুখে উৎসারিত হয়ে সুখ দুঃখাদি ভোগানুকূল ভোগায়তন দেহ রচনা কচ্ছে। এই নিরবচ্ছিন্ন গতির দ্বিবিধ স্পন্দন অনুভূত হয়। কেন্দ্রে স্থৈর্য্য আর ক্রমবিস্তৃত পরিধিতে চাঞ্চল্য। যাহা প্রকৃতি পুরুষের লীলা রহস্য বা মহারাস নৃত্যরূপে বর্ণিত হয়েছে। চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে ঘূর্ণায়মান চিৎকণ সমূহ, আর কেন্দ্রস্থলে স্থির অচঞ্চল চিদ্‌ঘন যেন এই মহা নৃত্যের নাটুয়া নটবর পুরুষোত্তম নির্ব্বিকার অচল সত্যায়তন স্বরূপ কেন্দ্রে অবস্থিত। যেন এই সত্য পুরুষ নিরবচ্ছিন্ন প্রণব বাঁশরী নিনাদে রচনা কচ্ছেন—অনাদি অদ্ভুত অবিশ্রান্ত অনাহত শব্দ তরঙ্গ, যার পরিণতি বা এক একটী তরঙ্গ বুদ্‌বুদ এই জড় ও চৈতন্যময় নৃত্য পরায়ণ অনন্ত কোটী সৌর জগত তুমি আমি বিশ্বের নর নারী সমগ্র প্রাণী। পরমার্থতঃ এই এক অনির্ব্বচনীয় আদি অনাহত শব্দ কেন্দ্রই "অনাদিরাদি গোবিন্দ" "দ্বৈত অদ্বৈত বিবর্জ্জিত অলক্ষণ তুরীয় ব্রহ্ম" "সত্যস্য সত্যম্ ঋতম্ বৃহৎ" "অপূর্ব্ব নির্ব্বিশেষে পুরুষোত্তম সদ্‌গুরু" ইহাই রস স্বরূপ—

"রসো বৈ সঃ" এই পরম রসই পরমানন্দ স্বরূপে উপভোগ্য—চিৎ প্রবাহাকারে উপলব্ধির যোগ্য—সৎ বা সত্য স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত সচ্চিদানন্দ। ইহার কণা মাত্র উপভোগ করেই বিশ্ব সঞ্জীবিত, ইহার সম্যক অনুভূতিই পরম পুরুষার্থ বা অত্যন্ত সুখ। "ব্রহ্ম সংসর্গমত্যন্তং সুখমশ্নুতে" কিন্তু এই যে রস ইহা দুঃখের মূল্য দিয়ে সঞ্চয় কর্ত্তে হয়। কল্পিত ভাবতরঙ্গে ভাসমান দৈহিক সুখকামী এ সুখের অধিকারী হয় না। "আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং" "বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।"

এই রসকে উপভোগ কর্ত্তে হলে আমাদের জানতে হবে, জীব কি, ব্রহ্ম কি? পূর্ব্ব কথিত নিরঞ্জন ও মায়া প্রভাবে বিচ্ছুরিত বিকর্ষণী ধারা (centrifugal) প্রবাহ বেগে, বহির্ম্মুখ গতিশীল চিৎকণসমূহই জীবাত্মা আর কেন্দ্রস্বরূপ চিদ্‌ঘনই সাধনার লক্ষ্য পরমাত্মা ব্রহ্ম। যে জীব স্বীয় সৎকর্ম্ম বা তপস্যাবলে কেন্দ্রাভিমুখী (centrifugal) ধারার সহিত চিৎকণ প্রবাহকে মিলিত ক'রে অন্তর্ম্মুখী কর্ত্তে পারে, সেই হয় পরমানন্দের ভোক্তা। এই মিলনের নামই "যোগ" অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদ বুদ্ধির অপনোদন। তাই দর্শন বলেন, "জ্ঞানান্মুক্তি"—"প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম" এই আনন্দভুক্ জীবকেই বলে লব্ধানন্দী আপ্তকাম মহাপুরুষ, ইহারাই যথার্থ স্বাধীন ও পরম সুখী "রসং হেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি" অবশ্য প্রতীক উপাসকও এই কেন্দ্রস্বরূপ পরমাত্মার স্বীয় আনন্দ বর্দ্ধন রূপ কল্পনা করেই তার অর্চ্চনা করে থাকেন—চিত্তপ্রসাদ লাভের জন্য; অতএব প্রতীক উপাসনা আনন্দ লাভ প্রচেষ্টার একটী দিক মাত্র, পৌত্তলিকতা নহে। কিন্তু সত্য জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে জীব কিছুতেই পরিতৃপ্ত হতে পারে না। এ বিশ্বে আর কিছুতে সুখ নাই। শান্তি নাই। আছে শুধু পরাজ্ঞান লব্ধ মুক্তিতে। আর কিছুর উপর নির্ভর করা চলে না—এক মাত্র সত্য ভিন্ন। মানবের চির শান্তিময় বিশ্রাম নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ আছে কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক স্বাধীনতায়,—অনন্ত অসীম প্রেমসমুদ্র নিমজ্জিত অবগাহনে। কাল্পনিক ভাববিমুগ্ধচিত্তে সত্যানুভূতি হয় না। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ হয় না।

"যং লব্ধা চাপর লাভমন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে॥"

সত্য জ্ঞানই ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যে পথ তাই সত্য সাধন পন্থা। যদিও এই ব্রহ্ম মনাদি বিষয়ী-ভূত নহেন, তথাপি হৃদ্ গুহাতে এই অব্যক্ত ব্রহ্ম সত্বার উপলব্ধি হয়। যেমন দয়া স্নেহাদি বৃত্তির কোনও আকার নাই তথাপি মনে তাহার উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ নিরবচ্ছিন্ন উদ্বেগ হীন আনন্দ অনুভূতিই ব্রহ্মানুভূতি। এই আনন্দ লাভের জন্য উপাসক ব্রহ্মের বাচক বা নির্দ্দেশ নামাদি অবলম্বন ক'রে মনের দ্বারাই মনঃকে কেন্দ্রস্থ করতঃ ব্রহ্মকে সন্নিহিত ভাবে পুনঃ পুন স্মরণ করেন—আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট অবলম্বন বা ঈশ্বর প্রনিধান এই স্মরণে সাহায্য করে, এই ক্রিয়ার নাম ধারনা। এই অভ্যাস দৃঢ় ও নিরবচ্ছিন্ন হইলেই তাহাকে ধ্যান বলে "সমান প্রত্যয় প্রবাহ করণম্ ধ্যানম্।" চিন্তা প্রবাহ এবং ধ্যান প্রবাহ একই কথা। জীব মাত্রই চিন্তা করে কিন্তু তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য

বিষয়ের শৃঙ্খলাহীন অনুস্মরণ মাত্র, তজ্জন্য তাহাকে ধ্যান বলে না। যে প্রবাহ বলে মনঃ বিষয়ের—অনুস্মরণ করে সেই প্রবাহন সত্য পদর্থে—প্রবাহিত করার নাম ধ্যান। সত্যধ্যান প্রবাহ দ্বারাই চিত্ত দোষ মুক্ত বা সংস্কার মুক্ত হয়ে বৃত্তি রহিত হয়। এবং ইহাই উপাসকের প্রাথমিক অভ্যাস, তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যম দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈ র্নিগূঢ়াঃ, সকল শাস্ত্রেই—ধ্যান প্রবাহ মুক্তির উপায়—রূপে বর্ণিত ও উপদিষ্ট হয়েছে,—রাগোপ হতি র্ধ্যানম্"। মানবের যত প্রকার কাম্য আছে তন্মধ্যে মোক্ষ বা অপবর্গই," পরম পুরুষার্থ। বেদান্ত বলেন, "চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থেষু মোক্ষ এব পরম পুরুষার্থঃ," এই পুরুষার্থ লাভের যাহা অন্তরায় তাহাই দুঃখ বা বাধনা, ইহার অত্যন্ত নিবৃত্তিই অপবর্গ। ন্যায় দর্শন বলেন,—"বাধনালক্ষণম্ দুঃখমিতি, তদত্যন্তাবমোক্ষোহপবর্গঃ॥' বৈশেষিকগণ বলেন—"বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ এবং আত্মার সহিত ইন্দ্রিয়-গৃহিত বিষয়ী মনের সংযোগই দুঃখ। যখন মনঃ ইন্দ্রিয়সংসর্গ ত্যাগী হয়ে আত্মাভিমুখী বা কেন্দ্রাভিমুখী হয়, তখনই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। আত্মেন্দ্রিয় মনোংর্থ সন্নিকর্ষাাৎ সুখ দুঃখঃ। তদারম্ভে আত্মস্থে মনসি শারীরস্য দুঃখাভাব সংযোগঃ।" সাংখ্য বলেন—জ্ঞান পথে অবিবেকরূপ প্রতিবন্ধকের বিনাশই মুক্তি। ধ্যান প্রবাহ দ্বারাই একার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। 'মুক্তিরন্তরায় ধ্বস্তের্ণপরঃ।" পাতঞ্জল দর্শনের মতে—দ্রষ্টা দৃশ্যের সংযোগই দুঃখ হেতু। এই সংযোগের কারণ অবিদ্যা বা ভ্রান্তি অবিদ্যার নাশ হলেই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ে আত্মা লিপ্ত হন না, কাজেই আত্মা স্বীয় স্বরূপে শুদ্ধ চিন্ময় ভাবেঅবস্থিত থাকেন। এই অবস্থার নামই কৈবল্য।—"দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগোহেয় হেতু।" তস্য হেতুরবিদ্যা, তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদৃশেঃ কৈবল্যম্।" ধ্যান প্রবাহ দ্বারাই এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। "ধ্যান হেয়াস্তদবৃত্তয়ঃ, তত্রধ্যামর মনাশংয়ম্," কেবল মাত্র ধ্যান দ্বারাই যে চিত্ত যন্ত্রণাময় বিষয় সংসর্গ হ'তে মুক্ত হয়ে, পরমানন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ কর্ত্তে পারে, ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং ইহা প্রত্যেক মানবের জন্য উপদিষ্ট।

কিন্তু শাস্ত্রে ধ্যেয় পদার্থ যথা অভিমত প্রিয়বস্তু নির্দ্ধারণ করার উপদেশ থাক্‌লেও, ধ্যেয় তাহাই হওয়া সঙ্গত, জীব যাহা হ'তে চায়। যেহেতু যে যেরূপ পদার্থের ধ্যান কর্ব্বে সে সেইরূপ গতি, গুণও অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। সুতরাং যাঁহা যাঁহার লক্ষ বা উপাস্য, তাঁহাই তাঁহার ধ্যেয় হওয়া সঙ্গত। মুক্তির জন্য জ্ঞান প্রয়োজন অতএব যিনি জ্ঞান ময়, অজ্ঞান নাশে সমর্থ, এমন ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষই কোন লাভের জন্য ধ্যেয় বা উপাস্য হওয়া কর্ত্তব্য।

"যং যং লোকং সম্বিভাতি বিশুদ্ধ সত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জায়তে তংশ্চৈ কামান্, তস্মাদাত্মজ্ঞানমর্চ্চয়েৎ ভূতিকামঃ॥"

কে উপাস্য? "সর্ব্বশরীরস্থ চৈতন্য প্রাপক গুরুরুপাস্য"। সুতরাং বিকাশের সারভূত নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ বীজাধার অনন্ত জ্ঞানময় সদ্‌গুরুই সত্যাশ্রয়ী মানবের ধ্যেয় এবং উপাস্য,। এই স্বরূপ কল্পনাপ্রসূত বিগ্রহ বা প্রতীক নয়—স্বপ্রকাশ প্রত্যক্ষ সত্যস্বরূপ।" সে পূর্ব্বেষাম্ অপিগুরু কালে নানব চ্ছেদাৎ। তা নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞয় বীজম্।" সেই পূর্ব্ব কথিত আদি অব্যক্ত শব্দ কেন্দ্রই গুরু।

(গৃ—শব্দে) তিনি শব্দ দ্বারাই আপনি আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন, এবং তাতে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছেন। তজ্জন্যই তিনি সদগুরু সংজ্ঞায় অভিহিত হন। যেখানে জ্যোতিও অপ্রকাশ তথায় এক মাত্র শব্দ ধারাই আত্মপ্রকাশের প্রথম অভিব্যক্তি। তজ্জন্য তাঁহার বাচক প্রণব বা ওঙ্কার শব্দ ধারা। এই শব্দ ধারাই চিৎ প্রবাহ এবং ইহাই স্থূল সূক্ষ্ম কারণাত্মক বিশ্বরূপে প্রতিভাসিত। হচ্ছে। এই ওঙ্কারই অক্ষর এবং সত্যম্ তদেতৎ সত্য, যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ বিস্ফুলিঙ্গঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপা তথা ক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্যভাবা প্রজায়ন্তে তত্রৈবাপিয়ন্তি।'

সুতরাং ব্রহ্মের প্রিয় নাম, সত্য অভিব্যক্তি, সাধনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, স্বপ্রকাশ সর্ব্বদেহস্থ অনাহত শব্দ ধারা ওঙ্কার শ্রবণ মনন ও উদগীথা নিদিধ্যাসন সহকৃত গুরু স্বরূপ ধ্যানই সত্য উপাসনা এবং সনাতন সাধন পন্থা।

ভগবদ্গীতা—সারসংগ্রহ

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ রায়, বি,-এ, ন্যায়বাগীশ

গীতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের একটী অংশ। ইহাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে।

মহাভারত পাঠে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। শৌর্য্যে বা বীর্য্যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা দৈহিক সম্পদে, রাজনীতি বা যুদ্ধকৌশলে, তাঁহার সময়ে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তৎকালিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্মান তাঁহাকেই দেওয়া হইয়াছিল। তিনি এইরূপ আধ্যাত্মিক সম্পদসম্পন্ন ছিলেন যে ভগবানের সহিত যোগ যুক্ত হইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল। অর্জ্জুনকে তত্ত্বোপদেশ দিবার সময় তিনি এই প্রকার যোগযুক্তাবস্থায়ই ছিলেন। অনুগীতাতে আছে যে, যুদ্ধের পর অর্জ্জুন পুনরায় পূর্ব্বপ্রদত্ত উপদেশ শ্রবণের প্রার্থী হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "হে অর্জ্জুন আমি তোমাকে তখন যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা যোগ-যুক্তাবস্থায় থাকিয়া বলিয়াছিলাম, এখন আর আমি তাহা স্মৃতিপথে আনিতে পারিব না। তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শোন নাই ইহা বড় দুঃখের বিষয়। এখন তোমাকে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ স্বরূপে জানাতেই হইয়াছে ধর্ম্মাচরণের পর্য্যাপ্তি।

পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া।
ন চ সাদ্য পুনর্ভূয়ঃ স্মৃতির্মে সংভবিষ্যতি।
অবুদ্ধ্যা নাগ্রহীর্য্যত্বং তাম্ সুমদপ্রিয়ম্।
সহি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে॥

গীতার ভক্ত দিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণ অবতার ছিলেন; কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি আংশিক অবতার ছিলেন, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে প্রখর আধ্যাত্মিক সম্পদসম্পন্ন মনুষ্য হইতে উচ্চ স্থান দিতে অনিচ্ছুক। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে মনুষ্য বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে এক স্থলে বলিয়াছিলেন, "হে রাজন্ মনুষ্যের পক্ষে যাহা সম্ভব তাহা আমি আপনার জন্ম করিব; দৈবের উপর আমার হাত নাই"। গীতাতেও তিনি ভগবানের বিভূতি মাত্র বলিয়াই স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণ অবতার ছিলেন, না আংশিক অবতার ছিলেন, না কেবল মাত্র প্রখর যোগবলসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক ভাবে বা অন্য কোনোও ভাবে আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এই স্থানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গীতোপদেশ ভগবানেরই বাণী; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ যোগ যুক্তাবস্থায় থাকিয়া, ভগবান যাহা বলাইয়াছিলেন, তাহাই বলিয়াছিলেন। গীতোপদেশের সার-মর্ম্ম সংক্ষেপে এবং স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য; ভগবান করুন যেন ভ্রম-প্রমাদ না ঘটে।

সকল প্রকার ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবার সময়ই একটী কথা মনে রাখিতে হইবে—এই সকল গ্রন্থে অনেক সময় ধর্ম্মের সার কথার সঙ্গে অর্থবাদ এবং আখ্যায়িকা জড়িত থাকে।

কোন্‌টা অর্থবাদ কোনটা কেবল মাত্র আখ্যায়িকা, ইহা ঠিক মত ধরিতে না পারিলে অনেক সময় ধর্ম্মগ্রন্থ ভুল বুঝিবার আশঙ্কা থাকে। যাহা ভাল তাহার অতিরিক্ত মাত্রায় প্রশংসা, এবং যাহা মন্দ তাহার অতিরিক্ত মাত্রায় নিন্দা করাকে অর্থবাদ বলে। এই প্রকার ভ্রমপ্রমাদ হইতে পাঠককে মুক্ত রাখিবার জন্ম ভাগবত বলিয়াছেন যে, যেরূপ মধুকর পুষ্প হইতে কেবল মাত্র তাহার সার সংগ্রহ করে, সেইরূপ সুনিপুণ পাঠকও ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সার সংগ্রহ করিবে।

অণুভ্যশ্চ মহদ্‌ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বেভ্যঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥

ভারতীয় প্রথা অনুসারে ধর্ম্মোপদেশের প্রার্থীকে বিনীত ভাবে উপদেষ্টার নিকট যাইয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয়। ঐ প্রকার বিনীত এবং শান্ত সমাহিত শিষ্যের নিকটই ধর্ম্মোপদেশের মর্ম্ম প্রকাশিত হয়। শ্রুতিবর্ণিত "তস্মৈতে কথিতা অর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"—অর্জ্জুনে গীতোপদেশেও এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয় নাই।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে।
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌॥

এই কথা বলিয়া ধর্ম্মোপদেশের প্রার্থী হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন।

ধর্ম্মের গোড়ার কথাই হইয়াছে আত্মার নিত্যত্বে বিশ্বাস। দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার ধ্বংস হইলে ধর্ম্মাচরণের সাফল্যই কি—প্রেরণাই বা আসিবে কোথা হইতে? তাই আত্মার নিত্যত্ব অবলম্বনেই উপদেশের আরম্ভ। তাই উপদেশের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইহা নিত্য শাশ্বত পুরাণ, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

জীব যখন অমর তখন তাহার পক্ষে নিত্য কালের জন্য, সর্ব্ব অবস্থা নিরপেক্ষ হইয়া যাহাতে সুখী হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। সর্ব্বাবস্থা নিরপেক্ষ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলেই—অর্থাৎ যে অবস্থা লাভ করিলে সর্ব্ব প্রকার ভয়ের হাত এড়াইতে পারা যায়, যাহাতে জরার ভয়, ব্যাধির ভয়, মৃত্যুর ভয় প্রভৃতি দূর হইয়া যায়, সেই অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই ঐ সুখ বা আনন্দ লাভ হয়। তাহা লাভের এক মাত্র উপায় অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। তাই গীতা বলিতেছে :—

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।

জীবের পক্ষে চরম জ্ঞেয় কি তোমায় বলিতেছি। যাহা জানিলে অমৃতত্বের অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থা—নিরপেক্ষ স্বাধীনতার অনুভূতি হয়। সেই চরম জ্ঞেয় বস্তু সদসৎ জড় জগতের অতীত আদ্যন্ত রহিত ব্রহ্ম।

অনাদি সৎ পরং ব্রহ্ম নসন্নাসদুচ্যতে॥

সেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্‌ এবং সর্ব্বব্যাপী। গীতার কবিত্বের ভাষায়

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩।১৩
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ॥ ১৩।১৭

ইহা সকল তত্ত্বের চরম তত্ত্ব। যেরূপ সূত্রে মণি গণ প্রোথিত থাকে, তেমন ইহাদ্বারা এই চরাচর বিশ্ব বিধৃত।

মত্তঃ পরতরং নান্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণ ইব ॥ ৭।৭

এই পরতম তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্ম পরমাত্মা মহেশ্বর প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত হয়। ভাগবতের ভাষাতে কথাটি কত সুন্দররূপে বলা হইয়াছে।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমব্যয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

এই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান একই সত্তার তিন নাম। সাধকের ভাবের পার্থক্যতানুসারে নামের পার্থক্য। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই ভাবত্রয়ের মধ্যে পরমাত্মভাবই আমাদের নিকটতম। পরমাত্মা স্বরূপেই তিনি আমাদিগের আত্মার আত্মা, আমাদিগের চালক এবং পোষক।

উপদ্রষ্টানুমন্তাচ ভোক্তা ভর্ত্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মা চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥

এই পরমাত্মভাবই গীতার উপাস্য। এই "সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ" "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি সর্ব্বক্ষেত্রেষু" "হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্টিতম্" "সর্ব্বভূতানাংহৃদ্দেশে তিষ্ঠতি" প্রভৃতি গীতোক্ত বাক্য সকল এই কথার সমর্থন করিবে ॥

বলা হইয়াছে অপরোক্ষভাবে ব্রহ্মকে জানাই হইয়াছে ধর্ম্মাচরণের সাফল্য—ধর্ম্মের সুপর্য্যাপ্তি। কিন্তু শ্রুতিতে আছে "স বেত্তি বেদ্যং ন তস্যাস্তিবেত্তা", যদি তাহা হয় তবে ব্রহ্মকে জানিবার চেষ্টা কি বৃথা শক্তিক্ষয় নয়? বাস্তবিক শ্রুতিতে যা আছে "নতস্যাস্তিবেত্তা" এই কথা ঠিকই। তবে কথাটীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। যে শ্রুতিতে আছে "নতস্যাস্তি বেত্তা" তাহাতে ইহাও আছে যে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত"নান্য পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"; এই সকল কথা কি বিরুদ্ধ বাক্য? না, বিরুদ্ধ বাক্য নহে; "ন তস্যাস্তি বেত্তা" ইহার অর্থ এই নয় যে কাহারও ব্রহ্মানুভূতি হয় না, ইহার অর্থ এই যে কেহই ব্রহ্মকে কোনোও ইন্দ্রিয়ের সহায়ে বিষয় রূপে জানিতে পারেনা। বাস্তবিক ব্রহ্ম চিন্ময় বস্তু, তাহাকে জড়ের সাহায্যে জানিবারত কথাই হইতে পারে না। "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ। যেন রূপং রসং বিজানীত তম্ কেন বিজানীয়াৎ"। যদি ব্রহ্মকে কোনও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়রূপে জানা না যায়, তবে তাহাকে জানিবার আর একটী মাত্র উপায় হইয়াছে—ব্রহ্ম হইয়া। প্রকৃত কথাও তাই। শ্রুতিতে আছে "ব্রহ্ম সন্ ব্রহ্মআপ্যেতি"। গীতা বলিতেছে, ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মকে জানা যায়,

স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি।

গীতার আগা গোড়া পর্য্যন্ত সাধক কি উপায়ে ব্রহ্মভূত হইবে সেই উপদেশেই পরিপূর্ণ। এই ব্রহ্মভূত বা ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হওয়া কথাটী গীতাতে নানা ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। 'ব্রাহ্মী-স্থিতি', 'ব্রহ্মে স্থিত', 'মদ্‌ভাব', প্রভৃতি শব্দ দ্বারা এই অবস্থাটীই লক্ষিত হইয়াছে। নিম্নের কয়েকটী শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে।—

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ২।৭২
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্‌ভাবমাগতাঃ ॥ ৪।১০
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ৫।২০

এখন প্রশ্ন হইতেছে ব্রহ্মভূত হইবার উপায় কি? কি সাধনা দ্বারা ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হওয়া যায়! ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার অনাত্মবস্তুজনিতবিকার-বর্জ্জিত। তাহাতে রাগ বা দ্বেষ নাই। সুতরাং ব্রহ্মভাবাপন্ন হইতে হইলে সাধককেও রাগদ্বেষবর্জ্জিত হইতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার চিত্তচাঞ্চল্য রহিত হইতে হইবে। গীতার ভাষায় এক কথায় গুণাতীত হইতে হইবে। এই গুণাতীত কথাটীর নানা প্রকার প্রতিশব্দও গীতাতে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—নির্দ্দোষ, সম, শান্ত, নির্দ্বন্দ্ব, ধীর, নিস্ত্রৈগুণ্য ইত্যাদি। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত অবস্থার বিস্তারিত লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্‌ক্ষতি ॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যমিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥১৪।২২-২৫

গুণাতীত বা নির্ব্বিকার অবস্থালাভের সাধনা কি? আমাদিগের চিত্তবিকার জন্মায় কিসে? রাগ দ্বেষই এই বিকারের কারণ। ব্রহ্মে রাগদ্বেষ নাই। যাহাকে ব্রহ্মকে আদর্শ করিয়া জীবন গঠন করিতে হইবে, তাহাকেও সর্ব্বপ্রকার রাগদ্বেষ বর্জ্জিত হইতে হইবে।

ব্রহ্ম সকলের প্রতি সমান, কেহ তাহার দ্বেষ্যও নাই, কেহ তাহার প্রিয়ও নহে।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যো ন মে প্রিয়ঃ।৯।২৯

সুতরাং যাহাকে ব্রহ্মভূত হইতে হইবে তাহাকেও সকল ভূতের প্রতি সমদর্শী হইয়া রাগদ্বেষ বর্জ্জিত হইতে হইবে। তাই গীতা বলিতেছেন।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ ৫।১৮-১৯

সকলের প্রতি কি ভাব পোষণ করিয়া সমদর্শী হইতে হইবে? গীতা বলিতেছেন, সকলকে নিজের মত দেখিয়া সমদর্শী হইতে হইবে।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৬।৩২

ঈশোপনিষদে আছে,

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

ভাগবতে এই সমদর্শন এতই প্রশংসিত হইয়াছে, ইহাকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান কপিলের দ্বারা তাঁহার মাতা দেবহূতিকে বলা হইয়াছে,

ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ।
মংনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥

সাধককে ব্রহ্মভাবাপন্ন হইতে হইলে সমদর্শী ত হইতেই হইবে, এই ছাড়া তাহাকে বিষয় বা অনাত্ম-বস্তুর প্রতিও রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত হইতে হইবে; তাই গীতা বলিতেছেন,

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ২।৬২-৩

বিষয়াশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন,

প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং।
ন সাম্পরায় প্রতিভাতি বালম্॥

এখন প্রশ্ন হইতেছে কি উপায়ে বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারা যায়?

গীতা ইহার উত্তরে তিনটী উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন,

১ম। অবিচ্ছেদে অনন্ত ভাবে ভগবানকে স্মৃতি পথে রাখা। এই ভাবে ঈশ্বরযুক্ত থাকার নাম ভক্তি-যোগ।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ৮।১৪

এই প্রকার অনন্ত ভাবে অবিচ্ছেদে আদর পূর্ব্বক ভগবানকে স্মৃতিপথে রাখাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। এই প্রকার ভক্তি দ্বারা সাধক গুণাতীত হইয়া ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হয়েন।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥১৪।২৪

প্রকৃত কথা এই যে সর্ব্বদা মন ভগভাবে ভরপুর থাকিলে, ইহাতে আর বিষয়াসক্তির স্থান থাকেনা।

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥

ভাগবতে আরও আছে।—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥

২য়। বৈরাগ্য লাভের দ্বিতীয় উপায় হইয়াছে তত্ত্ববিচার দ্বারা আত্ম ও অনাত্ম বস্তু নিরূপণ পূর্ব্বক যাহা অনাত্ম বস্তু তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে চিন্তা পথ হইতে অপসৃত করিয়া আত্মস্থ হওয়া। এই প্রণালীর সাধনাদ্বারা আত্মস্থ হওয়ার নাম জ্ঞান বা সাংখ্য-যোগ। গীতায় আছে :—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি-র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥

হে অর্জ্জুন, মনে রেখ যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ; মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইহারা সকলই জড়; ইহাদিগের একটীও আত্মা নহে। আত্মা ইহাদিগের অতীত। সাধনা দ্বারা মনকে এই সকল হইতে অপসৃত করিয়া 'বিষয়বাসনারূপ মহাশত্রুকে জয় করিতে পারা যায়।

সাধনার প্রণালীটী এই ভাবে বিবৃত করা হইয়াছে।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ৬।২৪-২৫

জ্ঞানমার্গাশ্রয়ী দিগের সাধনাই হইয়াছে "নেতি নেতি" করিয়া সর্ব্ব প্রকার অনাত্ম বস্তুকে চিন্তা পথ

হইতে অপসৃত করিয়া নির্ব্বাতপ্রদীপের স্তায় শান্ত।" তাহাদিগের "ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ"—সহজ কথায় কিছুর চিন্তা না করা। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে কথাটী এই ভাবে,

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥

যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি তাহা দিগের স্ব স্ব ব্যাপার হইতে বিরত থাকে ইহাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা, ব্রহ্মভূত হইবার অবস্থা। এই অবস্থা লাভ করিতে পারিলে সাধক দেখিতে পায় যে তিনি চৈতন্যময় পুরুষ—দেহ হইতে ভিন্ন; স্বরূপ ঐক্য বশতঃ নিজের মধ্যেই সকল চৈতন্যের চৈতন্য পরমাত্মাকেও উপলব্ধি করিতে পারেন। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিতেছেন:—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৪।১৯

৩য়। বৈরাগ্য লাভের তৃতীয় উপায় হইয়াছে ভগবদ্ প্রেরণাই কর্ত্তব্য বুদ্ধির মূল, এই কথা মনে রাখিয়া ফলাফলে সমচিত্ত থাকিয়া নির্ভয়ে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা। এই প্রণালীর সাধনার নাম **কর্ম্মযোগ**।

এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিলে কর্ম্ম দ্বারা বিকারগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকেনা। সহজেই গুণাতীত অবস্থায় বিরাজিত থাকিতে পারা যায়। গীতা বলিতেছেন—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ৫।১০

এই প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাকে বলে যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা। যোগই কর্ম্মের কৌশল—"যোগ কর্ম্মসু কৌশলম্"। গীতা বলিতেছেন:—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥২।৪৮

হে ধনঞ্জয়, তুমি যোগস্থ হইয়া ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। ফলা ফলে সমচিত্ত থাকাই ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ। ইহাই যোগ।

কোন্ কথা মনে রাখিলে ফলাফল সমিচিত্ত থাকা যায়? ভগবৎ প্রেরণাই কর্ত্তব্য বুদ্ধির মূল; এই প্রেরণাতে আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিবার আদেশ পাই মাত্র—প্রত্যেক কর্ম্মেই কৃতকার্য্য হইবার প্রতিজ্ঞা থাকেনা। তাই গীতা বলিতেছেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্ম্মফলহেতু-র্ভূ-র্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ২।৪৭

এই কর্ম্মযোগ গীতাতে এত প্রশংসিত হইয়াছে যে, ইহাকে উপলক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই কর্ম্ম যোগের রহস্য যিনি জানেন তাহার পক্ষে বেদ বেদান্তাদির পাঠ নিষ্প্রয়োজন। সমগ্র দেশ জলে প্লাবিত হইলে কোন বুদ্ধিমান লোক তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ক্ষুদ্র জলাশয়ের অন্বেষণ করে?

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ২।৪৬

ইহাত হইবারই কথা। সকল মনুষ্যের মধ্যে যখন কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল, তখন কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্ম লাভের উপায় যে অতি আদরণীয় হইবে, ইহাত বলাই বাহুল্য। এই প্রণালীর কর্ম্মযোগই গীতার বিশেষত্ব। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মপন্থা আছে—ভারতীয়ই হউক, বা অন্য স্থানেরই হউক তাহাদিগের কোনটীর মধ্যে এই প্রণালীর কর্ম্মযোগের উল্লেখ বা বিবৃতি নাই। এক অর্থে বলিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণই এই যোগের আবিষ্কর্ত্তা। অবশ্য আমি ইহা বলিনা, যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে কেহ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্ম লাভ করেন নাই। তাহাত হইতেই পারেনা; কারণ গীতাতেই রহিয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বে জনক প্রভৃতি রাজন্যগণ কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন—এবং বিবস্বান ইহা মনুকে, মনু ইক্ষাকুকে শিক্ষা দিয়াছিলেন! সময়ে লোকে ইহা ভুলিয়া যায়; এবং শ্রীকৃষ্ণ ইহা পুনরায় উদ্ধার করেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কর্ম্মযোগের আবিষ্কর্ত্তা, ইহা দ্বারা আমি এই বলিতে চাই যে জ্ঞান এবং ভক্তির ন্যায় এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ যে একটী ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়, ইহা তিনিই স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—এবং ইহার যে কৌশলটী কি তাহাও স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

গীতার ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কেহ বা জ্ঞান যোগের কেহ ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া নিজ নিজ শক্তি এবং বুদ্ধি বাক চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। গীতোক্ত কর্ম্মের কথা এক প্রকার উল্লেখ করিতেও অবসর পান নাই! যদিও বা কখনও কখনও কর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন, তখন কর্ম্মদ্বারা তাঁহারা বেদোক্ত যাগ যজ্ঞই লক্ষ্য করিয়াছেন। গীতার কর্ম্মযোগ সর্ব্বপ্রকার নিষ্কাম কর্ম্মকে লক্ষ্য করে, ইহা যেন তাহারা বুঝিতেই পারেন না। নিষ্কাম কর্ত্তব্য কর্ম্ম যতই গুরুতর হউক না কেন, তাহা যে কর্ম্মযোগ অনুযায়ী কর্ম্ম তাহা গীতাতে স্পষ্ট ভাষায়ই উল্লেখ আছে। এই প্রকার কর্ম্ম করিতে পৃথিবীর সর্ব্বলোকও যদি হত্যার আবশ্যক হয় তথাপি তাহা কর্ম্মযোগেরই অনুযায়ী। গীতা বলিতেছেন, যাহার কর্ম্মেতে কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, যিনি ফলাফলে সমচিত্ত থাকেন, তিনি অন্য কর্ম্ম ত দূরের কথা, কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে যদি পৃথিবীর সকল লোক বধকরা স্বরূপ গুরুতর কর্ম্মও করেন, তথাপি কর্ম্ম জন্য বিকার দ্বারা অভিভূত হয়েন না। এবং ইহা তাহার বন্ধনেরও কারণ হইতে পারে না।

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৮।১৭

দেশে এমন একটী সময় আসিয়াছিল, যখন লোক সন্ন্যাস বা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মত্যাগকেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় মনে করিতে। ইহার ফলে মিথ্যাচার (মিথ্যাচার স উচ্যতে)। গীতা এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে Reasoned protest.

বলা হইয়াছে যে গীতার কর্ম্মযোগের সাধনপথটী পূর্ব্বে জানা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের সময় লোকে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহা পুনরুদ্ধার করেন। কে বলিতে পারে যে লোকে ইহা আবার ভুলিয়া যায় নাই! সাধু মহাপুরুষ যাঁহারা আসেন, তাঁহারা ত জ্ঞান বা ভক্তির কথাই বলেন, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যে ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হওয়া যায়, তাঁহারা যেন এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না—অথচ এই কর্ম্ম যোগের সাধন পথটী হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন যে এখন সেই সময় হইতে কম তাহা নহে। ভগবান করুন যেন আমাদের দেশের সকলেই জ্ঞানী অজ্ঞানী, ধনী নির্দ্ধন, যুবক বৃদ্ধ

সকলেই এই কর্ম্মযোগের সাধনপথটী হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাদিগের হৃদয়স্থ উপদ্রেষ্টা অনুমন্তা ভোক্তা ভর্ত্তা মহেশ্বরকে অর্জ্জুনের ন্যায় বলিতে পারেন,

নষ্টো মোহঃ স্মৃতি-র্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়াঽচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

জ্ঞান ভক্তি এবং কর্ম্ম এই তিন উপায় ব্যতীত ব্রহ্মভাবাপন্ন হইবার আর উপায়ান্তর নাই।

ভাগবতের একদশ অধ্যায় যাহা গীতারই প্রতিধ্বনি মাত্র, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট ভাষায়ই উদ্ধবকে বলিয়াছেন,

যোগ এষো ময়া প্রোক্তো নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥

জ্ঞান কর্ম্ম এবং ভক্তির মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে ভাষ্যকারদের মতভেদ আছে; তর্ক বিতর্কেরও অন্ত নাই। দেখা যাউক গীতা কি বলিতেছেন। জ্ঞান এবং ভক্তির মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যাহারা জ্ঞান মার্গাশ্রয়ী বিষয় হইতে সম্যক রূপে ইন্দ্রিয়-গ্রাম সংযম রূপ উপাসনা দ্বারা আত্মস্থ হয়েন, তাহারাও ব্রহ্মকে লাভ করে এবং যাহারা অবিচ্ছেদে অনন্য ভাবে ভগবানে মন রাখিয়া তাহাতে যুক্ত থাকে, তাহারাও তাহাকেই লাভ করে। তবে এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দেহধারীর পক্ষে অব্যক্তের উপাসনা অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয় সংযম অপেক্ষাকৃত অধিক কঠিন।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ১১২-৫

আর এক স্থলে জ্ঞান এবং কর্ম্মের উপলক্ষেও এইরূপ ভাবই প্রকাশ করা হইয়াছে। অজ্ঞানীরাই জ্ঞান এবং কর্ম্মকে পৃথক বলিয়া জানে। জ্ঞানীরা জানে যে উভয়েরই ফল। ফলতঃ জ্ঞান এবং কর্ম্মকে যাহারা এক বলিয়া দেখে তাহারাই ঠিক দেখে।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালা প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫।৪-৫

প্রকৃত পক্ষে এই উপায়-ত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের কথাই হইতে পারে না। সাধকের প্রকৃতি অনুসারে যাহার নিকট যে ভাল বোধ হয়, তাহার পক্ষে সেইটাই শ্রেষ্ঠ। বিচার বুদ্ধি যাহার প্রকৃতির বিশেষত্ব তাহার জন্য জ্ঞান, কর্ম্মপ্রবৃত্তি যাহার প্রকৃতির বিশেষত্ব তাহার জন্য কর্ম্ম এবং ভাব-প্রবণতা যাহার প্রকৃতির বিশেষত্ব তাহার জন্য ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে এই সকল উপায় যতটা ভিতরের বিষয় ততটা বাহিরের বিষয় নহে; যতটা মানসিক প্রক্রিয়া ততটা বাহ্যিক ব্যাপার নহে। সকল সাধকই অল্পবিস্তর তিন পথেই চলে এবং কতকটা অগ্রসর হইলে তাহারা প্রকৃতির অনুকূল যে উপায়টী তাহাতে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করে। এই কথা উপলক্ষ করিয়াই বলা হইয়াছে,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

এখন গীতোপদেশের সার মর্ম্ম অল্প কথায় বলা যাইতে পারে। সকল তত্ত্বের চরম তত্ত্বের অব্যয় জ্ঞানময় বস্তু যাহা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি, যাহাতে স্থিতি এবং যাহাতে লয়, তাহাই ব্রহ্ম পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মকে অপরোক্ষ ভাবে জানাতেই হইয়াছে ধর্ম্মাচরণের সাফল্য। এই ব্রহ্মকে অপরোক্ষভাবে জানিবার এক মাত্র উপায় হইয়াছে ব্রহ্মভূত বা ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়া—ব্রহ্মকে আদর্শ করিয়া জীবন গঠন করা। ব্রহ্মভূত হইবার উপায় হইয়াছে সর্ব্বপ্রকার অনাত্মবস্তুর প্রতি রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত হওয়া—এক কথায় গুণাতীত হওয়া। সকল ভূতকে নিজের মত প্রীতির চক্ষুতে দেখিয়া, এবং বিষয়ের প্রতি রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া এই অবস্থা লাভ করিতে পারা যায়। ইহার আর অন্য উপায় নাই। এই বিষয়ের প্রতি রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত হওয়ার নাম বৈরাগ্য। তিন উপায়ে বৈরাগ্য লাভ করিতে পারা যায়,—১ম, বিচার পূর্ব্বক আত্ম অনাত্ম বস্তু নিরূপণ পূর্ব্বক, সর্ব্ব প্রকার অনাত্ম বস্তুকে একটী একটী করিয়া চিন্তা পথ হইতে অপসৃত করিয়া সর্ব্বপ্রকার চিন্তাশূন্য হওয়া—এই প্রকার মানসিক প্রক্রিয়ার নাম **জ্ঞান**। ২য়, অবিচ্ছেদে অনন্য ভাবে ভগবানের কোনো একটী ভাব দ্বারা মনকে ভরপূর করিয়া রাখা—এই প্রকার মানসিক প্রক্রিয়ার নাম **ভক্তি**। ৩য় সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য বুদ্ধির মূল ভগবৎ প্রেরণা—এই কথা মনে রাখিয়া ফলাফলে সমচিত্ত থাকিয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা—এই রূপ মানসিক প্রক্রিয়ার নাম কর্ম্মযোগ বা **নিষ্কাম কর্ম্ম**। আরও সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে অপরোক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কার্য্যকরী সাধন হইয়াছে—

১ম। সমদর্শন এবং জ্ঞান।

অথবা

২য়। সমদর্শন এবং ভক্তি।

অথবা

৩য়। সমদর্শন এবং কর্ম্ম।

সমদর্শন—আত্মৌপম্যেন সকলকে ভালবাসা হইয়াছে সকল প্রকার সাধনার সাধারণ ভূমি।

আইন ভঙ্গ

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ শেঠ

কথাটা খুবই চলিয়াছে। কিন্তু দেখিতে ক্ষতি কি যে ভাষা দ্বারা যদি কোনও বাস্তব ভাবের প্রকাশ সত্য হয় তবে আইন ভঙ্গ বলিয়া কোনও বাস্তব সত্তা আছে কি না? আইন বস্তুটাই বা কি? আর তাহার ভঙ্গ করা কাজটাই বা কি? আইন বলিয়া লোকে যাহা জানে তাহার মূলে আইনত্বটা কি, আর তাহা ভাঙ্গিয়া যে অবস্থা বা অভাব ঘটাইয়া তোলে তাহার বস্তুগত প্রকৃতিই বা কি?

আইন কথাটা আমাদের সংস্কৃত ভাষায় নাই। আইন পারস্য ভাষা হইতে আমদানি। আমাদের দেশের প্রতিশব্দ হইল বিধিনিষেধ।

আইন কথাটা আজকাল যে অর্থে চলিতেছে তাহা নিছক ইংলণ্ডের 'ল' কথার অনুবাদ মাত্র। ঐ 'ল' কথার দ্যোতনা ইউরোপের ইতিহাসে কত রকমের ভাবের ব্যঞ্জনা করিয়াছে তাহা একজন অধ্যয়নরত ছাত্রের চারি পাঁচ বৎসর গবেষণার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। আমরা এ নিবন্ধে সে বিফল প্রয়াস করিতেছি না। তবে এই সমস্ত ব্যঞ্জনার একটা মোটামুটি আভাস দিয়া আমাদের মূল বক্তব্যটী পরিষ্কার করিতে চাই। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা ইংরাজী ভাষার মারফতেই জানিয়াছি। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে সকল প্রকার চিন্তা ধারার প্রকাশ হইতে পারে, সেই স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া লইয়া লিখিতেছি।

প্রথমে আমরা গ্রীসের ইতিহাসে আইনের কথা পাই। প্রাচীন গ্রীসে জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা ও নাগরিক একপ্রাণতা লইয়া একটা নাগরিক সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেখানে শ্রেণিবিদ্বেষ ছিল না বলিলেই হয় এবং সহরের ভিতরে একটী স্বাজাত্যবোধে একটা আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিল। সেই গ্রীসের চিন্তা ধারার ভিতর প্রথম মনস্বী ছিলেন সক্রেটিস্। তিনি একপক্ষে যেমন মানুষের নিজেকে জানাই চরম সত্য বলিয়া প্রচার করেন, মানুষের ব্যবহারিক সত্তার পক্ষে সমগ্র জাতির সহিত একীভূত মনোভাবই জ্ঞানমার্গে লাভ করাই তাহার মতে কার্য্যপ্রণালীর আদর্শ ছিল। কাজেই রাষ্ট্রের আইন ও সর্ব্বানুমত ব্যবহারই তাঁহার কাছে আইন ছিল। প্লেটো বলেন যে গুণে মানুষের সত্তা সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে তাহাই ন্যায় বিচার এবং যে জ্ঞানী মণ্ডলী সেই ন্যায় বিচারের সাহায্য করেন তাঁহাদের বিধান হইল আইন। এরিষ্টটল এই সমন্বয় মানুষের অভিজ্ঞতা জাত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। প্লেটো যাহা জ্ঞানীর ভাব সম্পদ বলিয়া মানিতেন, এরিষ্টটল তাহা মানুষের ক্রমবিকশিত গৃহ, গোত্র, গ্রাম ও সহরের অভিজ্ঞতা দ্বারা গড়িয়া উঠে বলিয়া মানিতেন। কাজেই তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান এবং রাষ্ট্রের পক্ষে আইন ছিল ভিত্তি।

ইউরোপে খ্রীষ্ট ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আইন সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। স্কলাষ্টিকরা আইন অর্থে ধরেন একটা বাহিরের শাসন মন্ত্র—রাষ্ট্রকে বজায় রাখিবার কৌশল। গ্রোটিয়স বলেন

আইন হইল সামাজিক ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন। স্পিনোজা বলেন কার্য্য ব্যবহারের নীতি। একমাত্র লায়েবনীজ বলেন যে ব্যষ্টির ভিতর ভগবৎসত্তার বিকাশই আইন!

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই সকল ধারণা লইয়া অনেক দার্শনিক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বিখ্যাত দার্শনিক স্যাভিনী বলেন যে ক্রমাভিব্যক্ত জন সমাজের ও জনমতের বাহিরের রূপই হইল আইন। জুকৃটা বলেন স্বার্থ ব্যাকুল ব্যক্তির সহিত সাধারণ মতের সংঘর্ষ হইতেই আইনের উদ্ভব, যেখানে সংঘর্ষ নাই সেখানে আইনও নাই। তাঁহার সমসাময়িক গষ্টেভ হুগো বলেন, লোকে তাস পাশা খেলায় যেমন একটা নিয়ম মানিয়া চলে, তেমনি যাহা লোকে মানিয়া লয় তাহাই প্রকৃত আইন। তিনি এতদূর বলেন যে জনসাধারণের প্রকৃতি ও প্রথা বিরুদ্ধ কোনও নিয়ম যদি রাষ্ট্র প্রবর্ত্তন করে এবং তাহা যদি সমাজ না মানিতে বা না বহাল করিতে চায়, তবে তাহা আইনের নামের যোগ্য নহে।

বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্ট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপাসক। কিন্তু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধের সম্ভাবনায় আইনের অস্তিত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেন। ক্রাউস্ বলেন বহিপ্রর্কৃতি ও বিকৃত ব্যক্তিগত প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যে যুক্তিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিতে হয় সেই যুক্তি বলে সমাজের একটা জৈব সত্তা ধরিয়া যে নিয়ম পালন করিতে হয় তাহাই আইন। কাজেই তাঁহার মতে আইনের একটা বহিরঙ্গ সত্তা আছে। হেগেল বলেন, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বহিবিকাশই আইন, এবং তদ্বারা বিশ্ব বাসনার সহিত ব্যক্তিগত বাসনার সঙ্গতি রক্ষা হয়। কোহেন বলেন আদর্শ স্বত্বের ও আদর্শ ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠাই হইল আইনের কার্য্য, কাজেই যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শের পরিবর্ত্তন হইয়া চলিয়াছে। রুডলফ্ ষ্ট্যামলার কাণ্টের মতবাদে বিজ্ঞানের বস্তু তান্ত্রিকতার অভাব বোধ করেন, তাই তাঁহার চিন্তা ধারায় ব্যক্তিরও যেমন আত্মা আছে সমাজেরও তেমনি আত্মা আছে স্বীকৃত হয়। তাঁহার মতে চারিটী মৌলিক তত্ত্বের উপর ন্যায় বিচারের ভিত্তি নির্ভর করে।

১। ব্যক্তির ইচ্ছাকে দমন করিতে কোনও স্বৈরাচারী জবর দস্তি বা বাধা থাকিবে না।

২। সাধারণের সুযোগ সুবিধা হইতে স্বেচ্ছাচারি ভাবে কাহাকেও বঞ্চিত করা যাইবে না।

৩। আইনের দাবি দ্বারা প্রত্যেকের অস্তিত্ব রচিত হইবে।

৪। সমাজের মৈত্রী-জনিত স্ব-নিয়ন্ত্রণের (ঘর গুছাইবার) অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া আইনের শাসন ক্ষমতা দ্বারা অসাম্য প্রতিষ্ঠা হইবে না।

ইহার পর দার্শনিক কোহলারের মতবাদ। তাঁহার মতে জাতির প্রকৃতি ও জীবাত্মার উপর ইতিহাসের ঘটনাবলী যে দাগ রাখিয়া যায় তাহাই বর্ত্তমানের জাতিগত সাধনা। সেই সাধনার ভিত্তিই হইল আইনের বস্তুগত অধিকার। কাজেই তাঁহার বিশ্বাস যে একটী জাতির অতিমানুষরা আইন দ্বারা অতীতের শ্রেয়কে বজায় রাখেন, প্রতিক্রিয়াশীল ও হানিকর উপদ্রবকে বিসর্জ্জন করেন এবং জাতিকে উন্নতির পথে আগাইয়া দেন। রাষ্ট্রে ও ব্যক্তিতে একটা পারস্পরিক সহযোগিতা থাকাতে রাষ্ট্রে ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করা সাধারণতঃ অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক।

ইউরোপের বুধমণ্ডলীর চিন্তাধারা এইরূপ ভাবে নানা প্রকারে অভিব্যক্ত হইয়া আজ যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ইংলণ্ডের ব্যবস্থাপক ও পণ্ডিত গণের আইন সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু তাহার

সঙ্গে মিলে না। প্লেটোর কাছে যাহা মনোরাজ্যের আদর্শ জ্ঞানজাত, লায়েবনীজের কাছে যাহা ভগবৎ স্ফুরণে প্রাণবন্ত, ষ্ট্যামলারের কাছে যাহা একটা আদর্শ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপায়, হেগেলের যাহা বিশ্বতন্ত্রের সুর ও কোহ্লারের কাছে যাহা মানুষের সাধন সম্পত্তি রক্ষা ও অর্জ্জনের উপায়, ইংলণ্ডের কাছে তাহা হুকুম মাত্র। ব্লাকষ্টোন বলেন রাষ্ট্র নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারিক নিয়মই আইন, ষ্টিফেনও তাহাই সমর্থন করেন, বিচার পতি মার্কবি একটা কথা মাত্র অতিরিক্ত বলেন যে, তাহাই বটে—তবে যাহা সাধারণে মানে। নিবন্ধকার হল্যাণ্ড মানুষের বহির্ম্মুখীন কাজেই তাহা নিবদ্ধ রাখিতে চান বটে, কিন্তু বর্ত্তমান ইংলণ্ডের লোকমতে ও ব্যবহারিক প্রয়োগে দেখা যায় অষ্টিনের আইন সংজ্ঞাই তাহাদের মস্তিষ্ক দৌড়ের শেষ কথা। অষ্টিনের মতে রাজনৈতিক উচ্চাধিকারী বা রাজশক্তি রাজনৈতিক নীচাধিকারীর মানিবার জন্য যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া দেন তাহাই আইন। কাজেই বেন্থাম, অষ্টিন, মেন হ্যামিল্টন প্রভৃতির মতে আজ্ঞা, আজ্ঞাবাহী প্রজার বাধ্যবাধকতা ও দণ্ড এই তিন লইয়া হইল আইন। বিলাতী বিশ্বকোষের লেখকের বিদ্যাও এইপর্য্যন্ত যায়। আভিধানিক অর্থ একচুলও এদিক ওদিক হয় না।

মার্কিণ দেশে এ মতের ব্যবহারিক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। তথায় বহু প্রচলিত ও পারম্পর্য্য সমর্থিত প্রথাকেও লিখিত আইনের তুল্যমূল্য করা হইয়াছে। এক মোকদ্দমায় বিচারপতি বলেন আদালত দ্বারা যাহা লোক বলের সমর্থন হয় সেই সেই অবস্থার লিপিরচনাই হইল আইন। সুতরাং রাষ্ট্র শক্তির সহিত লোকমতের একটা সামঞ্জস্য এই সংজ্ঞাতে রক্ষিত হইয়াছে। ডিলন হল্যাণ্ডের সংজ্ঞাকে গ্রহণ করিয়া স্বীকার করেন—যদি আইনের স্বত্ব ও কর্ত্তব্য কোন কোন উৎস হইতে সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট তাহা বর্ণনা করিতে বলা হয়, তবে আমি মাথানত করিব এবং তাহার যথাযথ জবাব দিতে অপারগ বলিয়া স্বীকার করিব। ১৮৯০ সালে জেমস্ সি কার্টার নামে এক চিন্তাশীল লেখক বলেন—আইন সমাজ বহির্ভূক্ত হুকুমনামা নহে, রাজাজ্ঞাও নহে বা উচ্চাধিকারীর আজ্ঞাও নহে বা প্রতিনিধি সভার আজ্ঞাও নহে। It exists at all times as one of the elements of the society springing directly from habit and custom.—অভ্যাস ও প্রথা হইতে উৎপন্ন হইয়া সমাজের একটী সনাতন উপকরণরূপে ইহা বর্ত্তমান আছে। ইহা সমাজের একটী অজ্ঞাত সৃষ্টি বা বিভূতি। সাধারণতঃ ইহার ব্যাখ্যাতাকেও অপেক্ষা রাখে না পরিরক্ষকের তোয়াক্কা রাখে না। প্রত্যেক সামাজিকই ইহার সহিত সুপরিচিত ও ইহাকে মানিয়া থাকেন; এবং প্রথা মানে ইহা বলিয়াই আইন আইন। ব্যত্যয়ের জন্য আদালতের সৃষ্টি ও নূতন অবস্থার অনুকূলে নূতনের প্রবর্ত্তনের জন্য আইন সভার সৃষ্টি।

মার্কিণের চিন্তাধারায় কার্টারের মত স্থায়ী হইয়াছে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। কেননা উড্রো উইলসন যখন তাঁহার "রাষ্ট্র" সম্বন্ধীয় বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেন তখন তিনি আইনের সংজ্ঞা দিলেন—রাষ্ট্রের অধীনস্থ লোকের ব্যবহারিক জীবনের সম্বন্ধে রাষ্ট্রের অভিপ্রায়। সুব্যবস্থিত চিন্তা ও অভ্যাসের সেই অংশই আইন যাহা লইয়া বিশেষ ভাবে শাসন প্রণালী নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছে—ইংরেজী আইনতত্ত্বের মোহে পড়িয়াই উড্রো উইলসনকে এইরূপ স্বীকার করিতে হইয়াছে। নিবন্ধকার হল্যাণ্ডের সমস্ত কথা মানিয়া লইয়া তিনি পুনরায় Customবা প্রথাকেই সর্ব্বোচ্চ আসন দিতে বাধ্য হইয়াছেন। Custom is habit under another name ; and habit in its growth, while it continually adjusto

itself to the standard fixed in formal law, also slowly compels formal law to conform to its abiding influences. Habit may be said to be the great law within which laws spring up. প্রথা অভ্যাসের নামান্তর মাত্র। অভ্যাস জমিতে জমিতে লিপিবদ্ধ আইনকে যেমন বনাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তেমনি অভ্যাসের স্থায়ী ক্ষমতা লিপিবদ্ধ আইনকে ভাঙচুর করিয়া আনে। অভ্যাসই সেই মহত্তর আইন যাহার অভ্যন্তর হইতে আইন জন্ম গ্রহণ করে। ইহা আলোচনা করিতে করিতে তিনি স্বীকার করেন যে একটা জাতির ক্ষমতা আইনকে যদি সমর্থন না করে তবে তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। The majority must acquiesce, or the law must be nul. সংখ্যা গরিষ্ঠকে মানিতে হইবে, নতুবা আইন শূন্যগর্ভ হইয়া যাইবে। The habit of the people is the material on which the legislator works ; and its qualities constitute the limitations of his power. It is stubborn material, and dangerous. If he ventures to despise it, it forces him to regard and humour it ; if he would put it to unaccustomed uses, it balks him ; if he seeks to force it, it will explode in his hands and destroy him. The sovereignty is not his, but only the leadership. মানুষের অভ্যাসই আইন কর্ত্তার মাল মশলা ; আর সেই মাল মশলার গুণাগুণই আইনকর্ত্তার ক্ষমতার পরিধি। এই মাল মশলা বড়ই কড়া এবং বড়ই জ্বালাতন করে। তিনি যদি তাহা অবহেলা করেন, তবে তাহা মানাইয়া ও মান কাড়িয়া লয়, যদি অনভ্যস্ত পথে চালান তবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়, আর যদি জোর জবরদস্তি করেন, তবে তাঁহার হাতেই ফাটিয়া তাঁহাকেই ধ্বংস করে। শক্তির আধার, আইন কর্ত্তার নহে, তিনি নেতা মাত্র।

বলা বাহুল্য, অধ্যাপক উড্রো উইলসন তাঁহার মতামত কতটা কার্য্যতঃ মার্কিন দেশে চালাইতে পারিয়াছিলেন তাহাও বিবেচ্য। তবে একথা স্বীকার্য্য যে যুক্তরাজ্যের লোকমত যে মার্কিন দেশের রাষ্ট্র ও আইনে নিজেদের ক্ষমতা বহুল পরিমাণে প্রয়োগ করিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই।

স্বল্প কথায় আইন সম্বন্ধে যে যে মতবাদ বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতায় চলিতেছে তাহার আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে এতৎ সম্বন্ধে যত কিছু ব্যাপক দ্যোতনা নানা বিধান মণ্ডলীর ভাবনার ভিতর থাকুক না কেন, কার্য্যতঃ যাহা কিছু রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপিত হয় তাহাই আইন। ইহা মানুষের ঘর সংসারের বাহ্য শক্তির হুকুম মাত্র, শৃঙ্খলিত প্রণালী বদ্ধ ব্যবস্থায় বাধ্য করা এবং দণ্ড দ্বারা ইহার বলের পরিমাপ হয়।

আইন সম্বন্ধে ও আইন তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা মতবাদ পড়িয়া ও ইংরেজের আইন আদালতকেও জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্র করিয়া আমাদের দেশের বর্ত্তমান যুগের মনীষীরাও আইন তত্ত্বের চরম সত্য যে অষ্টিনের মতবাদ তাহা স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই।

ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় স্পষ্টই বলেন যে সংস্কৃত ভাষা ভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে উপকার করিয়াছে হিন্দুর আইন আইন-তত্ত্ব সম্বন্ধে সেই উপকার অচিরেই করিবে।

ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ স্মার্ত্ত শিরোমণি অষ্টিনের মত যে হিন্দু আইনের মৌলিক ভিত্তির ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না তাহা বারংবার বলিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু আইনকে শ্রীভগবানের আদেশ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

কামন্দক নীতিতে আছে "অশাস্ত্রচক্ষুর্নৃপতিরন্ধ ইত্যভিধীয়তে।"

ইং ১৯০৯ সালে ডাঃ প্রিয়নাথ সেন হিন্দুর আইন তত্ত্ব সম্বন্ধে ঠাকুর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বেদান্তবিদ্, শাস্ত্র-বিশ্বাসী ও আস্তিক্যবুদ্ধি সম্পন্ন হিন্দু ছিলেন। তাই তাঁহার বক্তৃতাবলীর প্রথমেই আইনের অধিকার সম্বন্ধে প্রথম যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা চিন্তনীয়।

"মানুষের প্রবৃত্তি ও বাসনার অসংখ্য প্রকার খেলার মধ্যে মানুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রিত করিবার নিয়মাবলী ব্যবস্থা করাই হইল আইনের অধিকার। সেই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির ইচ্ছাকে সে ব্যক্তির সমাজের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গত ও সামঞ্জস্য করা। ইহা অসংযত বাসনার অবাস্তব স্বাধীনতাকে এরূপ ভাবে সংযত করে যাহাতে যে সর্ব্বহিত যুক্তির প্রণালীতে সমাজ শাসিত হয় সেই প্রণালীতে ব্যক্তিগত বিশেষত্বের স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং তাহাদ্বারা সর্ব্বজনে ওতপ্রোত কারণ-ধারা সমাজকে ও ব্যক্তিকে উচ্চতর স্বাধীনতার পথে লইয়া যায়।" বলাবাহুল্য ইহা অষ্টিনের মতবাদের অনেক বিভিন্ন ভূমির বস্তু। পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে উপরে যত কিছু মতবাদের উল্লেখ করিয়াছি তৎসমুদয়ই ডাঃ সেনের বর্ণনার ভিতর পড়িয়া যায়। এখন আইন যদি ঐ তত্ত্ববস্তু হয় তবে ইহাও বোধগম্য হইবে যে আইন কানুন যদি আইন হয় তবে তাহা অমান্য করা চলে না। কেননা হিন্দু আইনতত্ত্বানুসারে "প্রবর্ত্তককার্য্যতা জ্ঞান সম্পাদক লিঙ্‌পদ ঘটিত বাক্যং"। কোন কার্য্য প্রবৃত্তি দিবে বা কোন কার্য্যে অপ্রবৃত্ত রাখিবে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান যে বাক্যে জানাইয়া দেয় তাহাই হইল বিধি। ইহা কোনও বাহ্য বস্তুর হুকুম নহে যে মানিব কি না মানিব সে চিন্তার অবসর দিবে। ইহা কার্য্যাকার্য্যে প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তির জ্ঞান সম্পন্ন করিবে বলিয়াই বিধি। সুতরাং যাহার কার্য্য তাহারই জ্ঞানের উপর এই বিধির বিধিত্ব।

তাহার পর আর একটী চিন্তনীয় বিষয় আছে। বিলাতী তত্ত্বে হুকুম হইল আইন। এই আইন একত্র করিলে আমাদের মহাভারতের দশখানা হইবে। আর আমাদের আইনের সমস্ত সার সংকলিত মনুসংহিতা খানা মহাভারতের এক আনা অংশ। অথচ আমাদের শিক্ষিত সমাজ বলিয়া বেড়ান যে ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে বন্ধন লইয়া হইল ইংরেজ স্বাধীন ও স্বাধীনতা সেবীর আদর্শ; আর ঐ অল্পায়তন মনুসংহিতাকে মানা হইল পরাধীনতা স্বীকার ও অত্যাচার বরণ। আবার এক দিক দিয়া দেখিবার আছে। ইংরেজের আইন আদালতের একটা বাঁধাবুলি হইল, আইনের অজ্ঞতা অমার্জ্জনীয়। কিন্তু ১০ খানা মহাভারত ও তাহার টিকাটিপ্পনী কয়জনই বা জানে বা ধারণা করিতে পারে? তাই রাষ্ট্রের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে সব সময় কেতাব দেখিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়। আর এই কেতাবতি আইনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ লইয়া গত ৪০০।৫০০ বৎসর ধরিয়া ৪০০০।৫০০০ নজীর তৈয়ারী হইয়াছে। তাহাদের নির্ঘণ্ট, সূচী, উপক্রমণিকা, উপোদ্‌ঘাত—সে যে কি এক বিরাট ব্যাপার, তাহার ইয়ত্তা করাই যায় না। অপর পক্ষে মনুসংহিতা হইল সকল স্মৃতির সার। কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাহাই প্রামাণ্য। সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে কর্ত্তব্য পালনের পদ্ধতিগুলি মানবজীবনের গভীরতম সত্য হইতে অবধারণ করিয়া বিধিবদ্ধ। স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং বাক্যং বিশ্বতোমুখং—এইরূপ হইল সূত্র। সেই সকল

সূত্রকে বিশ্বাস করিলেই তাহার অন্তর্নিহিত গভীরতম সত্য সকল স্বপ্রকাশ হইয়া ফুটিয়া উঠে। আবার সেই সকল সূত্র বিশ্বাস করিতে গেলে যে সাধনার আবশ্যক, তাহারও নির্দ্দেশ ঐ মনুসংহিতায় দিয়া দিয়াছে। মনুসংহিতার আইন মানাইবার জন্য কোনও বিশেষ আয়োজন নাই। কেননা, ঐ আইন না মানিয়া উপায় নাই। যে আইন না মানে, সেও তাহা না মানিবার আইনটী মানে—অর্থাৎ আইন না মানার প্রত্যবায় ও কুফলও আইনানুসারে ঘটিয়া যায়। মানবসমাজের অন্তর্নিহিত কল্যাণের আদর্শ লইয়াই হইল এই সকল বিধি নিষেধ। সেই কারণে মানাইবার জন্য এদেশের স্মৃতিশাস্ত্রের বিশেষ কোনও প্রয়োজন বোধ হয় নাই। আইনের অজ্ঞতাকে অমার্জ্জনীয় বলিবার জন্য ঢাক পিটাইবার আবশ্যক হয় নাই। কেননা, অধিকারভেদের নিয়মানুসারে যে যাহার অধিকারে সকলেই বিধি নিষেধ মানিতেছে বা লঙ্ঘন করিতেছে। তাহার প্রত্যবায়ের পুঞ্জীভূত ফল সমষ্টীকৃত হইয়া আর এক প্রকার বিধি নিষেধের অধিকারে আসিয়া পড়িতেছে। বিধি-নিষেধের প্রতিপালন বা প্রত্যবায় সমস্তই মানবের প্রবৃত্তি নিবৃত্তির খেলা বলিয়া মানবসমাজের আইন যে মহত্তর, গভীরতর, ব্যাপকতর ও অলঙ্ঘনীয়তর আইনের অংশ ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহার নিয়মে এই সকল বিধি-নিষেধের নিয়মকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এইখানে মনু সংহিতার আইনের বা বিধি নিষেধের মূল তত্ত্ব কি তাহা চিন্তনীয়—

তস্য কর্ম্ম বিবেকার্থং শেষাণামনুপূর্ব্বশঃ
স্বায়ম্ভুবো মনু ধীমানিদং শাস্ত্রমকল্পয়ৎ।

ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের আনুপূর্ব্বীক্রমে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার জন্য ধীমান স্বায়ম্ভুব মনু এই শাস্ত্র রচনা করিলেন।

হিংসা হিংসে মৃদু ক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্ম বৃতানৃতে
যদ্যস্য সোঽদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশেৎ।

হিংসা অহিংসা, মৃদুতা ক্রূরতা, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য ও মিথ্যা যাহার যে গুণ তিনি সৃষ্টিকালে বিধান করিলেন, তদুত্তর কালেও সেই গুণ তাহাতে স্বয়ং প্রবেশ হইতে লাগিল।

এখন এই গুণ ও অগুণের সমাবেশ হইতে মানুষকে সদাসর্ব্বদা ধর্ম্মপালন করিতে হয়। বিধি-নিষেধের কার্য্য ইহাই। সেই কারণে হিন্দুর শাস্ত্রে ত্রিধা বিভক্ত ভুমি হইতে মানুষকে তপস্যায় নিয়োজিত করিতে হয়। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। আজকালকার শিক্ষিত সমাজ ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক কথা দুইটা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারে কিন্তু আধিদৈবিক কথাটা শুনিলেই "কুসংস্কার" বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করে। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্যের ভাষ্যে এই তত্ত্বের মূলটুকু ধরিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন প্রত্যেক দেহীর দেহে দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে। ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তি বিবেক বিজ্ঞানের জন্য ও প্রাণ বিশুদ্ধি-বিজ্ঞান বিধি তৎপরতা জন্মাইবার জন্য দেবাসুর সংগ্রামের আখ্যায়িকা। দেবতা কি ? না শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল। তদ্বিপরীত অসুর। বিবিধ বিষয়ে প্রাণ ভোগবান থাকিয়া যে তমঃ আত্মিকা ইন্দ্রিয় বৃত্তি থাকে তাহাই অসুর। শাস্ত্রোপদেশ বা বিধি নিষেধ মানুষের এই দেব ভাবকে জাগ্রত করে, জয়ী করে ও মানুষকে ক্রমে দেবতা করে। আইনের কার্য্য হিন্দু মতে ইহাই। শ্রুতি বলেন "দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি"

উপাসক দেবতা স্বরূপ হইয়া দেবতাকে প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমানের ব্যবস্থাপক সভার আইনসমূহ হইল আধিভৌতিক জগতের স্থূল খেলা লইয়া রচিত, দেহসর্ব্বস্ব দেহাত্মন সভ্যতার বহিরঙ্গ চাকচিক্য লইয়া সজ্জিত, আর স্বার্থ সংঘর্ষের আপোষ লইয়া বুদ্ধিজীবির মস্তিষ্ক বিজৃম্ভণ মাত্র। আর আমাদের স্মার্ত্তব্যবস্থার প্রণয়নে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি লয়ের মূলে যে আধ্যাত্মিক সত্তার চিদ্‌ বিকাশ ও আনন্দলীলা আছে, তাহার সহিত যে আধিদৈবিক শক্তি ওতপ্রোত-ভাবে স্থাবর, জঙ্গম, সরীসৃপ, জীবজন্তু মানবকে ঐ জগৎ যন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সেই সমস্তের নির্দ্দেশমত মানবজীবনের তুচ্ছ আধিভৌতিক জীবনের সুর বজায় রাখিবার নির্দ্দেশে বিধি-নিষেধ। হইতে পারে বর্ত্তমান সভ্যজাতিসমূহের আইনসমূহের ভিতর দিয়া একটা আধ্যাত্মিক সত্তার ক্রমবিকাশমান স্ফুরণ আজকালকার সমাজতত্ত্ববিদগণ ধরিতেছেন। কিন্তু আমাদের ঋষিগণ সেই আধ্যাত্মিক সত্তাকে খুঁটী ধরিয়াই সমস্ত জীবনপথের গতিকে ঐ পথে লইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। ফলে বর্ত্তমান আইনের উদ্দেশ্য হইয়াছে, প্রেয়ের সন্ধানকে লোকগম্য করা, আর আমাদের স্মৃতির উদ্দেশ্য হইল শ্রেয়ের অনুকূলে প্রেয়ের সাধনকে নিয়োগ করা। আইনের উদ্দেশ্য বা সাধ্য হইল সুযোগ-সুবিধার সামঞ্জস্য, গতি নিরুদ্দেশ,—আর স্মৃতির লক্ষ্য ও সাধ্য হইল কল্যাণ, আর গতি ঐ কল্যাণের ধ্রুবতারার অভিমুখী।

ঐ কল্যাণ কথার কোনও ইংরেজী প্রতিশব্দ নাই। যাহা কিছু চেষ্টাং কলয়তি অর্থাৎ চেষ্টাকে গতিশীল করায়, তাহাই কল্যাণ। কার্য্যপ্রেরণার মূল কেন্দ্রে যাহা গতির দিকনির্ণয় করাইয়া দেয় তাহাই কল্যাণ। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে নিরুদ্দেশ যাত্রায় সুযোগ সুবিধা শত রকম সাধিত হইলেও তাহা যে কল্যাণের হইবেই এমন কোনও হেতু নাই। সহস্র সুযোগ সুবিধার ভিতর দুই চারিটা হয়ত কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সুযোগ সুবিধার মূলে হইল প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি—তাহার সহিত কল্যাণের আকাশ পাতাল তফাৎ। কেননা কল্যাণের মূলে হইল অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সের একীভূত 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা' বলিয়া মানা। মানুষ আসে অব্যক্ত হইতে, যায় অব্যক্তে, মধ্যে দুদিনের সফরী-লীলা ব্যক্তমধ্য। যে জ্ঞানে এই দুদিনের সুযোগ সুবিধার প্রাধান্য দিয়া মানুষের সমগ্রতাকে সংখ্যা গরিষ্ঠের খতিয়ান হিসাবে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা যে নিতান্তই অর্ব্বাচীন তাহা আমাদের স্মৃতি শাস্ত্রের একটা মূল তথ্য। অপর পক্ষে আমাদের সমাজসেবার মূলমন্ত্র হইল "সর্ব্বভূতহিত," নীতি হইল "সর্ব্বলোকস্থিতি" দার্শনিক তত্ত্ব হইল "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", আশীর্ব্বাদ হইল "সর্ব্ববাধা বিনির্মুক্ত ধনধান্য সুতান্বিত" ব্যবহারিক তত্ত্ব হইল "সর্ব্বমাত্মবশং সুখং সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্"।

এতদূর আসিয়া পাঠকবর্গকে ভগবানের আশ্বাস বাণী স্মরণ করাইয়া দিতে চাই,—

'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'

শ্রীভগবান স্বয়ং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিতেছেন,—অর্জ্জুন, কল্যাণকারী কেহই কখনও দুর্গতি ভোগ করে না, ইহা নিশ্চয়। এই যে আশ্বাস—ইহাই হইল আইনের চরম আইন। কেননা আইনের উদ্দেশ্যই এই কল্যাণ। নতুবা আইন আইনই নহে।

আজ এ কথা পাড়িতে হইতেছে অতি বড় দুঃখে। যে দুর্দ্দিনে আজ আমাদের

বিধ্বস্ত হইতেছে সেই দুর্দ্দিনের একমাত্র কারণ হইল এই যে আমরা কল্যাণের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। আজ যে নানা প্রকার আইন অমান্যের আন্দোলন হইতেছে তাহার গতিতে যদি কাহারও ধ্রুবতারার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যাইত, তবে নিশ্চয়ই বলিতাম তাহার কুল পবিত্র হইত, জননী কৃতার্থা হইতেন, এবং ধরণী ধন্যা হইত। কিন্তু দুঃখ এই যে সেই কল্যাণের আদর্শ নাই বলিলেই হয়। আর কল্যাণের আদর্শ থাকিলে আইন অমান্য বলিয়া কোনও কথা বলিতে হয় না—সে যে আইন মান্য করা, আইন প্রতিষ্ঠা করা, আইন জাগ্রত করা, আইনের রুদ্র দেবতাকে বরণ করা।

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে আইনের এই গভীর উদ্দেশ্য যে কোনও পাশ্চাত্য মনস্বী ধরেন নাই তাহা মনে করা ভুল হইবে। এমার্সন বহুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, The wise know that foolish legislation is a rope of sand which perishes in the twisting; that the state must follow, and not lead, the character and progress of the citizens—জ্ঞানী জানেন যে বোকামীর আইন বালির দড়ি, পাক দিলেই শেষ হইয়া যায়; রাষ্ট্র নাগরিকের চরিত্র ও উন্নতিকে অনুসরণ করিবে, তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে না।

To educate the wise man, the state exists; and with the appearance of the wise man the state expires. The appearance of character makes the state unnecessary. The wise man is the state.—জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব; তিনি আসিলেই রাষ্ট্র শেষ। চরিত্র আবির্ভূত হইলে রাষ্ট্র অনাবশ্যক, কেননা জ্ঞানীই রাষ্ট্র।

এই প্রবন্ধের উপসংহারে আছে যে প্রেমকে রাষ্ট্রের ভিত্তি করিবার চেষ্টা আজও হয় নাই। * * * আমরা এত নীচ যে আজও বলের শাসনকেই ভক্তি করি। * * * *

* * * ধর্ম্মে আস্থাবান এমন কোনও লোকের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে না যিনি রাষ্ট্রকে ঋত ও প্রেমের মন্ত্রে সঞ্জীবিত করিতে পারেন। I donot call to mind a single human being who has steadily denied the authority of the laws on the simple ground of his own moral nature. আমি একটা মানুষকেও স্মরণ করিতে পারি না যিনি নিজের সন্নীতির সরল বিশ্বাসে আইনের বন্ধনকে একাগ্র ভাবে অস্বীকার করিয়াছেন। জ্ঞানী দার্শনিক এমার্সনের এই আক্ষেপের মূলে সমগ্র সভ্য জাতির আইনের তত্ত্ব নিহিতং গুহায়াং; আর ভারতের আইনের তত্ত্ব ও শাস্ত্রের মর্ম্ম কথা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আমরা সেই কারণে মনে করি মহাত্মা গান্ধীর আইন ভঙ্গ আন্দোলন ভারতের এই লোকোত্তর বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এমার্শনের আক্ষেপ মিটাইতে পারিবে কি না তাহার বিচার ভার ভবিষ্যৎ মানব ও জগতের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। অলমতিবিস্তরেণ।

ভারতীয় সাধনা-মূলক শিক্ষা-পরিষদ্

প্রাপ্ত অভিমত সমূহের সার-সঙ্কলন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি *)

৫৭। **শ্রীযুক্ত অমৃত লাল দাস গুপ্ত**, প্রধান শিক্ষক ব্রজমোহন বিদ্যালয়, বরিশাল—

বরিশালের ঋষিকল্প শ্রীযুত জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি স্বরূপে লিখিতেছেন :—শ্রীযুত জগদীশ বাবুর শারীরিক অবস্থা এক্ষণে বড় খারাপ। এজন্য তিনি লেখককে সমিতির চিঠির উত্তর দিতে অনুরোধ করিরাছেন ; লেখক লিখিয়া জগদীশ বাবুকে শুনাইয়াছেন ; তিনি ইহার সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। পরিচিত কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তির নাম দিয়াছেন।

(১) ভারতের বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিক সাধনায়। তাহার ফল পরমাত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞান ; কিন্তু এই আধ্যাত্মিক সাধনা 'কোণ ঠেসা' হইয়া রহিবার বিষয় নহে ! সমাজ, দেশ ও বিশ্বের সেবা এই সাধনার অন্যতম অঙ্গ।

বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষা এই সাধনার প্রতিকূল ; উহা কেবল পাশ্চাত্য জড়বাদের পরিপোষক। আধ্যাত্মিকতার সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশ কালোপযোগী শিক্ষাই ভারতীয় সংস্কৃতি বা cultureএর অনুরূপ।

(২) দুইটী ঐক্যসূত্র পাওয়া যায়—(১) দেশাত্মবোধ ও (২) ধর্ম্মভাবের উদারতা। এই দুইটী দেশবাসীর মনে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে।

(৩) প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ জাতীয় ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। বর্ত্তমান শাসক সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তি অনুসরণ করিয়া চলিলে উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে।

(৪) বর্ত্তমান Lecture method শিক্ষা দোষণীয়—শিক্ষার্থীকে স্বাবলম্বী ও চিন্তাশীল করিয়া তুলিতে হইবে এবং অধ্যাপকের আদর্শে জীবন গঠিত করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের গঠনবিধি ও তদনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকের একত্র বাস স্থানের ব্যবস্থা হওয়া সঙ্গত। পাঠবিধি সম্বন্ধেও অধ্যাপক কি ভাবে পড়াইবেন তাহা নির্দ্দেশ করিবেন। যাহাতে বিদ্যার্থীর সাবলম্বন বৃত্তি ও চিন্তাশীলতার অনুশীলন হয় তাহাই করিতে হইবে। শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা মূলক হওয়া চাই। সকাল বিকাল ক্লাস থাকিবে। মধ্যাহ্নে আহারের পর বিশ্রাম স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক। সকালে মস্তিষ্ক চালনাজনক বিষয়ে ও বিকালে শিল্প ও ব্যায়াম শিক্ষা হইবে। মাতৃভাষার সাহায্যে সকল শিক্ষা হওয়া চাই। এই কঠিন অন্ন সমস্যার দিনে অর্থকরী

---

* ভারতের সাধনা, প্রথম সংখ্যা ৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সমিতি সকল প্রকার মত সাগ্রহে ও নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করিয়াছেন ও করিবেন : বিরোধী মত সমূহ বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিতেছেন ও করিবেন।

শিল্প ও ব্যবসায়াদি শিক্ষার একান্ত আবশ্যক। ছাত্রদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা হইতে সাহিত্যানুরাগী ও বিজ্ঞানানুরাগী এই প্রকার শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। ছাত্রগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে তাহা লইয়া পড়িবে। বাধ্যতামূলক বিষয়বাহুল্য থাকা উচিত নয়, তাহাতে অনেক ছাত্রের জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ইংরাজী শিক্ষা কেবল উচ্চ শিক্ষাভিলাসীকে বিশেষ করিয়া দিবে ; সাধারণের পক্ষে চলিত রকমে দিবে মাত্র। রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যে হিন্দী ভাষা প্রচলন আবশ্যক, সংস্কৃত কেবল সাহিত্যানুরাগী ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে, অপরের জন্য নয়—নীতি ও ধর্ম্মমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৫৮। **শ্রীযুক্ত ভবতারণ মুখোপাধ্যায়,** প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য পতঞ্জলীশ্বর-যোগাশ্রম ও ভূতপূর্ব্ব বঙ্গীয় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, সালিখা।—

লেখক একটী সারগর্ভ প্রবন্ধে প্রথমতঃ সাধারণ ভাবে সকল মানবের পক্ষে শিক্ষা ও সাধনার স্বরূপ ও মাহাত্ম্য কি তাহা উল্লেখ করিয়াছেন ; তৎপর ভারতীয় শিক্ষা ও সাধনা ও তাহাতে আর্য্য ঋষি বা ব্রাহ্মণগণের স্থান, উহার আদর্শ ও লক্ষ্য দেখাইয়াছেন।

তৎপর বর্ত্তমান শিক্ষার সহিত তুলনা করিয়া, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাকেই শিক্ষার আদর্শ করিতে চাহেন। তৎসম্পর্কে "চতুরাশ্রম" ও "চতুর্ব্বর্ণের" ও শিক্ষার লক্ষ্য "পুরুষার্থ চতুষ্টয়" লাভ ইহাদের স্বরূপ ও শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন।

—এইরূপ শিক্ষা সকল লোকের পক্ষে প্রযুজ্য ; কাজেই হিন্দু মুসলমান সকলে শিক্ষাক্ষেত্রে এই ঐক্যসূত্রে মিলিতে পারেন।

—শিক্ষা পুস্তকগত হইবে না, কার্য্যতঃ হওয়া চাই

—বর্ত্তমান তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও সমাজের অপর লোকসকল—এই শিক্ষা দেশের নিরক্ষতার কারণ। দেশীয় ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে সমাজে এত মূর্খতা বা নিরক্ষরতা থাকিত না।

—বর্ত্তমান সাম্যবাদ যে একদর্শী তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন।

—মাতৃভাষাতে শিক্ষা, ইংরেজী শিক্ষা ও হিন্দি শিক্ষা কিরূপ হওয়া চাই, শিক্ষার বিবিধ স্তরে—প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

—কার্য্যকরী শিক্ষা :—কৃষি, শিল্প ইত্যাদি ; কিন্তু বিস্তারিত কিছু বলেন নাই।

উপস্থিত উদ্যোগের জন্য কি কি আবশ্যক—ধর্ম্মোপদেষ্টা কর্ম্মী, অর্থ চাই—

সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটী সঙ্ঘশক্তির অধীনে আনা দরকার। সকলকে ব্যক্তিগত প্রাধান্যমুক্ত হইতে হইবে—প্রতিষ্ঠান-প্রতিষ্ঠাতাগণের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। অথচ এই শিক্ষা সমিতির শক্তি-প্রভাবিত করিতে হইবে, এজন্য পরস্পর মেলামেশা আবশ্যক।

৫৯। **শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি,** ভোলানন্দ আশ্রম, হরিদ্বার।—

প্রাচীন বর্ণ ও আশ্রম অবলম্বনে শিক্ষাপদ্ধতি বর্ত্তমান ভারতে প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন না। বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থার প্রতিকূল।

—একটী সঙ্ঘ সংগঠন সম্ভবপর হইতে পারে, যদি সনাতনধর্ম্মী নিজ স্বত্যাগে পরধর্ম্মানুষ্ঠানে

নিরত হয়। সকলকে একমুখী করা সমাজ ও সংসারে সম্ভবপর নয়—সমতাসাধন চেষ্টা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, গুণাতীত অবস্থায় তাহা সম্ভবপর। গুণাতীত হইলে সঙ্ঘের প্রয়োজন হয় না। বৈষম্যই সৃষ্টি।

(১) ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতিকে [সমতার সহিত এক মনে করিয়া] 'বাক্যার্থ যুক্ত হইলে'ও 'লক্ষ্যার্থে' অর্থশূন্য বলিতে চাহেন।

(২) শিক্ষা অসম্প্রদায়িক হইতে পারে কিনা সন্দেহ করেন।

ক্ষাত্রশক্তিতে সঙ্ঘসংগঠন হইতে পারে, ব্রহ্মশক্তিতে সংগঠন বা সঙ্ঘ হয় না; সাত্ত্বিক ত্যাগী-ব্যক্তি একক কার্য্য করিলেই কার্য্য সাধন হয়; তজ্জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হয় না। তিনিই সঙ্ঘবদ্ধ করেন; ইত্যাদি।

—ভারতে এখন যে তম প্রবাহ খেলিতেছে, তাহার দূরীকরণ রজগুণসাধ্য। স্বাধীনতা অভাবে কোনও সঙ্ঘ দাঁড়াইতে পারে না।

—বর্ণে বর্ণে যে ঈর্ষা দ্বেষ বিদ্যমান, তাহার মূল নষ্ট করিতে স্পর্শস্পার্শী ত্যাগে হয় না—বহিঃশত্রু হইতে আত্মরক্ষণার্থে দাঁড়াইলেই ইহার মীমাংসা হইয়া যাইবে—এখন ভারতে জাতীয়তা নাই—এই জাতীয়তাবুদ্ধি জাগাইবার জন্য কাজ করিবার আছে; নিঃস্বার্থভাবে এজন্য সঙ্ঘ কাজ করিলে বেশ field আছে। Native state গুলিতে ঐ জাতীয়তার ভাব জাগাইতে হইবে।

—হিন্দী ভাষাকে common রাখার পক্ষপাতী; সংস্কৃতকে জাতীয় ভাষা করা কঠিন।

—জাতীয়তার ভাব জাগ্রত করা অদ্বৈতবাদের দ্বারা বা কোনও বাদের দ্বারা হইবে না। উহা রজোগুণের বিকাশ দ্বারা করিতে হইবে।

—বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা কমিয়া যাওয়া একটা চিন্তার বিষয়। প্রতিকারকল্পে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন। ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থার আবশ্যক। Physical culture হইলে mental culture আনা কঠিন হইবে না। বর্ত্তমানে যে সকল কাগজাদি আছে তদ্দ্বারা অনায়াসে হইতে পারে।

—বঙ্গের চিন্তাই পূর্ব্বে করা দরকার, সমগ্র ভারতের নহে—charity begins at home. 'বঙ্গদেশে কোন স্থানে নিজ মনোমত একটী খাড়া করুন, দেখাদেখি প্রয়োজন হইলে তদনুকরণে সহস্র দাঁড়াইয়া যাইবে। যেমন গুরুকুল দৃষ্টে ঋষিকুল।

৬০। **শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়,** শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পন্দিচেরী।—

লেখক প্রথমতঃ একটী ভূমিকাতে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অন্তঃসারশূন্যতা আদি মহৎ দোষ সকল দেখাইয়া উহার কারণ উল্লেখ করেন এবং তাহার প্রতীকার করা যে কঠিন তাহা বলিয়া ভারতীয় সাধনামূলক শিক্ষা দ্বারাই যে তাহা হইতে পারে তাহা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। অতঃপর পাঁচটী পৃথক প্রবন্ধে সমিতির আলোচ্য বিষয় কয়টী সম্বন্ধে অতি সুচিন্তিত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। বলিতেছেন :—

ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে অন্তঃসারশূন্য তাহা সকলেই স্বীকার করেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের দেহ, প্রাণ, মনের স্বাভাবিক বিকাশকে সাহায্য করা; বর্ত্তমানে এই উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হয়ই না, বরং অনেক সময় উল্টা ফলই হইয়া থাকে। ছাত্রগণ স্কুলে শিক্ষা লাভ করিতে করিতে স্বাস্থ্য হারাইয়া ফেলে এবং তাহাদিগের মনোভাব বিকৃত হয় এবং স্বাভাবিক প্রতিভা ও শক্তি রুদ্ধ ও নষ্ট

হইয়া যায়। যদি বা দুই চারিটী প্রতিভাশালী লোকের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা এ শিক্ষাগুণে নয়—ইহার সকল বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া। তদ্ব্যতীত সাধারণতঃ ছাত্রগণ এরূপ শিক্ষা দ্বারা লাভ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্তই হইয়া থাকে। আজকাল অনেকেই ইহা বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু তবু ত ইহার প্রতীকার হইতেছে না; কারণ এই শিক্ষাপদ্ধতির দোষ দেওয়া যত সহজ কোনও আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতির নির্ণয় (ও স্থাপন) করা তত সহজ নয়। পাশ্চাত্য জগতে শিক্ষাপদ্ধতি লইয়া কত পরীক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে (আমাদের দেশে এক্ষণে সেরূপ কোন চিন্তা বা চেষ্টা নাই); তবু প্রকৃত পন্থা বিষয়ে এখনও যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে; তাহা না হইলেও পাশ্চাত্য দেশে বর্ত্তমানে যাহা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তাহা যে আমাদের দেশেরও উপযোগী হইবে তাহা নহে।

এইজন্য ভারতের শিক্ষা পদ্ধতিতে বৈশিষ্ট্য কি হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন—তাহাও কঠিন। এ বিষয় আমাদের দেশের লোকের ধারণা নিতান্ত অস্পষ্ট (দেশে চিন্তাশীলতা ও তদনুকুল উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার অভাব)। কেহ বলিয়া থাকেন ভারতের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে হইলে আমাদের আবার সেই প্রাচীন যুগের শিক্ষাপদ্ধতি ফিরাইয়া আনিতে হইবে।—লেখকের মতে তাহা সম্ভবপর নয় [তিনি ভারতের সাধনা ও শিক্ষা সমুদয়ই ভবিষ্যৎ কোনও মহত্তর আদর্শের অনুযায়ী দেখিতেছেন] বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে আমাদিগকে যে সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আবার ইংলণ্ড বা জারমেনীতে যে শিক্ষা চলিতেছে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া 'জাতীয় শিক্ষা' বলিয়া চালাইলেও আমাদিগের হইবে না—বর্ত্তমান তথাকথিত National School গুলির যেমন দশা। ঐ সকল মূলতঃ পাশ্চাত্যভাব ও পাশ্চাত্য আদর্শেই অনুপ্রাণিত। এ দেশের প্রাচীনকালের শিক্ষা যেমন বর্ত্তমানের উপযোগী নহে, ইউরোপ বা আমেরিকার পদ্ধতি ভারতের পক্ষে উপযোগী নহে। তথাপি আমাদের একটা পদ্ধতি স্থির করিতেই হইবে।

যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতীয় জাতি যে মহান্ সত্যের প্রকাশ করিতেছে, যাহা ভারতীয় জাতীয় জীবনকে এক বিশেষ ছন্দ, বিশেষ গতি, বিশেষ রূপ দিতেছে, সেই সত্যকে অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে; এবং সেইজন্য ভারতীয় সাধনা ও শিক্ষা দীক্ষার মূল কথাগুলিকে আমাদিগকে শক্ত করিয়া ধরিতে হইবে। তবেই আমরা মহান্, উদার, শক্তিমান্ কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিব। নতুবা কোনও মিথ্যা বা অসম্পূর্ণ কিন্তু জমকাল নীতি বা পদ্ধতিও ধরিয়া অগ্রসর হওয়া খুব সহজ হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহা শূন্যতা ও নিষ্ফলতায়ই পর্য্যবসিত হইবে।

শিক্ষাপদ্ধতিকে ভারতীয় সাধনামূলক আদৌ করা চলে কিনা এ বিষয়ে কেহ কেহ আপত্তি করেন;—(১) শিক্ষায় কোনও জাতিভেদ নাই, সকল দেশের লোকের প্রয়োজন এক রকম, সর্ব্বত্র সত্য এক, বিদ্যা এক—বিজ্ঞান সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষা কি?......জগতে দিন দিন জ্ঞান বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইতেছে, আমাদিগকে তাহার সহিত তাল রাখিয়াই চলিতে হইবে, সেজন্য আমাদিগের শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি, আদর্শ ও নীতি সমুদয় সম্পূর্ণ আধুনিক হওয়া চাই। লেখক অন্ধভাবে ভারতের প্রাচীন রীতিনীতিকে ফিরাইয়া আনিতে চাহেন না, যদিও এদেশে আজও এরূপ পশ্চাদ্‌গামী মনোভাব যথেষ্ট আছে এবং সেইজন্যই জাতীয় শিক্ষার মূলনীতি সম্বন্ধে লোকের মনে

নানা ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন যুগে ফিরিয়া যাওয়া কি না যাওয়া তাহা জাতীয় শিক্ষার প্রশ্ন নহে; বিদেশ হইতে আমদানী করা শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা আমরা গ্রহণ করিব না ভারতের মন ও প্রকৃতিতে যে উচ্চতর সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে তাহারই বিকাশ করিব—ইহাই প্রশ্ন। বলিতেছেন—"অতীত ও বর্ত্তমান লইয়া প্রশ্ন নহে, বর্ত্তমান ও ভবিষৎ লইয়াই প্রশ্ন।" আবার দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন—"ভারতের অন্তর্নিহিত উচ্চতর সম্ভাবনা সমূহ যে কৃত্রিম মিথ্যা দ্বারা বর্ত্তমানে চাপা পড়িয়াছে, তাহাকে ঘুচাইয়া দিয়া ভবিষ্যৎ প্রগতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে; ভারতের আত্মা—ভারতমাতা আজ ইহাই দাবী করিতেছেন।" আবার বলিতেছেন যে—এই আপত্তির কারণ (ক) লোকের ধারণা নানা বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করাই শিক্ষার মূল কথা; এ ধারণা খুব প্রচলিত হইলেও খুব ভ্রান্ত। শিক্ষার মূল লক্ষ্য মানুষের মন ও আত্মার শক্তিসকলকে গড়িয়া তোলা, যাহা দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জিত হইবে এবং যাহাতে ঐ জ্ঞান সুপ্রযুক্ত ও সুব্যবহৃত হইতে পারে তদনুযায়ী ইচ্ছাশক্তি ও চরিত্রকে গঠন করা; বিজ্ঞানের জ্ঞান লইয়া আমরা জীবনে কি ভাবে লাগাইব মানুষের মধ্যে (বিজ্ঞানেতর) অন্যভাবে জ্ঞান লাভ করিবার যে সকল মহতী শক্তি রহিয়াছে, তাহার লব্ধ জ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সম্বন্ধ কি হইবে—বিজ্ঞান দ্বারা মানবাত্মার ও মানবজীবনের বিকাশের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহাই প্রধান প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সমাধানে ভারতবাসীর বিশিষ্ট প্রকৃতি, বিশিষ্ট সাধনা, বিশিষ্ট জীবনপ্রণালীর হিসাব লওয়া একান্ত আবশ্যক। সংস্কৃত শিখি বা ইংরেজী শিখি, দেখিতে হইবে যে সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে আমরা কেমন করিয়া আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ও সাধনার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে পারিব, ইংরেজী ভাষার সাহায্যে কেমন করিয়া আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া আমাদের সভ্যতার সহিত তাহার প্রকৃত সত্য সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিব। ইহাই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও নীতি—আধুনিক সভ্যতা আধুনিক জ্ঞানকে অবহেলা করা নহে, কিন্তু আমাদের নিজেদের সত্বা, নিজেদের মন, নিজেদের আত্মার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া।

(২) দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, বর্ত্তমান যুগের জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে হইলে আমাদিগকে এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতাই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে (জাতীয় শিক্ষা আদি প্রসার করায় মন না দিয়া) আমাদের এমন শিক্ষা চাই, যাহা আমাদিগকে পাশ্চাত্য সভ্যতার যোগ্য করিয়া তুলিতে পারে। লেখক ইহার খণ্ডন করিতে গিয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখাইয়াছেন যে বর্ত্তমান ইউরোপে যে আধুনিক সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই মানবজাতির—মানব প্রতিভার চরম কথা নয়। এসিয়া এই আদর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য নয়। ইউরোপের এই বৈজ্ঞানিক, তর্কবুদ্ধি প্রসূত, শিল্পতান্ত্রিক ও তথা কথিত গণ-তান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের চখের সম্মুখে ধ্বংস লাভ করিতেছে; এক্ষণে যদি আমরা সেই রসাতলগামী ভিত্তির উপর আমাদের সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিতে যাই, তবে তাহা আমাদের পক্ষে মারাত্মক পাগলামীই হইবে। লেখক বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন যে—যখন পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বাগ্রগণ্য মনীষীগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার এই আসন্ন ধ্বংশ দেখিয়া এসিয়ার প্রতিভা-জাত নূতন অধ্যাত্ম সভ্যতার দিকে আশার সহিত চাহিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন আমাদের দেশের (এই সকল) লোক আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা, শক্তি ও সদ্‌ভাবনাকে অবহেলা করিয়া ধ্বংসোম্মুখ, মৃতকল্প ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শ অনুসরণ করিতে চাহিতেছে।

(৩) তৃতীয় আপত্তি এই যে, সকল দেশের মানুষের মন সমান, একই রকমের; অতএব সর্ব্বত্রই একই রকম শিক্ষাযন্ত্রের দ্বারা সকল মানুষকে একভাবে গড়িয়া তোলা যায়। লেখক ইহাকে একটী প্রাচীন কুসংস্কারমূলক অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া মনে করেন। তিনি লোকের ব্যক্তিগত মন ও আত্মার অনন্ত বৈচিত্র্যে বিশ্বাস করেন। সকলের মধ্যে সাম্য যেমন রহিয়াছে, বৈশিষ্ট্যও তেমনই আছে। সমগ্র মানবজাতি এবং ব্যক্তিগত মানব এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী শক্তিরূপে রহিয়াছে এক একটী নেশনের বিশিষ্ট মন—এক একটী জাতির বিশিষ্ট আত্মা। এই তিনের ঠিকমত হিসাব রাখিয়া শিক্ষা দ্বারা মানুষের মন ও আত্মার শক্তিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে।

আলোচ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

(১) ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতির স্বরূপ—জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে যে ভারতীয় সাধনার প্রকৃত স্বরূপটী সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আবশ্যক, লেখক তাহা প্রথমে স্বীকার করিতেছেন। এবং পাশ্চাত্য আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া ঐ আদর্শের স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। এই দুই-এতে বহু প্রভেদ; পাশ্চাত্য জড়বাদ ও ভোগ এবং তদনুযায়ী শিক্ষা ও জীবনাদর্শ—ভারত এ সকলকে অবহেলা করে নাই; রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এই সকল দিকেই ভারত বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়াছে। কিন্তু ভারতের আর এক মহত্তর আদর্শ আছে, তাহা আত্মার সত্তার জ্ঞান এবং ভগবানের সহিত তার সম্বন্ধ—প্রকৃতি ও পুরুষ—আত্মাপুরুষের সম্পূর্ণরূপে প্রকাশলাভ মানবীয় সাধনার চরম লক্ষ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদী ইহার অনেক পশ্চাতে। মানুষের অন্তর্নিহিত ভাগবত সত্তাকে পূর্ণ করিয়া দিব্য ভাগবত জীবন লাভ করাই পরমার্থ ও পুরুষার্থ। ইহাই ভারতের বৈশিষ্ট্য, ভারতের সাধনা। এই আদর্শই ভারতবাসীর সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, শিল্প, কলা প্রভৃতি সমুদয় ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ভারতবাসীর জীবনে অনেক উত্থান পতন হইয়াছে, সমাজ ও রাষ্ট্রে অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে, কিন্তু এই মূল আদর্শটী ভারত কখনও সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই, এবং এই আদর্শের প্রভাবেই ভারতের পুনঃ পুনঃ মৃতকল্প অবস্থাতেও নূতন জীবন সঞ্চার হইয়াছে, শুধু ব্যক্তিগত মানব জীবন নহে, সমাজ জীবনেও ভাগবতের প্রকাশ করিতে হইবে, এই আধ্যাত্মিক সত্যের উপর সমাজকেও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, ইহাই ভারতের আদর্শ। এ যাবত সভ্য সমাজে এ আদর্শ ফুটিয়া উঠে নাই; ভারত সমাজে তাহা কতকটা হইয়াছে। ভবিষ্যতে ভারতকেই সে কাজ সম্পূর্ণ করিতে হইবে। বর্ণাশ্রম আদি ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ঐ আধ্যাত্মভাব পূর্ত্তির জন্যই ব্যবস্থিত হইয়াছিল। ভারতীয় প্রাচীন ঋষিরা যে পথে ভারতের জাতীয়-জীবনকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সেই পথে চলিয়া ভারতবাসীর প্রকৃতি আধ্যাত্মভাব গ্রহণ করিবার জন্য অনেকখানি যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। আবার অন্যদিকে কালক্রমে তাহাদের জীবনে অনেক মিথ্যা, গ্লানি আবর্জ্জনাও জমিয়া উঠিয়াছে। ঋষিদের আধ্যাত্মদৃষ্টিলব্ধ জ্ঞানের সাহায্য আমাদিগকে লইতে হইবে; বর্ত্তমান ভারতীয় জাতির প্রকৃত অবস্থা কি, তাহার শক্তি কোথায়, তাহার দুর্ব্বলতা কোথায়, তাহা সুক্ষ্মদৃষ্টি সহায়ে পর্য্যাবেক্ষণ করিতে হইবে। জগতের অন্যান্য জাতির নিকট হইতে আমরা যথার্থভাবে যাহা শিখিতে পারি, গ্রহণ করিতে পারি, তাহাও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভবিষ্যতে ভারতীয় জাতি যে মহত্তর শক্তি গৌরবের জীবন লাভ করিবে, সে সম্বন্ধেও যতদূর সম্ভব স্পষ্ট ধারণা করিতে হইবে; তবেই আমাদের প্রগতির পথ দেখিতে পাইব এবং সেই পথে

যাহাতে ভারত সন্তান নিশ্চিত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারে তদনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিব।

—ইউরোপেও আধ্যাত্ম সাধনাসম্পন্ন লোক আছেন, কিন্তু ইউরোপের সাধারণ সাধনা বা culture জড়বাদমূলক; ভারতের জড়বাদী চার্ব্বাকপন্থী রহিয়াছেন, কিন্তু ভারতের সাধারণ culture আধ্যাত্মবাদ মূলক। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে এই দুই এর সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইত। এক্ষণে আমরা সেই আদর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া হীনবল হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে পাশ্চাত্যের নিকট আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জ্ঞানকে যখন আধ্যাত্ম আদর্শের অনুসরণ করিয়া পরিপূর্ণ আধ্যাত্ম জীবন গঠনের কার্য্যে লাগান যাইবে তখনই মানব সমাজে প্রকৃত শান্তি ও শৃঙ্খলা, প্রকৃত সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভারতই এই আদর্শ জগতকে দেখাইতে পারিবে।

(২) ভারতীয় সাধনানির্দ্দেশক ঐক্যসূত্র:—প্রস্তাবিত শিক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত এই ঐক্যসূত্র নির্ণয় করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন—সুদূর অতীতে ভারতের বৈদিক ঋষিগণ দিব্য সাধনা বলে মানবজীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে গভীর সত্যের স্বরূপ পাইয়াছিলেন তাহাই ভারতীয় সাধনার বীজস্বরূপ, তদবধি যুগে যুগে তাহার কিরূপ বিকাশ লাভ হইয়াছে তাহা দেখাইয়া বেদ ও উপনিষদে ভারতীয় সাধনার যে ঐক্যসূত্র লিখিত আছে তাহা তৎপরবর্ত্তী নানা অবস্থায় আরও বিভিন্নতার মধ্যে গীতার যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকেই লেখক ভারতীয় সাধনার নির্দ্দেশক ঐক্যসূত্র বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

(৩) প্রস্তাবিত বিষয়ে লেখক "শিক্ষা ও স্বধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন—

মানুষের পক্ষে দেবত্বলাভ সম্ভব—মানুষই সৃষ্টির চরম বস্তু নয়, যেমন ইউরোপীয় ক্রমবিকাশ-বাদ বলিয়া থাকে। মানুষের পক্ষে এই দিব্যজীবন লাভ করিবার ব্যবস্থা ভারতীয় জাতীয় প্রকৃতির উপযোগী শিক্ষা।

—প্রাচীন ভারতে যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহাতে দেখা যায় যে কেবল কোনও নির্দ্দিষ্ট এক প্রকার শিক্ষাই প্রচলিত ছিল না—বৈদিক ও উপনিষদের যুগের শিক্ষা ও কালিদাসের যুগের শিক্ষা, বৌদ্ধযুগের শিক্ষা, বর্ত্তমান টোলের শিক্ষা—এই সবই বিভিন্ন পদ্ধতির ছিল। ভারতের সেই প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি এখন আর সম্পূর্ণভাবে প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর নহে—প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির যেমন গুণ ছিল তেমন দোষও ছিল; পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি হইতেও আমরা অনেক জিনিষ গ্রহণ করিতে পারি। মোট কথা প্রাচ্য হউক পাশ্চাত্য হউক, পুরাতন হউক নূতন হউক, আমরা এমন পদ্ধতি চাই যাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবে শিক্ষা হয়। অতএব অন্ধভাবে কোনও কিছু গ্রহণ বা বর্জ্জন না করিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে উৎকৃষ্ট শিক্ষার মূলসূত্র কি—এবং বর্ত্তমানে কিরূপ শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, ভারতের যে জাতীয় আদর্শ—জাতীয় সাধনা—তাহারই প্রয়োজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবে সিদ্ধ হইবে।

—জাতীয় সাধনা ও আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কোনও শিক্ষা-পদ্ধতিই উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। আধ্যাত্ম জীবন লাভই ভারতের জাতীয় আদর্শ—শুধু ব্যক্তিগত নহে, সমাজকেও আধ্যাত্মভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির লক্ষ্য যেমন প্রাচীন ভারতের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি হইতে আমাদের সারবস্তু উদ্ধার করিয়া বর্ত্তমান কালোপযোগী করিয়া লইতে হইবে, তেমনই পাশ্চাত্যজাতি তাহাদিগের নিজস্ব সাধনা দ্বারা শিক্ষা সম্বন্ধে যে সব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহারও

সার গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সাধনার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। এইভাবেই এদেশের বর্ত্তমান শিক্ষা সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির মূল সত্য দুইটী—(১) স্তরে স্তরে ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া উন্নতি লাভ করা এবং (২) স্বধর্ম্মনিষ্ঠা; যাহাতে প্রত্যেক মানুষ আপন আপন স্বভাবের সুচারু বিকাশ করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভারতীয় সাধনার এই সার তত্ত্ব গীতাতে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে; ইহার উল্লেখ করিয়া লেখক "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো............পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এই শ্লোকের আধারে গীতার উপদেশকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষা পদ্ধতি গঠন করিলেই তাহা ভারতীয় সাধনামূলক শিক্ষা হইবে, ইহা বলিতেছেন। পরিশেষে এই শিক্ষাতে ধর্ম্ম শিক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা কি হওয়া উচিত ও তাহাতে সেবাধর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৪) শিক্ষা পদ্ধতি—শিক্ষার নীতি ও উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া লেখক শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে এক বিস্তারিত নিবন্ধ দিয়াছেন।

—এই শিক্ষা পদ্ধতি মনস্তত্ত্বের গভীর আলোচনা সাপেক্ষ; আমাদের দেশে যোগশাস্ত্রে তাহার চরম উন্নতি লাভ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশেও এখন মনস্তত্ত্বের আলোচনা মূলে শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু তাহা ভারতীয় যোগ শাস্ত্রের তুলনাতে অতি নিম্নস্তরে; তথাপি ইহাদের আবিষ্কৃত নিয়ম বিশেষ এখন আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে নিয়োগ করিতে হইবে। মোটের উপর প্রধানতঃ ছাত্রগণের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির বিকাশ সাধন করিতে হইবে, তারপর অধীত বিদ্যা অতি সহজে আয়ত্ত হইবে। "কিছুই শেখান যায় না" এই তত্ত্বটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

—জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির প্রধান সাধন অন্তঃকরণের চারিটীর স্তর—চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও ঊর্দ্ধ হইতে প্রেরণা লাভের একটী স্তর যাহা মানুষে এখনও পূর্ণভাবে বিকশিত হয় নাই (অনুভব?), যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংসে ছিল। শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞ বিশেষের মত দেখাইয়া লেখক শ্রীঅরবিন্দের তিনটী মূল সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

(১) ছাত্রগণকে কিছু শেখান হইবে না, তাহারা নিজে নিজেই শিখিবে।

(২) শিক্ষাকে interesting বা চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে।

(৩) ছাত্রগণকে কিছু মুখস্ত করান হইবে না।

এবং বলিতেছেন যে এই তিনটী মূলসূত্রকে ধরিয়া চলিলে বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির দোষগুলি এড়াইয়া আমরা প্রকৃত শিক্ষার পথটি ধরিতে পারিব।

—শিক্ষার প্রণালী বিবৃত করিয়া লেখক শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া কঠিন, উপস্থিত জাতীয় বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণ প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির ভাবে অভিভূত। তাঁহারা পূর্ব্ব সংস্কার বশেই কাজ করেন—তাঁহাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে তাঁহারা একটী সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ সৃষ্টি করিতে যাইতেছেন, পুরাতনকে নির্ম্মমভাবে পিছনে ফেলিয়া যাইতে হইবে। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কোনরূপ আপোষ হইতে পারে না। উপরের লিখিত শিক্ষানীতি অবলম্বন করিয়া চলিলে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ যুগান্তর করিতে পারিবেন।

—শিক্ষকগণকে ভারতীয় সাধনার ভাব জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। তাঁহারা যেন আমাদের

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

প্রথম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৭ [অষ্টম সংখ্যা

নিবেদন

বিগত বৈশাখের সংখ্যা 'ভারতের সাধনা' যখন প্রায় সম্পূর্ণ হইতে যাইতেছে, তখন উহাকে এক আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। বিশেষ কোনও চিন্তার কারণ না থাকিলেও, তাহাতে ইহার একটা সঙ্কট বলিয়াই মনে হইয়াছিল। ফলে বৈশাখের পত্রিকার প্রকাশ কার্য্য তখন স্থগিত রাখিতে হয়। আজ জ্যৈষ্ঠের সংখ্যার সহিত উহাকে প্রকাশিত করিতে গিয়া এক দিকে যেমন সঙ্কোচ বোধ এবং গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণের নিকট এই বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, অপর পক্ষে উহাকে আজ মেঘ-মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে দেখিয়া নূতন আশা ও আনন্দ বোধ না হইতেছে এমন নহে। বিগত ২।৩ মাস যাবত পত্রিকা প্রকাশের নিয়মে যে ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছিল, তাহাই ক্রমে এই সঙ্কটে আসিয়া পরিণত হইয়াছিল। আমাদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই ইহা ঘটিয়াছিল। ভগবদ্ চরণে প্রার্থনা, আর ঐরূপ কিছু না ঘটে। আশা করি তাঁহার কৃপায় অতঃপর পত্রিকা প্রতি মাসে নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হইয়া সহৃদয় পাঠক গণের নিকট উপস্থিত হইবে।

সমুদয় কথার বিবৃতি করিয়া এস্থলে প্রয়োজন নাই। যদি 'ভারতের সাধনা' তাহার এই শৈশবের আপদ বিপদ অতিক্রম করিয়া পরিণত বয়েসে উপস্থিত হয় তবে তাহার জীবন কাহিনীর অঙ্গ বলিয়া এই সঙ্কট কালকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যে ভাব ও আদর্শ লইয়া 'ভারতের সাধনা' অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান সমাজের অনেকের মনোবৃত্তি, আইন কানুনের ব্যবহার, আচার, নীতি প্রভৃতির সহিত ইহার সম্পূর্ণ মিল না হইবারই কথা। 'ভারতের সাধনা' ভারতের সাধনার ভাবেতে পরিচালিত হয় —ইহাই প্রার্থনা ও আন্তরিক বাসনা। তাই বলিয়া বর্ত্তমান জগত ও সমাজের গুরুতর সমস্যা সমূহের সমাধানে ভারতের সাধনাকে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। ভারত তাহার নিজ ভাবেই সে সকলের সমাধান করিতে পারে, এ বিশ্বাস ও সঙ্কল্প রাখিয়া চলিতে হইবে। ভারতের নিজ সাধনা-গত প্রকর্ষের

প্রকৃতি উপলব্ধি করিলে এবং তাহা হইতে অপসারিত বর্ত্তমান সমাজের রীতি নীতি ও ব্যবহারে যে নানা প্রকার ব্যভিচার ও দুরিত দেখা যায়, এবং তাহাতে সংসারে যে দৈন্য ও দুঃখ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে, এ বিশ্বাস ও সঙ্কল্পের সমর্থন মিলে। আজ অনেকের কাছেই এ সঙ্কল্প ও বিশ্বাস বল হারাইয়া বসিয়াছে। তথাপি দেশের প্রকৃতি ও জাতির আন্তরিক অবস্থার সহিত ঐ আদর্শ এমনই দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ যে, বাহিরের সহস্র প্রকার বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও উহা বিলুপ্ত হইতে পারিতেছে না। বাহিরের উদ্বেগ ও আবর্জ্জনা সময় সময় আসিয়া উহাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে বটে, এবং তাহাতে লোকের দৃষ্টিও বিভ্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু ভারত চিরকাল আপন সাধনা বলেই আপনার আত্ম-সংরক্ষণ করিয়া আসিয়াছে এবং চিরদিনই করিবে।—সে সংরক্ষণই উহার প্রকৃত রক্ষা; অপর সংরক্ষণ বা উন্নতি বিনাশের নামান্তর মাত্র।

এই যে মহান্ জীবনাদর্শ অন্তরে লইয়া 'ভারতের সাধনা' শৈশবের এই আকুলি-কাকুলি করিতেছে, তাহাতে যাঁহারা ইহাকে স্নেহ ও অনুরাগ ভরে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে ইহার সামান্য মাত্র অস্বাস্থ্য ও ব্যতিক্রম দেখিলে বিচলিত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। যে সকল সহৃদয় গ্রাহক ও পাঠক ইতিমধ্যে 'ভারতের সাধনার' জন্য উৎকণ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহাদের নিকট এই নিবেদন জ্ঞাপন করিয়া বর্ত্তমান সময়ের জন্য ক্ষান্ত রহিলাম যে,—'ভারতের সাধনা'র পরিচর্য্যার কার্য্য এখনও উপযুক্ত ভাবে উপযুক্ত পাত্র দ্বারা হইয়া উঠিতেছে না। ইহার সফলতার জন্য তাঁহাদের সদিচ্ছা ও ভারতের সাধনার আন্তরিক শক্তির উপরই ভরসা রাখিয়া চলিতে হইতেছে। এতদুভয়ের বলে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও, শৈশবের এই বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমে উহা পরিণত বয়সের বল ও সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়া দেশ ও জনসেবায় নিয়োজিত থাকিতে পারে ইহাই প্রার্থনা।

সঙ্কট-রহস্য

বর্ত্তমান সময়কে নানা দিকে এক সঙ্কট-কাল বলা যাইতে পারে। সঙ্কট আসে লোককে অভিভূত করিবার—নিস্পন্দ অকর্ম্মণ্য করিবার—অসার নির্ম্মূল বা অপদার্থে পরিণত করিবার—জন্য নয়। বরং নির্জ্জীবকে সজীব করিতে, দলিত পতিত অসারকে জাগ্রত উন্নত ও কর্ম্মোৎফুল্ল করিতে, সঙ্কটের ন্যায় দ্বিতীয় সহায় আর নাই। সর্ব্বোপরি সঙ্কট লোকের মন সেইখানে লইয়া যায়,—যেখানে ঘোর দুঃখে আনন্দ, অন্ধকারে আলোক ও বিহ্বলতার মধ্যে নূতন নূতন পথের সন্ধান পাওয়া যায়। পদে পদে সঙ্কটকে বরণ করিয়া না লইতে পারিলে, জীবনের সার্থকতাই হয় না। সঙ্কট আসিবে এবং তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে—এই দুই-এতে জীবনের সাফল্য।

জাতি ও ব্যক্তি উভয়ের জীবনেই সঙ্কট সম্ভবপর, এবং আসিলে তাহা সৌভাগ্যের সূচক বলিয়া স্বাগত ও বরণ করিবার যোগ্য। বিপদকে প্রলোভনের বস্তু বলিয়া সদা তাহার সম্মুখীন হইতে হয়; এবং বাধা-বিঘ্ন-বিপদের অঙ্কে কৃতকার্য্যতার পরিমাপ করিয়া চলিতে হয়। সঙ্কটের ধারেই যত লোকের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বাড়িয়াছে, প্রতিভা সম্যক্ বিকাশের অবকাশ পাইয়াছে।

সঙ্কটের এই গুণ কিন্তু সঙ্কটাপেক্ষীর চরিত্রবল সাপেক্ষ—পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বস্তুগত ঘটনাবলীরও নিরপেক্ষ নয়। নতুবা সঙ্কট কেবল দুর্দ্দৈবের দণ্ড বা আকস্মিক বিভীষিকা মাত্র বলিয়া

প্রতিভাত হইত—জগত নিয়ন্তৃ উন্নতির পথ প্রদর্শক বাস্তক সত্য বা ঋত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার যোগ্য হইত না।

বাস্তবিক সঙ্কটকে সঙ্কট করিয়া তোলে মানুষ তাহাতে আপন ব্যক্তিত্ব—আমিত্ব ও আমারত্ব—ফলাইতে গিয়া। নতুবা জাগতিক সাধারণ ঘটনা ও সঙ্কটে কোনও পার্থক্য নাই—অতি সাধারণ ঘটনা হইতেই সকল প্রকার সঙ্কটের সৃষ্টি হয় ; আবার অতি গুরুতর ঘটনাকেও সঙ্কট-বিবর্জ্জিত করিয়া তোলা যায়। যে সঙ্কটের উৎপত্তি মমত্ব ও আমিত্বে—হিংসা-দ্বেষ-লোভ-মোহ-স্বার্থপরতা-অহঙ্কার ও কর্ত্তৃতাভিমান যে সকল সহজ ও সরল ঘটনাকে জটিল করিয়া তোলে—রিপুর তাড়নায় মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া যে সকল বিপদ ডাকিয়া আনে—তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। পরিণামে লোক তাহাতে ধ্বংসের মুখেই নিপতিত হয়। নতুবা সঙ্কটে যে শিক্ষা দান করিতে পারে ফল তার অমোঘ। কিন্তু এ সঙ্কটে তাহা লাভ করা কঠিন !

দৈব-দুর্ঘটনা যাহা মানুষকে অকস্মাৎ আসিয়া আক্রমণ করে—অগ্নি, বায়ু, জলের উৎপাত মহামারী, মৃত্যু, শোক-তাপ ইত্যাদি—সে সঙ্কটে মানুষ ইচ্ছা করিলেই অতি সহজে সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে। ইহারা যেমন অকস্মাৎ আইসে, তেমন অচকিতেই মহা ফল দান করিয়া শ্রেয়ের পথে লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু মানুষ আপন চিত্তে সঞ্চিত সংস্কার-বশে তাহাকেও মায়া-মোহ-স্বার্থের বেষ্টনীতে আনিয়া ফেলে এবং তাহাতেই যত কষ্ট পায়। মোট কথা সঙ্কট যেরূপেই আসুক না কেন, নিরপেক্ষভাবে তাহার সম্মুখীন হওয়া চাই, যেন আত্মাভিমানের আবরণ, ব্যক্তিত্বের আভরণ, তাহার স্বরূপ-বোধে ব্যাঘাত না জন্মাইতে পারে। বাধা বিঘ্ন যাহাই আসুক, স্বরূপে প্রকাশ পাইলে, তাহাকে অতিক্রম করা সহজ। বিঘ্নের প্রকৃত স্বরূপ বোধে উহার অর্দ্ধেক সত্তা বিনষ্ট হইয়া যায় ; বাকী অর্দ্ধ নষ্ট হয় কর্ত্তৃত্বাভিমান-বর্জ্জিত নিষ্কাম কর্ম্মসহযোগে। আর একাজে প্রকৃত সাফল্য আইসে এতদুভয়-সঞ্জাত ভক্তিবল বা ভগবৎপ্রসাদের মাহাত্ম্যে। মুখামুখী বিপদে বা সম্মুখ সমরে আগুয়ান্ বীর পুরুষকে কর্ত্তব্যবিমুখ ও ক্লৈব্য দশায় অভিভূত দেখিয়া জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ নীতি গ্রন্থে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে—জীব-প্রকৃতি ও জগৎ প্রকৃতি সম্যকৃরূপে উপলব্ধি করিয়া সকল প্রকার সংস্কার জনিত দোষ বর্জ্জন পূর্ব্বক অনন্যভাবে ভগবদ্ চরণে চিত্ত-মন সমর্পণ পূর্ব্বক, ফলাফল লাভালাভে সমচিত্ত হইয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিবারই বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জীবনের প্রতি পদ-বিক্ষেপ সঙ্কটময়—মহা সমরের প্রতীক স্বরূপ। প্রকৃত ভাবে তাহার সম্মুখীন হইতে পারিলে মহাবিজয়েরই ফল লাভ হইতে পারে।

সঙ্কটের ছায়া

আজ জগতের সর্ব্বত্র মহা সঙ্কটের ছায়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম ও নীতি সংসার হইতে লুক্কাইত হইবার উপক্রম হইয়াছে। উচ্চ চিন্তা ও দার্শনিক দৃষ্টি আর লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। জড়বিদ্যায় প্রভূত উন্নতি সাধন হইয়াছে বলিয়া অনেকে স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে বটে ; কিন্তু এই জড়-বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান যে পরিমাণে আত্ম-হনন ও সৃষ্টির বিনাশেই দিন দিন অধিকতর ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা ক্রমেই অধিকতর প্রতীয়মান হইতেছে। সমাজ-বিজ্ঞান প্রসার লাভ করিয়াছে, ব্যবহার শাস্ত্র বা আইন কানুনের আয়তন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, জল-স্থল-অন্তরীক্ষে লোকের যাতায়াতের ব্যবহার অসম্ভব সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ সকলেরই প্রগতি ধ্বংস বা বিনাশের দিকে বলিয়া দিন দিন পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রায় সর্ব্বত্র চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এজন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।

এ জগদব্যাপী সঙ্কটের মধ্যে ভারতের আতঙ্ক দিন দিন আরও গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। এই বিগত একমাস কাল মধ্যে ইহা যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি উভয়েই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সময়ে রাজশক্তি এদেশের জনসাধারণের জন্য উদারনীতি অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার স্বত্বাধিকার প্রদান করিবেন বলিয়া আয়োজন ও প্রতিশ্রুতি দান করিতেছিলেন, সে সময়েই এইরূপ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। আর একটী বিরুদ্ধ গুণের কার্য্য এই সংঘটিত হইতেছে যে দেশনায়ক প্রযোজিত অহিংস্রনীতির বিরুদ্ধেই নানাপ্রকারের নির্য্যাতন ও উৎপীড়ন প্রয়োগ করা যাইতেছে! দণ্ড রাজনীতির একটী প্রধান অঙ্গ সন্দেহ নাই। কিন্তু শান্তকে শান্তির বিধানে পরাভূত করিতে—মৈত্রীকে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে—কোনও গূঢ়তর বিধানও থাকিতে পারে। ভারত তাহার সুদীর্ঘ সাধনায় সেই গুঢ় রহস্যের সন্ধান করিয়া গিয়াছে। তাই তার সমুদয় সমস্যার সমাধানে, সকল দুর্দ্দশার প্রতীকার কল্পে, নানা প্রতিকুল ও বিরোধী ভাবের মধ্যেও সেই নীতি অবলম্বন করিয়াছে। ইহাতে তাহার জয় হইয়াছে কি পরাজয় হইয়াছে, তাহার শেষ বিবরণ এখনও ইতিহাসের পৃষ্ঠে লিখিত হয় নাই। তবে তাহার উদ্দেশ্য ও সাধনে যে সেই নীতিই এক্ষণে—এই ঘোর দুর্দ্দিনেও—পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই জগতের নিকট উপস্থিত আছে; আর জাগতিক ব্যাপারে যে সঙ্কটের অবস্থা দিন দিন ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে ভারতীয় সাধনার এই মৌলিক নীতির বিশেষ উপযোগিতা আছে বলিয়াই অনুভূত হইতেছে। বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষ উপস্থিত এই বিপদে ইহা সম্যক অবধারণ করিয়া চলিলে, এ গোলযোগের মীমাংসা সহজেই হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কোনও সঙ্কটকেই লোকে নাকি এইভাবে গ্রহণ করিতে তৈয়ারী হইয়া আইসে নাই। ফলে সঙ্কটের যাহা কল্যাণ তাহার স্থানে অকল্যাণের প্রসার বাড়িয়া চলিয়াছে!

দিগ্‌-দর্শন

স্বাধীনতার অভিধান

"স্বাধীনতা অর্থে আমি বুঝি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন—সমগ্র মানব জাতির সহিত ভ্রাতৃত্ব বা মৈত্রীর ভাব। এ হিসাবে ইংলণ্ড স্বাধীন নয়, বলশেভিক রুশও স্বাধীন নহে। কেন না, সাম্রাজ্যবাদের উৎকর্ষ সাধিত হয় দুর্ব্বলের নিষ্কাশন বা লুণ্ঠন দ্বারা; আর বলশেভিক নীতি—তা গরীবের জন্য যতই অশ্রুপাত করুক না কেন—মানুষকে মানুষ হিসাবে যে সম্মান দিতে হয়, উহা তা জানে না। লেনীন্ সম্বন্ধে ট্রটস্কী যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে—লেনীন্ বলিতেছেন, "তোমরা কি মনে কর যে আমরা কখনও অতি কঠোর বিপ্লবাত্মক বিভীষিকার সৃষ্টি না করিয়া বিজয় লাভ করিতে পারিব?"

ধরায় কখনও নব যুগের প্রবর্ত্তন হইবে না যতদিন শাসক সম্প্রদায় উৎপীড়ন-নীতি, তথা লেনীনের উপাস্য দেবতা—"বিভীষিক সৃষ্টির আবশ্যকতা"—বর্জ্জন না করে!

যখন সকল জাতি সমরনীতি এবং পরস্পরের প্রতি হিংসা ও ঘৃণা প্রতিরোধ করিবে, তখন মাত্র নূতন সুবর্ণযুগের আরম্ভ হইবে।—টি-এল-ভাস্বানী, ভারত সমালোচনী।

ভারতে খৃষ্ট-সম্প্রদায়

ভারতবর্ষে আজ যে বিভিন্ন দিকে না না প্রকারের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, খৃষ্টান সম্প্রদায় তাহা হইতে একবারে নিরপেক্ষ বা উদাসীন নহে; থাকা উচিতও নয়। ধার্ম্মিক সম্প্রদায় হিসাবে এদেশে ইহাদের অবস্থিতি যে বিচিত্র তাহা বলা বাহুল্য। আজ কাল এদেশের—কেবল এদেশের নহে, সকল দেশের—সকল শ্রেণীর লোক আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিতেছে, খৃষ্টানগণও যে তাহা করিতেছেন না, তাহা নহে। তবে অন্য সকল সম্প্রদায়ের কার্য্যকারিতার বিষয় যেমন এদেশের সাধারণে লোকে বিদিত আছে, খৃষ্ট-সম্প্রদায় সম্বন্ধে লোকের তেমন জানা নাই।

একথাই সর্ব্বাগ্রে জানা উচিত যে, খৃষ্টানগণ ত এদেশে একালে অতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই বসিতে পারিত—এজন্য তাহাদিগের বাহ্যিক ও পারিপার্শ্বিক না না প্রকার সুযোগ সুবিধাই ঘটিয়াছিল। প্রথম প্রথম ইহাদের প্রভাবও বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই তাহা বিলীন হইয়া আসিয়াছে। মোটের উপর ইহাতে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সাধনার সহিত সংঘর্ষে ইহাদের পরাভব মাত্র ঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারত কখনও কোনও ধর্ম্মকে অবহেলা বা বিনষ্ট করে নাই, বরং আপন মহান্ সাধনার বলে সকল ধর্ম্মের উৎকর্ষতা সম্পাদন করিয়াছে। এদেশের খৃষ্টান ধর্ম্ম ও খৃষ্ট ধর্ম্মের কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে।

প্রথমতঃ এদেশে খৃষ্ট-ধর্ম্মের একটা রাষ্ট্রীক পদবী আছে। রাজা খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী—রাজ বিধানে খৃষ্ট-ধর্ম্ম রাষ্ট্রের অঙ্গীয়—শাসন তন্ত্রের তৃতীয় ভাগ। ইংলণ্ডে ইহার কড়াকড়ি ব্যবস্থা আছে এবং ঐ ব্যবস্থা করিয়া লইতে বহু বাদ বিবাদ যুদ্ধ বিগ্রহ ও রক্তপাত হইয়াছিল। তথায় এক্ষণে চার্চ্চ-অব

ইংলণ্ড' নামক ধর্ম্মসংস্থা রাজ-শক্তির পরিজ্ঞাত ও তাহা দ্বারা পরিপুষ্ট। এদেশে অবশ্যই তেমন পাকাপাকি বা একছত্র ব্যবস্থা নাই; তথাপি উহার ছায়া এখানে না পড়িয়াছে, এমন নহে—এখানেও 'চার্চ্চ-অব-ইংলণ্ড-ইন-ইণ্ডিয়া' নামক উহার এক শাখা প্রতিষ্ঠিত আছে; এবং তাহা রাজ-শক্তির অনুমোদিত ও প্রতিপালিত। আর ইহার সুশাসন বা পরিচালনার নিমিত্ত—যেমন সাধারণ শাসন বিভাগে 'বড়লাট', সামরিক বিভাগে 'জঙ্গীলাট' আছেন—একজন লাট পদবীর ধর্ম্মাধিষ্ঠাতা 'পাদরী-লাট' বিদ্যমান আছেন।' রাজধানীতে তাঁহার অবস্থিতি; বিভিন্ন প্রদেশের বিসপগণ তাঁহার অধীনে থাকিয়া, নিজ নিজ এলাকার ধর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইংরেজ রাজ কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ভাবে ইঁহাদের মান্য করিয়া চলেন।

এ যাবতকাল এই 'চার্চ্চ-অব-ইংলণ্ড-ইন্-ইণ্ডিয়া' বিলাতের 'চার্চ্চ-অব-ইংলণ্ডের' অন্তর্গত ছিল—যদিও ইহাদের দূরত্বে ৬০০০ হাজার মাইল ব্যবধান—এবং ইংলণ্ডের ধর্ম্ম-বিষয়ক আইন কানুন ভারতের এই সকল ধর্ম্ম-সংস্থার বিধান বলিয়া অবধারিত ছিল, এবং এদেশের পাদরী-লাটকে বিলাতের ধর্ম্ম-নায়ক ক্যাণ্টার বেরীর আর্চ্চ-বিশপের অধীনে বা সাধারণ শাসনে থাকিয়া কার্য্য করিতে হইত। অবশ্যই কড়াকড়ি ভাবে এ শাসন পরিচালিত হইত না। এদেশের চার্চ্চগুলি বিলাতের চার্চ্চ-সম্মিলনী, 'কনভকেশন', 'ন্যাশন্যাল এসেম্ব্লী' প্রভৃতির কাজে যোগদানও তেমন করিত না। বিলাতের ধর্ম্মসংস্থা যেমন সর্ব্বদা পার্লেমেণ্টের আইন কানুনের দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া অস্থির ভাবে থাকে, এদেশের চার্চ্চগুলি তাহা হইতে মুক্ত।

কিন্তু ভারতের নিজ অবস্থায় এইখানের এই খৃষ্টান-মণ্ডলী আর বিচলিত না হইয়া পারেন না—কারণ প্রধানতঃ দুইটী—(১) এদেশের খৃষ্টানেরা সাক্ষাতে বা পরোক্ষে বিদেশীয় রাজশক্তির দ্বারা সংরক্ষিত। কিন্তু কোনও ধর্ম্মসংস্থাকে রাজশক্তির উপরে নির্ভর করিয়া থাকার ন্যায় অন্যায় ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। ইহার কুফল ইউরোপীয় ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে; বাস্তবিক খৃষ্ট ধর্ম্মের দুর্ভাগ্য যে, বিভিন্ন দেশের রাজশক্তির হস্তে উহাকে ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় চলিতে হইয়াছে। তাহার উপরে ভারতবর্ষে এখন যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইতে যাইতেছে, তাহাতে রাজশক্তি যাহাদিগের হাতে যাইবে, তাহাদের অধিকাংশ হইবেন অ-খৃষ্টান। (২) দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টান চার্চ্চ-গুলির আন্তরিক অবস্থাতেও বিচলিত হইবার কারণ আছে। ইংলণ্ডের প্রচলিত ইক্লেজিয়েষ্টিক্যাল' বা ধর্ম্মবিষয়ক আইন কানুন এদেশের খৃষ্টানগণের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে নাই। যেমন ইংলণ্ডের ধর্ম্ম-সংস্থার প্রধান কানুন 'এক্ট-অব-ইউনিফর্ম্মিটীর' অনুসারে প্রত্যেক চার্চ্চের 'প্রেয়ার-বুক' বা উপাসনা-পুস্তিকা অভিন্ন। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গিয়াছে যে, ইহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।* বাস্তবিক অনেক স্থলেই নানাবিধ পরিবর্ত্তন এদেশের খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং স্থানীয় প্রকৃতির স্বাভাবিক ভাবে চলিলে আরও অনেক পরিবর্ত্তন আসিবে। কীর্ত্তন সংযোগে উপাসনা, নগর সংকীর্ত্তন প্রভৃতি কোন কোন খৃষ্টান সম্প্রদায় ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

---

* It is urgently necessary that the Christians of our church in India should be free to develop their own forms of worship, and that there should be no legal obstacle to their doing so :—E. I. Palmer, D. D. Bishop of Bombay.

এই সকল পরিবর্ত্তনের অনুকূলে সম্প্রতি যে রাজবিধান ঘটিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। বিগত ১৯২৮ সালে "দি-ইণ্ডিয়ান-চার্চ্চ-এক্ট-এণ্ড-মেজার" নামে যে আইন পাশ হইয়াছে, তাহাতে এযাবত কাল 'চার্চ্চ-অব-ইংলণ্ড-ইন্-ইণ্ডিয়' নামে যে ধর্ম্ম সংস্থা অভিহিত হইত, তাহাকে বিলাতের 'চার্চ্চ-অব-ইংলণ্ড' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া ভারতে ইহাদের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনাধিকার দেওয়া হইয়াছে—Complete administrative autonomy. আশা করা যায়, এক্ষণে এই চার্চ্চগুলি মুক্ত ভারতীয় ভাবে প্রসার লাভ করিতে পারিবে।

কিন্তু এদেশে 'চার্চ্চ-অব-ইংলণ্ড-ইন্-ইণ্ডিয়া' ব্যতীত আরও অনেকগুলি চার্চ্চ বা খৃষ্টসম্প্রদায় বিদ্যমান। পৃথিবীর খৃষ্টান দেশ বা জাতি মাত্রেরই কোনও না কোনও চার্চ্চ আছে—এক ভারতবর্ষে এইরূপ বিভিন্ন খৃষ্টান মিশনের প্রায় ৯০টী চার্চ্চ আছে। ইহাদের কতকগুলি ইউরোপের, কতকগুলি আমেরিকার ও কতকগুলি অষ্ট্রেলিয়ার। ইহাদের মধ্যে আবার এক এক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন চার্চ্চ আছে।

সমবায় বা ঐক্য সংস্থাপন করিয়া শক্তিবৃদ্ধি করিবার এক প্রকার প্রচেষ্টা আজ কাল প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়। ভারতের এই বিভিন্ন খৃষ্ট সম্প্রদায়গুলিকে একত্র করিয়া সমগ্র সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্যও একরূপ প্রযত্ন চলিয়া আসিতেছে। অবশ্যই ধর্ম্মে সম্প্রদায়ের পার্থক্যের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য স্থাপন করা দুরূহ ব্যাপার। ধর্ম্ম ক্ষেত্রেই মানব সন্তানগণের মিল বা ঐক্যের সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কিন্তু ধর্ম্মে যত অনৈক্য ঘটিয়াছে এবং তাহাতে যেমন বিষময় কুফল উৎপন্ন হইয়াছে, এমন আর কোনও বিষয়ে হয় নাই! ইহাকেই মনুষ্যের দুর্ভাগ্যের একটী পরিমাপক যন্ত্র বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এদেশের হিন্দু-মুসলমান বা মুসলমান-খৃষ্টানের বিরোধের কথা হইতেছে না। কেবল বিদেশ হইতে আগত এ সকল খৃষ্টানদিগের মধ্যেই কত মতভেদ ও দলভেদ আছে, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য।

ভারতে খৃষ্টান ধর্ম্মের ইতিবৃত্তে দেখা যায়, (১) সর্ব্ব প্রথম সেণ্ট তমাস মালাবার উপকূল প্রদেশে খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন ও তথায় সীরিয় চার্চ্চ বা ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপর (২) বহু শতাব্দী পরে পর্ত্তুগীজরা এদেশে আইসে; তাহারা রোমান কেথোলিক চার্চ্চ স্থাপন করে। এই রোমক চার্চ্চ এর সহিত সীরিয়ান চার্চ্চের প্রথমে বিরোধ ঘটে; এবং বহুদিন পর্য্যন্ত সীরিয়ান চার্চ্চকে সীরিয়নের নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হয়। তৎপর (৩) এদেশে পর্ত্তুগীজদিগের আধিপত্য বিলীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ সীরিয়ান চার্চ্চগুলি রোমক চার্চ্চের বশ্যতা অস্বীকার করিতে থাকে; এবং এসিরিয়া হইতে আপন ধর্ম্ম-যাজক আহ্বান করিয়া আনে।

এই আদিম সীরিয়ান খৃষ্টানদিগের এক্ষণে তিনটী বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। তদতিরিক্ত রোমকদিগের সহিত সম্মিলনে ইহাদের আর একটী রোমো-সীরিয়ান শাখা উৎপন্ন হইয়াছে। মোটের উপর রোমান কেথোলিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একতা বা মিল মন্দ নয়। ইহারা সকলে গোয়ার প্রধান ধর্ম্ম-যাজক বা আর্ক-বিশপের আধিপত্য মানিয়া চলে; তাঁহার অধীনে এক বিশপ সম্প্রদায়ও আছে। (৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ভাগ হইতে অর্থাৎ খৃষ্টান রাজশক্তির প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়ার সময় হইতে, এদেশে বিবিধ খৃষ্টান চার্চ্চ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের লইয়াই এক্ষণে প্রায় ৯০টা খৃষ্ট সম্প্রদায় এক্ষণে এদেশে বিরাজমান। উহাদের মধ্যে কোনও মিল নাই। যদিও ইহাদের মধ্যেও

একতা সংস্থাপনের নিমিত্ত অনেক কাল হইতে চেষ্টা চলিতেছে। এতদুদ্দেশ্যে সর্ব্ব প্রথম ১৮৭১ খৃঃ অব্দে এলাহাবাদে একটী সভা হয়; তাহাতে চারিটী প্রেস-বিটিরিয়ান্ সম্প্রদায়ের চার্চ্চ-প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন; কিন্তু তখন ইহার কোনও সুফল ফলে নাই।

দক্ষিণ ভারতে খৃষ্টানদিগের সংখ্যা ও প্রভাব অধিক। এজন্য তাহাদের মিলনের চেষ্টাও স্বাভাবিক। ১৯০৮ অব্দে বিভিন্ন দক্ষিণ ভারতের চার্চ্চ মিলিত হইয়া 'সাউথ-ইণ্ডিয়ান-ইউনাইটেড্ চার্চ্চ" প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯২৬ খৃঃঅব্দে ঐরূপ আর একটী আন্দোলন উত্তর ভারতেও হয়—'ইউনাইটেড্-চার্চ্চ-অব-নর্থার্ণ-ইণ্ডিয়া' নামে এক সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উভয় আন্দোলনই প্রধানতঃ 'প্রেসবিটিরিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টানদিগকে লইয়া হয়। ১৯১৯ অব্দ হইতে দক্ষিণ ভারতে আর একটি আন্দোলন চলিতে থাকে, তাহাতে প্রেসবিটিরিয় ও এপিসকোপেসীয় সম্প্রদায়গণের মিলনের চেষ্টা হইতে থাকে। এই আন্দোলনটীকেই এক্ষণে সফল করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে 'চার্চ্চ-অব-ইণ্ডিয়া-বর্ম্মা-এণ্ড-সীলম', 'সাউথ ইণ্ডিয়ান', 'ডাইওসীয়ান্', 'সাউথ ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ চার্চ্চ' এবং ওয়েসলীয়ান চার্চ্চ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মিল হইবার কথা। কিন্তু এইরূপ সম্মিলনের মাহাত্ম্য কি বুঝিয়া উঠা কঠিন।

ভারতবর্ষে আজ যে নানা দিকে কেবলই অনৈক্য ও বিরোধের প্রসার বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে বিদেশীয় ধর্ম্মের এ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এ মিলন কেবল দলবদ্ধ সভা সমিতির 'মেম্বারসীপের' মধ্যে নিবদ্ধ রাখিলেই হইবে না; প্রকৃত চিত্তের ও মৌলিক কোনও নীতি অবলম্বনে, প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীবনের বাস্তব ভাবের ভিত্তিতে ইহার প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মের পরিভাষায় বলিতে গেলে, যেমন একজন বিশিষ্ট ধর্ম্মযাজক বলিয়াছেন—'What they will share is not merely membership in an institution, but membership in a body, the Body of Christ, which has a divine power of drawing them together; অর্থাৎ প্রকৃত মিলন হইতে পারে খৃষ্টের মহা কায়াতে, যাঁহার আকর্ষণী শক্তি ভগবদ্‌ভাবে ও রসে পরিপুষ্ট। কথা অতি উত্তম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান ভারতের এই অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য আনিতে হইবে, বিরোধের শান্তি সাধন করিতে হইলে, কেবল চার্চ্চে চার্চ্চে বা বিভিন্ন খৃষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন আনিলে চলিবে না—হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান জৈন শিখ পার্শি ও অপর সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন আনয়ন করিতে হইবে। এজন্য চাই—not membership in a Government, State or Congress, but membership in a body, the Body of India, which only has the supreme power of drawing them together! ভারতের এই মহাকায়ায়—ভারতের সাধনার—ক্ষেত্রেই ভারতের বা জগতের মহামিলনের সম্ভাবনা।

———

প্রতিধ্বনি

স্বাধীনতায় আত্মোৎকর্ষ

"আজ সকল দেশের লোক জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় বীতরাগ—চারিদিকে ঘোর অসন্তোষ বিরাজমান। যুবকগণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে—তাহারা ইহার পরিবর্ত্তন সাধন করিবে। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্ধারণ করা কঠিন; তাহাদের প্রশ্ন গুরুতর। শুনিতে পাই, সমুদয় যুব-শক্তি স্বাধীনতা অর্জ্জনে ক্ষেপণ করিতে হইবে; সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে—রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কিংবা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। এজন্য অতীতের ভাব-পরম্পরার ধার ধারিলে চলিবে না; প্রত্যেক জিনিষটী নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে—সকলকে এক সাম্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান সকল আন্দোলনের মূল নীতি-সূত্র এই সাম্য ও স্বাধীনতা। ইহাদের বিষয় সম্যক আলোচনা হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ স্বাধীনতার কথাই ধরা যাউক। ইহার তাৎপর্য্য ও লক্ষণাদি কি তাহা বুঝিয়া দেখা উচিত।

"স্বাধীনতার অর্থ যথেচ্ছাচার নহে। স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছ ব্যবহার চলিলে, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার প্রসার লাভ করে মাত্র; তাহাতে অপরের স্বাধীনতার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অনেক সংযত করিতে হয়—লোকে যাহা খুসী যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে না পারে এমন করিতে হয়। ব্যক্তিগত আচরণে এরূপ একটী প্রধান সংযমের নিয়ম সকলেই মানিয়া লইতে পারেন যে—কোনও লোকই এমন কাজ করিতে পারিবেন না যাহাতে অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সাধারণতঃ এই নিয়মটী ত অতি সহজ ও সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা করিতে গেলে, নানা জটিলতা আসিয়া পড়ে। ধরা যাইতে পারে যে, নিয়ম করিলাম কাহারও অনিষ্ট বা ক্ষতি করিব না; কিন্তু এজন্য সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে,—প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার কি যাহার খণ্ডন করিতে গেলে তাহার অনিষ্ট ঘটে, এবং যাহা হইতে আমাদিগের প্রতিনিবৃত্ত হইয়া চলিতে হইবে। এরূপ মনে করিলেই নানা জটিল প্রশ্ন আসিয়া পড়ে—সংসারের প্রত্যেক লোকেরই কি জীবন ধারণ করিবার ও সেজন্য উপযুক্ত খাদ্য, বসন ও বাসস্থান পাইবার অধিকার নাই? যদি তাহা থাকিয়া থাকে, তবে আবার প্রশ্ন উঠে—যে লোক নিরন্ন, ক্ষুধায় মরিতেছে, তার কি অপরের সঞ্চিত খাদ্য ছিনাইয়া লইয়া আপন ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার অধিকার আছে? যদি বল আছে, তবে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইল, যাহার সঞ্চিত খাদ্য অপহরণ করা হয় তাহার অনিষ্ট সাধন করা হইল—যদিও সে ব্যক্তি তাহার সঞ্চিত অর্থ নানা প্রকার অনাবশ্যক ভোগ বিলাসে মাত্র ব্যয়িত করিয়া ফেলে। আর যে ব্যক্তি অনাহারে কষ্ট পাইতেছে, সে হয়ত একজন অতি বড় অলস প্রকৃতির লোক—নিজে কখনও কোন কাজ করিবে না, অন্যের বহুকষ্টে ও বহুপরিশ্রম দ্বারা লব্ধ অর্থ হইতে বিনা ক্লেশে ভাগ বসাইতে চাহে। কাজেই পরিণামে প্রশ্ন এই দাঁড়ায় যে—কি অবস্থায়

ও কত দূর পর্য্যন্ত কোন লোক অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, যাহাতে সে নিজকে অনিষ্ট হইতে বাঁচাইতে সক্ষম হয়।

"আবার যাহাতে সকল লোক সমান ভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, সেজন্যও প্রত্যেক লোকের স্বাধীনতায় সংযম আনা আবশ্যক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিচারাদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টী ধরা যাইতে পারে—ন্যায় বিচার দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধন হইতে পারে, এজন্য প্রত্যেক লোককে সে বিচার্য্য বিষয়ে কি জানে তাহার সত্যতামূলক সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা আবশ্যক। তা হ'লেই সকল লোকে সমষ্টিভাবে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে—এজন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লোকেরই স্বাধীনতায় আঘাত করিবার প্রয়োজন হয়। এই ভাবেই সংসারের সকল প্রকার নিয়ম কানুন (রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমুদয়) প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বসাধারণ লোকের মঙ্গল কামনায় প্রণয়ন করা হয়; 'প্রকাশ্যভাবে' বলিতেছি এই জন্য যে, অনেক ক্ষেত্রেই, বাস্তবিক পক্ষে, এই সকল আইন-কানুন সর্ব্বসাধারণ লোকের উপকারার্থে প্রণয়ন করা হয় না; কোন ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী-বিশেষের লাভ বা স্বার্থেতে তৈয়ারী করা হয় মাত্র—চাই কি সেই ব্যক্তি বা শ্রেণী রাজা বা রাজ-পারিষদ, অথবা মুষ্টিমেয় রাজশক্তিসম্পন্ন লোক বা সামরিক ক্ষমতাদীপ্ত ব্যক্তি বা লোকের দল, যাজক বা ধনিক সম্প্রদায়, অথবা (এক্ষণে যেমন বিভিন্ন দেশে জনতন্ত্রের নাম হইতেছে) প্রজাতন্ত্রের নামে জন কতক রাজ শক্তির পরিচালক মাত্র হউন্ না কেন। সামাজিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিয়ম রাজ-দরবারের প্রবর্ত্তিত আইন কানুন অপেক্ষা অধিক ব্যাপক হইয়া থাকে। এমন কতকগুলি কর্ত্তব্য কার্য্য আছে যাহা দেশের সর্ব্বসাধারণের করণীয়; রাজাদেশ বা রাজ সরকারের প্রবর্ত্তিত আইন দ্বারা তাহার কোনও বিধান হইতে পারে না; লোকের সামাজিক ও ধর্ম্মগত বিবেক বুদ্ধিতে তাহা সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। রাস্তায় পড়িয়া বা পুকুরে ডুবিয়া একজন লোক আসন্ন-মৃত্যুর অবস্থায়; তখন যদি অপর কোন লোক তাহার সাহায্যার্থে না যায়, তবে সামাজিক নিয়মের দৃষ্টিতে সে অপরাধী; রাজ আইনে নহে। এইরূপ সামাজিক দায়িত্ব লোকের বহু আছে। লোকের অধিকার ও দায়িত্ব বিষয়ে এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা—কিরূপ অপরাধের কেমন প্রতীকার রাজ সরকার করিতে পারে, কোন্ বিষয়ে মীমাংসা কেবল সামাজিক নিয়ম দ্বারা হইতে পারে, এবং কিরূপ প্রশ্নের সমাধান কেবল ধর্ম্ম-বিশ্বাস বা ধর্ম্মের নিয়মে করিতে হইবে—এসকল ব্যবহার-শাস্ত্র, সমাজ-বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মৌলিক তত্ত্বের বিচারে করিতে হইবে; খাম খেয়ালী ভাবে করিলে চলিবে না। সভ্য দেশে এজন্য বিস্তারিত পুস্তক সকল রচিত হইয়াছে; আমাদের দেশে অতি বিস্তৃত শাস্ত্রের বিচার রহিয়াছে। তথাপি অনেক স্থূল বিষয়েও লোকের নানা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, কেবল মাত্র সাময়িক উত্তেজনায় অন্ধের মত পরিচালিত না হইয়া, এ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করা, এ সকল প্রশ্নের ভালরূপ বিচার করিয়া দেখা, আমরা কি চাই তাহার পরিষ্কার ধারণা করিয়া লওয়া এবং বর্ত্তমান অবস্থার বিচারে তাহা কি প্রকারে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে লাভ করা যায় তাহার উপায় স্থির করা, এই সকল বিষয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা।

"বর্ত্তমান জগতের মানব সমাজে স্বাধীনতার দেবদূত বলিয়া যাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ করা যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে জোসেফ্ মেট্সিনির স্থান অতি উচ্চে। তিনি আজীবন ইটালির স্বাধীনতাসমরে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং বীরের ন্যায় অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, এবং অবশেষে

নিজ জন্মভূমিকে অষ্ট্রীয়ার দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত দেখিবার সৌভাগ্যও তাঁহার ঘটিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই লোকের কর্ত্তব্যপালনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—সে কর্ত্তব্য নিজ পরিবারের প্রতি, স্বদেশের প্রতি, সমগ্র মানবের প্রতি, এবং পরমেশ্বরের প্রতি। এ কর্ত্তব্য পালন করিলেই প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হওয়া যায়। তাঁহার রচিত "মানবের কর্ত্তব্য" (Duties of man) নামক পুস্তকে জলন্ত অক্ষরে কেবল স্বাধীনতার অকৃত্রিম অনুরাগ ও মানব প্রেমের পরম উদার কথাই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তখন তাঁহার স্বদেশের যে সকল গুরুতর সমস্যার সমাধানে গভীর অনুধাবন করিয়া গিয়াছেন, আজ আমাদের সম্মুখে যে সকল প্রশ্ন উপস্থিত, তাহার সহিত উহাদের অতি ঘনিষ্ঠ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। তিনি স্বদেশবাসীগণকে বলিতেছেন,—"জড়তান্ত্রিক উন্নতির আশায় বিপথ-গামী হইও না; তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় উহাতে কেবল বিভ্রম উপস্থিত হইবে মাত্র। তোমাদের জন্মগত অধিকার (স্বাধীনতা) তোমরা কিছুতেই অর্জ্জন করিতে পারিবে না, যদি তোমরা কর্ত্তব্যের আদেশ মস্তক অবনত করিয়া মানিয়া না লও। স্বাধীনতা-স্বত্বের উপযুক্ত হও, তাহা হইলেই তার অধিকারী হইতে পারিবে। ভ্রাতৃগণ স্বদেশকে ভালবাস।" অন্যত্র বলিতেছেন,—"জীবন পথে ক্রম-উন্নতির দিকে অগ্রসর হও; তাহাই জীবনে লক্ষ্য করিতে হইবে। নিজ উন্নতি সাধন না করিয়া কেহ অপর কাহারও দুঃখের অপনয়ন করিতে পারে না। কেবল মাত্র জড়তান্ত্রিক স্বার্থের দৃষ্টিতে চলিলে অথবা ঐরূপ কোনও সংগঠনমূলক কার্য্যের নিমিত্ত সমরায়োজন করিলে, তোমাদিগের মধ্যে হইতেই হাজার হাজার অত্যাচারী উৎপীড়কের সৃষ্টি হইবে। আজ লোকের মনে যে কুপ্রবৃত্তি ও অহঙ্কার-মণ্ডিত স্বার্থের ভাব প্রবল, তাহার পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া সমাজ-সংস্থার পরিবর্ত্তন বা সংস্কার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, তাহাতে কোনও লাভ হইবে না। সমাজ সংগঠন কোন কোন বৃক্ষের মতন—পরিচালনার রীতি অনুসারে তাহাতে অমৃত বা বিষ উৎপাদিত হয়। সৎলোকের হাতে পড়িলে মন্দ সংস্থা হইতেও ভাল ফল পাওয়া যায়, আবার অসৎ লোকের দ্বারা অতি উত্তম সংস্থা অমঙ্গলের আধার হইয়া উঠে। তোমাদিগের চেষ্টা কখনও ফলবতী হইবে না, যদি তোমরা প্রথম হইতেই যথাসাধ্য আত্মোন্নতি সাধনে রত না হও।"—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, মান্দ্রাজ হিন্দু-যুবক সভা।

বিজ্ঞানের কুসংস্কার

"বর্ত্তমান কালে কতকগুলি ঘটনা ঘটিতেছে যাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কেবল মাত্র যান্ত্রিকতা বা কলকারখানার প্রসার দ্বারা সংসার রক্ষা হইতে পারে না। প্রকৃতির উপর শক্তি বা আধিপত্য অর্জ্জন করিলেই মানুষ মনুষ্যোচিত গুণে বিভূষিত হয় না; তাহাতে মানুষকে আরও অধিক হীনপ্রকৃতি করিয়া তুলিতেছে। একথা বেশ বলা চলে যে, মানবসন্তান বর্ত্তমান এই বৈজ্ঞানিক যুগের পূর্ব্বেও প্রকৃতির অনেক রহস্য অবগত ছিল। তাহাদের পক্ষে এক্ষণে বিজ্ঞান আদম-ইভের উপাখ্যানের জ্ঞানবৃক্ষের ফলভোগের ন্যায় সত্য সত্যই এক মহা বিপদসঙ্কুল বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান এই বিজ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধির অর্থ ই হইল সঙ্কটের পথ উন্মুক্ত করা। এখন ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বিগত জগৎব্যাপী মহাসমরে যদি কিছুতে সংসার সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে, তবে তাহা লোকের অজ্ঞান—যদি বিজ্ঞান বা কলকারখানার আবিষ্কার আরও পঞ্চাশ বৎসরের উন্নতি তখন করিয়া বসিত, তবে যে সকল জাতি ঐ মহাসমরে পরস্পরের ধ্বংসের

জন্য যুঝিতেছিল, তাহাদিগের অবস্থা কি হইত তাহা বুঝা কঠিন নয়। গল্পে আছে দুইটী ডাল কুকুর পরস্পর মারামারি করিতে গিয়া একে অন্যকে ভক্ষণ করিতে সুরু করিল। পরিণামে ইহাদের কাহারও কিছু অবশিষ্ট রহিল না, কেবল লেজ দুইটী মাত্র বাকী রহিল! সৌভাগ্যের কথা যে প্রোক্ত মহাসমরে পরস্পর ধ্বংসোন্মুখ জাতি সমূহের ঐরূপ ফল লাভের উপায় সম্পূর্ণরূপে জানা ছিল না! কিন্তু যেমন শুনা যাইতেছে, তাহা যদি আমাদের বিশ্বাস করিতে হয়, তবে ইহারা সকলেই এক্ষণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এমন লাগিয়াছে যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে আর তাহাদের সে ভুল বা বিফলতা হইবে না! বৈজ্ঞানিক রাজ্যের যান্ত্রিকতার মহলে ইতিমধ্যেই কত আশার কথাইত শুনা যাইতেছে—এরোপ্লেনের এমন উন্নতি হইয়াছে যে তাহাতে যথেষ্ট বিস্ফোরক পদার্থ বোঝাই করিয়া বিনা-তার তাড়িত শক্তিতে তাহা শত্রুর ধ্বংসে প্রয়োগ করা যাইবে; আর এমন গ্যাসের বোমা তৈয়ার হইয়াছে যে তাহার এক একটীতে বড় বড় নগর একবারে উড়াইয়া দেওয়া যাইবে। এখনও অবশ্য এই যান্ত্রিকতার উন্নতির পরাকাষ্ঠা সাধন হয় নাই। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে প্রকৃতির উপরে আরও একটু অধিক আধিপত্য লাভ করিতে পারিলে, মানব-সভ্যতা এমন অবস্থায় আসিবে যে তাহাতে তাহার আত্ম-হনন কার্য্য অতি সুশৃঙ্খল ও অমোঘ ভাবে সম্পাদিত হইবে।"—পাশ্চাত্য লেখক

লবণ-কর প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ

১। আজকাল লবণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে সর্ব্বত্র আলোচনা চলিতেছে। তাহার কারণ দেশনায়ক মহাত্মা গান্ধী লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। সুতরাং লবণকর সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে সংবাদ রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য।

২। অন্যান্য দেশে সরকারী কঠোর আইন আছে সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষে লবণের উপর যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় অন্যান্য দেশের কঠোর নিয়ম অতি লঘু বলিয়াই মনে হয়। জীবের জীবন ধারণের জন্য জল, বায়ু ও আলোর আবশ্যকতার ন্যায় লবণেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। দরিদ্র লোকের উদর পোষণের জন্য লবণ প্রধান অবলম্বন। যাহাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত, তাঁহারা সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য হেতু লবণের প্রয়োজনীয়তা কম অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু 'নুন-ভাত' যাহাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন, তাহাদের লবণের আবশ্যকতা যে অত্যন্ত অধিক তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। গরীব ভারতবর্ষ এই জন্যই লবণকে মহত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে এবং বলিয়া থাকে *"নুন খাই যার, গুণ গাই তার।"*

৩। প্রাণীগণের জীবন ধারণের জন্য যে সকল পদার্থ অত্যাবশ্যক প্রকৃতি তাহাদের ভাণ্ডার সকল সময় উন্মুক্ত রাখে—প্রকৃতি তাহাতে বিন্দুমাত্রও কৃপণতা প্রদর্শন করে না। প্রকৃতিদত্ত বস্তু

স্বেচ্ছামত উপভোগ করবার অধিকার যখন সকলেরই সমান, তখন লবণ সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইতে পারে। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে লবণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রকৃতি যেন বিশেষভাবে তদ্দেশবাসীর জন্য লবণের ভাণ্ডার দ্বার আরও উন্মুক্ত রাখিয়াছে। এদেশে সমুদ্রের জলে, হ্রদে, মাটিতে, পাহাড়ে এবং খণিতে—লবণ পাওয়া যায়। অনাদিকাল হইতে এদেশবাসী প্রকৃতিদত্ত লবণকে নিরুপদ্রবে ভোগ করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন সময় হইতে তাহাদের এই অবাধ ভোগের পথে বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল।

৪। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কোনও শাসকসম্প্রদায় ভারতবর্ষে লবণের উপর পৃথক কর ধার্য্য করেন নাই। তবে মুসলমান বাদশাহদের সময় অন্যান্য চালানী মালের উপর যেরূপ নাম মাত্র শুল্কের ব্যবস্থা ছিল লবণেও উপরও সেইরূপ শুল্ক আদায় করা হইত; লবণের উপর পৃথক্ কর নির্দ্দিষ্ট ছিল না। কিন্তু সেই শুল্ক এত অল্প ছিল যে লবণের ব্যবসায় ও উহার মূল্যের উপর উহার প্রভাব জনসাধারণের অনুভবের মধ্যেই আসিত না।

৫। ১৭৬৫—৬৬ সালে জেনারল্ ক্লাইভ্ দিল্লীর মোগল বাদশাহর নিকট হইতে নামতঃ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। তখন হইতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে এই প্রদেশসমূহের শাসনভার গ্রহণ করেন। কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ উক্ত প্রদেশ সমূহে লবণের বিস্তৃত ব্যবসায় ও উহার লাভ দেখিয়া তাহার উপর লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা লবণের কারবার এক চেটিয়া করিয়া লইল। প্রথমে তাহারা নীলামের দ্বারা লবণ বিক্রয় করিত। এই প্রকারে তাহারা লবণের কাট্‌তি হ্রাস করিয়া লবণের উপর অত্যধিক ভাবে কর বসাইয়া দিল। তৎপরে তাহারা লবণ নির্ম্মাণ কার্য্য নিয়ন্ত্রণ পূর্ব্বক লবণ প্রস্তুতকারীদিগকে বিশেষভাবে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই প্রকারে এদেশে যাহারা লবণের ব্যবসায়ের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত তাহাদের জীবন যাত্রার পথ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

৬। তাহার পর কোম্পানির দৃষ্টি অন্যান্য প্রদেশের উপর পতিত হইল। মাদ্রাজ, বম্বে, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে যে যে স্থানে কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল—সেই সেই প্রদেশে লবণ সম্বন্ধীয় কঠোর নীতি প্রবর্ত্তিত হইল। এই নীতি প্রবর্ত্তনের ফলে মালাবার ও কানারার লবণ প্রস্তুতের কারখানা নষ্ট হইয়া গেল—মাদ্রাজ পূর্ব্বউপকূলে বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল এবং কাদাপা, করনুল ও বেলারী প্রভৃতি স্থানে লবণ প্রস্তুতের কার্য্য রহিত হইল। এই প্রকারে লবণের উপর একাধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক কোম্পানি তাহার উপর এত গুরু কর বসাইলেন যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষে গরীব ব্যক্তি ও পশুদিগের জন্য লবণ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল।

৭। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির শাসনের অবসান হইলে যখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশরাজের শাসনাধীনে আসিল তখনও লবণের কঠোর নিয়ম পূর্ব্বের ন্যায় বলবৎ রহিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি মণ লবণের উপর ২॥০ টাকা কর ছিল। কিন্তু ১৮৮২ সালে কোম্পানি ঐ কর কমাইয়া ২৲ টাকা এবং ১৮৮৮ সালে উহা পুনরায় বর্দ্ধিত করিয়া ২॥০ টাকা ধার্য্য করিল।

৮। কিছু কাল লবণ কর এইরূপে চলিলে গোখেল মহোদয়ের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁহার চেষ্টায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লবণের উপর ধার্য্য কর মণকরা ২৲ টাকা, ১৯০৫ সালে ১॥০ টাকা এবং ১৯০৭ সালে ১৲ টাকা হইয়াছিল। প্রায় ১০ বৎসর উহা এক ভাবে চলিবার পর ১৯১৭ সালে

য়ুরোপের মহাযুদ্ধের সময় যখন সরকার টাকার আবশ্যকতা বোধ করিতে লাগিলেন তখন লবণ কর ১৷৹ করা হয়, কিন্তু ১৯২৩ সালে তাহা বৃদ্ধি করিয়া ২৷৷৹ টাকা করা হইলে এতৎ সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয়। অগত্যা তাহার পরের বৎসর সরকার লবণের উপর মণ করা ১৷৹ হারে কর ধার্য্য করেন। তদবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত লবণ করের হার সমভাবেই আছে।

৯। মানুষের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় ইতর প্রাণীদিগেরও লবণের আবশ্যকতা আছে। সরকারের এদিকে দৃষ্টি আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ১৯২৪ সালে লবণ করের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হইবার সময় সরকারের পক্ষ হইতে সার চার্লস ইনেশ ঐ কর অতি সামান্য বলিয়া প্রকাশ করায় তৎসম্বন্ধে সরকারের মনোভাবের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

১০। সরকারী বিবরণানুযায়ী একমণ লবণ তৈয়ার করিতে সরকারের ১০ পাই মাত্র খরচ পড়ে। তদুপরি ২০ আনা অর্থাৎ ২৪০ পাই শুল্ক ও লবণ স্থানান্তরে প্রেরণাদি বাবদ অন্যান্য খরচ ধরিয়া উহা এখন ২৷৷৹ মণ দরে বিক্রী হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি এক আনার লবণ ক্রয় করে তাহাকেও দুই পয়সা কর দিতে হয়। এই ভীষণ করের দরুণ এ দেশের গরীব লোক আবশ্যক পরিমাণ লবণ ব্যবহার করিতে পারে না। জমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির জন্যও লবণ আবশ্যক; কিন্তু দরিদ্র কৃষক লবণের অভাব বশতঃ চাষ হইতে উপযুক্ত শস্য উৎপাদন করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন, মৎস্য প্রভৃতি সংরক্ষণের ও গবাদি পশুদিগের রোগ হইতে মুক্তির জন্য এবং তাহাদের নিরাময় রাখিবার জন্য অধিক পরিমাণে লবণ প্রয়োজনীয়। অধিকন্তু শীত প্রধান দেশের লোকের অপেক্ষা উষ্ণ প্রধান দেশের লোকের লবণের আবশ্যকতা বেশী। কিন্তু দেখা যাইতেছে আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকেরা শীত প্রধান দেশস্থ লোকদিগের তুলনায় বাধ্য হইয়া জন প্রতি অল্প পরিমাণ লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে। কোন্ কোন্ দেশের লোক জন প্রতি কত লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল :—

দেশের নাম			জন প্রতি ব্যবহৃত লবণের পরিমাণ
ইংলণ্ড	...	...	৪০ পাউণ্ড
পর্ত্তুগাল	...	...	৩৫ „
ইটালী	...	...	২০ „
ফ্রান্স	...	...	১৮ „
রুশিয়া	...	...	১৮ „
বেল্‌জিয়াম্	...	...	১৬৷৷ „
অষ্ট্রীয়া	...	..	১৬ „
পারস্য	...	...	১৫ „
ব্রিটিশ ভারত	...	...	১২ „

এতৎপ্রসঙ্গে ভারতের সরকার দুই বৎসরে কত পরিমাণ লবণের শুল্ক আদায় করিয়াছেন তাহা মাননীয় উইলিয়ম্ রসের হিসাব হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯২৫—২৬	...	...	৬,৩৭,০৩,৫,৬০ টাকা
১৯২৬—২৭	...	...	৬,৭২,৮৩,২,২৩ „

১১। একদিকে যেমন কঠোর আইন প্রবর্ত্তনফলে লবণনির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল, অন্য দিকে তেমনি বিলাত হইতে লবণ আমদানীর সুবিধা উপস্থিত হইল। ভারতের সহিত বিলাতের বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যাপার সংঘটনের পর হইতে দেখা যাইতেছে যে, আমরা যত পরিমাণ দ্রব্য বিদেশ হইতে খরিদ করি তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ দ্রব্য আমরা বিদেশে চালান দিয়া থাকি। আবার, যে সকল মাল জাহাজে চালান যায় তাহা কাঁচা মাল বলিয়া জাহাজের বেশী স্থান অধিকার করে, কিন্তু এখান হইতে প্রেরিত মাল হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আসে বলিয়া জাহাজে অল্পতর স্থানের প্রয়োজন হয়। এই নিমিত্ত যত জাহাজ আমাদের দেশের মাল চালানে আবশ্যক হয়, বিদেশ হইতে মাল আনিতে তত জাহাজের দরকার হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের মাল বিদেশে লইবার জন্য যে সকল জাহাজ এদেশে আইসে, তাহা নিয়মিত ভাবে বোঝাই না হইলে সমুদ্রের উপর দিয়া যাতায়াত করিতে পারে না। সুতরাং জাহাজগুলিকে ভারী করিবার জন্য এবং জাহাজের ভাড়া উশুল করিবার জন্য বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া নাম মাত্র মূল্যের লবণ চালান দেওয়া হয়। কিন্তু জাহাজের ভাড়া যাহা'ত কম না হইতে পারে এবং লবণের দ্বারা যাহাতে ঐ ভাড়া আদায় হয় এইজন্য বিলাতের লবণ ভারতবর্ষে বেশী দরে বিক্রয় করা হয়। এদিকে দেশী লবণের উপর গুরু শুল্ক স্থাপনের জন্য এবং এদেশে সরকার কর্ত্তৃক প্রয়োজনানুরূপ লবণ নির্ম্মাণের কার্য্য বন্ধ রাখার নিমিত্ত ভারতের লবণ দুই টাকার কমে বিক্রী হইতে পারে না। কিন্তু বিলাতী লবণ তদপেক্ষা কম দরে বিক্রী হইতে পারে। এই জন্য দেশী লবণ বিলাতী লবণের সহিত প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হয় না। ভারতে বিলাতী লবণ প্রতি বৎসর কত টাকার বিক্রী হয়, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

সাল	মুল্য
১৯২৫—২৬	১, ০৪, ১৯, ৬৭২৲
১৯২৬—২৭	১, ২৬, ১৯, ৮৭৫৲
১৯২৭—২৮	১, ৭৪, ৮৪, ২৮৪৲

১২। এক্ষণে এই দেশের লোক যাহাতে অবাধে লবণ প্রস্তুত করিবার অধিকার পায় এবং লবণের জন্য ভারতবাসিগণকে পরমুখাপেক্ষী হইতে না হয়, তজ্জন্য মহাত্মা গান্ধী আত্মনিয়োগ করতঃ লবণ প্রস্তুত কার্য্যে সহকর্ম্মিগণ সমভিব্যাহারে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্য পদ্ধতি সম্বন্ধে কাহারও কাহারও মতভেদ থাকিলেও তাহার উদ্দেশ্য যে মহৎ সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈধ নাই।

মনো-বিজ্ঞান—প্রাচ্যে

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

"যং লব্ধা চাপরং লাভং
—মন্যতে নাধিকং ততঃ ॥"

এমন কিছু আছে যাহা পাইলে নিখিল জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য সম্ভারকে নিতান্তই তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। তাহা জড় নহে—চৈতন্য, মন নহে—প্রজ্ঞা, বুদ্ধি নহে—আত্মা। এই আত্মাকে লাভ করিলে অখিলের যাহা কিছু সমস্তকেই ধূলি মুষ্টির মত অকিঞ্চিতকর বলিয়া ধারণা হয়। জড় সত্য নহে—অবস্তু, তাহার কোন বাস্তব সত্ত্বা নাই। সেই জন্যই জড় প্রাপ্তিতে সুখ শান্তি তৃপ্তি আসে না। জড় অন্ধ তামস—আলোকের সুদূরবর্ত্তী।

মন এবং বুদ্ধি জড় রাজ্যের অন্তর্গত। সেই জন্য মনের দৃষ্টি—বুদ্ধির আবিষ্কার—সত্যের অতীত। মন ও বুদ্ধির সাহায্যে সত্য লাভ হয় না। সংসারে যাহা দিয়া মানুষ সুখ ও আনন্দ চায়, তাহা মনের সৃষ্টি বলিয়া, মানুষ তাহাতে আনন্দ পায় না। ভারত আত্মা সেই জন্যই চাহিয়াছিলেন—

যং লব্ধা চাপরং লাভং
মন্যতে নাধিকং ততঃ ॥

এই যে বস্তুটী যাহা লাভ করিলে অন্য সমস্তকেই নগণ্য বলিয়া বোধ হয়, ইহা মাত্র নাস্তিত্বের দিক। ইহার একটী অস্তিত্বের দিক আছে। এই বস্তুকে পাওয়াই যথার্থ পাওয়া; ইহাকে পাইলেই সত্য দৃষ্টি লাভ হয়, সত্য প্রত্যক্ষ হয়, বস্তু ও অবস্তুর—মিথ্যা ও প্রকৃতের যথার্থ জ্ঞান হয়।

যতক্ষণ এই প্রকৃত ও পরিপূর্ণ ভূমা লাভ না হয়, ততক্ষণ জানা না জানা—পাওয়া না পাওয়া—সুখ দুঃখ সবই শিশুর বাল্য ক্রীড়া—বালুর প্রাসাদ রচনা—নিশীথ স্বপ্নের মোহন মাধুরী!

মন ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে অবস্থিত প্রাণের সমস্ত কার্য্যই অলীক, তাহার গবেষণাও অলীক, তাহার আবিষ্কারও অবাস্তব; তাহার দর্শন, বিজ্ঞান, ভূয়ো দর্শন সমস্তই "অন্ধেনৈব নিয়মানা যথান্ধা"র মত অন্ধের গমন। তাহাতে কেবল ভুল, কেবল ভ্রান্তি, কেবল তামস অন্ধকার!

মন নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি আজ যাহা দেখে কাল তাহাই ভুল বলিয়া ভাবে; আজ যাহা সুধা বলিয়া সাগ্রহে আকর্ষণ করে পরক্ষণেই তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করে। এমনি করিয়াই মন—বুদ্ধির—নিষ্ফল ছুটাছুটি চলিতেছে। আর এই জন্যই ভারতবর্ষের আকাঙ্খা—

"যং লব্ধা চাপরং লাভং
মন্যতে নাধিকং ততঃ ॥"

চক্ষুতে যাহা দেখা যায়, কর্ণে যাহা শোনা যায়, স্পর্শনে যাহা অনুভব করা যায়, বুদ্ধিতে যাহা আবিষ্কার করা যায়, মনে যাহা উপলব্ধি হয়, সমস্তই স্বপ্ন সঞ্চরণ, মিথ্যার লীলা খেলা। মন-বুদ্ধি দিয়া কেবল যে চৈতন্য জগতই অপ্রাপ্য তাহা নহে, জড় জগৎও তাহাতে দুষ্প্রাপ্য। মন বুদ্ধির অধিকার-

ক্ষেত্র জড় জগতে, কিন্তু তাই বলিয়া জড় তাহার দৃষ্টিগত নহে। কারণ সত্য দৃষ্টিটাই যে চৈতন্যের অধিকারভুক্ত।

এই কারণেই জ্ঞানের প্রবক্তা—সত্যের দ্রষ্টা—জ্ঞানী ও সত্য-সাধক। যিনি সব দেখিয়াছেন, যিনি ভূমাকে পাইয়াছেন, তিনিই সমগ্রের পরিচয় দিতে সমর্থ ও অধিকারী। প্রদীপ জ্বালাইয়া গৃহ কোনের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, সূর্য্য দীপ্তিতে বিশ্ব-নিখিল উদ্ভাসিত হইয়া উঠে!

ভারতে এই সিদ্ধান্তটিই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধি ও মনীষা প্রদীপের ক্ষীণ জ্যোতি। যাহাদের হাতে এই ক্ষণদীপ্তি আলোক শিখা টুকু সম্বল ছিল, তাহারা একান্ত বিনীতভাবে শ্রদ্ধালু শিষ্যের মত এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। আর সমাজের নিয়ন্তা ছিলেন ঋষি—যাঁহার দৃষ্টি লাভ হইয়াছিল, যিনি ভূমাকে লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই ছিল না, জড়ের অর্ঘ্যে যাঁহার আত্ম দেবতার পূজা করিতে হইত না।

ঋষি ধর্ম্মপ্রবক্তা, সমাজশাসক, রাষ্ট্রপরিচালক। ঋষি শিক্ষক, ঋষি দার্শনিক তত্ত্ববিদ্, ঋষি কবি, ঋষি বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রবেত্তা এবং শস্ত্রবেত্তা। ঋষিত্বের ভিত্তিভূমির উপরই ভারতের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত।

কারণ ঋষিদৃষ্টিই অমোঘ, ঋষিদৃষ্টিই সম্পূর্ণ দৃষ্টি। যাহা দেখিলে সমস্তই দেখা হয়, দেখিবার আর কিছুই বাকী থাকে না, ঋষি তাহারই দ্রষ্টা।

হাওয়া ফিরিয়াছে—অন্ধ পথ দেখাইতেছে; জড় চৈতন্যের স্থান অধিকার করিয়াছে। আজ চৈতন্যের ক্ষেত্রে—ভূমার ভূমিতে—জড় ও ক্ষুদ্র মন-বুদ্ধি কর্ম্ম করিতেছে।

ফলও হইয়াছে—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।"

অন্ধ পথ দেখাইতেছে, বিশ্বমানব দুঃখের কণ্টকবনে নিপতিত হইতেছে। নিরন্তর রক্তাক্ত দেহ হইতেছে। চৈতন্যের অনন্ত ক্ষুধা, ভূমায় তাহার নিবৃত্তি। তাহাকে দেওয়া হইতেছে কেবল জড়, তৃষ্ণার্ত্তকে দেওয়া হইতেছে বালুকা। প্রদীপ জ্বালিয়া বিশ্ব আলোকিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এইবার মনোবিজ্ঞানের কথা।

মানবচিন্তা মনোরাজ্যটার পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিতেছে। এবং একটা কুহেলিকাচ্ছন্ন মনোবিজ্ঞান রচনা করিতেছে। এবং তাহার দ্বারা সমাজকে নিয়ন্ত্রিত ও মানুষকে আনন্দ দান করিতে চাহিতেছে।

এইখানে একটা রূপক গল্পের আশ্রয় লওয়া যাক্। চারিজন অন্ধ হাতি দেখিল। তাহাদের জ্ঞানের অবলম্বন মাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়। সেই জন্য কেহ বলিল—হাতি হাতের মত, কেহ বলিল—শুঁড়ের মত। মোট কথা যে যাহা স্পর্শ করিয়া বুঝিল, সে সেই প্রকারই একটা খণ্ড অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্তিময় অভিজ্ঞতার কথাই বিবৃত করিল।

বুদ্ধিমানের—প্রতিভাবানের—মনোবিজ্ঞান আবিষ্কার ঠিক এইরূপই একটা অন্ধ নিতান্তই খণ্ডীকৃত এবং অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা! মনীষীর দৃষ্টি অনন্তের মাঝে একটা অণুমাত্র; হয়ত ইহা বলিলেও বলা হইল না, উহা পরমাণুরও লক্ষ কোটী অংশের একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

"আত্মবৎ মন্যতে জগৎ"—ইহাও মনোবিজ্ঞান। আমি যাহা ও যেমন তাহারই প্রতিবিম্বন এই অন্তর্জগত এবং বহির্জগৎ। আমার ধারণা সংস্কার, আমার আশা আকাঙ্খা, বুদ্ধি প্রতিভা, আমার বুদ্ধির পরিধি এবং আদর্শ যতটুকু হইবে, ততটুকু লইয়াই তেমনি হইয়াই আমার অভিজ্ঞতা মূর্ত্তি লাভ করিবে। সৌন্দর্য্যের হয়তো একটা সার্ব্বভৌমিক "অদ্বীয়তম্" আদর্শ আছে। কিন্তু প্রত্যেক কবির কল্পনায়, প্রত্যেক শিল্পীর ধ্যানে, বিভিন্ন রূপের লীলা বিচিত্র ভঙ্গিমায় ফুটিয়া উঠে। ইহার কারণ ঐ— "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ"।

কবির কাব্য, শিল্পীর চিত্র ও ভাস্কর্য্য, দার্শনিকের চিন্তা, বৈজ্ঞানিকের গবেষণা সবই ঐ "আত্মবৎ"। কবি শিল্পী, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক যিনি যেমন তাঁর দানও ঠিক তেমনি। ঐ গুলি মনীষী বৃন্দের মনের প্রতিবিম্ব, অবিকল প্রতিচ্ছবি, এমন কি মানসসন্তানও বলা যাইতে পারে।

যে যাহা নয়, সে তাহা সৃষ্টি করিতে পারে না। জলের অগ্নিসৃষ্টির ক্ষমতা নাই, জড়ের জীবন সৃষ্টির সামর্থ্য থাকিতে পারে না, অন্ধকার কখনও দীপ্তির প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। যে যাহা, সে তাহাই দিতে পারে। তাহার অন্য কিছু দিবার চেষ্টা বায়ুকে মুষ্টির মধ্যে অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টার মতই একান্ত অলীক, আবাস্তব, অসম্ভব।

অন্ধের দৃষ্টি কেবলই যে অসম্পূর্ণ তাহা নয়, উহা সঙ্গে সঙ্গে অলীক। মন ও বুদ্ধির শক্তি, মনীষা ও প্রতিভা—ইহা অন্ধের বোধ। কাজেই ইহার ফল

"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধা!"

মন ও বুদ্ধি অসম্পূর্ণ, খণ্ড সঙ্কীর্ণ, আবিল অন্ধ। ইতর বিশেষ হয়ত আছে; কাহারও বেশী কাহারও কম, কেহ অত্যধিক মলিন, কেহ অপেক্ষাকৃত অল্প। মোটের উপর মন বুদ্ধির শক্তি সসীম।

আবার কেবল সসীমই নহে; উহা আপনাতেই আপনি মগ্ন। নিজে যাহা তাহাতেই আবদ্ধ। বাহিরের জগতে যেমন যাহার কথা জানা আছে, তাহাই বলিতে পারা যায়, যাহা দেখা গিয়াছে তাহার বিষয়েই বর্ণনা করা যায়, যাহা শোনা গিয়াছে, তাহাই কল্পনা করা যায়। মনোজগতেও ঠিক তদ্রূপ; মনটী যেমন গঠিত, যে সংস্কারে যে ধারণায় যে পৈতৃকত্বে, যে অভিজ্ঞতায় মনের রচনা অবিকল তেমনি। মৃত্তিকায় মৃৎপাত্রেরই জন্ম—"আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।" মনই জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। একের জগৎ অন্যের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।" আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" ইহা খাঁটি মনোবিজ্ঞান!

এইবার মনীষীর কথা! মনীষার অবলম্বন মন ছাড়া আর কিছুই নহে। এই মনটী দশের তুলনায় একটু বেশী ভাবিতে পারে, বুঝিতে পারে, চিন্তা করিতে পারে, কল্পনা করিতে পারে; এবং বাহ্য জগতের সহিত ইহার পরিচয় কিছু অধিক, কাজেই অভিজ্ঞতাও কিছু বেশী! এই হিসাবে সাধারণের অপেক্ষা মনীষার দাম কিছু বেশী। তথাপি তাহা অসম্পূর্ণ ও অন্ধ ভ্রমপূর্ণ।

মন ছাড়া তো মনীষীর কিছুই নাই! কিন্তু মন যে জড় জগতের ভিতর আবদ্ধ, নানা সংস্কারে আবিল, তাহার পৈতৃকত্ব ও অভিজ্ঞতায় সঙ্কীর্ণ! এই মনে শুদ্ধ, সত্ব, সম্পূর্ণ, অসীম, শিবসুন্দর এবং সত্যের ধারণা অসম্ভব। রঙিন কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া দেখিলে দ্রষ্টব্য বিষয় রঙিন দেখায়, বদ্ধ-সংস্কার রঙীন মনের মধ্যস্থতায়ও জগতকে মনের মতন দেখাইবে। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।"

বুদ্ধিমান, মনীষী ও প্রতিভাবানের দেখা বিকৃত দেখা, যাহা নয়, তাহারই দর্শন!

এই জন্যই আদেশ

"আত্মানং বিদ্ধি"

এই আত্মাই ভূমা, আলোক পূর্ণ দৃষ্টি অখণ্ড, বিশুদ্ধ, বিশ্ব মন। এই আত্মাকে জানিলে অজ্ঞাত আর কিছুই থাকে না। অবোধ্য আর কিছুই রহে না, সবই দর্শনীয় প্রত্যক্ষ স্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়, বুদ্ধি দিয়া কল্পনা করিয়া সংশয় সমাচ্ছন্ন করিয়া অবাস্তবকে বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে হয় না।

আত্মাকে যিনি জানেন, তাঁহার বাক্য বেদ। তাঁহার দর্শন মূর্ত্ত্য সত্য, তাঁহার আদেশ অমোঘ শাস্ত্র। এই আত্মবিদ্‌রাই জগতে মহা মহা পরিবর্ত্তন আনিয়াছেন—তাঁহাদের একটী উপদেশ পালন করিয়া মানব অমৃত লাভ করিয়াছে, নগণ্য জাতি মহাজাতিতে পরিণত হইয়াছে, কত নরনারী ধন্য হইয়াছে, অমর হইয়াছে।

আত্মা হইতেছে বিশ্ব মন, বিশুদ্ধ বিশ্ব মন। সর্ব্ব সংস্কার রহিত, সর্ব্ব বন্ধনাতীত, শিক্ষা দীক্ষা পারিপার্শ্বিকতা, বংশানুক্রমিতার অতীত; এক কথায় "শুদ্ধম্‌পাপবিদ্ধম্।" এই আত্মায় যিনি প্রতিষ্ঠিত, এই আত্মাকে যিনি জানেন, তিনিই মনোবিজ্ঞানের যথার্থ বিজ্ঞাতা।

মনীষীর দেখা মনোরাজ্য একান্তই অসম্পূর্ণ। মনীষী আপনার মন দিয়াই দেখেন, তাই তাঁহার রচিত মনোবিজ্ঞান, তাঁর শিক্ষা দীক্ষার, তাঁহার আদর্শের অনুরূপ। তিনি মনোবিজ্ঞান বলিতে গিয়া মনের যে শুধুই অসম্পূর্ণ পরিচয় দেন তাহা নহে, তিনি মনের বিকৃত, ব্যাধিগ্রস্থ, অশিব রূপটারই পরিচয় দিয়া থাকেন।

দর্শনে এবং সাহিত্যে মনোবিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এ মনোবিজ্ঞান পথ বলিয়া অপথে বা কুপথে লইয়া যায়, আলোক বলিয়া বিনাশগর্ভ বিদ্যুৎদীপ্তি দেখায়। সাহিত্যে এই শ্রেণীর বিষাক্ত মনোবিজ্ঞানের কিছু বাড়াবাড়ি। ইহাতে মনের যে পরিচয় লওয়া হয়, তাহা অধিকাংশ স্থলে বিকৃত, কদর্য্য, মানব সমাজের অহিতকারী, খণ্ডের ভিতরও বিখণ্ড।

যাহা হয়, হইতে পারে, হওয়া সম্ভব, যাহা হওয়া সঙ্গত, শোভন, সুন্দর, তাহা পাওয়া যায় না। কোন বিশেষ উদাহরণ লইয়া কাজ নাই। মোটামুটী, এক জাতীয় দার্শনিক ও সাহিত্যিক মানব মনের কদর্য্যতার আবর্জ্জনার দিকটা দেখাইয়া বলিয়া থাকেন, ইহাই মানব মন। তাঁহাদের ভুল হয়, যে বিশ্বমন যাঁহাদের অগোচর, মনের স্বরূপে যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহারা কেমন করিয়া মনের রূপ দেখিবেন। বিশ্ব মন মনবুদ্ধির অতীত; উহা সাধন প্রত্যক্ষ, আত্মজ্ঞান সিদ্ধ। স্বর্ণ যাহাদের লব্ধীভূত হয় নাই, স্বর্ণালঙ্কার সম্বন্ধে কোন বিশেষ কিছু বলিতে যাওয়া তাহাদের একান্তই ধৃষ্টতা।

অন্য দিকে বুদ্ধিলভ্য যে মনোজগৎটী তাহাতেও স্বর্গ আছে নরকও আছে, আলোকও আছে, অন্ধকারও আছে, পুষ্প আছে, আবর্জ্জনাও আছে। যে বলে আবর্জ্জনাই সত্য, পুষ্প মিথ্যা অথবা উপেক্ষণীয়, সে মানব জাতির শত্রু।

যে সাহিত্যিক ও দার্শনিক মনের শুভ্রতার পরিচয় না দিয়া মালিন্যের কথা বলেন, তাঁহারা চন্দনকে ফেলিয়া দিয়া পঙ্ক মাখেন। তাঁহারা "আত্মঘাতী", সমাজদ্রোহী, দস্যুর মত সমাজের উপদ্রব, আশঙ্কা, উৎপাত। সংসারে অন্ধকার ও দীপ্তি আছে। মানব মন সতৃষ্ণ নয়নে উষার অরুণচ্ছটার দিকেই নিবদ্ধ দৃষ্টি। মনোজগতে তাহা না হইবে কেন? কেন মানুষ দয়া, প্রীতি, ত্যাগ, ক্ষমা, স্নেহ, মৈত্রি,

বীরত্ব বিভূতির অমৃত জ্যোতি না দেখিয়া, পাপের বীভৎসতার, পাতিত্যের, কলঙ্কের অন্ধ তামসিকতায় বিচরণ করিবে?

যে মনটী সহজ স্বভাবে মানবের হস্তগত, তাহার শিবসুন্দর রূপটীর পরিচয় শিক্ষাসাপেক্ষী। মানব জাতি যখন মানবতার পথে অগ্রসর হইবে, তখন সে শিবতম মনোবিজ্ঞান রচনা করিবে। এই শিব সুন্দর মনের দর্শন লাভের পন্থা—

"আত্মনাং বিদ্ধি"

কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও যদি মনের কথা বলিতে হয়, তবে সুন্দর পবিত্র অমল মনের পরিচয় দেওয়াই মানব ধর্ম্ম।

—————

বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ও হিন্দুবিদ্বেষ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে, দেখা যাইতেছে, প্রাচ্য পাশ্চাত্য, স্বদেশ বিদেশ, প্রায় সর্ব্বত্রই আচারবিহীন বৌদ্ধধর্ম্মের একটা যেন জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। এই সময়ে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভারতবাসী হিন্দুও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন; কিন্তু অধিকাংশস্থলে দেখা যায়, কাহারও বৌদ্ধধর্ম্মের আচার অবলম্বনে আগ্রহ নাই এবং কেহই সেই আচার গ্রহণও করেন নাই। কেবল তাহাই নহে, অনেক সময় ভারতবাসী এই হিন্দুই বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা খ্যাপনাবসরে স্বধর্ম্মের অপকৃষ্টতা ঘোষণা করিয়া স্বধর্ম্মাচার্য্যগণকে অল্পবুদ্ধি বলিতেও উৎসাহিত হইয়া থাকেন। চীন ও জাপানে, যেখানে আজও বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত প্রবল বা জীবিত, তদ্দেশবাসী বৌদ্ধগণ যে হিন্দুধর্ম্মের অপকৃষ্টতা খ্যাপন করিবেন ও হিন্দু আচার্য্যগণকে উপহাসাদি করিবেন তাহা কিছুই বিচিত্র নহে; ভারতবাসী হিন্দুরা যে এখন ইহাতে যোগদান করিতেছেন ইহাই একটু বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, ভারত হইতে বৌদ্ধমত বিতাড়ন হিন্দুধর্ম্মের আচার্য্যগণের একটা গৌরবের ও বুদ্ধিমত্তার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত। আজকাল কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত ভাবের প্রবাহ চলিতেছে। এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সুরে সুর মিলাইয়া অনেক হিন্দুই বলিয়া থাকেন—হিন্দুদিগের যে দার্শনিক চিন্তার উৎকর্ষ তাহার জন্য হিন্দুগণ বৌদ্ধগণের নিকট বিশেষভাবে ঋণী, হিন্দুদিগের যাহা কিছু ভাল তাহাতে বৌদ্ধপ্রভাব অত্যধিকই লক্ষিত হয়; এমন কি হিন্দুর নিজের বলিয়া গর্ব্ব করিবার কি আত্মমর্য্যাদা বোধ করিবার বেশী কিছুই নাই। ঐহিক সুখৈকপরায়ণ পাশ্চাত্য গণ, শিক্ষার সাহায্যে আমাদিগকে ধর্ম্মহীন করিয়া, আমাদের আত্মমর্য্যাদাবোধশূন্য করিয়া আমাদিগকে যে রূপ করিতে চাহেন, আমাদিগের হৃদয়ে ক্রীতদাসের দাস্যবৃত্তি অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া আমাদিগকে

চিরদাস করিয়া রাখিবার জন্য আমাদিগকে যেরূপ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তাঁহারা বহুল পরিমাণে করিয়া তুলিয়াছেন; এভাব আর অধিকদিন চলিলে অচিরে আমাদের সত্তা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। এখন সত্যের সাহায্যে ইহার প্রতীকারের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার সময় আসিয়াছে। এখন পরকৃত গ্লানির উপেক্ষারূপ ঔদার্য্য দুর্ব্বলতার লক্ষণ বলিয়া বুঝিবার সময় আসিয়াছে। সাধারণ শিক্ষিত আজ সমাজ ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়াছে, ধর্ম্মের মূল বেদে অভ্রান্ত বুদ্ধি হারাইয়াছে, স্বধর্ম্মাচার বর্জ্জন করিয়াছে, এখন বিজ্ঞান দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ করা হয়, বিজ্ঞান সাহায্যে বেদের আদেশ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে, আর তাহার ফলে স্বেচ্ছা মত আচার বিচার অবলম্বন করা হইতেছে, এখন আমাদের নিজস্ব রক্ষা করিতে হইলে ইহার প্রতীকার ভিন্ন উপায় নাই। এ জন্য আমাদের বৈদিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে হইবে, বেদের অভ্রান্ততা নিজে বুঝিতে হইবে এবং অপরকেও বুঝাইতে হইবে; অন্তরে দাস্যভাব না আসিলে শরীরের দাস্যভাব স্থায়ী হয় না। তাই আজ শিক্ষার সাহায্যে সেই উভয় দাস্যভাব আমাদের মধ্যে প্রকটিত করা হইতেছে। যাহা হউক এখন যদি ইহার প্রতীকার করিতে হয়, তবে অন্তরের দাস্য অগ্রে বর্জ্জন করিতে হইবে; ধর্ম্ম, সমাজ, বিদ্যা, বুদ্ধিতে দাস্য অগ্রে পরিত্যাগ করিতে হইবে; তৎপরে শারীরিক দাস্য বর্জ্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক; অন্তরে ইচ্ছা না জন্মিলে কখনই শরীরে কার্য্য প্রকাশ পায় না। অতএব যাঁহারা আজ আমাদের বৈদিক ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা খ্যাপন করিতেছেন, আমাদের আচার্য্যগণের প্রতি উপেক্ষা ও উপহাসাদি করিতেছেন, তাঁহাদের কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া আমাদিগের আত্মরক্ষা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা দেখিতে পাই আমাদের মধ্যে এই আচার-হীন বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের একটী লক্ষণ এই যে,—হিন্দুধর্ম্মের আচার্য্যগণ বৌদ্ধধর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহারা যে বৌদ্ধধর্ম্মের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই; এইরূপ একটা ধারণা বা এইরূপ একটী মতের ঘোষণায় আজকাল অনেকেই বলেন—হিন্দুগণ যে বৌদ্ধমত খণ্ডনোদ্দেশ্যে তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা প্রকৃত বৌদ্ধমতই নহে, তাহা বিকৃত অথবা হিন্দুগণের স্বকপোলকল্পিত বৌদ্ধমত। প্রাচীনের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের ইংরাজী অনুবাদ কালে পণ্ডিত কাউয়েল ও গাফ সাহেব বৌদ্ধমতের পাদটীকায় এই কথাটী একটী পঙ্‌ক্তিতে উল্লেখ করিতেছেন; অতঃপর যে বহুলোকেই এই সুরটী খুব চড়াইয়া তুলিয়াছেন, তাহা সুধীবর্গের অবিদিত নাই। সাহেব পণ্ডিতদ্বয় যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—**Madhava probably derived most of his knowledge of Budhist doctrines from Brahmanical works; consequently some of his explanations seem to be at variance with those given in Budhist works.**

বস্তুতঃ সাহেবদ্বয়ের এই একটী কথাতেই পাঠকের মনে সর্ব্বদর্শনকার মাধবের উপর অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যাইবার কথা; যে হেতু মাধব বৌদ্ধগ্রন্থ না দেখিয়া বৌদ্ধমত বর্ণন ও খণ্ডন করিয়াছেন। আর আচার্য্যের উপর অশ্রদ্ধা জন্মিলে তদুক্ত উপদেশে কিরূপ শ্রদ্ধা থাকিতে পারে তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। বস্তুতঃ সাহেব পণ্ডিতদ্বয় কি একবার ভাবিলেন না যে, হিন্দুসন্তানই বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, আর হিন্দু আচার্য্যগণই বৌদ্ধধর্ম্মকে প্রকাণ্ড বহু সভায় বহুকাল ধরিয়া পরাজিত করিয়া অবশেষে তাহাকে ভারত হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, আর তাহাদের ভাগ আত্মসাৎ করিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে হিন্দুগণ যে বৌদ্ধমত

বুঝিয়াছেন তাহা কি করিয়া অবৌদ্ধমত হয়? হিন্দুগণ বৌদ্ধমত না বুঝিলে বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন কি করিয়া? বৌদ্ধমত বিতাড়ন করেন কি করিয়া?

যাহাহউক এই ভাবের কিছুদিন পরে, এক সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জাপানী পণ্ডিত ইয়ামাকামী এই সুরটী চরম মাত্রায় তুলিয়া হিন্দুধর্ম্মের আচার্য্যবর্য্য শঙ্করাচার্য্যের উপরে বিশেষ ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন; আর সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুগণও তাহারই তুমুল প্রতিধ্বনি প্রচার করিতে লাগিলেন। এখন অনেকের মুখেই শুনা যায়, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি হিন্দু আচার্য্যগণ বৌদ্ধধর্ম্ম কিছু জানিতেন না, তাঁহারা ভুল বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন, যাহা বৌদ্ধমত নহে তাহাই বৌদ্ধমত বলিয়া তাঁহারা খণ্ডন করিয়াছেন। এই পণ্ডিত ইয়ামাকামী একজন বৌদ্ধমত সম্বন্ধে বিশিষ্ট পণ্ডিত। তিনি Systems of Buddhistic Thought নামক গ্রন্থ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক অবান্তর কথাই জানিতে পারা গিয়াছে। এজন্য বাস্তবিক আমরা অন্তরের সহিত প্রশংসাই করিয়া থাকি। বিশ্ববিদ্যালয়ও ইহা প্রকাশ করিয়া বিদ্যা-বিবৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে পণ্ডিত ইয়ামাকামীর পোক্ত আক্রমণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথার আলোচনা করিব।

পণ্ডিত ইয়ামাকামীর রাগ ভগবান শঙ্করাচার্য্যেরই উপর দেখা যায়, কারণ তিনি অন্য কোন আচার্য্যকেই সেরূপ আক্রমণ করেন নাই। শঙ্করাচার্য্য যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতের সহিত বিচার করেন নাই, কেবল গ্রন্থ মধ্যেই বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন, এবং পক্ষান্তরে শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী মীমাংসাকার কুমারিলভট্ট প্রভৃতিই বৌদ্ধগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছিলেন; এবং শঙ্করের পর ন্যায়াচার্য্য উদয়ন প্রভৃতিই অবশিষ্ঠ বৌদ্ধবিজয় যজ্ঞে সাক্ষাৎভাবে পূর্ণাহুতি দান করিয়াছিলেন; তথাপি পণ্ডিত ইয়ামাকামী উক্ত কুমারিলভট্ট বা উদয়নাচার্য্যের খণ্ডনে উৎসাহিত হন নাই। কুমারিল ও উদয়নের সহিত বৌদ্ধগণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সভা করিয়া বিচারের কথা বৌদ্ধ এবং হিন্দু গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত ইয়ামাকামী তাঁহাদিগকে কেন আক্রমন করিলেন না, তাহা বুঝা যায় না; হয়ত তিনি প্রধান মল্লনিপাত মানসে শঙ্করকে আক্রমণ করাই সমীচীন বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধবিজয়ী কুমারিল্ প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের উদ্ধৃত বৌদ্ধ মতেরই অনুবাদ পুষ্টি ও খণ্ডন করিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে এজন্য পণ্ডিত ইয়ামাকামী কুমারিল, বাচস্পতি, উদয়ন প্রভৃতিকে আক্রমণ করিলেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা অধিক হইত; তবে একটা কথা এই যে, কুমারিলের গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ তেমন সুবিধাকর হয় নাই এবং তাহার প্রচারও হয় নাই। আর উদয়নের গ্রন্থের এখন পর্য্যন্ত অনুবাদই হয় নাই। পক্ষান্তরে শঙ্করের গ্রন্থের অনুবাদ ও প্রচার যথেষ্ট হইয়াছে। অতএব উহাদের খণ্ডনের বিদেশী পণ্ডিতের পক্ষে তেমন সুবিধা হয় নাই। হয়ত ইহাও একটা কারণ হইয়াছে।

যাহাহউক এসব অবান্তর কথা; এখন দেখা যাউক্ পণ্ডিত মহাশয় কি ভাবে আমাদের আচার্য্যগণকে, বিশেষতঃ শঙ্করাচার্য্যকে,আক্রমণ করিতেছেন। পণ্ডিত ইয়ামাকামী তাঁহার Systems of Buddhistic Thought গ্রন্থের ১০২ পৃষ্ঠায় 'The Buddhist schools mentioned in Hindu and Jaina works, এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—In Hindu and Jaina accounts of Budddhist philosophy, we find mention of only *four* schools, viz. (1) The Madhyamikas

or Nihilists, (2) The Yogacharas, or Subjective idealists, (3) The Sautrantikas or representationists and (4) Vaibhashikas or re-representationists...? These four, probably, represented the principal classes of Buddhists who flourished in India at a time when militant Vedantism was hurbing its missiles against the moriband faith of Sugata. The works of the Buddhist, so far as I am aware, know of no such fourfold classification, so that if I depart from it, I shall at least have the satisfaction of erring in good company, if at all it be an error, to analyse Buddhism from the Buddhist point of view. The explanations given of the origin of the names of the four classes of Buddhist philosophers in Hindu works, such as the Sarvadarsana Sangraha and the Brahmavidyabharana are fanciful and incorrect, ignoring as they do the historical sequence of the development of thought.

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জৈন ও হিন্দু আচার্য্যগণ যে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে মাধ্যমিক, যোগাচার,সৌত্রান্তিক ও বৈভাসিক এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা যে কোন বৌদ্ধগ্রন্থে আছে তাহা পণ্ডিত ইয়ামাকামীর বিদিত নাই। সম্ভবতঃ ভারতে বেদান্তিগণের সঙ্গে বৌদ্ধগণের বিবাদকালে এই চারি সম্প্রদায় প্রবল ছিল। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে এবং ব্রহ্মবিদ্যাভরণ গ্রন্থে ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কল্পিত ও ভুল ; অতএব পণ্ডিত ইয়ামাকামী যদি এই বিভাগ অনুসারে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিবরণ প্রদান না করেন তাহা হইলে কোন দোষের হইবে না, ইত্যাদি।

পণ্ডিত মহাশয় এই স্থল হইতেই বলিতে আরম্ভ করিলেন যে হিন্দু পণ্ডিতগণ বৌদ্ধমত অবগত নহেন এবং এই সুর ক্রমে যে কতদূর প্রবল হইতেছে তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, হিন্দুগণ বৌদ্ধ মত না জানিয়া স্বকোপল কল্পিত বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাই বলা যায়।

আমরা দেখিতে পাই যে, খণ্ডনীয় বৌদ্ধমত খণ্ডনের জন্য বৌদ্ধমতের পরিচয় যতটুকু আবশ্যক হিন্দুপণ্ডিতগণ ততটুকুই দিয়াছেন ; ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাহাদের বিভাগ প্রদর্শন করা কিংবা একজনকে বৌদ্ধধর্ম্ম আদ্যোপান্ত শিক্ষা দিবার জন্য, তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থে বৌদ্ধমতের শ্রেণীবিভাগ বা তাহার অনুবাদ করেন নাই ; সুতরাং পণ্ডিত ইয়ামাকামীর যে আক্ষেপ তাহা পরাজিতের আক্ষেপ, তাহা বিতাড়িতের বিষোদ্গার, তাহাতে হিন্দুপণ্ডিতগণের বৌদ্ধমত অনভিজ্ঞতার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে না ; অবশ্য জৈনগণের, পক্ষে (সুখের বিষয় এই যে জৈনগণের বৌদ্ধমতানভিজ্ঞতার পরিচয় দিবার জন্য তিনি আর কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই) ইহার কারণ আর কিছুই নহে—জৈনগ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হয় নাই ; বোধ হয় ইহার কারণ তিনি বলিতেছেন বৌদ্ধ কোন গ্রন্থে এইরূপ বিভাগ নাই। কিন্তু তিনিই পরপৃষ্ঠায় ইহাদের উৎপত্তি কাল সম্বন্ধে বলিতে গিয়া প্রকারান্তরে এই বিভাগ স্বীকার করিতেছেন, যথা—

Thus the Vaibhasikas arose in the third century after Buddha's death ; the Sautrantikas came in the fourth ; the Madhyamika school, as Aryadeva

states, came into existence five hundred years after the Nirvana of Buddha ; and Asangh tha founder of the Yogacharas or the Vignanavadins is at least as late as the third century of the Christian era Although Hindu critics of Buddhism are, in a sense, right in including the Vaibhasikas and the Sautranticas in the category of the Sarvastita vadins on the ground that both schools believe in the reality of the eighteen Dhatus, yet it must be borne in mind that the Sautrantikas never called themselves Sarvastitvavadins, because the authortative works of the latter school were not the same as others. 104 p. p.

অর্থাৎ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বৈভাসিকগণ নির্ব্বাণাব্দের ৩য়, সৌত্রান্তিগণ ৪র্থ, মাধ্যমিকগণ ৫ম, এবং বিজ্ঞানবাদিগণ ৮ম শতাব্দীতে আবির্ভূত ; অবশ্য হিন্দু সমালোচকগণ যে বৈভাসিক ও সৌত্রান্তিকগণকে সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বলিয়াছেন তাহা এক দৃষ্টিতে সঙ্গত, যে হেতু উভয়েই ১৮শ ধাতুর সত্যতায় বিশ্বাসী। কিন্তু সৌত্রান্তিকগণ কখনই নিজেকে সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বলেন নাই ; ইত্যাদি। এই কথায় বুঝা যায় যে, পণ্ডিত মহাশয় দার্শনিক দৃষ্টিতে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মের এই বিভাগ সঙ্গতই বিবেচনা করেন। অথচ তিনি না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না যে, সৌত্রান্তিকগণ নিজেকে সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বলেন না। পণ্ডিত মহাশয়ের—এই কথাটীতে মনে হয় যে হিন্দুগণের বৌদ্ধধর্ম্মানভিজ্ঞতা দেখাইবার জন্য তিনি বিশেষ প্রয়াসী হইয়াছেন।

আচ্ছা, বৌদ্ধধর্ম্মের কোন গ্রন্থে এই বিভাগ না থাকিলেই যে ইহা বৌদ্ধসম্মত নহে, তাহা কি করিয়া বলা যায়? হিন্দুদর্শনশাস্ত্রে উপক্রম উপসংহারাদি ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্য নির্ণায়ক লিঙ্গের বিচারাঙ্গতা এবং কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা কোন গ্রন্থেই দেখা যায় না ; কিন্তু সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া কার্য্য করেন ; অতএব ইহাতে যেমন হিন্দুদার্শনিকগণের বিচারাঙ্গতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা বলা যায় না, এস্থলেও কি তদ্রূপ বলা যায় না? সুতরাং বৈভাসিকাদি বৌদ্ধধর্ম্মের চতুর্ব্বিধ বিভাগ বৌদ্ধ কোন গ্রন্থে না থাকিলেই যে তাহা বৌদ্ধ সম্মত নহে, তাহা বলা সঙ্গত হয় না ; ইহা হিন্দুগণকে নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? অবশ্য বিপক্ষ যে প্রতিপক্ষের নিন্দা করিবেন তাহা স্বাভাবিক।

তাহার পর এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত মহাশয় বলিতেছেন যে, বৌদ্ধগণের এই চতুর্ব্বিধ বিভাগোৎপত্তি সম্বন্ধে মাধবাচার্য্য যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা ভুল, যথা—মাধবাচার্য্য এই সম্বন্ধে বলিতে গিয়া নাগার্জ্জুনের যে "দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগা" প্রভৃতি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা উক্ত চতুর্ব্বিধ সম্প্রদায়োৎপত্তি প্রসঙ্গেই উক্ত হয় নাই, যথা—

But when we come to the real meaning of these lines, we find that they refer not to the four different schools of Buddhism, as Madhavacharya makes out, but to the two sorts of doctrines taught by Buddha viz, the convention (samvriti) and the transcendental' (parmartha) of which we have already spoken in an earlier lecture. 103 p. p. অর্থাৎ উক্ত নাগার্জ্জুনের শ্লোকগুলি সম্বৃতিসত্তা ও পরমার্থ সত্তাসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, চতুর্ব্বিধ বিভাগ সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই, ইত্যাদি।

কিন্তু মাধবাচার্য্য উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

"ন চ বিনেয়াশয়ানুরোধেন উপদেশভেদঃ সাম্প্রদায়িকঃ ন ভবতি ইতি ভনিতব্যম্। যতো ভণিতং বোধিচিত্তবিবরণে—

দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ॥
গম্ভীরা উত্তানভেদেন কচিচ্চোভয় লক্ষণা।
ভিন্না হি দেশনাভিন্না শূন্যতাদ্বয় লক্ষণা॥

এই শ্লোকগুলি হইতে মাধবাচার্য্য প্রমাণ করিয়াছেন যে, বৌদ্ধগণের যে সম্প্রদায় ভেদ, তাহা একই বুদ্ধের উপদেশ হইলেও শিষ্যগণের বুদ্ধিভেদ বশতঃ হইয়াছে। পণ্ডিত অভ্যঙ্কর ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—

"ন চ বিনেয়েতি।" বিনেয়াঃ শিষ্যাঃ। শিষ্যানাং বুদ্ধিতারতম্যেঽপি গুরোঃ উপদেশঃ একরূপঃ এব যুক্তঃ ইত্যাশয়ঃ। "দেশনা "ইতি, উপদেশ ভেদেন হি তত্ত্বভেদো ন শঙ্কনীয়ঃ কিন্তু মার্গভেদঃ। তত্ত্বং তু শূন্যতারূপম্ একমেব হীনমধমোৎকৃষ্টধিয়ো হি শিষ্যাঃ ভবন্তি। তত্র যে হীনমতয়ঃ একপদে শূন্যতাতত্ত্বং জ্ঞাতুম অসমর্থাঃ তে সর্ব্বাস্তিত্ববাদেন তদাশয়ানুরোধাৎ শূন্যতায়াম্ অবতার্য্যন্তে। যে তু প্রকৃষ্টমতয়ঃ তেভ্যঃ সাক্ষাদেব শূন্যতাতত্ত্বং প্রতিপাদ্যতে। দেশনা উপদেশাঃ। সত্ত্বানাং প্রাণিনাম্ আশয়াধীনাঃ তদনুসারিণঃ লোকনাথানাং সন্মার্গ প্রদর্শকানাম্ উপদেশাঃ উপায়ানাং মার্গানাং বহুত্বাৎ ভিদ্যন্তে। দেশনা চ কচিৎ গম্ভীরা গূঢ়ার্থা কচিৎ উত্তানাস্পষ্টার্থা কচিৎ অংশভেদেন উভয়রূপা ইতি ভিন্না ভবতি। অদ্বয়লক্ষণা শূন্যতা তু অভিন্না এব। একরূপং শূন্যতাতত্ত্বং তু ন ভিদ্যতে এব ইত্যর্থঃ।

সুতরাং উক্ত শ্লোকগুলিকে যদি মার্গভেদের হেতু শিষ্যবুদ্ধিভেদ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে কোন দোষই হইতে পারে না। পণ্ডিত মহাশয় যদি উহাদিগকে সম্বৃতি সত্তাবাদ ও পরমার্থসত্তাবাদ রূপ বুদ্ধের দুইটী মতবাদের প্রতি প্রমাণ বলিতে পারেন তবে, মাধবাচার্য্য সৌত্রান্তিক বৈভাসিকাদি রূপ চতুর্ব্বিধ মতবাদের প্রতি প্রমাণ বলিলেও যে কোন দোষ হয়, তাহা বলা যায় না; শিষ্যবুদ্ধিভেদে উপদেশভেদ ইহা উক্ত শ্লোকে উক্তই হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ মাধবাচার্য্য "ন চ বিনেয়াশয়ানুরোধেন উপদেশভেদঃ সাম্প্রদায়িকঃ ন ভবতি ইতি ভণিতব্যম" এই কথা বলায়, উক্ত চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধমতের বিভাগের হেতুরূপে যে উক্ত শ্লোকগুলিকে মাধবাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। তিনি বলিতেছেন, "শিষ্যগণের বুদ্ধি অনুসারে শিষ্যগণ কর্ত্তৃক যে বুদ্ধের উপদেশভেদ, তাহা যে সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ সম্প্রদায়সিদ্ধ অর্থাৎ প্রামাণিক নহে," তাহা বলা উচিত নহে; এইমাত্র মাধবাচার্য্যের এই কথায় যে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—The explanation given of the origin of the names of the four classes of Buddhist philosophers in Hindu books, such as the Sarvadarsanasamgraha and the Brahmavidyabharana, are fanciful and incorrect ইত্যাদি, ইহা তিনি মাধবাচার্য্যের আশয় না বুঝিয়াই বলিয়াছেন। বলিতে হইবে মাধবোদ্ধৃত এই শ্লোকগুলি সৌত্রান্তিকাদি নামোৎপত্তির ব্যাখ্যা করিবার জন্যই নহে, প্রত্যুত মতভেদোৎপত্তির ব্যাখ্যারই জন্য, ইহা পণ্ডিত মহাশয় লক্ষ্য করিলেন না। নামোৎপত্তি ও মতভেদোৎপত্তি ত এক কথা নহে। তাহার পর পণ্ডিত মহাশয় উক্ত চারি সম্প্রদায়ের উৎপত্তিতে

কালগত পারম্পর্য্য দেখাইয়াছেন। যথা—বৈভাসিক ৩য় শতাব্দীতে, সৌত্রান্তিক ৪র্থ শতাব্দীতে ইত্যাদি; আচ্ছা তাহা হইলে কি বলিতে হইবে, উক্ত চারি সম্প্রদায়ের মত বুদ্ধের উক্ত নহে বা বুদ্ধের সম্মত নহে! যদি পণ্ডিত মহাশয়ের প্রদর্শিত কালভেদ উক্ত চারি সম্প্রদায়ের উৎপত্তিরই কালবোধক হয়, তবে কি উক্ত সময়ের পূর্ব্বে উক্ত চতুর্ব্বিধ মত ছিল না বলিতে হইবে? কিন্তু উক্ত চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বুদ্ধের উক্তি অবলম্বনেই নিজ নিজ সম্প্রদায় পুষ্ট করিয়াছেন, ইহাই তাঁহারা বলিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। একথার প্রমাণ উদ্ধৃত করা এস্থলে বাহুল্য মাত্র। অতএব পণ্ডিত মহাশয় সাম্প্রদায়িক দ্বেষমুক্ত হইয়া নিজ বক্তব্য বলিতে পারেন নাই, ইহাই আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়।

পরিশেষে এ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা যাইতে পারে। পণ্ডিত মহাশয় বলিতেছেন—সৌত্রান্তিকগণ নিজেকে কখন সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বলিতেন না। সুতরাং বস্তুতঃ তাহারা সর্ব্বাস্তিত্ববাদী হইলেও তাহাদের উক্ত নামে উল্লেখ করা ভুল হইয়াছে। কিন্তু একথাও নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। কারণ নামকরণের নিয়ম আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্ণাত্মকভাবাত্মক জীবজন্তু ও জড়বস্তুর নামকরণ মনুষ্যেই করিয়া থাকে, বর্ণাত্মক ভাষাভাষী মনুষ্যের নামকরণ তাহারা নিজে এবং তাহাদের প্রতিবেশী প্রভৃতি অপরেও করিয়া থাকে। যেমন "ঘটপট" নাম ঘট পট করে নাই, মনুষ্যেই করিয়াছে। অশ্ব গো নামকরণ মনুষ্যেই করিয়াছে। হিন্দু নাম হিন্দু ও অহিন্দু উভয়েই করিয়াছে; ক্রিশ্চানগণের ঈশাই নাম অপরেই করিয়াছে; ইত্যাদি। অতএব হিন্দুপণ্ডিতগণ সৌত্রান্তিকগণকে তাহাদের মতানুসারে সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বলিলে তাহারাও আপত্তি করিবেন না, অপরেও করিবে না। অতএব স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিত ইয়ামাকামী বৌদ্ধমতনির্ব্বাসনকারী হিন্দুগণের বৌদ্ধধর্ম্মানভিজ্ঞতা প্রমাণের জন্য যে সময়ে সময়ে অসঙ্গত বাক্য বলিয়া ফেলিবেন, তাহা তাঁহার পক্ষে একেবারে অস্বাভাবিক ব্যাপার হইতে পারে না। আর এটা যে পণ্ডিতমহাশয়ের দুরাগ্রহের ফল তাহা তাঁহার কথা হইতেও বুঝা যায়, যথা—What Sankara's sources of information concerning the Sarvastitvavadins were, it is difficult to determine at the present day. Nevertheless it is certain that he could not have consulted their authoritative philosophical works in their original form—105 p. p.

অর্থাৎ শঙ্কর সর্ব্বাস্তিত্ববাদীর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার মূল কি তাহা আজ নির্ণয় করা অতি দুরূহ। তথাপি তিনি যে প্রামাণিক বৌদ্ধদর্শন গ্রন্থের অবিকৃতরূপ দেখিতে পান নাই তাহা নিশ্চিত। আচ্ছা, শঙ্করের বৌদ্ধমতের আকরস্থান যদি নির্ণয়ই হইল না, তবে তিনি অবিকৃত প্রামাণিক বৌদ্ধগ্রন্থ দেখেন নাই, ইহা কি করিয়া বলা যায়? এটা কি দুরাগ্রহ নহে? দুরাগ্রহ ভিন্ন অন্য কোন পণ্ডিত কি একথা বলিতে পারে? দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতেই নিজের কথার প্রতিবাদ! বলা বাহুল্য মাধবাচার্য্য শঙ্করের কথিত বৌদ্ধমতেরই অনুবাদ সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে করিয়াছেন।

সেকাল-একাল

("ও-পারের কথা"র লেখক)

বিধানের বিধি—চাই না যা—পাই তা ; চাই যা—পাই না তা। তবুও মানুষ সুখ, শান্তি ও আনন্দের ভিখারী ভিখারিণী। তা হ'লে চাওয়া রোগ লয়ে মানুষের জন্ম। অভিজ্ঞতার শিক্ষা—সুখ, শান্তি ও আনন্দ চাওত, সুখ, শান্তি ও আনন্দ যত পার দাও। এইগুলা দেবার চেষ্টায় না থেকে শুধু পাবারই সাধ পুষলে 'উলটা বুঝলি রাম' হয়ে দাঁড়ায়। বাসনা—ডাকিনী, ভাবনা—পেত্নী ও ভয়—ভূত মানুষকে যাঁতাপেশা করচে। বাসনার শত মুখ, ভয়ের হাজার মুখ ও ভাবনার দশ হাজার মুখ! তাই মানুষকে শিঁটকে শিঁটকেই দিন কাটাতে হচ্চে! দেহ-অহংবুদ্ধিযুক্ত মনরূপ জীব দেহ-উনানে, হিংসা-ভয়-লোভ-ভাবনা-অনলে ও প্রাণ-হাঁড়িতে বাসনা-জল হ'য়ে হরদম টগ্ বগ্ করে ফুটচে! আবার 'বুক ফাটেত মুখ ফুটে না' এই ভাবে বাষ্পীয় স্নানে (ভেপর বাথে) আধ মরা হ'য়ে রয়েছে! তবুও ঈষৎ হাসি-খুসী, ক্ষণিক রং তামাসা ও নগণ্য লাভ, কোমলও রসালভাবে পা টিপে টিপে বা হামাগুড়ি দিয়ে এসে মানুষের বুকে ও মাথায় জুড়ে বসে। এই নব ছাবগুলার দৌলতে মানুষ তখনকার মত শত শত জ্বালার খেইগুলা হারিয়ে ফেলে! তাই মনে হয়, মানব-জীবন স্মৃতি-ভ্রান্তিযুক্ত নিকৃতি। সাধারণ জীবের এই নিকৃতিটার ভ্রান্তি পাল্লাটাই ঝুঁকে থাকে। তা না হ'য়ে স্মৃতি-পাল্লাটা যদি অষ্ট প্রহর ঝুঁকে থাকতো, তা হ'লে এই ধরাটা বিশাল ভীমরতিশালা হ'য়ে পড়তো। বিরাট রাশ টেনে বিলক্ষণ হুঁসিয়ারিতেই ভবের খেলা সাধচে। তবুও দেখা যায় যে :ছড়্ ছড়ে বা ঝড়্ ঝড়ে শক্তিযানে ছ-দশ বস্তা, বৈভব-মাল স্থিতি করে রাজা-প্রজা, পণ্ডিত-মূর্খ বা মঠধারী-সংসারী, যিনি যা হ'ন না কেন অমনি অল্প বিস্তর ভীমরতিরোগগ্রস্থ হন। এই জন্যই ধরা ভরা রেশারিশি। সেকালে ভারতে এ রোগটা মাঝে মাঝে দেখা দিয়াছিল, একালে কিন্তু কথায় কথায় সভ্য ও শিক্ষিত জাতিদের দৌলতে ধরায় এ রোগটা মৌরশী পাট্টা নিয়েছে! তাই নামে সরসতা, কাজে বেজায় নিরসতা ; নামে সভ্যতা, কাজে বিষম বর্ব্বরতা ও নামে বিচার, কাজে নির্ম্মম ঘাতকতা—এই চিত্রগুলিই জ্বল জ্বল ক'রে ভাসচে। ভারতের আট আনা মাত্রায় তমোগুণ কর্ষিত হবার একালে মহা সুযোগ। ইহার পরিবর্ত্তে ভারত নিঃসন্দেহ লাভ করতে পারে অপর পক্ষের রজো-মিশ্রিত সত্বগুণ। তবে যদি তুমি ভেদবুদ্ধিকে সম্বল ক'রে আসুরিক বৃত্তি ধর— তা হ'লে জগন্মাতার অসিতে তোমার মস্তক কর্ত্তন হবেই হবে। আর তা না হলে অভয়দায়িনী ও বরপ্রদায়িনী মা তোমার—তোমারিত। তাই বলি, ভারত তুমি সেকালে জিতেছ—হেরেছ। একালে কিন্তু তোমার প্রকৃত জয় পরাজয়—তোমার—তোমারই কর্ম্মের উপর নির্ভর কচ্চে।

নরম-গরম, কোমল-কঠিন, সুখ-দুঃখ, সচ্ছন্দতা-অসচ্ছন্দতা প্রভৃতি হাঁ-না (পজেটিভ-নেগেটিভ) লয়ে মানুষকে প্রাকৃতিক বিধানে গুজিয়ে উঠতে হবেই হবে। মানুষের হাল্ ফিল্ অবস্থা সঙ্কোচ।

এই দেহ—অহংবুদ্ধি যুক্ত মন-সোয়ারিকে প্রাণ-মাঝি আর বুদ্ধি-স্মৃতি-ধৃতি দাঁড়িদের দৌলতে বিকাশ-তীর্থের যাত্রী হ'তে হবে। সেকালে উন্মুক্তা বিরাট-প্রকৃতির সঙ্গগুণে, প্রাণ-মাঝি ও বুদ্ধি-স্মৃতি দাঁড়িরা সাধারণতঃ সুস্থ ও সবল হত। তাই সেই ধরণের ধৃতি-দাঁড়ি জোগাড় ক'রতে তখনবেগ পেতে হত না। একালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বা টোলের বা রাজার দেওয়া উপাধিধারীতে ভারত বিছিয়ে পড়লেও, ধৃতি-শক্তিরত কথা নেই, প্রাণ, বুদ্ধি ও স্মৃতি-শক্তি ধাৎ ছাড় ছাড় হ'য়ে দাঁড়িয়েছ! তাই এত বড় ভারতের বিশেষ অভাব দু-চারটে শ্রীশ্রীবিবেকানন্দের ও পাঁচ-দশটা স্যার জগদীশের। আধুনিক যাবতীয় আওতার মধ্যে শিক্ষার আওতাটাই দিন দিন ঘন, ঘনতর ও ঘনতম হ'য়ে প'ড়চে। তাই ভারত লাল চুসি কাঠি লয়ে দিন-রাতগুলোকে গলা টিপে বার ক'রতে আর রাজি নয়। এখনকার স্কুল-স্কুলের এটা একটা বিশেষ কারণ। বাদী—প্রজা, প্রতিবাদী—রাজা। বিচারকও রাজপক্ষ মাত্র।

ভারত! তুমি সেকালে জ্ঞান বিস্তারে কার্পণ্য দেখায়েছিলে বটে, কিন্তু জ্ঞানের নামে গরল পরিবেশন কর নাই। তবুও একালে তোমাকে কর্ম্মফল রেহাই দিল না। তুমি যে হও সে হও না কেন, জেনো ভাই কর্ম্মফল-দণ্ড অলঙ্ঘনীয়!

সেকালে আদর মহা আদর ছিল ধৃতি শক্তির। স্ব স্ব প্রাপ্য ঠিক ক'রে উহা লবই-লব বা পাবই-পাব ইহাই প্রকৃত ধী বা ধারণাশক্তির কর্ম্ম। ধারণাশক্তির প্রভাবে রমণীকুল মাতৃরূপে জীবের স্থিতি কার্য্য সাধনে সক্ষমা। কেবলমাত্র ধী-শক্তিই মানসিক বলের উৎকর্ষতা সাধন করায়ে এ-পার, ও-পারের যাবতীয় কর্ম্মে সাফল্য দেয়। পাশ্চাত্য জগৎ ও জাপান ধৃতি-শক্তির অনুকম্পায় নানা প্রকার গবেষণা ও উদ্‌ভাবনায় সফলকাম হয়েছে। একমাত্র এই শক্তির প্রভাবে পাশ্চাত্য জাতি জড় জগতের আধিপত্য লাভ করেছে।

সংযম অর্থাৎ শান্তং শিবং সুন্দরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং ভাব লয়ে ধী-শক্তিতে স্থিতি হওয়া সেকালের ব্যবস্থা ছিল। এইজন্য উচ্চবর্ণের গায়ত্রীতে "ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ" এই বাক্য-গুলি সন্নিবেশিত। এই জন্যই গায়ত্রীর ধ্যান ধারণা করা, তা আবার প্রত্যহ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ব'লে সেকালে আদিষ্ট ছিল। তবেই তাঁরা উচ্চতম বর্ণভুক্ত হ'তেন। একালে সে কড়া কড়ি নাই, তাই একালে উচ্চতম বর্ণভুক্ত জীব বেজায় সস্তা। কাঁচ ঔজ্জ্বল্য হিসাবে হীরা বা বহুমূল্য, কিন্তু ঔজ্জ্বল্য শুভ্রতায় বেজায় সস্তা। মস্তিষ্ক-বিকাশ ও হৃদয়-বিস্তার জীবের ঔজ্জ্বল্য। সংযম, অকপটতা, সৎসাহস ও নিরলসতা প্রভৃতি বিকাশের লক্ষণ। বাক্য, কার্য্য ও চিন্তায় কাপট্য, দাম্ভিকতা ও পাশবাচার সংকোচের লক্ষণ। মহাত্মা গান্ধিজী একালে বিকাশের অবতার। অপর পক্ষ সংকোচের প্রতিমূর্ত্তি। একপক্ষ সত্ত্ব রজোর প্রশান্তমূর্ত্তি। অপর পক্ষ—রজো তমোর প্রচণ্ড মূর্ত্তি। বিকাশ ও সংকোচ উন্নতির ও অবনতির অতীব সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড। মহাত্মাজীর সম্বন্ধ সূক্ষ্মতম রাজ্যের সহিত বার আনা ও ইহ জগতের সহিত মাত্র চার আনা। অপর পক্ষ কেবল মাত্র ইহ জগতের চিন্তায় ভরপুর। সুতরাং মহাত্মাজী একালের একজন সেজে থাকলেও বাস্তবিক তিনি সেকালের একজন। ভারত তুমি ধন্য! তোমারই একজন কেবলমাত্র ভারতের নয় সমগ্র মানবজাতির পাশবাচার ও বর্ব্বরতা অকাতরে বহন করতে উদীয়মান। তবুও তাঁকে চিনলে না বা চিনতে চেষ্টাও কর না!

জীবের সবল চিন্তাকুলতা। সুতরাং তাদের অভাব চিন্তাশীলতা। চিন্তাকুলতা কার্য্যকারিতা

শক্তির অপব্যয় করায়, কিন্তু চিন্তাশীলতা এই শক্তি সংযতভাবে বৃদ্ধি করায়। স্থূল দেহ ও অহং বুদ্ধির ভোজ্য-সেব্য চিন্তাকুলতা। চিন্তাশীলতা কিন্তু জীবের সূক্ষ্ম দেহ গঠিত ক'রে সূক্ষ্মরাজ্যের সহিত সম্বন্ধ করায়। সুতরাং চিন্তাকুলতা সংকোচের ও চিন্তাশীলতা বিকাশের পন্থা। এ কালের শিক্ষার আয়োজন স্থূল বুদ্ধি ও স্মৃতি পর্য্যন্ত, কোন কোন স্থলে অসংযত ধৃতি পর্য্যন্ত। সে কালের শিক্ষার আয়োজন ছিল সংযত বুদ্ধি, স্মৃতি ও ধৃতি। একালের শিক্ষা—চিন্তাকুলতা, সেকালের শিক্ষা চিন্তাশীলতা। সুতরাং ভারতের সেকালের ও একালের কত পার্থক্য! ভারতের আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার মোহান্ধ গুরুকুল! তুমি যে হও সে হও না কেন, কর্ম্মফল হ'তে অব্যাহতি পাওয়া তোমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব।

ঝুটো, বেজায় ঝুটো একালের কাষ কারবার। জাত্যাভিমানে ঝুটো, শিক্ষায় ঝুটো, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সাধনে ঝুটো, আচার ব্যবহারে ঝুটো, ঘরে বাহিরে ঝুটো ও এমন কি আহার্য্যেও ঝুটো। গুরুচরণের উপর বিষ ফোড়া রক্ষককুলও কম ঝুটো নন। সেকালের ভারত একটু আধটু গলদ ক'রলেও এতটা ঝুটো ছিল না। তাই জাহাজ জাহাজ ঝুটো আমদানি হ'তে পারে নাই। একালে কিন্তু ঝুটো মুক্তা ও ঝুটো হীরার মত, ঝুটো গুরু, ঝুটো শিক্ষক ও ঝুটো লেখক দেখা দিয়ে ঝুটো গিরির মাত্রা এমন বেড়ে উঠচে যে 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা' না বলায়ে ছাড়বে না দেখছি! ব'লতে কি জনে জনে ঝুটোমি করে ঝুটোদের হরদম খোরাক যোগাচ্চে! তাই ঝুটোর দল ধাৎ ছাড়া হ'য়েও হচ্চে না। ভুত-প্রেত দৈত্য-দানবদের খেয়াল ঘুচতেই হবে যদি জনে জনে খেয়ালদারি না হয়ে সাম্‌লে সামলে চ'লতে অভ্যাস করে। চাই উদ্যমশীলতার ও চিন্তাশীলতার সঙ্গে বাক্যও কার্য্যে সংযম। মরাল হ'য়ে পাঁক ঘেটে ঘেটে ও ক্যাঁক-ক্যাঁকানী বুলি সেধে শ্রীশ্রীবীণাপানীর বীণা হবার সাধ পুষা কিংবা পেচক সেজে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন ক'রে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণীর: শ্রীচুপড়ি হবার আশা করা—মিথ্যা, মিথ্যা বেজায় মিথ্যা। (হিন্দুদের প্রধান প্রধান মূর্ত্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করবার সুযোগ ও অবকাশ পেলেই তা করা হবে।)

বাংলা দেশের ঘরে ঘরে বৎসরে অন্ততঃ চার দফা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবী পূজিতা হন। অটুটভাবে ঠাকুরাণীর প্রসাদ পাবার মানসে যাঁর যেমন সাধ্য ও অতি সন্তর্পণে এই কর্ম্ম পূজারীকুল দ্বারা সাধিত হয়। অন্যান্য পূজা কিন্তু (৺ সত্যনারায়ন বাদে) বৎসরে একবার মাত্র সাধন করে গৃহস্থ প্রাণ-মনের সঙ্গে স্ব স্ব অস্থি মজ্জাগুলাও জুড়ান্। এত করেও লক্ষ্মী দেবী গৃহস্থের সঙ্গে অধিকাংশ পূজারী-কুলের প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত ক'রতে বিষম নারাজ! কিন্তু তাঁর খোস নজর অযাচিতভাবে প'ড়চে জাপানে, মার্কিন দেশে, ইংলণ্ডে ও এমন কি নগণ্য হলাণ্ডে। ছি ছি দেবি! তুমি নাসিকা কর্ণ সংযুক্তা হ'য়েও বস্তুতঃ নাক কাণ কাটা। শুধু তাই নয় তোমার আকর্ণ বিস্তৃত আঁখিদ্বয় থাকতেও তোমার এক চোখমীতে বা বেইমানিগিরিতে তুমি বাস্তবিক অপরাজিতা। তুমি আহূতা ও পূজিতা হও বাংলা দেশের উচ্চতমবর্ণের দ্বারা, আর তুমি উদর পূর্ত্তি কর এই দেশের উপাদেয় সামগ্রীতে—তা আবার অতীব সম্ভ্রমে ও সোহাগে। কিন্তু তোমার অকপট অনুগ্রহ তাদেরই প্রতি যারা তোমার অর্চ্চনা বন্দনার ধার ধারে না!

বাংলাদেশের গৃহিণীকুল স্ব স্ব সংস্কার ও শিক্ষানুযায়ী অতীব ভক্তিসহকারে আয়োজন ক'রলেও বা দেবীর আগমন-সূচক আলপনা দিলেও, তিনি প্রকৃত আদৃতা ও অর্চ্চিতা হন কি-না এই বিষয়

আলোচ্য। এই ভাবে বাংলার হিন্দুদের কা কথা সমগ্র ভারতের পূজা-শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় ধর্ম্ম বিকৃত কর্ম্মের সামিল হচ্চে না কি?

ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আদর, ভালবাসা প্রভৃতি প্রত্যেকটাই আকর্ষণী-শক্তি। যাঁর যে মাত্রায় যে কোনও গুণের প্রভাব থাকে তিনি সে মাত্রায় আকর্ষণ ক'রতে সক্ষম হন। সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিন গুণের মধ্যে রজোগুণ মধ্যস্থিত। রজোগুণ সত্ত্বগুণের সহিত মিলিত হ'লে কোমলতায় ও সংযমের কর্ম্ম সাধন করায়। রজোগুণ তমোগুণের সহিত মিলিত হয়ে পাশবাচারে বা স্বার্থপরতায় বা দাম্ভিকতায় আবদ্ধ করায়। কোন আদর্শ মানব-মানবীর বা দেব-দেবীর বা জাগতিক যাহা কিছুর গুণের বা শক্তির (অর্থাৎ মূর্ত্তির নয়) আদর করাই তাঁকে ভক্তি, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করা বা ভালবাসা। বাংলা দেশ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। জাপান বৈভবকে আদর করে অর্থাৎ ভালবাসে। ভক্তি শ্রদ্ধা করা অর্থাৎ ভয়যুক্ত আদর করা বা ভালবাসা। বাটীর ভৃত্যগণ গৃহস্বামী-স্বামিনীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে অর্থাৎ ভয়যুক্ত ভালবাসে। সুতরাং যথাসম্ভব নিকটে থেকেও দূরে দূরে থাকে। বাটীর পুত্র-কন্যাগণ গৃহস্বামী-স্বামিনীকে ভালবাসে অর্থাৎ দূরে দূরে থাকলেও কাছে কাছে থাকে। যে জন আপন-বড় আপন জেনে কাছে থাকে ও সন্তানের মত তাঁদের সেবায় তৎপর-তৎপরা সে লোক কর্ত্তা-গৃহিণীর প্রসাদ পায় না কি? মহাশক্তি, মহালক্ষ্মী ও মহা আনন্দ তোমার—তোমারই প্রকৃত মা-বাবা নন কি? আপনার মা-বাবাকে প্রাণহীন ঝুটো ভাড়া করা পুজারী দ্বারা পুজার-ব্যবস্থা করা প্রাণহীন যজ্ঞের সামিল নয় কি? ঠাকুর, দেবতা, ঈশ্বর, ভগবান প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করা ক্ষুদ কুঁড়া বা মুষ্টি-ভিক্ষা পাবার ব্যবস্থা নয় কি? আপন মা-বাবাকে ঠাকুর, দেবতা, ঈশ্বর বা ভগবান বলা দাস-দাসীর কর্ত্তা-বাবু গিন্নী-মা বলাতে প্রভেদ কি? পুত্র কন্যার ও দাস-দাসীর আহারের শয়নের ও পরিধানের ব্যবস্থায় বিশেষ পার্থক্য থাকে। পুত্র কন্যা দশটা অপরাধ করলে কেবলমাত্র দাস-দাসী দুইটা শাসিত-শাসিতা অপরাধে দোষী-দোষিনী হ'লে স্থান চ্যুত-চ্যুতা হয়। দ্বিতীয় পক্ষকে বিদূরিত-বিদূরিতা ক'রতে বার-তিথি-ক্ষণ উপেক্ষিত হয়। বিধি বিধানের বাঁধা-বাঁধি সংকোচ—বিষম সংকোচের হেতু! মা-বাবা বা স্বামী বা সখার সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপন ক'রতে হ'লে যাবতীয় সংকোচ-ব্যবধানগুলাকে মল-মূত্র হিসারে বর্জ্জন করাই প্রকৃত প্রীতির বা প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপন করা। তমোগুণের কর্ম্ম পাঁজি পুঁথির বাঁধা-বাঁধি মেনে চলা। পাজি অহং ও দেহবুদ্ধিযুক্ত মনই যত বাঁধাবাঁধি গণ্ডির মধ্যে থাকতে বিশেষ প্রয়াসী। প্রাণে-মনে খটকা জাগালেই খটকার ছোট বড় ঘাগুলো খেতে হবেই হবে। সেকালের খটকাগুলাকে আঁটি বা তড়পা ক'রে একালে জঞ্জাল বৃদ্ধি করবার আবশ্যক হয় নাই, কারণ ঝুটো বেজায় ঝুটোর প্রভাবে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে কতকটা থাপার মাঠ হয়ে পড়েছে! আবশ্যক—বিশেষ আবশ্যক হয়েছে তমোগুণের প্রভাব ক্রমশঃ হটায়ে রজোগুণের মাত্রাটাকে বৃদ্ধি করা। চাই কম কথা, বেশী কাজ। চাই ছোট বড় যার যা কাজ বিধি বেঁধে ও প্রাণ মন ঢেলে সাধা। চাই স্থাবর অস্থাবর যা কিছু ভাল-খুব ভাল অবস্থায় রাখা। চাই জানা ছোট বড় করণীয় সব কাজই সেই মহাশক্তি, মহালক্ষ্মী ও মহাআনন্দের, সুতরাং এই সামান্য কাজ ঠিকঠাক না সাধতে পারলে বড় কাজ বা বড় পদ পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এই ভাবেই মহাশক্তির ও মহালক্ষ্মীর প্রকৃত পূজা সাধিত হয়। মানুষের উঁহুগুলাই অগুণের রাজা। উঁহু অর্থাৎ 'পারব কি' 'হবে কি'—এই সব কথা ও ধারণা। কলসী শত ছিদ্রযুক্ত হলেও কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধাই সেই কলসী

যমুনার বারিতে পূর্ণ করে আনতে সক্ষমা হয়েছিলেন! সাধারণ জীবের দেহ সম্বন্ধ হিসাবে কম টান বা বেশী টান্ হয়। শ্রীমতীর সংস্কারবশতঃ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে শ্রীকৃষ্ণ দেহধারী হলেও পূর্ণময়। পূর্ণময় সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত। সুতরাং কলসী ও শ্রীমতী উভয়েই পূর্ণ। এবম্প্রকার ধারণা অন্ততঃ তৎকালীন ছিল ব'লেই শ্রীমতী এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হ'তে পেরেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীজীরও শ্রীমতী রাধার ধারণায় সাদৃশ্য থাকায় মনে হয় তাঁর তিরোধান হ'লেও অল্পকাল মধ্যে তাঁর ধারণা ফলবতী হবে। মহাত্মাজীর সংযম মন্ত্রে—তা কিন্তু বাক্যে, কার্য্যে ও চিন্তায় অন্ততঃ চার আনা মাত্রায় ভারতবাসী-বাসিনী দীক্ষিত হলে ভারতের এ কূলের ও ওকূলের সুদিন আসা নিতান্ত সম্ভব। সংযম—প্রকৃত সংযম দেহ ও অহংবুদ্ধির প্রবল রাহু। মহাত্মাজীর সংযম অভ্যাস করাই তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধার ডালি বা নৈবিদ্য অর্পণ করা।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণী লীলাময়ী। প্রবেশ করেন অলক্ষ্মীর ধূলা-ঝুল ঝাড়তে ঝাড়তে। কিন্তু প্রস্থান কালীন নিজের পদচিহ্ন মুছতে মুছতে গোল বাঁধায়ে যান। তিনি সে মাত্রায় একজনকে বা এক জাতিকে 'বড়' করেন, সে মাত্রায় নির্ম্মমভাবে সেই ব্যক্তি বা জাতিকে 'ছোট' করতে কুণ্ঠিতা হন না। তাঁর চক্ষে পাশবাচার ও বর্ব্বরতা নিতান্ত হেয়। সুতরাং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর বরপুত্রগণেরাও কর্ম্মফল বিধানে আবার পেচকশ্রেণীভুক্ত হবে, তাতে সন্দেহ কি!

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী সর্ব্বসাধারনের আগ্রহ ও আলোচনা সাপেক্ষ]

বিশ্ববিদ্যালয়সংস্কার-সমিতি ঃ—সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তরিক অবস্থার সংস্কার-কল্পে সংগঠিত এক কমিটী বা সমিতির কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমিতি বিগত ১৯২৮ সনের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বা সাধারণ সভা দ্বারা নিয়োজিত হয়। বর্ত্তমান ১৯৩০ সনের ৩১শে মে তারিখে গভর্ণমেণ্টের সহিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে যুক্তি বা বন্দোবস্ত আছে তাহার সময় অতিক্রান্ত হইবে; এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহার ভিতরকার অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিয়া ও বুঝাইয়া দিতে হইবে, যাহাতে সরকারের তুষ্টি সম্পাদন করিয়া, ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতে পারে। এজন্তেই এই কমিটীর সৃষ্টি হয়। কমিটীকে বর্ত্তমান অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-দান, পরিচালনা ব্যবস্থা প্রভৃতি সাধারণ বিষয় এবং বিশেষ করিয়া, ভবিষ্যতে পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের উচ্চ শিক্ষার বিভাগে কিরূপ উন্নতি হইতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অপর বিদ্যালয় (কলেজ) সমূহের সাধারণ কার্য্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, এসকল সম্পর্কে আ।থক:সমস্যার বিষয় তদন্ত করিয়া, অভিমত দিবার কথা ছিল, যেন চিরতরে ('permanently') ইহার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দক্ষতা (most efficient,) ও আর্থিক সম্পদে বলীয়ান্ ভাবে চলিতে পারে। তদন্তের লক্ষ্য ছিল—(১) বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষাদান ও অনুবেশনের (research) ব্যবস্থা আছে, তাহার প্রধান প্রধান বিষয়ের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত শিক্ষার দৃষ্টিতে যাহা যাহা আবশ্যক, তাহার নির্ণয় করা; (২) বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে যে শক্তি, সামর্থ্য ও কার্য্যপদ্ধতি রহিয়াছে, তাহাদিগকে আরও অধিকতর কার্য্যকরী করিবার জন্য ও আর্থিক দৃষ্টিতে তাহাদের আরও সম্বদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্য্য পরিচালনা ও শিক্ষা বিভাগে কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা দেখা; (৩) আর্থিক স্থিতি ও পরিচালনার সৌকার্য্যার্থে কার্য্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সুব্যবস্থার একটী প্রণালী প্রস্তুত করা; এবং (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাদানবিভাগ ও অনুবেশনবিভাগকে আরও স্থায়ী ও সন্তোষজনক অবস্থাতে আনয়ন করিতে হইলে, ইহার আর্থিক অবস্থা কিরূপ হওয়া আবশ্যক যথাসম্ভব তাহার একটা নির্ভুল বরাদ্দ ঠিক করিয়া দেওয়া, যেন সিনেট এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট আপন আর্থিক অবস্থার বিবরণী পেশ করিতে পারেন।

মোটের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক অবস্থা ও উপস্থিত কার্য্যবিধির সঙ্গতি দেখাইয়া রাজসরকারের আনুকূল্য লাভই এই কমিটীর উদ্দেশ্য। কমিটীর কার্য্যক্রম সমুদয়ই ঐ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়াছে; উপস্থিত এই রিপোর্ট যাঁহারা পাঠ করিবেন, তাহারা বিশেষ ভাবে তাহা:বুঝিতে পারিবেন। দেশের শিক্ষা-সমস্যা যে কত গুরুতর বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে:চাহেন না। অতি

বড় এক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া এদেশের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী, ততোধিক দেশের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে পরিপুষ্ট হইয়া, বর্ত্তমান যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-সংস্থা সমূহের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের সংরক্ষণের নিমিত্তই ইঁহারা ব্যস্ত, প্রকৃত সংস্কারের নিমিত্ত ইঁহাদের মাথা ঘামায় না। তাহা হইলে ইঁহাদের নিজেদের অস্তিত্ব থাকে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-কল্পে এই অল্পকালের মধ্যে যে উদ্যোগ ও অর্থব্যয় হইয়াছে, পৃথিবীর আর কোনও শিক্ষা-সংসদে তাহা কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ। বিশ্ব-বিশ্রুত শেড্‌লার কমিশন কলিকাতাকে অবলম্বন করিয়া আসমুদ্র হিমাচল আলোড়ন করিয়া আসিল; কিন্তু বহু লক্ষ টাকার সেই পর্ব্বত-প্রমাণ আয়োজনে মূষিক-পরিমাণ ফলও প্রসূত হয় নাই। ক্রমে ঐ কমিশন অতীতের কাহিনী বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। তারপরে 'গভর্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট্ কমিটী', "পোষ্ট গ্রাডুয়েট্ রি-অরগেনি-জেসন্ কমিটী' প্রভৃতি আরও অনুসন্ধানের বহরা চলিয়াছে। এ সকল অনুসন্ধানের বা শুভ ইচ্ছার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতর বিশেষ কিছুই হয় নাই—যদি কিছু হইয়া থাকে তবে তাহা দেশের স্বাভাবিক অবস্থার আবশ্যকতার দাবীতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর ত্রুটীর দৃষ্টিতে,—যেমন, উপস্থিত এই শিক্ষার প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা বাড়িয়াছে, শিক্ষিতের চরিত্রে দিন দিন তরলতা ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইতেছে, বেকার-সমস্যা দেশে বিকট আকার ধারণ করিয়াছে। এ সকল বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণের দৃষ্টি নাই; পক্ষান্তরে "As a result of the experience of the past few years and in view of the need for determining the financial situation in the future, it was felt that an investigation into the academic and financial position of the University would be of value."—এজন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিনেট' সভা 'সিণ্ডিকেটের' অনুরোধক্রমে 'Reorganisation Committee'র পরে পুনঃ আবার এই "Organisation Committee'র নিয়োগ করিয়াছিলেন!

মোট কথা শিক্ষা-সংস্থা, রাষ্ট্রসংস্থা, শাসন বা বিচার এবং সমাজসংস্থা ইহাদের কোনওটীই এক্ষণে মৌলিক উদ্দেশ্যের বা আদর্শের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না। ইহাদের নিজ নিজ সত্তা রক্ষা করিবার জন্যই সংগঠক, পুনর্গঠক বা সংস্কারকগণ ব্যস্ত। আন্তরিক দোষ গুণের বিচার বড় হয় না। অনেক পূতিগন্ধময় দোষিত ক্ষতে প্রলেপ দেওয়া হয় মাত্র। আজ এদেশের শিক্ষা-সংস্কার সমস্যায় যে যে কথা মনে আইসে, তাহার মধ্যে উচ্চ শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতা অথচ বিপুল ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অপ্রাচুর্য্যের বিষয় এবং সর্ব্বোপরি এ সকল শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পরস্পরের মধ্যে অসঙ্গতিই প্রধান। দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় অক্ষর পরিচয়ের ব্যবস্থা হয় না; মাধ্যমিক শিক্ষাতে দেশের প্রকৃতি ও শিক্ষার্থীর জীবনের আবশ্যকতার প্রতি দৃষ্টি নাই; অথচ উচ্চ শিক্ষার 'পোষ্ট গ্রেডুয়েট্' ক্ষেত্রে বি-এল ও এম-এ, এম-এস-সির জন্য বিপুল আয়োজন; ও তাহাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত হয়! আলোচ্য রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে—'Almost all who gave evidence testified to the fact that the majority of students, when they come up to the M.A , or M.Sc., classes from the Colleges, had not had the training necessary for profitably undertaking Post-Graduate 'studies without further preparation.—অর্থাৎ বি-এ, বি-এস-সি পর্য্যন্ত পড়িয়া কেহ এমন বিদ্যা লইয়া আইসে না যে পোষ্ট-গ্রেডুয়েটের এম-এ, এম-এস-সির

পাঠ সম্যকরূপে অবধারণ করিতে পারে ; এজন্য তাহাদিগের জন্য পোষ্ট গ্রেডুয়েট্ ক্লাশে সুদীর্ঘকাল পুনঃ অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। খ্যাতনামা অধ্যাপক সার সি. ভি. রমনের নামের দোহাই দিয়া রিপোর্ট বলিতেছে—"Four years' Post-Intermediate effective teaching is absolutely essential for practically all students." তাৎপর্য্য গ্রেডুয়েট্ হওয়ার পরও চারি বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষক বা অধ্যাপকের শিক্ষায় শিক্ষালাভ করিলে পর কেহ প্রকৃত পক্ষে অনুবেশন বা research করিবার অধিকারী হইতে পারে অধ্যাপক রমনের ভাষায়, "The two year's M. Sc,. course is necesearily one in which the students must be given a thorough grounding in the fundamentals of this subject. As a rule only after this are they fitted to take up research and not before." এ সমুদয়ই হয়ত ঠিক্। কিন্তু এজন্য গুণাগুণ শক্তি-অশক্তির বিচার না করিয়া দলে দলে ছাত্রগণকে পোষ্ট গ্রেডুয়েট্ পর্য্যন্ত টানিয়া আনিবার প্রয়োজন কি ? ঐ শিক্ষা কি কেবলই প্রকৃত মেধাবী ছাত্রগণকে লইয়া অনুবেশন বা research দ্বারা হইতে পারে না ? কিন্তু তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিপুল আয়তন পোষণ হয় কি করিয়া ?

এতদ্ প্রসঙ্গে "ভারতীয় সাধনা মূলক শিক্ষা পরিষদের" বিগত ফাল্গুণের সংখ্যায় সঙ্কলিত বিবরণের এক অংশ উল্লেখ যোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে—"অতি প্রাচীন কাল হইতে এই সাধনার মূলে সমুদয় ভারত ব্যাপিয়া অতি বিস্তৃত ভাবে সুসৃঙ্খল শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তাহাই এক্ষণে ইষ্ট কোম্পানীর শিক্ষা বিষয়ক 'ডেস্‌পাম' সমূহে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র সকলের ভাগ্য উন্মুক্ত থাকিলে, অধিকারী অনধিকারী নির্ব্বিশেষে উচ্চ শিক্ষা সম্পূর্ণরূপেই গবেষণা বা Research দ্বারা হওয়া কর্ত্তব্য। লোক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষাগন ইহাতে নিয়োজিত থাকিবেন। "প্রাথমিক শিক্ষা সর্ব্বসাধারণ বালক ও বলিকাগণে জন্য সার্ব্বজনীন করিতে হইবে.........এবং অধিকাংশ লোকই যাহাতে এই শিক্ষা কালের অন্তে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে দক্ষতা ও আর্থিক সম্পদ্ লাভের বিশেষ যোগ্যতা লইয়া বাহির হইয়া সংসার ও সমাজের কাজ আসিতে পারেন, তাহা প্রধাণতঃ দেখিত হইবে।" ভারতের সাধনা পৃষ্ঠা ৩০৫-৬

প্রেরিত পত্র

(১) সকলেই নিজের চিন্তাগুলিকে ভাষায় প্রকাশ করিতে চাহে ; যদিও উহা দুঃসাহস ব্যসন বলিয়া সংশয়ের চকিত বিদ্যুল্লেলা মনের মধ্যে খেলিয়া গিয়াছে তবুও নিজের চিন্তাগুলিকে ভাষায় প্রকাশের চেষ্টা মাঝে মাঝে করিয়া আসিয়াছি। বহুদিন পূর্ব্বে "মহাভারতে অনুশীলন তত্ত্ব" নামে একখানি পুস্তিকা ছাপাইয়া ছিলাম প্রকাশক না জোটায় বন্ধুদের উপহার দিয়া নিঃশেষ করিয়াছি। আজ যখন "চোখের বালিতে" অনেকের চোখ কর্ কর্ করে, "চরিত্রহীন" চরিত্রহীনতার প্রেরণা দেয়, "শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী অনেককে ভবঘুরে করিয়া তোলে, "নৌকাডুবিতে" অনেকের নৌকা খানচাল হয়, "গৃহদাহে" অনেকের গৃহ দাউ দাউ করিয়া জ্বলে, "ঘরে বাইরে" ঘরে বাইরে দাবানলের জন্ম দেয়, তখন

"মহাভারতে অনুশীলন তত্ত্ব" পড়িবার লোক পাওয়াত সম্ভবপর নয়; যে সব বন্ধুদের বইখানি দিয়াছিলাম, তাঁহারা পড়িয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কেহ কেহ "বেশ ভাল" বলিয়াছিলেন, চারিদিকেই "হৃদয় মুখেতে দুঁহু সমতুলের" অত্যন্তাভাব লক্ষ্য করিয়া মনে হইয়াছিল বন্ধুদের ঐ "বেশ ভাল"র মনের সঙ্গে সম্পর্কটা পাশ্চাত্যদের ভাড়াটিয়া শোককারীদের আচরণের সঙ্গে মনের সম্পর্কের মতই নিবিড়।—স. মা।

(২) আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে ২।৪ জন সহর বাসিণী শিক্ষিতা হইলেও অধিকাংশ নারীই অশিক্ষিতা ও অজ্ঞা। একটা মাসিক পত্র থাকিলেও তাহাদের শিক্ষা দিতে শিক্ষিতা নারী সমাজকে ও অনুরোধ করা চলে তারা যদি কিছু কিছু লিখিয়া শিক্ষা প্রদান করেন। কারণ নারীর সুখ দুঃখ নারীর অভাব বেদনা নারী যত বুঝিবেন পুরুষে তাহা বুঝিবেন না। পুরুষরা চাহেন পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের নারীদিগকে গঠিত করিয়া তুলিতে। কতকটা হইয়াছেও তাহাই কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের ঘরে ইংরাজী সমাজের রীতিনীতি শিক্ষা শোভনীয় হইবে না, পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাতে আমাদের নারী সমাজ আরও অবনত হইয়া পড়িতেছে ও পড়িবে।

কতকগুলি মহানুভব পুরুষ নারীর অস্তিত্ব স্বীকার সৎ-শিক্ষা ধর্ম্ম শিক্ষা এবং কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ পুরুষই রাজী নন; তারা নারীকে পায়ের তলায় দাবাইয়া রাখিতেই চাহেন, নারীকে মনুষ্য মধ্যেই গণ্য করেন না। যাহা হ'ক সে সম্বন্ধে আমাদের আলোচনীয় নহে। আমরা নারীকে পূর্ব্ব যুগের আর্য্য নারীদের মত শিক্ষা দিতে, এবং নারীদের অন্তরে মনুষ্য শক্তি জাগ্রত করিয়া তুলিতে—তাহারা যেন বোঝে কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার। এবং সৎসাহস সৎচিন্তা, স্বধর্ম্ম আলোচনা, স্বধর্ম্ম পালন করিয়া স্বকর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে। যে নারীগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহাদের নিবেদন, তাঁরা এই অজ্ঞদের চোখের আবরণ খুলিয়া দিয়া হাত ধরিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া লউন।

বহুদিন গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ থাকিয়া অধিকাংশ নারীরই হাত, পা, মন, সব বদ্ধ হইয়া গিয়াছে; মনে ইচ্ছা থাকিলেও অগ্রসর হইতে সাহস করে না। যেমন পিঞ্জরের পাখীকে ছাড়িয়া দিলেও সে উড়িতে পারে না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, অন্যান্য পাখীরা এসে ঠোকর মারিয়া মেরে ফেলে। আমাদের বেশীর ভাগ নারীদিগের সেই দুর্দ্দশা, সাহস করিয়া ঘরের বাহির হইলেও সুপথ, কুপথ বাছিয়া লইতে পারে না, কুপথে গিয়া পড়িয়া মান ও প্রাণ হারায়। সুতরাং প্রথমেই আত্মবল ও আত্ম রক্ষার দরকার।—সু. বা. দেবী ও শকুন্তলা বসু, তপনীকা সমিতি ও শিক্ষা মন্দির।

———

মাস-পঞ্জি—বৈশাখ ১৩৩৭

১লা বৈশাখ হইতে।—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়া ছয় মাস কারাবাসে দণ্ডিত হন—বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস নেতাগণ ধৃত ও দণ্ডিত হইতে থাকেন—অকস্মাৎ চট্টগ্রাম সহরে এক গোলযোগ ঘটে: অনুমান একশত লোক সেনাবাস ও পুলিসের অস্ত্র-খানা আক্রমণ করে ও বিনষ্ট করিয়া দেয়। ইহারা টেলিফোন অগ্নিসাৎ ও দূরের রেল পথও ভগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই আক্রমণের ফলে একজন সার্জ্জেন্ট-মেজর, একজন এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান, ও চারিজন ভারতীয় সেনার প্রাণনাশ হইয়াছিল।—দেশে লবণ-আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে বিদেশীয় বস্ত্র ও মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের আন্দোলন বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে—বড় লাটের আদেশে বঙ্গদেশে অর্ডিনেন্স জারি হইল—ইতিপূর্ব্বে "বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল-ল-এমেণ্ডমেন্ট একট" নামে যে সকল কঠোর আইনের বিধি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তন করা হইল —কাঞ্চনজঙ্গা আরোহণ-কারীর দল জন্‌গ্রী গিরি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন—স্যার কুরমা রেডি ভারত গভর্ণমেণ্টের এজেণ্টরূপে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিলেন—পেশোয়ারে ভীষণ দাঙ্গা হয়, পুলিশের গুলি চলে, অনেক লোক হত ও আহত হওয়ার সংবাদ আসিয়াছে—ভারতীয় রাষ্ট্র-পরিষদের অধিনায়ক মাননীয় মিঃ জেঃ পেটেল পদত্যাগ করিলেন; পদত্যাগ দান কালে তিনি যে বিবৃতি করিয়াছেন তাহাতে চারি বৎসর কাল তিনি যে বাধা বিঘ্ন ও কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—মহাত্মা গান্ধীর প্রধান পার্শ্বচর মহাদেব দিশাই গ্রেপ্তার হন—ভারতীয় সংবাদ পত্রিকার শাসনকল্পে বড়লাট এক অর্ডিন্যান্স আইন পাশ করিলেন—কারাবাসী বন্দী শ্রীযুক্ত জে. এম. সেন গুপ্ত ৫ম বার কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হইলেন—গোয়ালন্দ জগন্নাথ গঞ্জ পথে কগুব নামক ষ্টিমার খানি জলমগ্ন হওয়াতে প্রায় ৩০০ শত যাত্রীর প্রাণনাশ ঘটিয়াছে—প্রেস অর্ডিনেন্সের প্রভাবে ভারতীয় লোকের পরিচালিত অনেক স্থানের বহু সংবাদ পত্র প্রকাশ বন্ধ হইয়াছে—ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় বিলাতের রাজনীতিতে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে বলিয়া সংবাদ প্রকাশ—প্যারিস সহরে 'মে ডে" উপলক্ষে প্রায় ৮০০ শত কমিউনিষ্ট বা জনসাম্যবাদী গ্রেপ্তার হইয়াছে—কেইরো সহরের নিকট একটী প্রাচীন কবর হইতে ৮০টী মামী জড়িত মৃত দেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে—মনোমোহন সিং নামে এক জন ভারতীয় যুবক বায়ু পথে ইউরোপ হইতে ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—পেগু সহরে এক ভূমিকম্পের ফলে প্রায় পাঁচ শত লোকের প্রাণ হানি ঘটিয়াছে—মহাত্মা গান্ধী বড়লাট সমীপে দ্বিতীয় পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, ভারত সরকার এদেশ হইতে লবণ আইন তুলিয়া দিন, নচেৎ তিনি লবণ গোলা অধিকার করিবেন। সরকার যেন এই অহিংস্র প্রতিরোধ কারীদিগের প্রতি আইন সঙ্গত ও সভ্যোচিত ব্যবহার কারণ, বিশেষ করিয়া তিনি তাঁহা অবলম্বিত অহিংস্র-নীতি সমর্থন করিয়াছেন;—মহাত্মা গান্ধী বোম্বে রাজ সরকারের কোনও বিশেষ ক্ষমতা বলে ধৃত ও অবরুদ্ধ হইলেন—বরদা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ্ শ্রীযুক্ত আব্বাস তাইবজী মহাত্মার স্থানে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন—সোলাপুরে বিষম দাঙ্গা উপস্থিত হয়—মনোমোহন সিং বায়ু পথে করাচী পৌঁছেন—কাবুলে ব্রিটিশ লিগেসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে—দেশের প্রায় সর্ব্বত্র বখরী-ঈদ উৎসব নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হইয়াছে—নভসরীতে শ্রীযুক্ত আব্বাস তাইবজী ৫৯ জন স্বেচ্ছাসেবক সহ ধৃত হইলেন—১০০ শত সত্যাগ্রহী ধরসনা যাত্রা করিয়াছিলেন—শ্রীযুক্ত তায়েবজীর ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাবাস হইল।—৩১শে পর্য্যন্ত।

Regd No C—1789

Printed at the Metcalfe Printing Works, 34 Mechuabazar Street, by Jatindra Mohan ... Published by ... from 84, Bechu Chatterjee Street, Calcutta.

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনামূলক ভাব-ধারার বাহক সময়োপযোগী
মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম.এ সম্পাদিত

বিষয়

প্রথম বর্ষ } আষাঢ় ১৩৩৭ { নবম সংখ্যা

ভারতের সাধনা—নিয়মাবলী

সাধারণ

১। প্রতি বাঙ্গলা মাসে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয়।

২। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র এবং বৈশাখ হইতে আশ্বিন—দুই ষাণ্মাসিক হিসাবে বৎসর গণনা হইয়া থাকে। গ্রাহকগণ ষণ্মাসের প্রথম হইতে অথবা বৎসরের যে কোনও সময় হইতে পত্রিকা লইতে পারেন। মূল্য বার্ষিক ৪৲, ষাণ্মাসিক ২।০, প্রতি সংখ্যা ।৶০, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

৩। পত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন।

৪। টাকা-কড়ি ও চিঠি-পত্র ম্যানেজার বা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন

দেশের ধর্ম্ম, অর্থ, জ্ঞান ও স্বাস্থ্য সাধনার নির্দ্দেশক সমুদয় বিষয়ের বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে গৃহীত হয়; অশ্লীল ও সমাজের অনিষ্ট-কর বিষয়ের বিজ্ঞাপন পরিত্যজ্য। বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ—কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত স্থির করিবেন।

এজেন্সী

মাসে অন্ততঃ ১০খানি পত্রিকা লইলে কেহ এজেন্ট হইতে পারেন। উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্টগণ নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশী বা কম দরে পত্রিকা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। প্রতি মাসের হিসাব ঐ মাস মধ্যে পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে, না করিলে পর মাসের পত্রিকা পাইবেন না। পার্শেল পাঠাইবার খরচ আমরা বহন করি; কিন্তু মনি অর্ডার কমিশন বা পত্রাদি লিখিবার খরচ এজেন্টকে বহন করিতে হইবে।

১৪নং বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ
ভারতের সাধনা কার্য্যালয়

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

প্রথম বর্ষ] আষাঢ়—১৩৩৭ [নবম সংখ্যা

সাধনার পথে

ক্ষীণ হউক্ বা উচ্চ হউক্—স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট হউক্, আজ পৃথিবীর্ অনেক স্থানেই একটা মিলনের রব শুনা যাইতেছে। বৃহত্তর মানব-সমাজে এই অত্যল্প কালের মধ্যেই জাতি-সঙ্ঘ, রাষ্ট্র-সঙ্ঘ, শ্রমিক ও বাণিজ্য পরিষদ্ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইল, আর তাহার সমর্থনে বিবিধ শান্তি-সম্মিলন, অস্ত্রত্যাগের আয়োজন প্রভৃতি নানাবিধ প্যাক্ট, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি, প্রস্তাবাদি হইয়াছে। ক্ষুদ্রতর গণ্ডির মধ্যে বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতির ভিতর নানা বর্ণ, নানা সম্প্রদায়ের আপন আপন ধর্ম্ম ও কর্ম্মগত বিভিন্ন প্রকারের সম্মিলন দেখা যাইতেছে। এ সকল মিলন প্রচেষ্টা অবশ্যই সে নীতিসূত্রের সন্ধান লয় না, যাহা ভারতীয় নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে সকলকে—'বসুধৈব কুটুম্বকম্' করিয়া লইতে চায়—যে নীতিকে এক শাশ্বত সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। পাশ্চাত্য মনীষীর ভাব ও ভাষাতে যাহা—'a possession for all time' এবং যাহাতে 'the whole human family is bathed with an element of love like a fine ether!" এ কোনও মিলনের মন্দির নয়—এ চুক্তি বা 'প্যাকট' বাঁধিবার স্থানমাত্র—উকীল বা এটর্ণীর অফিস গৃহ।

মিলন-মন্দির

এ মিলনের শব্দই উত্থিত না যদি বিচ্ছেদের ভাবে সংসার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া না থাকিত, এ ঐক্যবন্ধনের আবশ্যকতা কেহ বোধ করিত না, যদি অনৈক্যের গরলে সমাজ বিষাক্ত না হইত, এ বন্ধুত্বের উচ্ছ্বাস ও পরার্থপরতার আবেগ প্রকাশ পাইত না যদি বৈর স্বার্থপরতায় আকণ্ঠ পরিপূরিত না হইয়া থাকিত। এইরূপ অবস্থায় এই সকল মিলন চেষ্টা বা প্যাক্টের পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইয়া আসিতেছে—জাতি-সঙ্ঘের বৃহত্তর জাতি সমূহের প্রবল শক্তির পেষণে ক্ষুদ্রতর জাতি সকলের অস্তিত্বে ভীতি উপস্থিত করিয়াছে, এক রাষ্ট্র-শক্তির প্যাক্ট বা সঙ্ঘবদ্ধতায় অপরের সন্দেহ ও ঈর্ষার উদ্রেক করিতেছে—একের সহিত সন্ধির বন্ধনে অপরের সমরায়োজনের প্রয়োজন হইয়া উঠিতেছে! আজ এই নানা

শোরগোলের মধ্যে (মিলন) মন্দিরের কাঁসরী-ঘণ্টার শব্দে কর্ণপাত না করিয়া (মিলন) বাজারের কেনা-বেচার মধ্যে প্রবেশ করিলেই এই মিলনের সার মর্ম্ম বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ইংলণ্ডের 'কন্‌সারভেটিভ্‌' বা রক্ষণশীল রাজনৈতিক দল যে বাস্তবিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চরম শক্তির পরিচালনা করে, তাহা ইহাদের রাজনীতির একটু পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ভারত ও সাম্রাজ্য

নামতঃ উদারনৈতিক, শ্রমিক প্রভৃতি বিভিন্ন দলের প্রতিপত্তি সময় সময় দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহা রাজনৈতিক দিঙ্‌মণ্ডলের নিরুদ্বেগতার সময়েই হইয়া থাকে; কোনও রূপ সঙ্কটের সময়ে রক্ষণশীল দলেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, অথবা অন্যান্য নামীয় দলের কার্য্যপ্রণালীও রক্ষণশীল দলেরই অনুরূপ হইয়া থাকে। কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তি বা জাতির পক্ষে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক—ইংলণ্ড আজ জগতের মধ্যে যে অবস্থায় অধিষ্ঠিত, তাহাতে তাহার এই শক্তি, সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ করাই প্রধান কার্য্য; উহার রাজনীতিও তাহাই—বর্ত্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-নীতি রক্ষণশীলতার নামান্তর বা পরিণতি মাত্র। ইহাতে কাহারও সন্দেহ বা আপত্তি থাকা উচিত নহে। তবে কেহ ভ্রম প্রমাদে না পড়েন, ইহা বাঞ্ছনীয়। কারণ, নাম ও রূপের মোহ—কেবল আধ্যাত্মিক চিন্তা-ধারায় নহে, বাস্তব জগতেও ভয়াবহ।

ভারতবর্ষ লইয়া ইংলণ্ডের রাজনীতি যে রক্ষণশীলতার পরাকাষ্ঠা তাহা বলাই বাহুল্য। উদারনৈতিকের চূড়ামণি ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে 'ষ্টীল ফ্রেম' বা শক্ত নিগড়ে আটা বলিয়াই অভিহিত করিয়াছিলেন, আবার জনসাম্যের অভিভাবক বিলাতের শ্রমিক দলের নেতাকেও ক্ষমতা পাইয়া ভারতের জন-আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর ভাব ধারণ করিতে দেখা গিয়াছে। একবার বাঙ্গলার একজন রসজ্ঞ সাহিত্যিক বলিয়াছিলেন যে, জীববিশেষের দুইটী শৃঙ্গ 'বাঁকা', কিন্তু ক্রিয়া বিশেষে তাহারা 'একা' বা একই লক্ষ্যে চলে।

মিঃ ষ্টানলী বলডুইন্‌ বর্ত্তমান ব্রিটিশ 'কনসারভেটিভ্‌' দলের নেতা। তাহার অভিমত ভারতীয় ব্রিটিশ রাজনীতিতে প্রমাণ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার লক্ষ্যে ল্যাঙ্কাসায়ারে স্বদলের নিকট এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের নিজের লোকের উপরই উহার শাসনভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা উহার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট (predestined) পথেই উহাকে পরিচালিত করিয়া চলিবেন, এ বিশ্বাস যেন আমাদের থাকে।.....ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমুদয় অংশের সহিত পূর্ণ সহযোগ আমাদের রাখিতে হইবে। আর তাহাতে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ সেই অংশ মাত্র। ভারতবর্ষ যখন তাহার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে, তখন তাহাকে সেই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ভাগের অংশ রূপেই নানা অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সেই কর্ত্তব্য সমষ্টি হচ্ছে—পরস্পর একতা সম্বদ্ধ হইয়া সমুদয় পৃথিবীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া।"

ভারতবর্ষ কখনও কাহারও বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় নাই—বরং সকল জাতি সকল লোককে মৈত্রী ও সাম্যের আহ্বানে আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছে; তার আপন সাধনার মৌলিক

মিলনের এক দিক

নীতিসূত্রে সেই মিলনের বন্ধন রহিয়াছে। যাহারা বৈরীভাবে আসিয়াছে তাহারাও ইহার বাহিরে পড়িয়া থাকে নাই। ভারতের ধর্ম্ম সেই সাম্য

ও অহিংস্র নীতিতে প্রতিষ্ঠিত; এজন্য তাহার প্রভাব জগতের অধিকাংশ লোকের অন্তরে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং জগতের বিবধ ধর্ম্মে তাহা এখনও বিদ্যমান। আজ পৃথিবীর ভাব ও কর্ম্মধারায় যে জড়বাদ-মূলক ঐহিক সর্ব্বস্বতা প্রধান্য লাভ করিয়াছে, এবং যাহাতে অভিভূত হইয়া সংসার আজ হিংসা দ্বেষ ও পরস্বাপহরণের দ্বারা ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহার হাত হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির জন্য ভারতের সনাতন অহিংস্র বা শান্তি নীতিই কার্য্যকরী হইবে। অজ্ঞান, অহংকার ও মোহের বশে মানুষ যতই তার বিরোধ করিতে যাউক্ না কেন, একদিন তাহাকে মস্তক অবনত করিতেই হইবে। ভারতের সনাতন মিলননীতির ভিত্তিতেই জগতের প্রকৃত শান্তির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ভারতের এই দুর্দ্দিনেও ভারতের মনীষা সেই লক্ষ্য ও দৃষ্টি হারাইয়া চলে নাই। অপূর্ব্ব বৈরাগ্যোদ্দীপ্ত স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সাধনার মৌলিক তত্ত্বের ভিত্তিতে জগতের সম্মুখে যে বিজয়-নিশান উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যৎ মানবের মহামিলনের সূচনা করিতেছে; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন কামনায় যে ভারতী কথা গাহিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার লক্ষ্যও সেই এক দিকে; সাধনা-পূত অরবিন্দ যে নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহার পূর্ণ বিকাশে ভারতীয় সাধনার সেই মর্ম্মই উদ্‌ঘাটিত করিতে চাহেন, যাহাতে সমুদায় ক্ষুদ্র শক্তি ও মতবাদ এক মহাশক্তির অঙ্গরূপে প্রকৃত মৈত্রীবন্ধনে সম্বদ্ধ হইবে; আর সত্যনিষ্ঠ মহাত্যাগী মহাত্মা গান্ধী আজ কর্ম্মক্ষেত্রে যে অহিংস্র নীতির অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই মিলন ও ঐক্যের সম্বন্ধ রাখে।

ভারতীয় সাধনার ঐক্য সূত্রকে উপেক্ষা করিয়া, যাঁহারা ভারতের বা জগতের সহিত মিলনের প্রতীক্ষা করেন, তাঁহারা কোনও ক্ষণিক উদ্দেশ্য বা লাভালাভের বিচারে অগ্রসর হইতে পারেন; কিন্তু প্রকৃত ফল লাভ কিছু করিতে পারিবেন না। বরং বিপরীত ঘটিবারই সম্ভাবনা। জাগতিক ব্যাপারে তাহাই ঘটিয়া আসিতেছে।

মুখে যাহাই বলুক না কেন, প্রকৃত পক্ষে ইউরোপীয় মনোবৃত্তিতে শান্তি বা মৈত্রীর স্থান নাই বলিলেই চলে। শিক্ষা দীক্ষা ও ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা সমুদায়ই উহার বিরুদ্ধে। এত

মিলনের আর একদিক

সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া বিভিন্ন প্রকারের ধারাবাহিক যুদ্ধ পরম্পরার কাহিনী আর কোনও স্থানের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না; আর উহার সভ্যতা ও সাধনার ভিত্তিও গড়িয়া উঠিয়াছে, বিভিন্ন জাতিরমধ্যে বিরোধ ও সমরানলের মধ্য হইতে। বর্ত্তমান জগতের জড়বাদমূলক বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে তাহা আরও সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর অনেকের মনে শান্তি বা মৈত্রীর ভাব জাগ্রত হইলেও, তাহা যে কাহারও অন্তস্থল স্পর্শ করে নাই, তাহাতে প্রকৃত মানবপ্রীতির স্থান নাই, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। যুদ্ধজনিত অবসাদ ও তাহাতে জনবল ও ধনবলে ক্ষীণ হইয়াই আজ ইউরোপ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে; সুযোগ হইলেই আবার ভীষণ রূপ ধারণ করিয়া পুনঃ মহাপ্রলয়ের সূচনা করিবে। এজন্য ইতিমধ্যেই আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই ভাব এখন কিরূপ প্রবল, নব্য ইতালীর একচ্ছত্র পরিচালক ও নির্ম্মাতা বিশ্ববিশ্রুত

ইতালীর আত্মপ্রকাশ

মুসোলিনীর কয়েকটী বক্তৃতা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতে পারে— মিলেন সহরে আহুত সৈনিকদিগের এক বিরাট সভায় তিনি বলিতেছেন—

'কপটতার এমন দৃষ্টান্ত মানব জগতে আর কখনও দেখা যায় নাই। সকলেই মনে করিতেছে যে কেবল ইতালী মাত্র সামরিক বিমান-যানের মালিক, অপর সকল দেশ কেবল কাগজের ঘুড়ি উড়াইতেছে,—ইতালীরই বন্দুক আছে, আর সকলের আছে বেড়াইবার ছড়ি, ইতালীরই কেবল সেনানিবাস ছাউনী প্রভৃতি আছে, অন্য সকল দেশে প্রমোদ ভবন-শান্তি নিকেতন মাত্র রহিয়াছে,—কেবল মাত্র ইতালীরই আস্পর্দ্ধা যে সে নৌবহরের অধিস্বামী হইবে, আর সকল জাতির জেলে নৌকা ও ভেলা মাত্র রহিয়াছে! প্রকৃত বিষয় যে এ সকলের উল্টা তাহা সকলেই জানে। একমাত্র ইতালীই বা অস্ত্রশস্ত্র বিবর্জ্জিত হইয়া থাকিবে কেন?" আর বলিতেছেন, "আমার বক্তৃতা শুনিয়া ইউরোপের রাজহংসকুল শিহরিয়া উচ্চরবে নিজ নিজ বিবিধ কিল্লা রক্ষায় ব্যস্ত হইয়াছে!" *

সাম্রাজ্যবাদের উপাসক ইংলণ্ড ও আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নিরত একনিষ্ঠ সাধক ইটালী—এই দুই বিভিন্ন দিগভিমুখীন ইউরোপীয় রাজশক্তির ভাব দেখিয়া বর্ত্তমান জগতের প্রগতি বুঝিতে পারা যায়। কারণ ইউরোপই এক্ষণে জগতের নিয়ন্তা ও শক্তির আধার। ইউরোপের প্রভাবই জগতে বিস্তার লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষও এক্ষণে ইউরোপের করকবলে; ইউরোপীয় প্রভাব তাহার উপরেও বল বিস্তার লাভ করিয়া বসিয়াছে। একদল লোক তাহাতে সম্পূর্ণরূপেই আত্ম বিক্রয় করিয়াছে। তাহারা বৈর বা মৈত্রীর সম্বন্ধ ইউরোপীয়ভাবেই সংস্থাপিত করিতে চাহে—সকল সমস্যার সমাধান এই পাশ্চাত্যের ভাবে করিবে। ইহারা ভারতের জাতীয় সাধনার কোনও সন্ধানই রাখে না। উহার আন্তরিক শক্তির পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবকাশ তাহাদের ঘটে নাই। কিন্তু একটু মনোনিবেশ করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আজ ভারতের যে নূতন জাগ্রতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহা এক হিসাবে পাশ্চাত্যের নীতি ও লক্ষ্য এবং ভারতের জীবনাদর্শেরই মধ্যে দ্বন্দ্ব—ঐহিক সর্ব্বস্বতা ও পরমার্থপরতা, ভোগ-বিলাস ও ত্যাগ, পরস্বাপহরণ ও পরার্থে দান—ইহাদের বিরোধ মাত্র। সকল বিষয় না বুঝিয়া—না গণিয়া বাছিয়া বা খতিয়ান করিয়াই আপন প্রকৃতির প্রেরণায় অজ্ঞাত সারেই যেন ভারতের অন্তরাত্মা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিয়াছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্যক্তি বিশেষের প্রভাব বা নেতৃত্বকে এ আন্দোলনের কারণ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব বা নেতৃত্বের মূল্য বা গুরুত্বও ততখানি মাত্র, যতখানি তাহা ভারতীয় সাধনার মৌলিক প্রকৃতির সহিত মিল রাখিয়া চলিয়াছে বা যতখানি সে উহাকে জীবনে উপলব্ধি ও প্রতিফলিত করিয়া চলিতে পারে। অনেক বিকৃত ও বৈদেশিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিকেও আজ ঐরূপ নেতৃত্বের অনুগামী হইয়া চলিতে দেখা যাইতেছে।

শক্তির পরীক্ষা

* "There has never been such a spectacle of human hypocricy. Any one would think that only Italy has war planes and other countries paper kites, only Italy has guns and other countries walking sticks, only Italy has barracks and elsewhere there are only pleasure palaces and recreation halls, only Italy has the effrontery to possess a navy and other nations have only fishing smacks and yachts. You know how different is the truth. Why should only Italy remain unarmed?" And again, "All the geese in Europe have been cackling in defence of their various capitals in consequence of my speeches".—Reutor May 23, London.

আর এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ভারতবর্ষে আজ বিভিন্ন শক্তির ক্রীড়া চলিতেছে। প্রবল পরাক্রান্ত বৈদেশিক রাজশক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, দেশের ভিতরেই বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় রত রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাদের কার কতখানি শক্তি বা বল তাহার পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, দেশের মৌলিক প্রকৃতি ও প্রয়োজনের দৃষ্টিতে যে আপনাকে অধিক নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে পারিয়াছেন ও পারিবেন, তিনিই অধিক শক্তির অধিকারী। ভারতের পক্ষে সে শক্তি ভারতের সাধনাবল। এজন্য বর্ত্তমান এই বিরোধী শক্তি সমূহের মধ্যে তাহাকেই প্রবল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে সেই সাধনার পথে চলিয়াছে। বাহিরের কোনও শক্তিকে প্রকৃত দেশের শক্তি বলা যাইতে পারে না; বাহিরের কোনও কারণেই অচিরাৎ তাহার বিলোপ সাধন হইতে পারে। দেশের মধ্যে যে সকল শক্তি আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই নিজ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, বাহ্যিক আবরণ বা চতুরতার নীতিতে ইহারা আপনাদিগকে পরিপুষ্ট করিতে চাহে; বাস্তবিক ইহাদিগের মধ্যে সমর্থতা অপেক্ষা ভয়, আশঙ্কা ও সঙ্কোচের ভাবই অধিক। যাহাদিগের মধ্যে বাস্তবিক কোনও শক্তির চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহারা ভারতের নিজ সাধনার পথেরই অনুযাত্রী; এবং যতদূর তাহারা এই পথে থাকিবে ততদূর শক্তির অধিকারী হইবে। ভারতের শৃঙ্খলা ও জগতের শান্তি স্থাপনের অধিকারও তাহাদিগের।

ছাত্রআন্দোলনে শিক্ষা

বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র দেশে যে ছাত্র-আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে আর ছাত্র-চাঞ্চল্য বলা চলে না—দেশের সর্ব্বসাধারণেরই তাহাতে চাঞ্চল্যের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ছাত্রগণই দেশের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবে—শুভ, অশুভ, মঙ্গল বা অমঙ্গল তাহাদের বর্ত্তমান প্রকৃতি ও ব্যবহারের উপর নির্ভর করিতেছে। উপস্থিত এই রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এদেশের ছাত্রগণের শিক্ষা ও ব্যবহার বহুদিন হইতেই বড় আশঙ্কার কারণ হইয়া আসিয়াছে। প্রকৃত নিদান ধরিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। বরং যে সকল দোষ এখন গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, শিক্ষা-প্রণালী ও শিক্ষা-বিধানে তাহার প্রশ্রয়ই দেওয়া হইয়াছে। উপস্থিত আন্দোলনে সতর্কিত হইয়া বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ যে সকল প্রতিবিধান করিতে যাইতেছেন, তাহার মধ্যে দুই একটী কথা ছাত্র চরিত্রে শিক্ষকের প্রভাব—'a strong influence to their students'—ও তাহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, দেখিয়া আমরা এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও কিঞ্চিৎ আশার আলোক পাইয়াছি—যদিও কথাটা সম্পূর্ণ ঐ লক্ষ্যে বলা হয় নাই এবং আর যে সকল কথা এতদ্ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার তেমন সামঞ্জস্যও নাই—সরকারী সার্কুলারে যে সকল কার্য্যে শিক্ষককে ছাত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে কাজে আটকাইয়া রাখিতে চাহে—(in activities which may interest students or occupy their

attention')—তাহার মধ্যে আন্তরিক চরিত্রের উল্লেখ নাই, আধুনিক সভ্যতার কতকগুলি বাহ্যিক বিষয়েই এই প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে—'In the organisation of games, the boy scout movements, historical and scientific excursions, debating societies and in the publication of schools and college magazines'. এইরূপ অনেক কার্য্য দ্বারাই যে উপস্থিত এই উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বুঝিতে এখনও বাকী আছে। বৈদেশিক শিক্ষা-প্রণালীর ইহাই বিষময় পরিণাম। ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে গুরুর চরিত্র প্রভাবই প্রধানতঃ আবশ্যক। এই শিক্ষার মূল নীতি এই যে, প্রত্যেক লোকের অন্তরে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত রহিয়াছে; উচ্চ বা সম্যক্ বিকশিত মনুষ্য চরিত্র বা শিক্ষকও গুরুর প্রভাবে ও সংশ্রবে তাহার সম্যক্ বিকাশ সাধন হয়; আর ঐ অন্তর্নিহিত বীজ-শক্তির প্রকৃত বিকাশ লাভ হইলেই চরিত্র নির্ম্মল, সংযত ও বাস্তবিক শক্তি-সম্পন্ন হয়। তখন একদিকে তাহাদের যাবতীয় অধীত বিদ্যা—কলা বিজ্ঞানাদির জ্ঞান লাভ অতি সহজে হয়, আর তাহারা সমাজের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

ইস্তাহারে আরও আছে যে গভর্ণমেণ্টের বেতনভুগী শিক্ষকগণের উন্নতি বা অতুন্নতি এইরূপ প্রভাব বিস্তারের উপরই নির্ভর করিবে—"at the time of making promotion or granting permission to officers to cross efficiency bars, the share taken by cfficers in such activities and their succcss in influencing students will be taken into consideration." চাকুরীর যোগাড় ও রক্ষা, এবং তারপরে 'প্রমোসন' লাভ ও 'এফিসিয়েন্সীবার' ডিঙ্গাইতে যে সকল গুণের প্রয়োজন—চরিত্রের তাহাতে কতখানি স্থান আছে গভর্ণমেণ্টের উচ্চ বিভাগের সে সংবাদ রাখা আবশ্যক। চরিত্রের দিক দিয়া বাছিয়া কতগুলি নিয়োগ-পত্র দেওয়া হয়, তাহার খবর তাহারা বলিতে পারেন। চাকুরী-রক্ষা ও তদতিরিক্ত প্রমোসনের চিন্তা ব্যতীত স্বাধীন চিন্তার অবসরই বা কোথায় যাহাতে কেহ প্রকৃত হিতকর, সুস্থ ও সবল কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। বাঙ্গলার এই দুই পুরুষ শিক্ষার অবস্থা পর্য্যালোচনায় দেখা যায় একালেও একজন অশ্বিনীকুমার দত্ত বা গোপালচন্দ্র লাহিড়ী স্বাধীন ভাবে ছাত্র সমাজে যে প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহাতে দেশের যে কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত আর নাই। দেশের কল্যাণ শিক্ষকের উপরই নির্ভর করিতেছে। শিক্ষার মৌলিক নীতি ছাড়িয়া বাহ্যিক আবরণে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিলে পরিণাম যাহা হয়, সর্ব্বত্র এখন তাহাই দেখা যাইতেছে।

কমিশন ও কনফারেন্স

সাইমন কমিশন দুই কীস্তিতে তার রিপোর্ট বাহির করিয়াছে; আগামী অক্টোবর মাসে রাউণ্ডটেবিল কনফারেন্স বসিবে, বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ভারতের ভবিষ্যত শাসন চক্রের নেমী কিরূপ ভাবে ঘুরিবে, তাহার আকার ইঙ্গিত ইহাদের দ্বারা হইয়া ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের হাতে তাহার

পাকা রাস্তা নির্দ্দিষ্ট হইবে। রিপোর্টের প্রথম অংশে দেশের পূর্ব্বেকার অবস্থা ও বর্ত্তমান রাষ্ট্রীক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাম্প্রদায়িক বিবিধ বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন; দ্বিতীয় খণ্ডে প্রস্তাবিত শাসন বিধির এক পরিকল্পনা দিয়াছেন। প্রথম ভাগে দেশের অবস্থার এমনই বিবরণ দিয়াছেন যে তাহাতে শাসন ব্যবস্থায় লোকেট স্ব-শাসনের অধিকার খুব বেশী দূর বিস্তৃত করা কেহ স্থায্য মনে করিতে পারেন না। ভারতের সমাজনীতি দূষিত, সাম্প্রদায়িক বিরোধ উন্নতির বিষম পরিপন্থী—এই দুই কথা ভারতীয় শাসন সংস্থার সংস্কারের প্রস্তাব বলবৎ হইয়া উঠা অবধি দেশ বিদেশে প্রভূত পরিমাণে বিজ্ঞাপিত হইয়া আসিতেছে। কমিশন-বিবরণীর প্রথম অধ্যায় তাহার বিলক্ষণ সহযোগিতা করিয়াছে। এ অবস্থায় কমিশনের প্রস্তাব যে ভারতীয় লোকদিগের মনোমত হইবে না, সে আশঙ্কা পূর্ব্ব হইতেই হইতেছিল; কার্য্যতঃ হইয়াছেও তাহাই। দেশের যাহারা পূর্ণ স্বাধীনতাকামী তাহারা অবশ্য কমিশন বিবরণীর লাভালাভের বিচার তত করে না। তদ্‌ভিন্ন অপর সকল দল ও সকল সম্প্রদায়ের লোক এক বাক্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। স্বয়ং বড় লাট লর্ড আরউইন রিপোর্টে বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার প্রতিকারের পথ অনুসন্ধান করিতেছেন। এই জন্যই বিলাতে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের আয়োজনও শীঘ্র শীঘ্র হইতেছে। কমিশনের রিপোর্ট পড়িয়া লোকের মন এমনই বিগড়াইয়া গিয়াছিল যে অতঃপর রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের উপর আর কাহারও বিশ্বাস বা ভরসা কিছু ছিল না। বড় লাট এই বিরোধের মধ্যে এক মধ্যস্থতার কার্য্য করিয়াছেন—সিমলাতে ব্যবস্থা পরিষদের বৈঠকে এজন্য যে বিজ্ঞাপ্তি দিয়াছেন তাহাতে তিনি এই বাক্যদান করিয়াছেন যে "কনফারেন্সে ভারতের সকল সমস্যা এরূপভাবে সমাধান হইবে যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের লোকই তাহাতে সন্তুষ্ট হইবে। এবং কনফারেন্স যে সমাধান করিবেন তাহার ভিত্তিতেই ভারতের শাসন-সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব পার্লামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করা হইবে। কনফারেন্সে ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবেই আলোচনা হইবে। রাজ-প্রতিনিধির কথাতে অনেকেই আশ্বস্ত হইয়াছেন; শ্রীযুক্ত জয়কার, জিন্না প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহারা বিজ্ঞাপন করিয়াছেন—'অক্টোবর মাসে লণ্ডন সহরে যে কনফারেন্স হইবে তাহাতে অনেক সুফলের আশা করা যায়। ষ্ট্যাটুটরী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে এই কমিশনের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কমিশনের সিদ্ধান্তে ভারতের লোক সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। শুধু তাহাই নয়, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের পক্ষে উহা বিষম বাধা। কিন্তু বড় লাটের মুখে এই কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হওয়া যায় যে, এই রিপোর্টই কনফারেন্সের একমাত্র আলোচ্য বিষয় বা শাসন সংস্কার পদ্ধতির ভিত্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে না।'

বড় লাট লর্ড আরউইন শান্তিকামী ও উদারনৈতিক একথা তাঁহার শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইবে। গত নভেম্বর মাসে তিনি স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যে উদারতাপূর্ণ উক্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে এ দেশবাসী মাত্রই উৎফুল্ল হইয়া ছিল। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী তাহার অনুবর্ত্তী বিশিষ্ট লোকদিগের মত উপেক্ষা করিয়াও তদনুযায়ী মৈত্রীর সন্ধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক বায়ুমণ্ডলে সুবাতাস বহিতে থাকে। কিন্তু ভারতের বড় লাট ব্রিটিশরাজনীতির দাস মাত্র। ইতিপূর্ব্বে একজন জবরদস্ত রক্ষণশীল ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটরী লর্ড আর একজন অতি বড় প্রতিপত্তিশালী ভাইসরয়কে বলিয়াছিলেন যে তিনি তাহার অধীনে অধঃস্তন কর্ম্মচারী মাত্র।

কিন্তু ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মণ্ডল হইতে তখন নানা বিরুদ্ধ মত উত্থিত হইতে থাকে। বড় লাটের কথা ডুবিয়া যায়। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র পুনঃ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। দেশের নেতৃবর্গ ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পাইতে প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে এক চরম নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। তদবধি দেশের ভিতরে যে উদ্বেগ উৎপীড়ন ও বিশৃঙ্খলা দেশের সর্ব্বত্র জমা হইয়া তাহাই দেশের জনসাধারণকে অধিকতর বিব্রত ও শঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে; বাহিরের কমিশন বা কনফারেন্স লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর অতি অল্প লোকেরই আছে। যাঁহাদের আছে তাহারা দেশের প্রকৃত অবস্থার সহিত পরিচিত নহেন, বিজাতীয় ভাব ও পরদেশিক আবহাওয়াতে ঘুরিয়া বেড়ায় মাত্র, দেশের প্রাণ-শক্তি, বুভুক্ষু অন্তরের সন্ধান রাখে না।

ভারতের বন্ধুরূপে লর্ড আরউইন বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারণ করিতে চাহিয়াছেন, কমিশন ও কনফারেন্সের লক্ষ্যও হয়ত তাহাই, ফলে ইহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কমন্ওয়েলথে ভারতবর্ষকে অংশীদার করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দিতেছেন। এবং মিঞা শাহন জওয়া সাহেবের মত এদেশের অনেকেই উৎফুল্ল হইয়া বলিতে পারেন—"বড় লাটের বক্তৃতায় আমাদের আশঙ্কা দূর হইয়াছে, এক্ষণে আমরা রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যাইয়া অবিলম্বে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দাবী করিতে পারিব। আমার মনে হয় যে ভারতও ব্রিটেনের মিলন বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে।" সবই ঠিক, কিন্তু এজন্য চাই খাঁটি ব্রিটেন ও খাঁটি ভারতবর্ষকে, এবং তদুপরি মানবীয় প্রকর্ষের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে। তদভাবে কোনও মৈত্রীয় বা মিলনের কথা নীতি-চাতুর্য্যে ডুবিয়া যাইবে, মানবীয় ধর্ম্মের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। এতদ্ বিষয়ে কমিশন বা কন্ফারেন্স কিছু করিতে পারেন বা করিবেন এ ভরসা কেহ করিতে পারেন না। কমিশনের কার্য্য বিবরণী, প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে যে সকল মতামত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এরূপ অভিযোগ না হইতে পারে এমন নহে—কমিশন ভারতের যে চিত্র অঙ্কন করিয়া আপন প্রস্তাবের ভূমিকা করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত ভারতকে কেহ দেখিতে পাইবে না। ভৌতিক ক্রিয়ার প্রভাবে বাহ্যিক ছায়া চিত্রের আবেশে বিকৃত ভারতের রূপ প্রতিফলিত করিয়াছেন মাত্র। প্রকৃত ভারত তাহার পশ্চাতে সুপ্ত, জাগিয়া উঠিলে সে আপনিই সকলকে মৈত্রী ও মিলনের প্রকৃত পথ দর্শাইবে।

———

গায়ত্রী

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মল্লিক তত্ত্ববিশারদ

হিন্দুগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ মধ্যে গায়ত্রী ও প্রণবের সর্ব্বাংশে উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। চারি বেদের সার গায়ত্রী মন্ত্র এবং তাহার সার প্রণব। প্রণব মূল। প্রণবের ব্যাখ্যাই অন্যান্য শাস্ত্র।

শাস্ত্র গ্রন্থে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাইবার পদ্ধতি দৃষ্ট হয়। সেই জন্য ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থ হইতে ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম ও কারণ বিষয়ে প্রবেশ করিবার জন্য সাধন, দূরদর্শী ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন। গায়ত্রী মন্ত্র প্রধানতঃ (আদিদেব) সবিতৃদেবের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ সূক্তের ১০ম ঋক্‌টী গায়ত্রী মন্ত্র।

"তৎ সবিতু র্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি,
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ!"

ইহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য সবিতা বা সূর্য্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে ভাল হয়, এই জন্য এই বিষয়ের অবতারণা করিতেছি!

বর্ত্তমান সময়ে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব, গাণপত্য। এই পঞ্চ সম্প্রদায়ই বেদকে মূল ভিত্তি বলিয়া জানেন। এবং বেদ হইতেই তাঁহাদের ধর্ম্মের পোষক মূল সূক্ত উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। বেদের এক এক জন ঋষির সম্পূর্ণ বাক্যকে সূক্ত বলে "সম্পূর্ণং ঋষিবাক্যন্তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে॥" বৃহদ্দেবতা। এইরূপ প্রধান পাঁচটী সূক্ত হইতে পাঁচটী প্রধান সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। রুদ্র সূক্ত শৈবগণের, দেবী সূক্ত শাক্তগণের, গণপতি সূক্ত গাণপত্যগণের, পুরুষ সূক্ত বৈষ্ণবগণের এবং সৌর সূক্ত সৌরগণের মূল ভিত্তি।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা জৈমিনি দর্শন হইতে বেদান্তদর্শন পর্য্যন্ত ছয়টীই বেদমূলক।

ইহার মধ্যে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৫০ সূক্তটী সৌর সূক্ত। ইহাকে প্রধান ও অপর সূক্তগুলিকে গৌণ ভাবে লইয়া সৌর সম্প্রদায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

সৌর সূক্তটীর সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এস্থলে আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

এই সূক্তটীর দেবতা, সূর্য্য
কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ! দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং। ১।

১। "সূর্য্য দীপ্তিমান্ ও সকল প্রাণীদিগকে জানেন, তাঁহার অশ্বগণ তাঁহাকে সমস্ত জগতের দর্শনের জন্য ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে।"

২। সমস্ত জগতের প্রকাশক সূর্য্যের আগমনে নক্ষত্রগণ তস্করের ন্যায় রাত্রির সহিত চলিয়া যায়।

৩। দীপ্যমান্ অগ্নির ন্যায় সূর্য্যের প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ সকল লোককে এক এক করিয়া দেখিতেছে।

৪। হে সূর্য্য। তুমি (মহৎ পথ) ভ্রমণ কর, তুমি সকল প্রাণীদিগের দর্শনীয়, তুমি জ্যোতির কারণ ; তুমি সমস্ত দীপ্যমান অন্তরীক্ষে প্রভা বিকাশ করিতেছ।

৫। তুমি দেবলোকগণের সম্মুখে উদয় হও, মনুষ্যগণের সম্মুখে উদয় হও, তুমি সমস্ত স্বর্গলোকের দৃষ্টির জন্য উদয় হও।

৬। হে শোধনকারী অনিষ্টনিবারক। তুমি যে আলোক দ্বারা প্রাণীগণের পোষণকারী রূপে জগৎকে দৃষ্টি কর।

৭। (সেই আলোক দ্বারা) রাত্রির সহিত দিবসকে উৎপাদন করিয়া এবং প্রাণীদিগকে অবলোকন করিয়া, তুমি বিস্তীর্ণ দিব্যলোক ভ্রমণ কর।

৮। হে দীপ্তিমান্ সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্য। হরিৎ নামক সপ্ত অশ্ব রথে তোমাকে বহন করে, জ্যোতিই তোমার কেশ।

৯। সূর্য্যরথবাহক, সাতটী অশ্বীকে যোজিত করিলেন, সেই স্বয়ংযুক্ত অশ্বীদিগের দ্বারা তিনি গমন করিতেছেন।

১০। অন্ধকারের উপর উত্থিত জ্যোতি দৃষ্টি করিয়া, আমরা সমস্ত দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান্ সূর্য্যের নিকট গমন করি। তিনিই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ।

১১। হে অনুকূল দীপ্তিযুক্ত সূর্য্য। অদ্য উদয় হইয়া এবং উন্নত আকাশে আরোহণ করিয়া আমার হৃদ্‌রোগ এবং হরিমাণ রোগ নাশ কর।

১২। আমরা আমাদের হরিমাণ (হরিদ্বর্ণ) শুক ও শরিকা পক্ষীতে স্থাপন করি, আমাদের হরিমাণ হরিদ্রায় স্থাপন করি।

১৩। এই আদিত্য সমস্ত তেজের সহিত উত্থিত হইয়াছেন, তিনি আমার অনিষ্টকারী (রোগ) বিনাশ করিয়াছেন, আমি সে অনিষ্টকারীকে বিনাশ করি না।

এই ত্রয়োদশ ঋক্‌ই সূর্য্য সূক্ত। ("রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কৃত অনুবাদ")

এই সূক্তটীর টীকায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন। ১১, ১২, ১৩ একটী "ত্রিচ"; পীড়া আরোগ্যের জন্য সূর্য্যের উদ্দেশে এই মন্ত্রগুলি পড়িতে হয়। কথিত আছে যে সূর্য্য প্রস্কণ্ব মুনি দ্বারা এই রূপ স্তুত হইয়া সেই মুনির "শ্বেতি" রোগ ভাল করিয়া দিয়াছিলেন।"

"হৃদ্‌রোগং"—হৃদয়গতং আন্তরং রোগং,
"হরিমাণং" শরীরগতং কান্তিহরণ শীলং বাহ্যং রোগং"—সায়ন।

সূর্য্য অন্তর এবং বাহ্য উভয়বিধ রোগের উপশম করেন।

এই উপলক্ষ্য হইতে আমাদের দেশে একটী শ্লোক প্রচলিত আছে,

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ, ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানমিচ্ছেত্তু শঙ্করাৎ, মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দনাৎ॥

শারীরিক আরোগ্য লাভের জন্য সূর্য্যের, ধনের জন্য অগ্নির, জ্ঞানের জন্য মহাদেবের ; এবং মুক্তির জন্য বিষ্ণুর উপাসনা করিবে। পরবর্ত্তী সাহিত্যে এই সূর্য্যদেবকে আরাধনা করিয়া অনেক লোক উৎকট ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্ব

তাহার এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। তিনি কোন কারণে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইয়া, নারদের উপদেশে সূর্য্যের আরাধনা করিয়া রোগ মুক্ত হন। এবং রোগ মুক্তির জন্য যে পঞ্চাশটী শ্লোক রচনা করিয়া সূর্য্যদেবের স্তব করেন তাহা পাঠ করিয়াও অদ্যাপি উক্ত রোগ হইতে অনেকে মুক্তিলাভও করিয়া থাকেন। ঐ শ্লোকপঞ্চাশৎ "সাম্বপঞ্চাশিকা" নামে খ্যাত। কাশ্মীর দেশের আচার্য্য অভিনব গুপ্তের শিষ্য "রাজানক ক্ষেমরাজ" ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন, এবং তাহা অদ্যাপি বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত আছে। এই পঞ্চাশটী শ্লোকে বেদের সার প্রণব ও গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে। গায়ত্রী বুঝিবার পক্ষে এই স্তোত্র বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

ইহার অনেক পরে সংস্কৃত সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ময়ূর ভট্টের আবির্ভাব হয়, তিনি কোন কারণে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইলে স্বয়ং সূর্য্যদেবের আরাধনায় রত হন এবং একশত শ্লোকময় স্তোত্রে আদিত্যের স্তব রচনা করেন, তাহা "সূর্য্যশতক" নামে খ্যাত। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন "সংস্কৃত সাহিত্য মধ্যে ময়ূরভট্ট একখানি মাত্র "কোষকাব্য" করিয়া যেরূপ কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি যদ্যপি অন্যান্য কবিগণের ন্যায় কোন "আখ্যান বস্তু" অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য রচনা করিতেন, তাহা হইলে তিনি একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ মধ্যে পরিগণিত হইতেন।"

সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে এইরূপ গায়ত্রী ব্যাখ্যা বিষয়ক অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। বিশেষতঃ অদ্যাপি "আদিত্যহৃদয়" অনেক লোকের "নিত্য পাঠ্য" রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এবং প্রত্যেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দুমাত্রেই প্রতিদিন সূর্য্যার্ঘ না দিয়া জলগ্রহণ করেন না, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ সম্প্রদায়ই নিজ নিজ ইষ্টকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সকলেই বলেন ব্রহ্ম ভিন্ন আরাধ্য অপর কেহ নহেন।

ষড় দর্শন ও পঞ্চ সম্প্রদায়ের মতে প্রায় এইরূপ অভিমত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা পুরুষ সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ। তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ এবং জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন অথচ তিনি সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত। নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ; এবং তটস্থ রূপে জগতের, জন্মাদিরও কারণ। জগতের উৎপত্তির কারণ হইয়াও তাঁহার স্বরূপ ভাব লাভ করিবার জন্যও তিনি সৃষ্টির মধ্যে অবস্থিত হইয়া সৃষ্ট জীবকে প্রেরণা দিতেছেন। সেই প্রেরণা লাভ করিবার জন্যই গায়ত্রীর উপাসনা। বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য ইহার তিন প্রকার অর্থ করিয়াছেন।

"যঃ" সবিতা দেবঃ "নঃ" অস্মাকং "ধিয়ঃ" কর্ম্মাণি, ধর্ম্মাদিবিষয়া বা বুদ্ধীঃ "প্রচোদয়াৎ" প্রেরয়তি, "তৎ" তস্য "দেবস্য" দ্যোতমানস্য "সবিতুঃ" সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া প্রেরকস্য জগৎ স্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য "বরেণ্যং" সংস্বরূপতয়া জ্ঞেয়তয়া চ ভজনীয়ং "ভর্গঃ" অবিদ্যা তৎকার্য্যয়োর্‌-ভর্জনাৎ ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ "ধীমহি" বয়ং ধ্যায়ামঃ। যদ্ ভর্গো ধিয়ঃ প্রচোদয়তি তদ্ ধ্যায়াম ইতি সম্বন্ধঃ।

যে সবিতৃদেব আমাদের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম বিষয়ে বুদ্ধি প্রেরণা করিতেছেন, সেই দ্যোতমান "সবিতার" অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামি জগৎস্রষ্টা প্রেরক পরমেশ্বরের বরণীয় অর্থাৎ সৎস্বরূপ এবং জ্ঞেয়

বলিয়া একমাত্র ভজনীয় (ভর্গ) পরব্রহ্মাত্মক জ্যোতিকে ধ্যান করি, যে ভর্গ আমাদিগকে বুদ্ধি বিষয়ে প্রেরণা দিতেছেন।

যদ্বা—যঃ সবিতা সূর্য্যঃ "ধিয়ঃ" কর্ম্মাণি "প্রচোদয়াৎ" প্রেরয়তি, তস্য "সবিতুঃ" সর্ব্বস্য প্রসবিতুঃ "দেবস্য" দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য "তৎ" সর্ব্বৈর্দর্শনীয়তয়া প্রসিদ্ধং "বরেণ্যং" সর্ব্বৈঃ সম্ভজনীয়ং "ভর্গঃ" পাপানাং তাপকং তেজোমণ্ডলং "ধীমহি" ধ্যেয়তয়া মনসা ধারয়েম।

যে প্রত্যক্ষ সূর্য্য আমাদিগকে কর্ম্মে প্রেরণ করিতেছেন—সেই জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্ব প্রসবকারী সূর্য্যের সকলে যাহা দর্শন করিতেছেন, সেই প্রসিদ্ধ, সকলের সম্যক্‌রূপে আরাধনার বস্তু পাপের নাশক তেজোমণ্ডল আমরা ধ্যান করি।

যদ্বা, ভর্গশব্দেনান্নমভিধীয়তে "যঃ" সবিতা দেবঃ "ধিয়ঃ" প্রচোদয়তি, তস্য "দেবস্য" প্রসাদাৎ "তদ্‌ভর্গঃ" অন্নাদিলক্ষণং ফলং "ধীমহি" ধারয়াম তস্যাধারভূতা ভবেম।

পুনরায় অর্থান্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন। ভর্গ শব্দে অন্ন অর্থও হইয়া থাকে। যে সবিতা দেব—বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন, সেই দেবতার প্রসাদে, সেই অন্নাদিলক্ষণ ফল আমরা ধ্যান করি। বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য এই গায়ত্রী মন্ত্রের এইরূপ ত্রিবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই ত্রিবিধ অর্থই সম্ভব। যিনি অধ্যাত্ম জগতে যে স্তরে উপনীত, তাঁহার পক্ষে সেই স্তরের ব্যাখ্যাই ঠিক বলিয়া বোধ হইবে।

এক্ষণে আমরা পার্শিগণের গায়ত্রীর মূল ও ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে হিন্দু ও পার্শিগণের মধ্যে একই ভাব এবং প্রায় একই আচার অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। উভয়ের মূল উৎপত্তি এক স্থান হইতেই হইয়াছে। গত চৈত্র মাসের "পঞ্চপুষ্পে" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, মহাশয় "প্রাচীন ইরাণ" নামে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"ইরাণদিগের গায়ত্রী তিনটী পাদে বিভক্ত। প্রথম পদে আটটি, দ্বিতীয়ে ছয়টি ও তৃতীয়ে সাতটি পদ সর্ব্বশুদ্ধ একাদশটি ছন্দঃ গায়ত্রী। মন্ত্রটির প্রত্যেক পাদে গড়ে গায়ত্রীর দুই পাদ। মোটের উপর মন্ত্র দুইটী "আর্য্য" গায়ত্রী ঋকের সমান।

প্রথম পাদ—

"যথা অহু বইর্‌যো।
অথা রতুশ অষাৎ চিৎ হচা॥"

[টীকা যথা=যেমন যথা; অহু—অহ্র, গাথায় দীর্ঘ, অসু, পৃথিবীর অধিপতি; বইর্‌য়ো বৃ (বরণ করা) সর্ব্ব-শক্তিমান্ বীর্য্যবান (যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ) অথ—তেমন, তথা, রতুশ্—ঋষি, অষাৎ—ধর্ম্মহেতু ঋতাৎ; চিৎ—নিশ্চয়ই, হচা—সচা, সহ]

যেমন নরপতি (ইহলোকে) বীর্য্যবান (সর্ব্বশক্তিমান) তেমনি ঋষি ও (ইহলোক ও পরলোকে) ঋত প্রভাববশতঃ নিশ্চয়ই (সর্ব্বশক্তিমান্)

দ্বিতীয় পাদ—

"বঙ্‌হেউশ দজদা মনঙ্‌হো।
শ্যওথননীম অঙ্‌হেউশ্ দজদাই॥"

[টীকা বঙুহেউস্—বসোঃ, সৎ, দজ্দা (বৈদিক দত্তা) দত্তানি, দানানি দান সমূহ, মনঙহো (এখানে অবেস্তা ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে সমাস হইয়াছে) সদন্তকরণের ; শুওথননাম—শ্যু—চ্যু (বৈদিক চ্যৌতনানাম্) কর্ম্মকারীগণের অঙহেউশ—অসোঃ, প্রাণের, জীবিতগণের প্রাণিরাজ্যের ; মজ্দাই—মজ্দায়, মেধসে (Gelduer) প্রভুর নিমিত্ত]

ভূতনাথের (প্রজাপতির) নিমিত্ত যাঁহারা (নিষ্কাম) কর্ম্ম করেন, সদন্তঃকরণের দান সমূহ তাঁহাদেরই নিমিত্ত (রক্ষিত থাকে) অর্থাৎ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম যাঁহারা করেন, তাঁহারাই সদন্তঃকরণের দান পাইবার অধিকারী, অর্থাৎ তাঁহাদের ও চিত্ত পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ করে ;

তৃতীয় পাদ—

ক্ষত্রেম চা অহুরাই আ।

যীম্ দ্রিগুব্যো দদৎ বাস্তারেম্॥

[টীকা ক্ষত্রেম্—ক্ষত্রম্, বীর্য্য, বল ; চা = চ গাথায় দীর্ঘ, ও ; অহুরাই—অসুরায়, অসুরস্য ষষ্ঠীর স্থলে চতুর্থী, অসুরের ; যীম্—যম, যাহাকে ; দ্রিগুব্যে—দরিদ্রেভ্যঃ দরিদ্রগণকে, দদৎ—অদদৎ, দিয়া থাকেন ; অতীত কালের অর্থ ইহাতে নাই ; বাস্তারেম্—সাহায্য ;]

ও অসুরের (পরমেশ্বরের) বল, তাঁহারই নিমিত্ত, যিনি দরিদ্রগণকে সাহায্য দান করিয়া থাকেন।

এই তিন পাদে তিন প্রকার বিভূতির কথা উক্ত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে দরিদ্রগণকে সাহায্য করা প্রধানতঃ অন্ন দ্বারাই হইয়া থাকে। ভর্গ অর্থে অন্ন সেই জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্থে যাঁহারা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম করেন তাঁহারাই চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করেন। সায়নাচার্য্য দ্বিতীয় অর্থে বলেন সূর্য্য মণ্ডলে জ্যোতির প্রভাবে পাপ সকল ভস্মীভূত হইয়া যায়, চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয়। এবং প্রথম অর্থ ব্যাখ্যায় বলেন ঋষিই সর্ব্বশক্তি মত্তা লাভ করিয়া থাকেন—যিনি পরব্রহ্মের ধ্যান করেন, তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তি নির্ম্মল হয় এবং তিনি নির্ম্মল প্রেরণা লাভ করেন। ইরাণ দেশের গায়ত্রীতে যে সকল অর্থ তিন পদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর্য্য গায়ত্রী ত্রিবিধ ব্যাখ্যাতে ঠিক প্রায় সেইরূপ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাব এবং ভাষার ও অনেক সাদৃশ্য সেইজন্য দেখিতে পাওয়া যায়। পার্শিগণের ও আর্য্যগণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রাচীন, যজ্ঞ ও ধ্যান সম্বন্ধে যে একতা আছে, তাহাও আমরা পার্শি প্রবর নাশ্‌শরবনজী, এম দেশাই মহাশয়ের প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া দেখাইয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। Theosophy in India 1909 Zoroastrian yasna Page 261.)

পার্শিগণের আবেস্তায় কয়েক খণ্ড পুস্তক আছে এক এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের ন্যায়। তাহার মধ্যে "যশ্ন" নামে এক প্রধান গ্রন্থ আছে। যশ্ন শব্দ সংস্কৃত যজ্ঞ শব্দের বাচক। যশ্‌ন শব্দের ব্যুৎপত্তি = যজ্‌ ধাতু হইতে = যজ ধাতুর অর্থ, যজন পূজন। যজ্‌ ধাতু হইতে যোজা শব্দ ও নিষ্পন্ন হইয়াছে। যোজ শব্দের অর্থ অতি গভীর। আবেস্তায় যোজদাথ্রগর শব্দের অর্থ = যিনি আহুর মজ্‌দ সহিত একীভূত হইয়াছেন অর্থাৎ সংস্কৃতে যোগী শব্দের যাহা অর্থ তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। যশ্‌নের প্রধান অধ্যায়ে (হা) প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে "যোজদাথ্রগর" অর্থাৎ উপাসক প্রথমে আহুর মজ্‌দের সহিত যুক্ত হইবার জন্য তাঁহার গুণাবলীর স্মরণ করিয়া

স্তব করিবেন। সকল গুণাবলীর মধ্যে প্রধান গুণ, তাঁহার "সৌন্দর্য্য"। তাঁহার ন্যায় সুন্দর কেহ নাই। ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় সৌন্দর্য্য, তাঁহার সৌন্দর্য্যের আভাস মাত্র। পারশিকগণের বিশ্বাস, যে আহুর মজদ মনুষ্য মূর্ত্তিতে বা অন্য কোন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন না, কেবল মাত্র সূর্য্য বা অগ্নিতে তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে, বৈদিক আবির্ভাব ও এইরূপ।

"খোরসেদ্ নিয়ায়েশ" অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে "হে আহুর মজ্‌দ! সকল জ্যোতির মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ, সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সার মূর্ত্তি সূর্য্যই আপনার মূর্ত্তি "আহুর মজ্‌দের পুত্রই অগ্নি" (আতম্ নিয়ায়েস্) এই উক্তি আবেস্তায় বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পারসিকগণের "অগ্নিমন্দির" আহুর মজ্‌দের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আনুষ্ঠানিক পারসিকগণ প্রতি মাসে চারিদিন করিয়া এবং আদিবিহিস্ত এবং আদের (কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ) মাসে চন্দন কাষ্ঠ লইয়া প্রতিদিন অগ্নি মন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। প্রতিদিন "অগ্নি মন্দিরে" যাইবার পূর্ব্বে, পারসিকগণ স্নান করিয়া শুক্ল বস্ত্র পরিধান করেন। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিবার জন্য এই সাধন।

এই সময়ে "হুকৃত" "হুমৃত" ও "হূর্শত" অর্থাৎ বাক্ শুদ্ধি, কায় শুদ্ধি ও মনঃ শুদ্ধি ত্রিবিধ সাধন করিতে হয়। কায়মনও বাক্যের পবিত্রতা সাধনই পারসিকগণের প্রধান সাধন। সমস্ত জীবনই এই সাধনায় অতিবাহিত করিতে হয়। বৈদিক আচারের সহিত পার্শিগণের আচারের আরও সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যগণের ন্যায় পার্শিগণের উপনয়ন সংস্কারও হইয়া থাকে। বালক বালিকাগণের ৭ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে এই উপনয়ন সংস্কার বা দীক্ষা হইয়া থাকে। এই সময় হইতে দীক্ষিত বালক বালিকাগণকে উপবীত বা "কুস্তি" এবং "সুদ্রা" বা শ্বেতবর্ণের রেশমী জামা পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ প্রদত্ত হয়।" "কুস্তি" মেষ রোমে নির্ম্মিত ৭২টি সুতার দ্বারা রচিত হইয়া তিন গ্রন্থীতে কটি দেশে ধারণ করিতে হয়। আর্য্যগণের ন্যায় পার্শিগণও চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত। আর্য্যগণের সামবেদের সামগাণের সহিত যেরূপ হোম করার পদ্ধতি আছে, পার্শিগণের "হোম যস্ত" গ্রন্থে ঠিক সেইরূপ গান করিবার প্রথা বর্ণিত হইয়াছে।

পুরোহিতের নামও অথর্ব্বা (সংস্কৃত অথর্ব্বন্); জেওর্তা=হোতা; রথি অধ্বর্য্য। যজ্ঞে দুগ্ধ, ঘৃত, সমিধ আর্য্যগণের ন্যায়ই প্রদত্ত হইয়া থাকে।

বৈদিক অনেক শব্দ ও এইরূপ পার্শি ধর্ম্মে স্থান লাভ করিয়াছে এবং এই জন্য সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মূল কথা এই অগ্নির দ্বারা কায় বা শরীর শুদ্ধি এবং সূর্য্যোপাসনা দ্বারা বাক্য এবং মন (বুদ্ধি) এই উভয়ই পরিশুদ্ধি লাভ করে। এই জন্য পার্শিগণের অগ্নি ও সূর্য্য, দেহ, বাক্য ও মন পবিত্র করিবার একমাত্র অবলম্বন।

অন্যান্য পরভাবিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই জ্যোতি এবং সাধনের কথা গৌণ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের শাস্ত্র মধ্যে এই তত্ত্ব কোথায় মুখ্য এবং কোথায় গৌণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমরা আমাদের প্রকাশিত "ধর্ম্ম সমন্বয় বা পন্থা নামক গ্রন্থে চারি ভাগে বর্ণনা করিয়াছি। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে তাহা দেখিতে পারেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ও হিন্দু-বিদ্বেষ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইবার পণ্ডিত ইয়ামাকামী শঙ্করের ভ্রম প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া কিরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাই দেখা যাউক। পণ্ডিত ইয়ামাকামী তাঁহার গ্রন্থের ১০৫ পৃষ্ঠায় শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের সৌত্রান্তিক সম্মত পরমাণুবাদ খণ্ডনের ভূমিকার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া নিজ পুস্তকের ১২২ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন—"The atoms are living things possessing all the four qualities of the four great elements, viz. earth, air, fire and water. In this matter I beg leave to point out what I consider to be an error on the part of Sankaracharya.

Sankara's error

In his account of the Sarvastitvavadins Sankaracharya observes :—

"চতুষ্টয়েক পৃথিব্যাদি পরমাণবঃ খর স্নেহোষ্ণেরণস্বভাবাঃ
তে পৃথিব্যাদিভাবেন সংহন্যন্তে ইতি মন্যন্তে" (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য) ২।২।১৮

Before discussing the passage, let me point out to you that there is every reason to believe that the whole sentence from চতুষ্টয়ে to সংহন্যন্তে reads like a quotation from a Buddhist work. Its meaning is perfectly clear. It signifies that the atoms of earth and other elements are possessed, all of them, of the qualities of roughness, viscousness, heat and moveableness, and that it is their combination which produces earth etc. This is the legitimate interpretation of the passage; for, according to the Buddhist, the atoms are the same in all the elements, and each atom possesses the four qualities viz: those of earth, air, fire and water. Now as it appears from the commentators of Sankara, who, in all probability represent the traditional interpretation handed down by him, Sankara misunderstood the meaning of the Sanskrit Compound পৃথিব্যাদিপরমানবঃ খরস্নেহোষ্ণেরণ স্বভাবঃ তে পৃথিব্যাদিভাবেন in the context. He thought that the four qualities mentioned there belonged respectively to the four elements. Accordingly the Ratnaprovha, the Bhamati and Anandagiri make out that, according to the Buddhist, the atoms of earth are hard, those of water are viscous, those of fire are hot, those of air are molute. Dr. Thibaut's version follows the interpretation of the commentators, while, Prof, Deussen's German version retains the ambiguity of the original Sanskrit. That the

compound in question does not bear the meaning given to it by Sankaracharya and his commentators, is clear from the following extract from the Abhidharmavibhasasastra which exists in the Chinese version of Heouen Soang.

Question :—How do you know that the qualities of all the four mahabhutas (viz : earth, air, fire and water) are inherent in the paramanus ?

Answer :—We know this, because the possession by the atoms of the distinctive characterestics and special functions of the four elements can be inferred in the case of all material things from the following fact, viz :—

The characteristics of the earth can be perceived by the sense-organs in solids. But the characterestic of water also is discernible in solids, because if it did not exist in it, gold, silver or copper and tin could not be reduced to a melting form,"

Again if the characteristic of water did not inhere in the atoms, they could have coperance. And if the characteristic of fire did not inhere in them, fire could not be produced by striking a flint with a piece of iron. Preservation being the characteristic quality of fire (that is heat), accordlng to Buddism, if the atoms had not the characteristic quality of fire inherent in them, material things would be incapable of preservation. Lastly, if movement, the characteristic quality of wind, were absent in the atom things would not move, or grow or perform any other function implying movement. So it is clear that Sankaracharya made a mistake about the meaning of the passage." 122-124 p. p.

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরমাণুগুলি জীবন্তবস্তু, এবং ক্ষিতি, বায়ু, অগ্নি ও জলরূপ চারিটী ভূতের চারিটী গুণ বিশিষ্ট। এ বিষয়ে শঙ্কর ভুল করিয়াছেন। কারণ, সর্ব্বাস্তিত্ববাদীদিগের মত পরিচয় প্রদান কালে তিনি বলিতেছেন যে—"চতুষ্টয়ে চ পৃথিব্যাদিপরমানবং খরস্নেহোষ্ণেরণ-স্বভাবাং তে পৃথিব্যাদিভাবেন সংহন্যন্তে ইতিমন্যন্তে" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৮)

এই বাক্যটী দেখিলেই মনে হয় ইহা কোন বৌদ্ধগ্রন্থের বাক্য। ইহার অর্থ শঙ্কর করিতেছেন যে, পৃথিব্যাদি চারি প্রকার পরমাণু যথাক্রমে খর স্নেহ উষ্ণ ও ঈরণ স্বভাবাপন্ন। অর্থাৎ পৃথিবী খর বা কঠিন, জল পরমাণু স্নেহযুক্ত, অগ্নিপরমাণু উষ্ণ, বায়ু পরমাণু ঈরণ স্বভাব; কিন্তু ইহার অর্থ তাহা নহে। ইহার অর্থ সকল পরমাণুই পৃথিব্যাদি মহাভূতের যে খরাদি চারিটী গুণ আছে সেই চারিটী গুণ বিশিষ্ট, সুতরাং পরমাণুগুলি একই প্রকার, চারি প্রকার নহে। শঙ্কর উক্তবাক্যের সমস্তপদের সমাসটী বুঝিতে পারেন নাই, আর তদনুসারে তাহার টীকাকারেরাও ভুল করিয়াছে।

ইহার প্রমাণ অভিধর্ম্ম বিভাষাশাস্ত্রের একটী প্রশ্নোত্তর হইতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থখানির হুয়েনসাঙ্গ কৃত চীন ভাষার অনুবাদ এখনও পাওয়া যায়। যথা—

প্রশ্ন—কি করিয়া তুমি জানিলে যে, ক্ষিতি, বায়ু, অগ্নি ও জল এই চারিটী মহাভূতের গুণ গুলি পরমাণুতে স্বাভাবিক ভাবে আছে ?

উত্তর—যেহেতু চারিটী ভূতের বিশেষ প্রকৃতি এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্য সকল যে পরমাণু সকলে আছে, তাহা যাবতীয় ভৌতিক বস্তু দেখিলে জানা যায়। যেমন ক্ষিতির প্রকৃতি, কঠিন বস্তুতে ইন্দ্রিয় দ্বারাই জানিতে পারা যায়। তদ্রূপ জলের প্রকৃতিও কঠিন বস্তুতে দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ কঠিন বস্তুতে যদি জলের প্রকৃতি না থাকিত, তাহা হইলে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রাদি অগ্নি সংযোগে গলিত অবস্থা প্রাপ্ত হইত না, ইত্যাদি। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শঙ্করাচার্য্য উক্ত বাক্যের অর্থ বুঝিতে ভুল করিয়াছেন—ইত্যাদি।

এখন শঙ্করের উদ্ধৃত উক্ত বাক্যটী এবং পণ্ডিত ইয়ামাকামীর মন্তব্যটী পড়িলে কি মনে হয় ? আমাদের মনে হইতেছে, উক্ত উদ্ধৃত বৌদ্ধ বাক্যটীর অর্থ শঙ্করই ঠিক্ বুঝিয়াছেন এবং পণ্ডিত ইয়ামাকামীই বুঝিতে পারেন নাই। কারণ,—চতুষ্টয়ে চ পৃথিব্যাদি "পরমাণবঃ খরস্নেহোষ্ণেরণ-স্বভাবাঃ তে পৃথিব্যাদিভাবেন সংহন্যন্তে"—এই বাক্যে সকল পরমাণু একই প্রকার, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মই চারি প্রকার—ইহা কিছুতেই বুঝা যায় না। যাঁহার সামান্যও সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান আছে, তিনিই ইহার পণ্ডিত ইয়ামাকামীর-সম্মত অর্থ করিতে পারেন না। যেহেতু যদি পরমাণু সকল একই প্রকার ইহা বলাই উদ্দেশ্য" তাহা হইলে "চতুষ্টয়ে চ পৃথিব্যাদি পরমাণবঃ" না বলিয়া কেবল "পরমাণবঃ" মাত্র বলিলেই চলিত। 'চতুষ্টয়ে' পদ দ্বারা পরমাণু সকল চারি প্রকারই বলা হইয়াছে। আর পৃথিব্যাদি পদ দ্বারা পরমাণুসকল যে পৃথিব্যাদিরূপেই চারি প্রকার ইহাই বলা হইয়াছে। আর সেই পরমাণুই চারি প্রকার ভাবে অর্থাৎ স্থূল পৃথিব্যাদিরূপে মিলিত হইয়াছে। পণ্ডিত ইয়ামাকামীর ব্যাখা গ্রহণ করিলে "চতুষ্টয়ে" ও "পৃথিব্যাদি" পদদ্বয় ব্যর্থ হয়। যদি বলা যায় চতুষ্টয়ে পদের সহিত পরমাণুর অন্বয় নহে, কিন্তু পৃথিব্যাদির অন্বয় হইবে, সুতরাং অর্থ হইবে "পৃথিব্যাদি ভূত চারিটীর পরমাণু সকল" আর তাহা হইলে পরমাণু আর চারি প্রকার হইল না, ভূত সকলই চারি প্রকার হইল। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে চতুষ্টয় পদের সহিত পৃথিব্যাদিপদের সমাস থাকিত; তাহা কিন্তু নাই। আর এ ক্ষেত্রে বস্তুতঃ এমন কোন কারণই নাই, যাহাতে সমাসের এই নিয়মের লঙ্ঘন করা আবশ্যক হইবে। সমাসের পূর্ব্বপদের কারকপদ অথবা সম্বন্ধপদই পৃথক থাকিতে পারে বিশেষণপদ অসমস্তভাবে থাকিতে পারে না। অতএব 'চতুষ্টয়ে' পদ 'পৃথিব্যাদির বিশেষণ হইয়া আর পৃথক থাকিতে পারে না।

তাহার পর "পৃথিব্যাদি পরমাণবঃখরস্নেহোষ্ণেরণস্বভাবাঃ" বলায় পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু পরমাণু খর স্নেহ উষ্ণ এবং ঈরণ স্বভাব বলা হইয়াছে। আর তাহাতে পৃথিবী পরমাণুর ধর্ম্ম খরত্ব, জল পরমাণুর ধর্ম্ম স্নেহত্ব, তেজঃ পরমাণুর ধর্ম্ম উষ্ণত্ব এবং বায়ু পরমাণুর ধর্ম্ম ঈরণত্ব ইহাই সিদ্ধ হয়। কারণ, এই পরমাণুর ক্রম ও সংখ্যা এবং খরাদি ধর্ম্মের ক্রম ও সংখ্যা একই সংখ্যার ঐক্য থাকিয়া ক্রম সম্ভবপর হইলে ক্রমানুসারে ব্যাখ্যা করাই স্বাভাবিক। যদি তাৎপর্য্য বা যুক্তির অনুরোধে ক্রম গ্রহণে কোন প্রতিবন্ধক থাকে, তবেই এরূপ স্থলে ক্রম অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু তাৎপর্য্য বা যুক্তি এস্থলে তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করে না, ইহা যথা-স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

তাহার পর পণ্ডিত ইয়ামাকামী বলিতেছেন যে শঙ্কর পৃথিব্যাদিপরমাণবঃ এই সমস্ত পদে অতি স্পষ্ট সমাসটা বুঝিতে পারেন নাই। অর্থাৎ বোধ হয় তিনি মনে করিয়াছেন শঙ্কর 'পৃথিব্যাদির পরমাণু সকল' এইরূপ ষষ্ঠী সমাস না ভাঙ্গিয়া 'পৃথিব্যাদিরূপ পরমাণুসকল' এইরূপে কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া ভুল করিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু তাহা হইলেও যে তিনি এই সমাসটাকে অতি স্পষ্ট বলিয়া কয়েক পঙ্ক্তি পরেই আবার তাহাকে অস্পষ্ট বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—ইহা বাস্তবিকই শঙ্করকে অজ্ঞ বলিবার জন্য তাঁহার অন্তরের আগ্রহেরই পরিচয় দিতেছে। কারণ, ১২২ পৃষ্ঠায় তিনি বলিলেন—"Its meaning is perfectly clear" আর ১২৩ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, "Dr. Thiaubt's version follows the interpretation of the commentators, while Prof. Deussen's German version retains the ambiguity of the original Sanskrit" এ স্থলে উক্ত সমাসটী স্পষ্ট বলিয়াই উক্ত সমাসে যে দ্ব্যর্থ আছে, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন। আচার্য্য শঙ্করকে যাঁহারা ভ্রান্ত প্রমাণ করিবেন, তাঁহাদের এত শীঘ্র শীঘ্র নিজের কথা প্রতিবাদ করা কি শোভা পায়? তাহার পর চতুষ্টয়ে পদ বাদেও "পৃথিব্যাদিপরমাণবঃ" পদের অর্থ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস দ্বারা "পৃথিব্যাদির পরমাণু সকল "বলিলেও যে পরমাণুসকল পৃথিব্যাদি চারিভূতের অনুরূপ, চারিপ্রকার নহে পরন্তু একই প্রকার—তাহা ত বুঝিবার কোন উপায় নাই। কারণ, "পৃথিব্যাদিভাবেন" এই পদটী পরে থাকায় ইহার অন্তর্গত পৃথিব্যাদির মধ্যে যে চারি প্রকারতা অর্থ আছে, সেই চারি প্রকারতা অর্থটী "পৃথিব্যাদি-পরমাণবঃ এই পদের অংশ পৃথিব্যাদির অর্থ মধ্যে কেন থাকিবে না? পৃথিব্যাদি এই পদাংশটী ত উভয় স্থলেই দেখা যাইতেছে। অতএব "পৃথিব্যাদিভাবেন" পদের অংশ পৃথিব্যাদির মধ্যে যেমন "চারিপ্রকারতা" অর্থ আছে, তদ্রূপ "পৃথিব্যাদিপরমাণবঃ" পদের পৃথিব্যাদি এই পদাংশে উক্ত "চারিপ্রকারতা" অর্থ স্বীকার করিয়া সেই "চারি প্রকারতা" অর্থ পরমাণুতেও অন্বিত করিতে হইবে। আর তাহা হইলে "পৃথিব্যাদির পরমাণু সকল" এই রূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসের অর্থে পরমাণু সকলের চারিপ্রকারতাই সিদ্ধ হইবে, এক প্রকারতা সিদ্ধ হইবে না। হইলে "পৃথিব্যাদিভাবেন" পদের দ্বারা যে চারিপ্রকার মহাভূতের কথা বলা হইয়াছে, সেই মহাভূতেরও একপ্রকারতা সম্ভব হইয়া পড়িবে। অতএব উক্ত বৌদ্ধবাক্যের অর্থ শঙ্কর যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই ঠিক অর্থ, তাহাই স্বাভাবিক অর্থ। পণ্ডিত ইয়ামাকামীর অর্থ ভুল এবং অস্বাভাবিক। বস্তুতঃ "পৃথিব্যাদিপরমাণবঃ পৃথিব্যাদিভাবেন সংহন্যন্তে" এই বাক্যে পৃথিব্যাদি চারি প্রকার পরমাণু তাহার কার্য্যভূত এই পৃথিব্যাদি ভূতরূপে মিলিত হইয়াছে—ইহাই অর্থ, পৃথিব্যাদি চারি প্রকার ভূতের এক প্রকার পরমাণু—এরূপ অর্থই নহে; এরূপ অর্থ হইতেই পারে না।"

যদি বলা যায়—তাৎপর্য্যানুরোধে অনেক সময় বাক্যের স্পষ্টার্থের অন্যথা করা যায়। উক্ত প্রশ্নোত্তর হইতে চারি প্রকার মহাভূতের এক প্রকার পরমাণু ইহা যে ব্যক্তি জানে, সে ব্যক্তি উক্ত "চতুষ্টয়ে" ইত্যাদি বাক্যে অর্থ পণ্ডিত ইয়ামাকামীর সম্মত অর্থই করিবে। অর্থাৎ তাৎপর্য্যানুরোধে "চতুষ্টয়ে" পদটী পৃথিব্যাদিরই বিশেষণ হইবে, পরমাণুর বিশেষণ হইবে না, আর তজ্জন্য সমাসের নিয়ম লঙ্ঘনই করা আবশ্যক হইবে। তাহা হইলে বলিব—উক্ত প্রশ্নোত্তরের অর্থও পণ্ডিত ইয়ামাকামী বুঝিতে পারেন নাই। উহার অর্থ শঙ্কর কৃত অর্থেরই সমর্থক, পণ্ডিত ইয়ামাকামীর সম্মত অর্থের সমর্থকই নয়। কারণ The characteristics of the earth can be perceived

by the sense-organ in solids. But the characteristics of water also is discernible in solids etc. ইত্যাদি কথায় ক্ষিতির ধর্ম্ম কঠিন পদার্থে যেমন আছে, তদ্রূপ জলের ধর্ম্মও কঠিন পদার্থে আছে, এই মাত্র বলা হইয়াছে। ইহা হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, এই কার্য্যভূত ক্ষিতি জল প্রভৃতিতে ক্ষিতি পরমাণু যেমন আছে, তদ্রূপ জল পরমাণুও আছে, অর্থাৎ চারিপ্রকার পরমাণু মিলিয়া এই স্থূল ক্ষিতি জলাদি হইয়াছে, এই মাত্র। আর এই অর্থই ইহার প্রশ্ন হইতেও প্রতীত হয়। কারণ প্রশ্ন হইতেছে—How do you know that the qualities of all the four *mahabhutas* (viz earth, air; fire and water, are imherent in the *paramanus* ? অর্থাৎ চারিটী মহাভূতের ধর্ম্ম যে পরমাণু সকলে আছে তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে ? ইত্যাদি। এখন এ কথায় পরমাণু যে এক প্রকার তাহা কি করিয়া বুঝায় ? Inherent in the *paramanus* বলায় পরমাণুর একপ্রকারতা বা চারিপ্রকারতা কিছুইত স্পষ্ট করিয়া বলা হইল না। বরং four *mahabhutas* অর্থাৎ চারি মহাভূতের—এইরূপ কথা পূর্ব্বেই থাকায় মহাভূতের চারিপ্রকারতা পরমাণুতেও আসিয়া পড়ে। চারিটী মহাভূতের ধর্ম্ম তাহাদের পরমাণুতে" অর্থাৎ তাহাদের চারিপ্রকার পরমাণুতে"—এইরূপ অর্থই সহজেই মনে উদয় হয়। এই প্রশ্ন ও উত্তর উভয় মিলাইয়া পড়িলে চারিপ্রকার মহাভূতের চারি প্রকার পরমাণু ইহাই বুঝা যায় ; অর্থাৎ খরস্নেহাদি চারি প্রকার ধর্ম্মাক্রান্ত চারিপ্রকার মহাভূতের যে চারিপ্রকার পরমাণু, তাহারাও চারিপ্রকার ধর্ম্মাক্রান্ত, ইহাই বুঝায়। এখন মহাভূতকে পরমাণুর মিলিতাবস্থা বলায় পরমাণু অমিলিতাবস্থাপন্ন বলা হয়, আর মিলিতাবস্থাপন্ন চারি প্রকার মহাভূতের মধ্যে ক্ষিতি খরপ্রধান, জল স্নেহপ্রধান—এইরূপ প্রধান-অপ্রধান ভাব থাকায়, সেই চারি প্রকার মহাভূতের অমিলিতাবস্থাপন্ন পরমাণু আর তাহার কার্য্যভূত মহাভূতের ন্যায় খর প্রধান, স্নেহপ্রধান ইত্যাদি প্রকার হইতে পারে না, প্রত্যুত খরপ্রধান ক্ষিতি নামক মহাভূতের পরমাণু কেবলই খরত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট, স্নেহপ্রধান জলনামক মহাভূতের পরমাণু কেবলই স্নেহত্বধর্ম্মবিশিষ্ট—ইত্যাদি প্রকার হইবে। বস্তুতঃ কার্য্যভূত ক্ষিতি যে খরপ্রধান তাহার কারণ তাহাতে খর ধর্ম্মাক্রান্ত ক্ষিতিপরমাণু অধিক, স্নেহধর্ম্মাক্রান্ত জল পরমাণু প্রভৃতি অল্প। এইরূপই অন্যত্র। সুতরাং উক্ত প্রশ্নোত্তর হইতে চারি প্রকার মহাভূতের এক প্রকার পরমাণু আর সেই সকল পরমাণুই খরাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট ইহা সিদ্ধ হয় না, প্রত্যুত তদ্বিপরীতই সিদ্ধ হয়, আর তজ্জন্য তাৎপর্য্যানুরোধে "চতুষ্টয়ে" ইত্যাদি বাক্যে 'চতুষ্টয়ে' পদ পৃথিব্যাদির বিশেষণ হইতে পারে না, সমাসের নিয়মানুসারে পরমাণুরই বিশেষণ হইবে।

বলিতে কি পণ্ডিত ইয়ামাকামী হুয়েনসাঙ্গের কৃত প্রাচীন ভাষায় অনূদিত মহাবিভাষা শাস্ত্রের উক্ত প্রশ্নোত্তরটীর অর্থই বুঝিতে পারেন নাই। বৌদ্ধপণ্ডিতগণ এত অল্পবুদ্ধি নহেন যে, তাঁহারা এক প্রকার পরমাণুর চারি প্রকার ধর্ম্ম—এরূপ বালকোচিত মত প্রকাশ করিবেন। দেড় হাজার বৎসরের প্রাচীন ভাষা আর বর্ত্তমান চীন ভাষা বহু পৃথক্, তাহার পর পণ্ডিত ইয়ামাকামী জাপানী—চীন জাতীয়ও নহেন। সুতরাং তিনি যে হুয়েন সাঙ্গের বাক্যের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতেও ভুল থাকিতে পারে। বস্তুতঃ Inherent in the *paramanus* এইরূপ বলায় পরমাণুর একপ্রকারতার সন্দেহ হইতে পারে। অবশ্য বিচার করিলে সে সন্দেহ যে থাকে না,

তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে মূলে যাহা আছে তাহাতে Inherent in their *paramanus* বলিলে এই সন্দেহ আরও ক্ষীণ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন বিচারহীন হইয়া অর্থ করা যেহেতু উচিত নহে, সেই হেতু পণ্ডিত ইয়ামাকামীর অর্থই ভুল। পণ্ডিত ইয়ামাকামী "চতুষ্টয়ে" ইত্যাদি বাক্যেরও অর্থ ভুল করিয়াছেন, আর প্রশ্নোত্তরবাক্যেরও অর্থ ভুল করিয়াছেন। অতএব চারিপ্রকার মহাভূতের পরমাণু চারিপ্রকার, একপ্রকার নহে, শঙ্করকৃত এই অর্থই ঠিক, এই অর্থই সঙ্গত, আর এই অর্থই বিচারসম্মত; এবং এই মতই খণ্ডনযোগ্য, আর তাহাই তিনি খণ্ডন করিয়াছেন, বালকোচিত মতের তিনি খণ্ডন করেন নাই। এইত গেল শঙ্করোদ্ধৃত বৌদ্ধবাক্যের নির্ণয়-সংক্রান্ত বিচার। এইবার পণ্ডিত ইয়ামাকামীর কথিত বৌদ্ধমতটী যে আপাতদৃষ্টিতেও যুক্তিসঙ্গত বৌদ্ধমত নহে, বিচারসঙ্গত বৌদ্ধমত হইতেই পারে না, তাহাই আলোচ্য। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটী কথা এস্থলে বলা যাইতে পারে, সে কথাটী এই—

পণ্ডিত ইয়ামাকামী বলিতেছেন শঙ্করকর্তৃক উদ্ধৃত বৌদ্ধমতজ্ঞাপক উক্ত বাক্যটী কোন বৌদ্ধমতের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বলিয়াই বোধ হয়। আচ্ছা, তাহা হইলে তিনি উক্ত বাক্যের আকর গ্রন্থের কেন অনুসন্ধান করিয়া শঙ্করের ভ্রম দেখাইলেন না? তাহাদের দেশে ত ভাল ভাল সকল বৌদ্ধ গ্রন্থেরই অনুবাদাদি হইয়া গিয়াছে। তিনি কি জানেন না যে. এক ব্যক্তির মত অন্য ব্যক্তির মত দ্বারা ব্যাখ্যা করা উচিত নহে? তিনি উক্ত বাক্যের আকর আবিষ্কার না করিয়া যে কোন একখানি গ্রন্থ দ্বারা তাহার ব্যাখা করিলেন—ইহা কি পণ্ডিতোপযোগী কার্য্য হইয়াছে? শঙ্কর সৌত্রান্তিক মতসম্পর্কে যে কথা বলিতেছেন, তাহার ব্যাখ্যা তিনি বৈভাষিক মত প্রধান "অভিধর্ম্ম বিভাষা শাস্ত্র" হইতে একটী প্রশ্নোত্তর উদ্ধার করিয়া শঙ্করের সৌত্রান্তিক বৌদ্ধমতে অনভিজ্ঞতা দেখাইলেন, ইহা খুবই বিস্ময়ের কথা বলিতে হইবে। আর তাহাও যদি তাঁহার স্বপক্ষের অনুকূল হইত, তাহা হইলেও এক কথা ছিল। দুঃখের বিষয় তাহাও অনুকূল হয় নাই।

বাস্তবিকপক্ষে বৌদ্ধমতে পরস্পর বিরুদ্ধ নানা মতভেদাদি যে হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন বৌদ্ধমতে পরস্পর বিরুদ্ধ নানা মত ভেদাদি হওয়ায় কনিষ্কের সময় মহাত্মা পার্শ্বের যত্নে ৫০০ শত স্থবির কর্তৃক উক্ত বিভাষাশাস্ত্র সংকলিত হয়। ইহা কাত্যায়নীপুত্রের 'অভিধর্ম্মজ্ঞানপ্রস্থান' শাস্ত্রের ভাষ্য স্বরূপ, ইত্যাদি; যথা—In the next century king Kanishkha is said to have commanded 500 Sthaviras or elders to collect together all the works which constituted the authoritative canon of the Sarvastitvavadins. This important collection was made under the superintendence of an elder or Sthavira named Parsva, who is said to have been the teacher of the poet Philosopher Asvaghosa. But by far the greatest Philosophical compilation of that age, or, for the matter of that, of any period of Buddhism is that monumental encyclopoedia of Hinayana Philosophy called the Abhidharma Mohavibhsa Sastra, which is a luminous, as well as a volumnous commentary on Katyaniputra's Abhidharmajnana

prasthava-sastra. The Sanskrit original of this work is lost, but Houen Soang's Chinese translation of it exists, consisting of 200 faciculi, which contains 4, 38, 449 Chinese characters. 105—6 p.

Thereupon the venerable Parsva told the king that during the many centuries that had elapsed since Buddha's death various conflicting theories had arisen amongst teachers and disciples all of whom different from one another and adhered to their particular views.

যে বৌদ্ধমতে এত মতভেদ, সেই বৌদ্ধমতের কোন একটা উদ্ধৃতবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার জন্য সেই বাক্যের আকর অনুসারে নির্ণয় না করিয়া অপর ব্যক্তির একখানি গ্রন্থ দ্বারা তাহার তাৎপর্য্য নির্ণয় কি পণ্ডিতোচিত কার্য্য হইয়াছে? আর এই মহাবিভাষাশাস্ত্র যে সম্পূর্ণ সৌত্রান্তিক মতের গ্রন্থ নহে, তাহাও বলা যায়। কারণ, 'বুনোস্থাঞিও' নামক ১২টী জাপানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ইতিহাস পুস্তকের ২য় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—The doctrine of this Sastra (Abhidharmakosa-sastra) is free from inclination to either the peculiar views of the Sarvastitvadins or those of the Sautrantikas. এই মতে কাত্যায়নীপুত্রকৃত জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্রের উপর পার্শ্বমুনি সংগৃহীত মহাবিভাষা শাস্ত্রখানি ভাষ্যস্বরূপ। অতএব এতদ্বারা যে ঠিক সৌত্রান্তিকমতের কথা পাওয়া যাইবে না, তাহা নিশ্চিত বলিতে হইবে। আর তজ্জন্য একই পরমাণু একই কালে চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মযুক্ত, ইহা বলা সঙ্গত হয় না।

তাহার পর তিনি যেপ্রমাণ উদ্ধৃত করিলেন, তাহাতে পরমাণুর একরূপতা সিদ্ধই হয় না। তথাপি যদি তাঁহার কথাই মানিয়া লইয়া বলা যায়, উহার দ্বারা পরমাণুর একরূপতা সিদ্ধ হয় ইত্যাদি, তাহা হইলে পরমাণু একরূপ কি চারি প্রকার, এই প্রশ্নের দ্বারাই কি সিদ্ধ হয় না যে, কোন কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতের মতে পরমাণু চারি প্রকার বিবেচিত হইত। আর সেই মতজন্য সংশয়বশতঃ উক্ত প্রশ্ন হইয়াছে। আর যদি বলা হয়, উহা কোন বৌদ্ধ মতবিশেষেরজন্য সংশয় নহে, বৈশেষিকাদি অবৌদ্ধের মতজন্য সংশয়, তাহা হইলে উহা উক্ত প্রশ্নোত্তর হইতে প্রমাণিত হয় না। প্রশ্নোত্তর পড়িলে মনে হয়, প্রশ্নের কারণ যে সংশয় তাহা কোন বৌদ্ধমতজন্য সংশয়। অতএব শঙ্করোদ্ধৃত বৌদ্ধ বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয়ের জন্য অন্য গ্রন্থের সাহায্য লওয়া এবং তৎপরে শঙ্করকে অজ্ঞ বলা পণ্ডিত মহাশয়ের গাত্রদাহ নিবারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইবার দেখা যাউক শঙ্কর যে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন এবং পণ্ডিত ইয়ামাকামী যে বৌদ্ধমত বর্ণন করিয়াছেন তন্মধ্যে কোন্‌টী অপেক্ষাকৃতযুক্তিযুক্ত এবং তজ্জন্য খণ্ডনের যোগ্য। যে হেতু স্পষ্টতঃ খণ্ডনের অযোগ্যমতের খণ্ডন অথবা নিজ মতের অবিরোধী মতের খণ্ডন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই করেন না।

প্রথমতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রায় সকল বৌদ্ধমতেই সকল ভাববস্তুই ক্ষণিক ভাব বস্তুর ক্ষণিকত্ব বিষয়ে প্রায় সকল বৌদ্ধাচার্য্যই একমত। আর এই ক্ষণিকত্ব বলিতে উৎপত্তিক্ষণের পরই বিনাশক্ষণ বলা হয়। বৈদিকমতেও কার্য্যভূত ভাববস্তু ক্ষণিক, তবে তন্মতে উৎপত্তি-

ক্ষণের পরক্ষণেই বিনাশ স্বীকার করা হয় না, স্থিতিক্ষণ একটা মধ্যে স্বীকার করা হয়। ইহাই উভয় মতের মধ্যে প্রভেদ।

এখন এক প্রকার পরমাণু সমূহই যদি চারি প্রকার ধর্ম্ম বিশিষ্ট হয়, ইহাই পণ্ডিত মহাশয়ের মতে বৌদ্ধমত হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, খর স্নেহ উষ্ণ ও ঈরণ স্বভাবগুলি একটী পরমাণুতে একই সময়ে থাকে কি করিয়া? যেহেতু উহারা ত বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। বিরুদ্ধ ধর্ম্ম একই কালে একটী ধর্ম্মীতে থাকিতে পারে না। যাহা খর অর্থাৎ কঠিন তাহা ত স্নেহধর্ম্মযুক্ত হইতে পারে না, আর যদি এক পরমাণুর ভিন্ন দেশে ভিন্ন গুণ বলা যায় তাহা হইলে পরমাণুবাদই আর থাকে না। যদি বলা হয়—যাহা কঠিন তাহা স্নেহযুক্ত হইবে না কেন? যেমন বরফ কঠিন, অথচ স্নেহগুণযুক্ত অর্থাৎ শৈত্যকারক। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই, যেহেতু পণ্ডিত মহাশয়ই স্নেহগুণের অর্থ তরলতা সম্পাদক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; যথা—But the characteristic of water also is discernible in solids, because if it did not exist in it—gold, silver or copper and tin could not be reduced to a melting form. 122—3. P. অতএব স্নেহ অর্থ বৌদ্ধমতে শৈত্যকারকই নহে, পরন্তু ইহা তরলতাসম্পাদক গুণ বিশেষ। এখন কঠিন ও তরলকে আর অবিরুদ্ধ ধর্ম্ম বলা যায় না। সুতরাং একইকালে একই পরমাণুতে বিরুদ্ধধর্ম্ম থাকিতে পারে না বলিয়া একই পরমাণু বিভিন্নকালে বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত হয়, অথবা বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত পরমাণু বিভিন্নই হয়. বলিতে হইবে।

যদি বলা হয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মগুলি একই পরমাণুতে বিভিন্নকালে থাকে বলিলে একই পরমাণু চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মযুক্ত বলা যায়। তাহা হইলে বলিব, যে পরমাণু উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হয়, তাহার ভিন্নকালে স্থিতি স্বীকার করিতে হয়। আর তাহা স্বীকার করায় তাহার বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিকত্ব অসম্ভব হয়। অতএব বৌদ্ধ সম্মত ক্ষণিকত্বের অনুরোধে একই পরমাণু ভিন্নকালে বিভিন্ন ধর্ম্মযুক্ত, ইহা আর বৌদ্ধ মতই হইল না। সুতরাং বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত পরমাণু বিভিন্নই হয়, ইহাই অপেক্ষাকৃত যুক্তিসহ বৌদ্ধমত বলিতে হইবে।

যদি বলা হয় খর স্নেহ উষ্ণাদি ধর্ম্মগুলি—তাহাদের অর্থ যাহাই হউক না কেন তাহারা যে অর্থে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হয় না, সেই অর্থের বোধক হইয়া অবিরুদ্ধ ধর্ম্ম এইরূপই স্বীকার করিব, তাহা হইলে বলিব—নানা ধর্ম্ম থাকে বলিলে সেই ধর্ম্মগুলি বিরুদ্ধ ধর্ম্মই হয়। সম্পূর্ণ বা অংশতঃও বিরুদ্ধভাব তাহাদের মধ্যে না থাকিলে তাহাদের নানাত্বই সিদ্ধ হয় না। আর যদি একই পরমাণু একই কালে নানা ধর্ম্মাক্রান্ত হয়, ইহা স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলে সেই পরমাণুসমূহ মিলিত হইয়া যাহা উৎপন্ন হইবে তাহাও তাহাদের পরমাণুর ন্যায় একই প্রকার হইয়া নানা ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে। ক্ষিতিপরমাণুর আধিক্য বশতঃ ক্ষিতি, জলপরমাণুর আধিক্যবশতঃ জল, ইত্যাদি ব্যবহার অসম্ভব হইবে; অথবা ক্ষিতি, জলাদির কোন ভেদই থাকিতে পারিবে না। অর্থাৎ জগতে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ুরূপ পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ থাকিবে না। অতএব খরাদি ধর্ম্মগুলি বিরুদ্ধ ধর্ম্মই বলিতে হইবে। আর তজ্জন্য এক এক ধর্ম্ম বিশিষ্ট এক এক পরমাণু অপর পরমাণু হইতে পৃথক্, ইহাই অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত বৌদ্ধমত বলিতে হইবে, অর্থাৎ একই পরমাণু খরাদি চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মাক্রান্ত ইহা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বৌদ্ধমত আর বলা গেল না। (ক্রমশঃ

পুরুষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সাহা, এম-এ

বৈষ্ণব সাধনার কথা হইতেছিল। আমার একজন বৈজ্ঞানিক বন্ধু কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং," তাই যদি হয়, তবে তিনি নারীও হইতে পারেন? তাহাকে স্ত্রীভাবেও ভজনা করা যাইতে পারে? প্রশ্নটী নিতান্ত অসঙ্গত মনে হইল। একটু ভাবিয়া দেখিলাম—উত্তর যাহাই হোক্, প্রশ্ন অনুচিত নহে।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।

যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।—চরিতামৃত।

ইহাতে কোনো কথাই বাদ যায় না। তিনি সর্ব্বভাবেই ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন। ইহা আচার্য্যগণের মত। শ্রুতিও বলিতেছেন—ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানার্থ। ত্বং কুমার উত বা কুমারী। কিন্তু সে মায়া-প্রপঞ্চে এবং লীলায়। পরমার্থতঃ এবং তত্ত্বতঃ তিনি কেবল পুরুষ। পুরুষই আদি কারণ। বিশ্বের মূল। বিশ্ব'পুর' ব্যাপিয়াই 'বাস' করেন, এই জন্য পুরুষ। আবার বিশ্বের সকল অভাব 'পূরণ' করেন—সুতরাং পুরুষ।

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুং।

ইহাই পরব্রহ্মের প্রকৃত বর্ণনা। পুরুষ আনন্দময়। আনন্দের স্বভাব প্রেম। আনন্দ এবং প্রেম উভয়ই সুন্দর। ব্রহ্মের এই আনন্দবৃত্তিই নারীরূপে মূর্ত্তিমতী। এই আনন্দ-বৃত্তি হইতেই বিশ্বসৃষ্টি। বিশ্ব ব্রহ্মের অপরিসীম আনন্দ-তরঙ্গ। জীবমাত্রই ঈশ্বরের আনন্দ-প্রবাহ-সঞ্জাত। সুতরাং প্রকৃতি-স্থানীয়। স্বরূপে জীব কখনো পুরুষ হইতে পারে না। ব্রহ্মও কখনো প্রকৃতি হইতে পারে না। প্রকৃতি ব্রহ্মের। ব্রহ্ম প্রকৃতি নহে।

আমরা যাহাকে জীবাত্মা বলি তাহা একটা যুগল-তত্ত্ব। আনন্দময়ী প্রকৃতি এবং সচ্চিদানন্দ পুরুষ। অব্যক্ত ব্রহ্মই অভিব্যক্ত হইয়া ব্যক্ত জীব হন। উদ্দেশ্য আনন্দ প্রেমসৌন্দর্য্য—লীলা। জীব=ব্রহ্মচ্ছায়া বা চিচ্ছায়া+প্রেমময়ী প্রকৃতি। সুতরাং জীব প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিই। কারণ ব্রহ্মতো পুরুষরূপেই পূর্ব্বাপর সমভাবেই আছেন। জীব যদি পুরুষ-ভাবে শাশ্বত-পুরুষাবস্থা প্রাপ্তির জন্য সাধনা করে, তবে তাহাকে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে সে পুরুষই। শাশ্বত পুরুষ একজনই। সুতরাং ব্রহ্মৈবাহমস্মি—তাহাকে এই ভাবের সাধনা করিতে হইবে। এবং যখন তাহার সিদ্ধিলাভ হইবে তখন সে ব্রহ্মে লীন হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করিবে। অতএব ভগবান্‌কে নারী-রূপে গ্রহণ করিলে নিজেকেই ভগবান্ হইতে হইবে। পুরুষ একজন চাই-ই। ভগবান যদি নারী হইলেন, তখন পুরুষ হইবে কে? যিনি সেই নারীকে গ্রহণ করিবেন তাঁহাকেই পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ভগবান্ হইতে হইবে। কারণ পুরুষ ব্যতীত নারীর কোনো মানে হয় না। পুরুষের হৃদয় হইতেই নারীর উদ্ভব। বাইবেলের ইভের জন্মবিবরণ অর্থযুক্ত।

ভগবানকে নারীরূপে পাওয়ার মানেই ভগবতীতে অর্থাৎ দুর্গাকে বা রাধাকে পত্নীরূপে

পাওয়া। এই অশোভন বাঞ্ছার শাস্ত্রে দুইটী উদাহরণ আছে। শুম্ভাসুরের দূত সুগ্রীব হিমাচল-সানুদেশ-সমাসীনা অতীব সুমনোহর রূপবতী ভগবতী পার্ব্বতীকে শুম্ভাসুরের আকাঙ্ক্ষা ও আদেশ জানাইল—

মাং বা মমানুজং বা চাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমং।
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্নভূতাসিবৈমতঃ।

দূতের কথা শুনিয়া ভগবতী বাহিরে গম্ভীর-ভাব ধারণ করিয়া মনে মনে হাস্য করিলেন। 'গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ' মহামায়া মায়াজাল বিস্তার করিয়া বলিলেন—

দূত তোমার প্রস্তাব অতি সুন্দর, কিন্তু একটা কথা। আমি অল্পবুদ্ধিবশতঃ একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি।

যো মাং জয়তি সংগ্রামে
যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে
স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।

তারপর দেবীর সঙ্গে শুম্ভাসুরের যুদ্ধ হইল। শুম্ভ সবংশে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল। আয়ান ঘোষ শ্রীরাধাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিল এবং শ্রীরাধাকে লাভও করিয়াছিল। যখন রাধা আয়ানের সংসারে আসিলেন তখন আয়ান আর পুরুষ থাকিল না। নপুংসক হইল। ইহার অর্থ অতি গভীর। শুম্ভ এবং আয়ানের জীবন হইতেই বোধ হয় আমাদের আলোচিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতেছে।

মায়া-প্রপঞ্চে আমরা দেখি লক্ষ লক্ষ পুরুষ, লক্ষ লক্ষ নারী। এই পুরুষই তাহার ঐশী-শক্তি সহযোগে বহু নর-নারী হইয়া বিবিধ বিচিত্র সম্বন্ধ বিস্তার করিতেছেন। নিত্যে ইহা হইতে পারে না। ভগবান্ নারী হইলে সাধনা অসম্ভব হয়। কেননা সাধকই তখন ভগবান্ হইয়া যান। এবং সাধকের ভগবান হওয়া মানেই ভগবানে লীন হওয়া। ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করা। ব্রহ্ম হইলেই হ্লাদিনী শক্তিরূপিনী রমণীকে পাওয়া গেল। ভগবান্‌কে রমণী-রূপে পাওয়ার আর প্রকারান্তর নাই। ভগবান্ পুরুষ এই জন্যই সর্ব্বপ্রকার সাধনা সম্ভব। তিনি সখা হইতে পারেন। পুত্র হইতে পারেন। আমি সখা হইয়া পিতা হইয়া পুরুষই থাকিতে পারি। তাহা পরমার্থতঃ সম্ভব হয়। পরম পুরুষ ভগবান্‌কে সম্মুখে রাখিয়া সর্ব্বপ্রকার ভাবাভিনয় হইলে মূল-পুরুষের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া রূপে শত শত তথাভিমানী পুরুষের উৎপত্তি বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তিনি নারী হইলে সৃজন ও লীলার, দুই প্রবাহই বন্ধ হইয়া যায়। ইহাই দার্শনিক সিদ্ধান্ত। বাহিরের দিক দিয়াও ইহা ধারণা করা যায়।

আমি স্বামী, তিনি স্ত্রী—মানে আমি বড়, তিনি ছোট। অর্থাৎ সে আমার অনুগত ও অনুগৃহীত। আমি তার প্রভু। তাহার, জীবন আমার জীবনের অন্তর্গত। আমার জীবন তাহার জীবনের চেয়ে বৃহত্তর। ভগবানের সঙ্গে যদি সাধকের এই সম্বন্ধ হয় তবে আর তিনি ভগবান নন, ভগবান্ আমার স্ত্রী হইলেও তিনি আমার পূজনীয়া। তিনি মহীয়সী। তিনি অসীমশক্তিশালিনী। আমি তাহার দাসানুদাস। তাহা হইলে আর ভগবান্ স্ত্রী হইলেন না। তিনি হইলেন আমার

জীবনের নিয়ন্ত্রী শক্তি। আমি তাহার অনুগত ও আশ্রিত। তিনি আশ্রিতের উপভোগ্য যে হইতে পারেন না। তিনি স্বভাবতই তাঁহার চেয়ে শক্তিমান যে পুরুষ তাহারি অনুগত হইবেন। তাহাকেই আত্মদান করিবেন। অর্থাৎ তিনি রাধা। কৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ করিবেন। সাধক শ্রীরাধার অনুগত হইয়াই—শ্রীরাধার উপাসনা করিয়াই—বুঝিতে পারিবেন যে তাহার পুরুষাভিমান মিথ্যা। সে প্রকৃতপক্ষে নারী। পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার বাঞ্ছিত। সে শ্রীরাধার দাসী।

ভগবানের সঙ্গে বিশ্বরমণীর বা শ্রীরাধার যে সম্বন্ধ, তাহার সহিত সাধারণ তথাকথিত পুরুষের সহিত নারীর সম্বন্ধ একজাতীয় নহে। অন্তরঙ্গভাবে অনুধাবন করিলেই বোঝা যাইবে পুরুষের যে নারীর প্রতি আকাঙ্ক্ষা তাহা নিগূঢ়ভাবে নারী হইবারই আকাঙ্ক্ষা। ভোগের মোহটা ভ্রম। কাজেই অচিরস্থায়ী পুরুষের ভোগবৃত্তিটী ক্ষণে ক্ষণে ধ্বংশ হইয়াই যায়। আবার আসে আবার যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভোগবৃত্তিটী আমার স্বরূপগত নহে। বাহির হইতে আসে। একটা আবেগের মত। একটা অবসেশন যেন। ভোগসমাপনে বৃত্তিটী অন্তর্হিত হইয়া যায়। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে পুরুষ প্রকৃত পুরুষ নহে। উচ্চ অঙ্গের প্রেমের দিক দিয়া দেখিলেও দেখা যায় রমণীর প্রতি যে অনুরাগ তাহা বিশুদ্ধাবস্থার রমণীর সঙ্গে অভিন্ন অর্থাৎ identified হইবার দুরন্ত বাসনা। ভাব-রসের খুব উপরকার স্তর-সমূহে sex-distinction লুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং পুরুষ-ভাব কোনো প্রকারেই প্রতিষ্ঠিত হয় না। উহা সাংসারিক প্রাকৃত-প্রেমের একটা অস্থায়ী অবস্থা। নারীর প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সাধনা করিলে উহা ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়, পরমপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া যদি সাধনা প্রবর্ত্তিত হয়, তবে ঐ পুরুষেরই একটী ছিন্ন বিম্বরূপে কোনো বিশেষ পুরুষ-ভাব দাঁড়াইতে পারে।

ভাবে এবং ভোগে উভয়তই পুরুষ-ভাব অস্থায়ী আমরা দেখিলাম। প্রকৃত পুরুষের অর্থাৎ শ্রীভগবানের পক্ষেই কেবল পুরুষ-ভাব নিত্য। সম্ভোগও সীমাহীন।

রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর-ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত।

নিরন্তর সম্ভোগ এক পরম পুরুষেই সম্ভব। কোনো জীবে সম্ভব নহে। বিশ্বে পুরুষ নিতান্তই এক। এইখানে একটী বিষয় বিশেষ-ভাবে ধ্যানদৃষ্টিতে দেখা আবশ্যক। সম্ভোগ বলিয়া যে একটা জিনিষ জগতে আছে তাহার বিশেষত্ব এই। সম্ভোগ কেবল নিজের জন্যই সুন্দর ও মনোহর। আর সকলের পক্ষে কুৎসিত! অন্যের সম্ভোগের বিষয়ে সকলেরি মনে একটা বিদ্রোহের ভাব আছে তাহা বিচার ও জ্ঞানের দ্বারা শান্ত করিতে হয়। আমিও যেমন অন্যেও তো তেমনি! এই প্রকার চিন্তা করিয়া মন স্থির করিতে হয়। পশুপক্ষীর মধ্যেও এই বিদ্বেষ ভাবটী খুব প্রবল। ইহার কারণও বোঝা যায়। আমি যখন ভোগ করিতেছি তখন আমার উপর ভোগাধিপতি ভগবানের আবেশ থাকে। কাজেই আমার ভোগটী সুন্দর মনে হয়। আমি ভোগ করি না। যাঁহার ভোগ তিনিই ভোগ করেন। অন্যের ভোগের প্রতি যখন দৃষ্টি করি তখন তো আর ভগবান্‌কে দেখি না। দেখি একটী ক্ষুদ্রজীব অনধিকার চর্চ্চা করিতেছে। দেবতার জন্য সাজানো নৈবেদ্য একটী সামান্য জন্তুতে নষ্ট করিতেছে। অন্তরের গোপন দেশে এই প্রকার একটী অনুভব জাগে। তাহা হইতেই ঐ বিদ্বেষটী সঞ্জাত হয়। সর্ব্বত্রই ভোগের কর্ত্তা "আমি"। আমি মানে আত্মান্তর্য্যামি পুরুষ।

যিনি প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। সম্ভোগের সময় যাহার সম্ভোগ তাহাকে সমর্পণ করিতে পারিলেই মঙ্গল। নতুবা অমঙ্গল। ভোগ ভগবানের। আমার নহে। ভগবানের ভোগ আত্মসাৎ করিতে যাইয়াই আমরা মরণপথের পথিক হই। ভগবান্ ভোগ করিয়া যে সুখ পান ভক্ত ভগবানকে ভালবাসিয়া তাহার চেয়ে সহস্রগুণ সুখ পায়।

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

এই জন্য ভগবান্ নিজেই ভক্ত-ভাব অবলম্বন করেন। এই জন্য শিব শ্মশানবাসী। এই জন্য কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ। গীতায় যে উপদেশ আছে—যৎ করোষি যদশ্নাসি * * তৎ কুরুস্ব মদর্পণং। তাহার প্রকৃত মর্ম্ম এইখানে বুঝিতে হইবে।

সমুদ্দীপিত প্রেম-পথে রমণীর সাধনা করিলে সাধকের পুরুষ-ভাবটা জলন্ত প্রেমের তাপে গলিয়া মিলাইয়া যায়। থাকে একটা দীপ্ত আত্ম-সমর্পণ-বৃত্তি। শেলী তাই বলিয়াছেন,

We shall become the same, we shall be one
Spirit within two frames, Oh ! wherefore two ?
One passion in twin-hearts !

বৈষ্ণব ঋষিও বলিয়াছেন ঠিক তাই—

না সো রমণ না হম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশন জানি।

জীবের পুরুষ-ভাব গৌণ। উহা transferred subject. নারী ভাবটাই মুখ্য। উচ্চতম সাধনায় প্রেমময়ী রমণী-ভাবেরই প্রতিষ্ঠা হয়। রমণী-ভাব লাভ করিতে পারিলেই সর্ব্বোত্তম কর্ম্ম-শক্তি লাভ করা যায়। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান আমার স্বামী। প্রভু। এই বিশ্বসংসারে আমাকে তাঁহারি কার্য্য করিতে হইবে। আমারি প্রিয়তমের সংসারে আমি তাঁহারি প্রীতির জন্য কার্য্য করিব। ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। এর চেয়ে আনন্দ আর কিছুই নাই। এই ভাব-সাধনাই গীতার সকল উপদেশের তাৎপর্য্য। সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—এর মানে এই দিকে খুঁজিতে হইবে। অজ্ঞলোকেরাই বলিয়া থাকে বৈষ্ণব-সাধনায় মানুষ দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হয়। প্রচলিত বৈষ্ণব-সাধনা অপূর্ণ। দেশে যে নিষ্কাম-কর্ম্ম-সাধনা চলিতেছে তাহাও অপূর্ণ। বৈষ্ণবের ভাব আছে। কর্ম্ম নাই। কর্ম্মীর কর্ম্ম আছে। ভাব নাই। দুই-ই নিষ্ফল। এ দুইয়ের মিলন না হইলে মঙ্গল নাই।

দিগ্‌ দর্শন

সাইমনি অসহযোগ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ।

সাইমন কমিশন তাহাদের রিপোর্ট দুই কিস্তিতে বাহির করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা বলিতে চাহেন যে ভারতে জনসাধারণের হাতে স্বায়ত্ত শাসনের ভারার্পণ করিবার বিস্তর বাধা বিঘ্ন বর্ত্তমান। সেই বাধা বিঘ্নের বর্ণন করিতে তাঁহারা একখণ্ড পুস্তিকা লিখিয়া জুন মাসের প্রথমার্দ্ধে প্রচার করিলেন। দুই সপ্তাহ পরে আরও একখানি পুস্তিকায় তাঁহারা তাঁহাদের শাসনসংস্কারযোগ্য প্রস্তাবাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দুই দফায় কমিশন সভাপতি সার জন সাইমন বেতার বার্ত্তা সাহায্যে তাঁহাদের বক্তব্য প্রচার করিয়াছেন।

প্রথম পুস্তিকাখানিতে ভারতে একতন্ত্রী জনগণ-প্রতিনিধি-পরিচালিত শাসনতন্ত্র হওয়ার যে কত রকম বাধা আছে তাহার অনুসন্ধান ও প্রচারই উদ্দেশ্য। কমিশন সদস্যগণ ১৮।১৯ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া "ভারতের নানা দেশ করি পর্য্যটন" এই প্রচার কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা ভারতে দ্বন্দ্ব ও ভেদের অস্তিত্বই দেখিতে পাইয়াছেন। ভারতের জীবন যাত্রায় কোনও একীভূত মূলসূত্র খুঁজিয়া পান নাই। ভাষার ভেদ, জাতির ভেদ, ধর্ম্মের ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, এই বিরাট দেশের ভিতর এমন পর্ব্বতপ্রমাণ বলিয়া তাঁহাদের নিকট ঠেকিয়াছে যে তাঁহারা এই ভারতের প্রতিনিধিদের লইয়া একটা রাজ্যতন্ত্র গড়িয়া তোলা অতি অমানুষিক বিরাট ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা ধরিয়াই লইয়াছেন যে ব্রিটিশ শাসনের ক্ষমতা ও অধিকারই ভারতকে একটা একীভূত সত্তা বলিয়া জানাইয়া দিয়াছে। নতুবা রুষবর্জ্জিত ইউরোপের মত ভারতবর্ষ একটা নানাজাতির সমাবেশ পূর্ণ মহাদেশ। ভারতে ন্যাসনেলিটীর উদ্ভব হইয়াছে দুইটী কারণে—একটা হইল ইংরেজী ভাষার প্রচলনে আর একটা হইল বর্ত্তমানের রাজনীতি-শিক্ষিত লোকের মতিগতিতে জগতে ভারতবর্ষকে একটা জাতি বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার আগ্রহে। কমিশন সভ্যদের বক্তব্যটা এইখানে তুলিয়া দিলে ভাল হয়। True it may be that its leaders do not reflect the sentiments of masses of men and women in India, who know next to nothing of politicians and are absorbed in pursuing the traditional course of their daily lives. But none the less however limited in numbers as compared with the whole, the public men of India claim to be spokesmen for the whole. ইহা সত্য যে জাতীয় আন্দোলনের নেতারা ভারতের নরনারী সংঘের কার্য্যকরী ভাবের প্রতিনিধি নহে। ঐ নরনারী সংঘ রাজনীতিকদের কিছুই জানে না আর দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পারম্পর্য্য ধারাকে মানিয়া চলে। কিন্তু তথাপি এই নেতারা সমগ্র জাতির যত অল্প অংশই হউক না কেন, তাহারাই জাতির হইয়া কথা কহিবার দাবি করে। বলা বাহুল্য, এই যে অভিমত, ইহা সার ভ্যালেন্টাইন চিরলের মতের পুনরুক্তি। সেই বিখ্যাত লেখকের উক্তি যদিও আমাদের পাঠকবর্গের নিকট ইতিপুর্ব্বে জানান হইয়াছে, তথাপি এস্থলে তাহা আর একবার না উদ্ধৃত করিলে প্রসঙ্গটা

পরিস্ফুট হইবে না। মাঘ মাসের "ভারতের সাধনায়" ২২৩ পৃষ্ঠায় চিরল সাহেবের উক্তিটী উল্লিখিত আছে। 'We want the western-educated Indian * * * * he has not as yet by any means proved his title to speak for the scores of millions of his fellow countrymen who are still living in the undisturbed atmosphere of the Indian middle ages * * * We should regard him as the only or the most authoritative mouth piece of the needs and wishes of other classes or the great mass of his fellow countrymen with whom he is often in many ways in less close touch than the Englishman who lives in their midst আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষিতকেই চাই * * * সে এখনও ভারতীয় মধ্যযুগে সমাহিত বিশ কোটী স্বদেশবাসীর হইয়া কথা কহিবার অধিকার অর্জ্জন না করিলেও এবং তাহাদের মধ্যে বসবাসকারী ইংরাজ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে সঙ্গবর্জ্জিত থাকিলেও আমরা তাহাদের স্বদেশীয়দের অভাব ও অভিপ্রায়ের ভাষা-দাতা বলিয়া মানিয়া লইব। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ইতিপূর্ব্বে যে নীতি কেবলমাত্র সাংবাদিকের মস্তিষ্ক বিজৃম্ভণ মাত্র ছিল, আজ তাহা রাজকীয় কমিশনের মন্তব্যের ভিত্তিতে পরিণত হইতে চলিল। এই নীতির ভিতর কু কোথায় তাহার একটা আভাস না দিলে, হয়ত অনেকেই আমাদেরই নিন্দা করিতে পারেন। ইংরাজী শিক্ষিত সমাজকে নেতা বলিয়া মানিয়া লওয়া দোষের নহে আমরাও সে-কথা বলিতেছি না। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত সমাজই দেশের রাজনৈতিক উন্নতির ভিত্তি, তাহাদের জাতীয় ভাবই একমাত্র জাতি সংগঠনের মালমশলা, দেশের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ৭০০।৮০০ বৎসরের পূর্ব্বেকার খাতে আজও প্রবাহিত কাজেই পরিগণনীয় নহে, এই ইংরাজী ভাষাই হইল জাতীয়তার বাহন—এ সমস্ত মনোভাবের পিছনে যে ভারত-অবজ্ঞা উকি মারিতেছে, ভারতের যুগযুগান্তের ইতিহাসকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব সূচিত হইতেছে তাহাই হইল কু। ইহাই হইল সাম্রাজ্যতন্ত্রের দম্ভ। ভারতের ইতিহাস ভারতের রাজনীতিক অভিব্যক্তির পক্ষে কিছুই নহে, আর ইংরাজের দুই দিনের সফরী লীলাই ভারতে নূতন রাজনীতির সৃষ্টি করিতেছে ও করিবে এ ভাব যেখানে বর্ত্তমান, তাহাই যে সকল প্রকার উন্নতির সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়, সকলপ্রকার অভিব্যক্তির মূলোৎপাটন করিতে উদ্যত, এবং ভারতের ক্রমবিকশিত মানবতাকে উন্মার্গগামী করাইয়া ও ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন করাইয়া একেবারে নাশ করিবার প্রয়াস—একথা বুঝিবার সামর্থ্য যাহাদের নাই তাহারা যেন এইখানেই এ প্রবন্ধ পড়া শেষ করেন। পত্রান্তরে দেখিলাম সম্পাদক সাইমন মন্তব্যের দুইটী মৌলিক দুরবগাহ তত্ত্ব খুঁটিয়া বাহির করিয়াছেন। কিন্তু যে দম্ভের পরিচয় উপরে উল্লিখিত হইল ঐ দম্ভ হইতেই যে সকল পাপই সম্ভব। এই বিষয় লইয়া একটু অন্য পরিচয় আবশ্যক।

ডাঃ বেশান্ত ভারতবর্ষের সহিত গত ৪০।৪৫ বৎসর পরিচিত। এ দেশের নানা জনমত সংগঠনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের কংগ্রেস আন্দোলনের একজন নেত্রী এবং কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভানেত্রী। ঐতিহাসিক পর্য্যবেক্ষণ শক্তিতে, সভ্যতার মূলসূত্র অধ্যয়ন-তৎপরতায়, আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পদের কার্য্যকারিতা জ্ঞানে, তাঁহার নাম পৃথিবীর ইতিহাসে বিশ্রুত-কীর্ত্তি। সাইমন সপ্তক পঞ্চত্ব পাইবার পর যখন বিস্মৃত হইয়া যাইবেন, তখনও এনি বেশান্তের নাম

সভ্যজাতির লেখমালায় অমর হইয়া থাকিবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে একখণ্ড ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি ভারতের অতীতের ভিত্তি লইয়াই ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তি গড়িয়াছেন।

"A curtain rises, and we see the Nation on the stage, full panoplied, complete, as no Nation could be without centuries, perhaps millenia of civilization behind it. This is true of India, as of Assyria, Persia, Egypt; but in one thing India differs from those whose contemporary she was. They are dead. She still lives.

যবনিকা উত্তোলিত হইলেই রঙ্গমঞ্চের উপর আভরণ-সজ্জিত, পূর্ণাঙ্গ জাতির দর্শন পাওয়া যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দীর, কল্লান্তের পর কল্লের সভ্যতা লইয়াই হইল জাতি। এসিরিয়, পারসিক, ও মিশর সভ্যতার সঙ্গে ভারতের সভ্যতা সমসাময়িক হইলেও ভারত তাঁহাদের হইতে এক বিষয়ে বিভিন্ন। উহারা মৃত, ভারত এখনও বাঁচিয়া আছে।

এই উক্তির পরে ডাঃ বেশান্ত ভারতের বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের উল্লেখ করিয়া ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে উদাহরণ স্বরূপ বিষ্ণুপুরাণ ও মৎস্য পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য কত আছে তাহাও উদ্ধৃত করিয়া, তাহার মূল বক্তব্যটী বলেন—It is on this literature and on the past embodied in it that the foundation of India Nationality is indestructably laid. এই সাহিত্যে ও এই সাহিত্যের অঙ্গীভূত অতীতের উপরই ভারতের জাতীয়তার ভিত্তি অবিনশ্বর ভাবে গঠিত হইয়া আছে।

He who knows nothing of the infinite wealth of this "unhistorical" Past will never understand the Indian heart and mind, and Sir Valentine Chirol, in his malicious and unscrupulous book on Indian Unrest saw accurately the truth that from the "Hindu Revival" was born the National movement of modern India.

এই প্রাগৈতিহাসিক অতীতের অসীম ঐশ্বর্য্যের কথা যিনি না জানেন, তিনি ভারতের অন্তঃকরণ ও মনের কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। "ভারতে অশান্তি" নামে সার ভ্যালেণ্টাইন চিরলের যে দুরভিসন্ধিপূর্ণ বেহায়া বই আছে, তাহাতে তিনি ঠিক সত্যই ধরিতে পারিয়াছিলেন যে 'হিন্দু পুনরুত্থান' হইতেই আধুনিক ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছে।

বলাবাহুল্য হিন্দু পুনরুত্থান অর্থে হিন্দু সমাজভুক্ত লোকের অভ্যুদয় মাত্র নহে। হিন্দুর ভাব-ধারা অতটা সঙ্কীর্ণ দ্যোতনা লইয়া ভারতের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। প্রকৃত জ্ঞানী মুসলমান সম্রাটরা ভারতের ঐ উদারতাকে মানিয়া লইয়াছেন। ইহা আমাদের স্বকপোল-কল্পিত কথার কথা নহে। ইতিহাস এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। সম্রাট আকবর আইনের চক্ষে সকল ধর্ম্মবিশ্বাসীকে তুল্যাধিকার দিতে হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষভাবে সকল লোকের পক্ষে সকল উচ্চপদে গুণানুসারে অধিকার ছিল। সম্রাট আরঙ্গজেব ঐ নীতি হইতে সামান্য রকমের বিচ্যুতি করাতেই মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ বপন হয়। কিন্তু তাঁহার পরেও পুনরায় আকবরের উদারনীতি পুনরায় সম্মানিত হয়। বাঙ্গলায় ইংরাজ

লাট ভেরেলষ্ট ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন :— যে মুসলমানরা তরবারি সাহায্যে তাহাদের জয় যাত্রার বিজয় পতাকা সর্ব্বত্র উড়াইয়া আসিয়াছিল, তাহারাই ভারতে আসিয়া সেই তরবারি খাপেই বন্ধ রাখিয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে একজন হিন্দুকেও তাহাদের আইন ও ধর্ম্মে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এই দেশে রক্তের বন্যা বহিয়া যাইবে, সেই কারণে সমীচীন বুঝিয়া তাহারাই হিন্দু ধর্ম্মের অভিভাবক ও রক্ষক হইয়াছিলেন। হিন্দুর ভাব ধারায় ধর্ম্ম বিদ্বেষ বা জাতি বিদ্বেষ বর্ত্তমান থাকিলে এই নীতির পরিপোষণ সম্ভব হইত কি ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাইমন কমিশনের সদস্যরা ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনকেই ভারতের জাতীয়তার জনক জননী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাসের ভিতর তাঁহারা ভেদ ও দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই। এখন বোধ হয় পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে সত ভাই চম্পারদল ভারতের ইতিহাসের ধারায় জাতীয়তার কিছুই দেখিতে চান নাই বলিয়াই দেখিতে পান নাই। এই সত্যকে লুকাইবার, ইতিহাসকে বঞ্চিত করিবার, অবশ্যম্ভাবীকে বিকৃত করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হইতেই পূর্ব্বোক্ত পত্রান্তরের উল্লিখিত অপর দুইটী মৌলিক বিকৃতি এই সপ্তকের মন্তব্যের ভিতর স্থান পাইয়াছে।

প্রথম। তাঁহারা ১৯২১ সালের আদম সুমারির কর্ত্তা মার্টেন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে "হিন্দু" বলিয়া কোনও একটীমাত্র বিশেষ ভাবের ধারণা হয় না। আমরা নিজের কথা বলিয়া পাঠকবর্গকে ভুল বুঝাইতে চাহি না। মার্টেন সাহেবের উক্তি পাঠকরা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে তাহার উক্তির প্রসঙ্গ ছিল—ধর্ম্ম হিসাবে ভারতের লোককে শ্রেণী বিভাগ করিবার অনেক অন্তরায় আছে। মুসলমান সম্বন্ধেও এক রকমে আছে, খৃষ্টিয়ান সম্বন্ধেও আর এক রকমে আছে, হিন্দুর সম্বন্ধেও অন্য রকমে আছে। তাঁহার কাছে সংজ্ঞা সূচক একীভূত ভাবের অভাব বলিয়া যাহা একটা সমস্যার ছিল, সেই অভাবের বর্ণনার মধ্যে হিন্দুর সম্বন্ধে যতটুকু আছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া কমিশন সদস্যরা হিন্দুকে নস্যাৎ করিতে চাহিয়াছেন। এই হীন মনোবৃত্তির অন্য কোনও জবাব দেওয়া আবশ্যক করে না। হিন্দু বলিতে সার উইলিয়ম জোন্স এই ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালে যে সম্ভ্রমের পরিচয় দিয়াছেন, সার টমাস মন্‌রো যে হিন্দু মন্ত্রীর গোময়লিপ্ত কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন, সার উইলিয়ম লকহার্ট ইংরাজ সেনাপতি হইয়া যে হিন্দু নাগা সন্ন্যাসীর আশ্রম দ্বারে সস্ত্রীক উপস্থিত হইয়া মাথা নত করিতেন, সার জর্জ বার্ডউড যে ভারতকে মাতা বলিয়া ও যে বর্ণাশ্রমকে ঘোষণা করিয়া নিজের আজীবন সেবার সার্থকতা প্রচার করিয়াছেন, পিয়ের লোতি কাব্যের উচ্ছ্বাসে যে ভারতকে "মানবের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার শৈশব দোলা" বলিয়া এই ইংরাজ শাসন কালে পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, জি ডবলিউ ডিকিনসন যে ভারতকে একবার দেখিয়াই সমগ্র পৃথিবী হইতে ভারতের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াছেন, সেই ভারতের একত্ব ও হিন্দুর সত্তা লইয়া তর্ক করিতে হইবে আমরা এত বড় হীনতা স্বীকার নাই করিলাম্। আমাদের একমাত্র কথাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি যে ভারতের যাহাকে এই সপ্তকরা ছোট করিতে চান সেই হইল হিন্দু। সে মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, জৈন হইলেও হিন্দু।

দ্বিতীয়। এই কমিশন সদস্যরা মণ্টেগু সাহেবের ১৯১৭ সালের ঘোষণায় যে অর্থ মঞ্জুর

করিয়াছেন তাহা কদর্থ ও বিকৃত। ১৯১৮ সালে তদানীন্তন বড়লাট চেমস্‌ ফোর্ড ও মণ্টেগু দুইজনে শাসন সংস্কার সম্বন্ধে রিপোর্ট লেখেন। ১৯১৯ সালের ৫ই মার্চ্চ তারিখে লাট চেম্‌স্‌ ফোর্ড ভারত সরকারের তরফ হইতে একটী ডেস্‌প্যাচ পাঠান। তাহাতে ১৯১৭ সালের ঐ ঘোষনার অর্থ যাহা লেখা আছে তাহাই যথার্থ। সেই কথাগুলি এত সহজ সরল ও সদ্‌বুদ্ধির সূচক যে তাহাতে সন্দেহের অবসর মাত্র নাই। কথাগুলি এই "আমাদের নিশ্চিন্ত ধারণা হইয়াছে যে ভারত শাসনের লক্ষ্য বা আদর্শ কি সেটার যথার্থ পরিচয় দেওয়ার সময় আসিয়াছে। ব্রিটিশ ইতিহাসের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে, ভারতের জনগণ আমাদের সাহায্যে ও পথ প্রদর্শনে নিজেদের শাসন কার্য্য নিজেরা করিতে শিখিবে এই আদর্শ ছাড়া আর কোনও লক্ষ্যের কল্পনা আমরা করিতে পারি না"। ঐ সাইমন সপ্তক বলেন যে পার্লেমেণ্টের কমিটি ঐ ঘোষণার যে অর্থ ধরিয়াছেন তাহাই ঠিক। সেই অর্থ এই যে ঐ ঘোষণার দ্বারা দায়িত্ব সূচক শাসন আংশিক ভাবে প্রবর্ত্তন করার উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল মাত্র দায়িত্ব সূচক শাসন কি করিয়া ক্রমিক ভাবে হইতে পারে সেই লক্ষ্য রাখিয়া স্বায়ত্ব শাসন অনুষ্ঠানের ক্রমোন্নতিই উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ দায়িত্ব সূচক শাসন পদ্ধতি হয় কোনও কল্পান্তে ঘটিতে পারে, আপাততঃ স্বায়ত্ত শাসন অনুষ্ঠানে স্বায়ত্ত কাহার ও যাহার আয়ত্ব করিবার আয়োজন সেই "স্ব" এর ভিতর কে, বা কাহারা, কত ভোটে, কি ভোটে, কি বিষয় লইয়া কতখানি শাসন করিতে পারিবে তাহা লইয়াই এই সপ্তরথী অত্যন্ত গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ভারতের বর্ত্তমান দ্বন্দ্ব বিরোধের ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারই একমাত্র অমোঘ ব্যবস্থা!

অর্থাৎ লাট চেম্‌স্‌ ফোর্ড যে কার্য্যের সময় আসিয়াছে বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, এই সপ্তকের নিকট সেই কার্য্যের সময় আসে নাই বলিয়া প্রচার করা অত্যন্ত আবশ্যক ঠেকিয়াছে। আমাদের পক্ষেও মনে হয় তাঁহাদের প্রস্তাবাবলী আলোচনা করিবার সময়ও বোধ হয় আসে নাই। একটা কথা কেবল পাঠকবর্গকে অনুধাবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। গত বৎসর অর্থাৎ ইং ১৯২৯ সালে অক্সফোর্ডে বেলিয়ল কলেজের মাষ্টার লিণ্ডসে সাহেব "গণতন্ত্রের মৌলিক উপাদান" সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা দেন। তাহাতে ঐ সপ্তকের দেশের পণ্ডিতই বলেন যে প্রতিনিধির শাসনতন্ত্রে লোক মতের প্রতিধ্বনি ও শাসন সৌকর্য্যই লক্ষ্য। এই দুইটী অর্থাৎ sensitiveness and efficiency সাধিত হইলেই গণতন্ত্র সার্থক হয়। "That and not pedantic uniformity is what democracy demands"। উহাই গণতন্ত্র চায়, পণ্ডিতী ঐক্যমত গণতন্ত্রের লক্ষ্য নয়। আর যে দ্বন্দ্ব বিরোধের কথায় পঞ্চমুখ হইয়া এই সপ্তক ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যের উদ্রেক করিতে চাহিয়াছেন, সেই দ্বন্দ্ব বিরোধের অস্তিত্ব ও সম্ভাবনাই উক্ত অধ্যাপকের মতে একপক্ষে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য-সাধনের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় ও অপরদিকে লোকমত সংগঠনের পক্ষে অধিকতর সার্থক, কেন না তাহাতেই strength and spontaniety of common life সাধারণ জীবন যাত্রার শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বলবত্তর হয়। এই বলবত্তর শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য যাহাতে উদ্ভব না হয় তাহাই কি এই সপ্তকের উদ্দেশ্য? কিন্তু এসব বিষয় লইয়া আলোচনার সময় আইসে নাই।

কিন্তু এক দিয়া দেখিতে গেলে এই সাইমনি ব্যাপারটাতে অসহযোগেরই জয় হইয়াছে। ভারতবাসী এই কমিশনের সহিত সহযোগ করে নাই। এই কমিশনও ভারতবাসী জমিদার,

মুসলমান, প্রজা, কংগ্রেস, সাংবাদিক সম্প্রদায় সকলের সহিত অসহযোগ করিয়াছিল তাহারা জানে এবং মানে যে তাহারাই ভারতের ইতিহাস ইংরাজী ভাষা ও শিক্ষা দ্বারা গড়িতেছেন এই স্পর্দ্ধার প্রশ্রয় দিয়াছে কে? যাহারা একই সময়ে মুখে অসহযোগ করিয়াছে কার্য্যে সহযোগ করিয়াছে, ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছে, জীবন পথে ইংরাজের সভ্যতাকে বরণ করিয়াছে, 'বন্দে মাতরং' ঘোষণা করিয়াছে আর মাতৃ-অপমানকে নীরবে সহ্য করিয়াছে, ভারতের স্বাতন্ত্র্যকে বাহানা করিয়াছে, আর ব্যবস্থাপক সভায় সেই স্বাতন্ত্র্যকে বজায় করিতে অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী শিক্ষাই হইল জাতীয়তার ভিত্তি-ভূমি, হিন্দু বলিয়া স্বতন্ত্র কোনও বাস্তবের জ্ঞান সম্ভব নহে, সিভিল সার্ব্বিস ও পুলিস সার্ব্বিস হইল ভারত শাসনের জামিন, আর শাসনতন্ত্রের দায়িত্ব ভারতবাসীর কাছে কবে হইবে তাহা আপাততঃ ভাবিয়া পাওয়া যায় না—সমস্ত ভারত, ভারতের ইতিহাস, ভারতের ভাবপরম্পরা ভারতের সাধনা, ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনের সহিত এত বড় অসহযোগ ইহাই কি মানিতে হইবে, না এখনও এই কমিশনের লেখার খতিয়ান কাটিয়া আলোচনার হিসাব নিকাশে আরও মানবতার অপমান পুঞ্জীভূত করিতে হইবে! যে দুর্ধর্ষ ধর্ষণ নীতির বজ্র হুঙ্কারের ভিতর এই রিপোর্টের অসহযোগ চপলালোকের আভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া ইতিহাস ঘোষণা করিবে, যদি দেশ এতদিনে বুঝিতে পারে—

ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর
পর কৈনু আপন আপন কৈনু ঘর।

তাই মনে হয় ভারতের গত ১৫০ বৎসরের ইতিহাসের ভিতর দিয়া ভারতের নির্য্যাতিত নিপীড়িত মানবতা প্রত্যেক ২৫।৩০ বৎসর অন্তর অন্তর্দেবতাকে জাগ্রত করিবার তপস্যা করিতে প্রেরণা পাইতেছে। সাইমন সপ্তক অসহযোগ করিয়া ইংলণ্ডের সভ্যতাকে কেবলমাত্র স্বতন্ত্র ও প্রধান বলিয়া ঘোষণা করিলেই যদি বর্ত্তমান অভিব্যক্তির চরম সার্থকতা হইত তবে 'অসহযোগের জয়' না বলিয়া সাইমনের জয়ই বলিতাম। কিন্তু আজিকার প্রথম সংঘর্ষের প্রথম আঘাতেই এই অসহযোগ ও প্রাধান্য প্রচার দ্বারা ভারতের জাগ্রত অন্তর্দেবতাকে যে ভাবে তুল্যবলশালী ও ভবিষ্যৎ-ভীতি-সঞ্চারকারী বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, তাহা যে ভারতের অসহযোগ নীতির জয়জয়কার ছাড়া আর কিছুই নহে। ভারতের বহিঃশত্রু চিরদিন ভারতের বুকে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে বাস করিয়াছে, এই বড় কঠোর সত্যকে অতীত বলিয়া উড়াইয়া বা চাপিয়া দিয়া, আজ যদি ভারতের ভয় বড়, ভারতের কি-জানি-কি মনোভাবের পরিবর্ত্তন ব্যর্থ করাই শ্রেয়, ভারতের সকল ইচ্ছা দমন করাই ৩০ কোটি লোকের সহিত দুই লক্ষ লোকের ক্ষণিকের দ্বন্দ্বে একমাত্র নীতি—ইহাই যদি ইংরাজী সভ্যতার একমাত্র সমস্যাপূরণ হয়, তবে এখনি বলিতে হইবে ভারতের নবজাগ্রত মানবতার কাছে এই সপ্তরথী অন্ততঃ হার মানিয়াছে। দুর্ভাগ্য কাহার? লর্ড হলডেন মরণের কিছু পূর্ব্বে যে আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, আজ এই সপ্তরথীর কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় যে সে আক্ষেপ নিতান্ত অমূলক নহে। ভারতের সহিত মিলন মানুষের পক্ষেও যেমন, মানব সংঘের পক্ষে ও তেমনি—অতি বড় ভাগ্যে এই মিলন হয়। লর্ড হলডেন তাই দুঃখ করিয়াছিলেন—আমরা সুযোগ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিলাম না। কত পুণ্য বলে, কালার বাঁশী শুনিতে পাওয়া যায় তাহা না বুঝিয়া আজ উহারা অসহযোগ করিল!

হিন্দুর আচার কি বালমৃত্যুর কারণ?

অন্ধমতের খণ্ডন

ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত, এম্-ডি

প্রায় এক বৎসর অতীত হইল বিলাতের "হিবার্ট জর্ণাল" পত্রিকায় মিস্ ইলিনর র‍্যাথবোন লিখিত "ক্যাথারিন মেয়ো ভারত-জননীর নিন্দা করিয়াছেন কি?" নামক প্রবন্ধের সমালোচনা সূত্রে বিলাতের ল্যান্সেট্ পত্রিকায় ভারতের প্রসূতি-তন্ত্র ও সমাজ-নীতির অযথা নিন্দাবাদ করা হয়। উপরন্তু ঐ ল্যান্সেট্ পত্রিকাতেই প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে মিস্ মেয়োর 'ভারত-জননী' (মাদার ইণ্ডিয়া) নামক পুস্তকের ভূরি ভূরি প্রশংসা করা হয়। আমরা এতদিন এই সকল অজ্ঞ ও একদেশ-দর্শী ব্যক্তির সমালোচনা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় মনে করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন যাবতীয় সরকারী ও বেসরকারী দেশের স্বাস্থ্যঘটিত কার্য্যবিবরণীতে (রিপোর্ট) সেই মিথ্যা সুর ধরিয়াছেন দেখিয়া এই সকল সমালোচনা যে একদেশদৃষ্টি-প্রসূত ও মিথ্যা তাহা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম।

ল্যান্সেট্ পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা এবং অশিক্ষিতা 'দাই'দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রস্তাব করা হইয়াছে। শিক্ষা বলিতে যদি আধুনিক শিক্ষাভাব না বুঝাইয়া প্রকৃত শিক্ষা বুঝায় তাহা হইলে এই কথা মূল্যবান তাহার আর সংশয় নাই।

ভারতে শিশুদিগের এত অকাল মৃত্যু কেন হয় বিচার করিতে গিয়া ল্যান্সেটের মত বিখ্যাত ডাক্তারী পত্রিকা ভারতের সমাজনীতির স্কন্ধে যাবতীয় দোষের বোঝা চাপাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। ভারতের অন্নাভাব ও ভীষণ অর্থাভাব যে বালমৃত্যুর একমাত্র কারণ না হইলেও যে প্রধান কারণ, তাহা বিজ্ঞানপত্রিকা ল্যান্সেট্ও যে বুঝিতে পারেন না, তাহা কল্পনা-বহির্ভূত বলিয়া মনে হয়। বিজ্ঞানালোক বিরহিত মূর্খ লেখকগণ (যেমন মিস মেয়ো বা র‍্যাথবোন) কোনরূপ অনভীষ্ট ফল দেখিলেই সমাজরীতিই দুষ্ট বলিয়া অজ্ঞতাবশতঃ স্থির করিলেও করিতে পারেন। কেননা তাহারা যে সমাজ-রীতির সহিত পরিচিত নহেন, আত্মাভিমান বশতঃ সেই রীতির সদ্গুণে সর্ব্বদাই অন্ধ। কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞানবিৎ না হইলেও যে বিজ্ঞানের অভিমান রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ভ্রম অমার্জ্জনীয়।

বিলাতের এ সকল বিজ্ঞানবিদ্গণের আচরণের সহিত ফরাসী দেশের সুবিখ্যাত বিজ্ঞান-পত্রিকা "লা নাতুর" (La Nature) পত্রিকার আচরণ তুলনা করিলে গুণগ্রাহিতায় মুগ্ধ হইতে হয়। তাহারা এসিয়াবাসীদের গুণ থাকিলে ক্ষুব্ধ না হইয়া আহ্লাদ করিয়া গ্রহণ করিতে জানেন। লা নাতুর লিখিয়াছেন "এই এসিয়াবাসীদিগের নিকট কোনও জিনিষ ব্যর্থ হয় না এবং অনুসন্ধান করিলেই

দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সকল জিনিষ বীজ ভাবে দিয়া গিয়াছেন তাহারা তাহার পুষ্টি করিয়াছে। তাহাদের রসায়ণশাস্ত্র আমাদেরই ন্যায় উন্নতি লাভ করিয়াছে। শিশুগণের অকাল মৃত্যু জাপানে প্রায় নাই এবং তথাকার অধিবাসিগণ এমন দীর্ঘ জীবন লাভ করে যে অন্য দেশে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ তাহাদের নাইট্রোজেনযুক্ত মাংস বর্জ্জিত খাদ্য—প্রধানতঃ শাকসজী ও তাহাদের বড়ই প্রিয় খাদ্য মাছ।" (—১৫ই নভেম্বর, ১৯২৯ সাল।)

আহারাভাবে মনুষ্যের স্বাস্থ্য থাকিতে পারে না ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তির সমাজ সংস্করণের দ্বারা রক্ষা হয় না, একথা আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই বুঝিতে পারে। তাহার জন্য কোনও বিজ্ঞান আবশ্যক হয় না। কিন্তু কালের কি অদ্ভুত মহিমা! ল্যান্সেটের ন্যায় বিজ্ঞান-পত্রিকাকেও প্রয়াস পূর্ব্বক প্রমাণ করিতে হইবে যে মনুষ্য আহার বিনা প্রাণ ধারণ করিতে পারে না! "অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্ত্তানাং শরণং ত্বহং। ধর্ম্মোবিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোর্ব্বাগ্‌ বিভ্যতোহরণম্।" অন্নই প্রাণিগণের প্রাণ, আমিই (শ্রীভগবানই) আর্ত্তব্যক্তিগণের আশ্রয়, ধর্ম্মই পরলোকারিত ব্যক্তিগণের একমাত্র বিত্ত এবং সাধুমহাত্মারাই সংসার-ভীত ব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয়।

১৯২৮ সালে আমেরিকায় মিসিসিপি নদীতে বন্যা আসিয়া দুকুল ছাপাইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায়। আমেরিকার গবর্ণমেন্ট ষ্টীমার ও মোটর বোট করিয়া খাদ্যদ্রব্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। এরোপ্লেনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন উপর হইতে খাদ্য দ্রব্য বর্ষণ করিতে লাগিল। খাদ্য দ্রব্যগুলি বন্যার জলে ডুবিয়া বৃথা নষ্ট হইল কি কেহ পাইল, সে বিষয়ে আদৌ দৃষ্টিপাত করিলেন না। জলপ্রবাহের ন্যায় অর্থপ্রবাহে দেশ প্লাবিত করিলেন। মনুষ্যে যাহা কল্পনা করিতে পারে তাহার কোনটাই বাকী রহিল না। এত করা সত্বেও এই দুদিনের বন্যায় সেই দেশবাসীদের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল ও পেলেগ্রা নামক ভীষণ রোগে দেশ জলপ্লাবনের ন্যায়ই ছাইয়া গেল। তাহাদের যে খাদ্যের অভাব হইয়াছিল তাহা নহে। খাদ্যদ্রব্য যথেষ্টের উপর যথেষ্ট ছিল। কেবল মাত্র সামান্য ভাইটামিন বি'র অভাবই এই ভীষণ ব্যাধিবন্যার একমাত্র কারণ। কৈ? আমেরিকাবাসীর এই আত্মশক্তির অভাবের জন্য কেহ তাহাদের সমাজ নীতিকে দুষ্ট বলিয়াছেন কি? ভারতে কে কোথায় কবে শুনিয়াছে যে একবার মাত্র বন্যায় দেশে পেলেগ্রা কি তদ্রূপ অন্য কোন ভীষণ ব্যাধি দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে? এই ঘটনাকে প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, ভারতবাসীরা যে আমেরিকাবাসীদের অপেক্ষা বহু গুণে সক্ষম ও সহিষ্ণু, তাহার আর সংশয় নাই। পুনশ্চ যদি সমাজনীতিকেই প্রধান কারণ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে এই সনাতন ভারতের সনাতন সামাজিক প্রথার তুলনায় আমেরিকার সমাজ নীতিকে অতি নিকৃষ্ট বলিয়াই নিঃসন্দেহ অনুমিত হয়।

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের মধ্যবর্ত্তী দেশ গুলিতে মাত্র ৪ বৎসরেরও অল্প কালের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের সামান্য কিছু ত্রুটি ঘটিয়াছিল; কিন্তু পেট ভরিয়া খাইয়াও দেশের লোকের স্বাস্থ্য এমনই ভাঙ্গিয়া গেল যে বহুকাল ধরিয়া রিকেট্‌স্‌ও টিউবারকুলোসিস নামক দুইটী অন্নজনিত রোগে ভিয়েনা নগরী ছাইয়া গেল। এই হতভাগ্য দেশে কিন্তু কতই সহ্য হয়

বলা যায় না। যদি সমাজনীতিই ইহার কারণ হয়, তাহা হইলে ইউরোপের এই সমাজনীতি দেশ হইতে যত শীঘ্র বিতাড়িত হয় ততই দেশের মঙ্গল। লোকে বৎসরের পর বৎসর যেরূপে করিয়া দুর্ভিক্ষ ও তাহার যোগ্য সেনাপতি বন্যার আক্রমণ অকাতরে সহ্য করিয়াছে তাহা দেখিলে এমন কোনও সত্যনিষ্ঠ লোক নাই যে বিস্ময়ে অভিভূত হন না। অভাব ও ক্লেশের সহচর দুর্ভিক্ষ বন্যা ও মহামারী প্রপীড়িত ভারতবাসী পৃথিবীতে এমন নিঃসম্ব, সারহীন মনুষ্য জন্মায় যে দুদিনের যৎকিঞ্চিৎ অভাবও সহ্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

যদি বালমৃত্যুই সমাজনীতির গুণাগুণ ও দেশের স্বাস্থ্যের উপর তাহার প্রভাবের একমাত্র পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে অপর দেশের সমাজনীতির তুলনায় ইংলণ্ডের সমাজনীতি যে হেয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেননা ইংলণ্ডে হাজার করা ৭০টি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু জাপানে বাল-মৃত্যু নাই বলিলেই হয়। ভারত সম্বন্ধে যেমন সমাজনীতিকেই বাল-মৃত্যুর একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেইরূপ যুক্তি উদ্ভাবন করিলে জাপানের সমাজনীতির সর্ব্বথা অনুসরণ করা ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য।

হিন্দুর আচার ব্যবহারের উপর আক্ষেপ বর্ষণের কতটুকু প্রকৃত কারণ আছে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত গতবৎসরের একটি সংখ্যাপরিগ্রহ হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে। গতবৎসর মাসিক আয় প্রায় ২০০৲ টাকা এরূপ ৮০০শত অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারের মধ্যে এই সংখ্যাপরিগ্রহ করা হয়; যাঁহারা বিলাতী মোহে মোহিত নহেন, যাঁহারা হিন্দুভাবে চলেন, ইংরাজী শিখিয়াও সনাতন ধাত্রী প্রথাকে ঘৃণা করিতে শিখেন নাই, সেইরূপ ৮০০শত জন্মের হিসাব গ্রহণ করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে বালমৃত্যু সংখ্যা মাত্র ২৩টি (অর্থাৎ হাজার করা ২৯টি অপেক্ষাও কম) কিন্তু ইংলণ্ডে বালমৃত্যুর সংখ্যা হাজার করা ৭০ (২।০ গুণ)। আমাদের বিদেশীয় সুহৃদ্-গণের যুক্তি অবলম্বন করিলে ইহা হইতে নিঃসংশয় প্রমাণিত হইবে যে পাশ্চাত্য সমাজনীতি অপেক্ষা ভারতীয় সমাজনীতি শতগুণে উৎকৃষ্ট। কিন্তু যাঁহাদের কোনও স্বার্থান্বিসন্ধানের প্রয়োজন নাই তাঁহারা ইহা হইতে কেবল ইহাই বুঝিবেন যে অভাবই (অন্নাভাব, অর্থাভাব ইত্যাদি) মৃত্যুর কারণ। সমাজনীতির কথা উত্থাপন করা উন্মত্তের প্রলাপ মাত্র।

কিছুদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজ স্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যক্ষের পরামর্শক্রমে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ৪টি নগরীতে (মাদ্রাজ, মাদুরা, কাম্বেতুর ও ত্রিচিনোপলী) সরকারী লোকের দ্বারা মৃত্যু সংখ্যা গণনা করা হয়। তাহার ফলের সহিত আমাদের গণনা সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। সর্ব্বশুদ্ধ ১৮৩০০০ লোকের হিসাব গ্রহণ করা হয়। তাহাদের মধ্যে ৭৩০৫ শিশু জন্ম লাভ করে। গণনার ফলে দেখা যায় যে, আয় বৃদ্ধি হইলে মৃত্যু সংখ্যার হ্রাস ও আয়ের হ্রাসে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এই কথা আপনা হইতেই এমন সুস্পষ্ট যে, ইহা বুঝিতে কোনও বুদ্ধি শুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। বিমূঢ়ধী শিক্ষাবর্জ্জিত বালকের নিকট যাহা স্পষ্ট হইতে সুস্পষ্ট, তাহা বুঝিতে যে গণনার সাহায্য লইতে হয় ইহাই আশ্চর্য্য। মাদ্রাজগণনায় দেখা যায় কোন পরিবারে ২৫৲ টাকার ভিতর মাসিক আয় হইলে মৃত্যুর হার হাজারে ১২০ জন, ২৫ টাকা হইতে ৫০ টাকার মধ্যে আয় হইলে ঐ হার ১০৫, আর ৫০ টাকার অধিক আয় হইলে হাজারে

৬৩ জনের মাত্র মৃত্যু হয়, অর্থাৎ দারিদ্র্য গ্রস্ত ও পীড়িতজনের বাল্যমৃত্যু সংখ্যার তিনভাগের একভাগ মাত্র।

গণনার দ্বারা যদি কিছু সপ্রমাণ হয়, তাহা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে আহারের উপরই জীবন নির্ভর করে (অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণাঃ) এবং আহার ভিন্ন অন্য কারণগুলি প্রায় কিছুই নহে। একদিকে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রধান দেশবাসী দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় বিধ্বস্ত বৎসরের ৪ পাউণ্ড আয়ের লোকের মধ্যে হাজার করা ৮৪ টী মৃত্যু, আর বিলাতের স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে আধুনিক সভ্যতার পুষ্ট ৬৫ পাউণ্ড বাৎসরিক আয়ের (ভারতের ১৬ গুণ) অধিবাসীগণের মধ্যে হাজার করা ৭০টী মৃত্যু। এই দুইটী তুলনা করিলে আমাদের দেশের অবস্থা অনেক ভাল বলিতে হইবে।

মাদ্রাজের সরকারী তদন্তের পর আর মিস্ মেয়োর ন্যায় Clap-trap লোকের অলীক অমূলক কথায় কর্ণপাত করিয়া ভারতের সভ্যতাও সমাজনীতিকে নিন্দা করা চলে না। পরের মুখে ঝাল না খাইয়া, বৃথা আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবার এই প্রাচীন ও অপরূপ সভ্যতার লীলাভূমি ভারতের তত্ত্ব অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। হিন্দু সভ্যতার মুখে চুণ কালি দিতে গিয়া, প্রাচীন ভারতের নির্ম্মল যশে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিতে গিয়া, মিস্ মেয়ো আত্মহারা হইয়াছেন। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া লজ্জার মাথা খাইয়া বলিয়াছেন—যে হিন্দুর মেয়ে প্রায়ই ৮বৎসর বয়সে গর্ভধারণ করে। এত দূর মিথ্যা কথা কোন ভারতবাসী কল্পনাও করিতে পারে না। মিস্ মেয়ো বলিয়াছেন যে এ দেশে এগার বা বার বৎসর বয়সে সন্তান প্রসব করাই সাধারণ এবং ১৪ বৎসর বয়সের ঊর্দ্ধে প্রথম সন্তান হওয়া বিরল। বিদেশীয় দিগের এই সব বাতুলের প্রলাপ শুনিবার ও বিশ্বাস করিবার এত ব্যস্ততা দেখিয়া আরও বিস্মিত হইতে হয়। মাদ্রাজের সরকারী তদন্তে পাওয়া যে ১৮৩০৪০ লোকের মধ্যে ১৭০০ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং ১৫ বৎসরের অপেক্ষা অল্প বয়সে গর্ভধারণ করিয়াছে এরূপ বালিকার সংখ্যা শতকরা ·৫৯, অর্থাৎ দুই শতের ভিতর একজন। আর মিস্ মেয়ো বলেন কিনা হিন্দুর মেয়ের ৮ম বর্ষে গর্ভ ধারণ করা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। লোকে কথায় বলে দশে মিলে ভগবান্ ভূত। মাদ্রাজের সরকারী তদন্তে আবিষ্কৃত সত্যও মিস্ মেয়োর প্রলাপোক্তির কাছে (বিস্ময় জনক) ভৌতিক বলিয়া মনে হয়!

প্রত্যেক ভারতবাসীর গড়ে বাৎসরিক আয় ২৭৲ (১পাউণ্ড ১৬শিলিং) দাদাভাই নওরোজী স্থির করিয়াছিলেন। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জন লোক পিছু বাৎসরিক ৩ পাউণ্ড আয় নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং এখন সরকারী রিপোর্টে বাৎসরিক ৫ পাউণ্ড হিসাব করা হইয়াছে। এখন জিনিষ পত্রের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে ইহা সরকারী রিপোর্টেও স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব এই সরকারী হার এখন বাৎসরিক ৩ পাউণ্ড হয়। বিলাতে (গ্রেটব্রিটেনে) প্রত্যেক অধিবাসীর বাৎসরিক আয় ৬৫ পাউণ্ডের উপর এবং একমাত্র সুরা পানেই প্রত্যেকের ৬।০ পাউণ্ড খরচ হয়। শিশুগণ মদ্যপানে অক্ষম, অতএব এ জন্য শিশুদিগকে বাদ দিলে গ্রেটব্রিটেনে লোক পিছু কেবল মদ্যপানেই ১৩ পাউণ্ড খরচ হয়। ভারতের তুলনায় গ্রেটব্রিটেন ঐশ্বর্য্যের স্বপ্নরাজ্যে বাস করি-তেছে এবং গ্রেটব্রিটেনের তুলনায় ভারত অভাবের নিম্নতম কূপে নিমগ্ন। এতাদৃশ অবস্থায়

পার্থক্য থাকিলে দুইটী দেশে কি করিয়া তুলনা হইতে পারে ? গ্রেটব্রিটেনবাসী এক মাসে যে টাকা উপার্জ্জন করে, সেই টাকা উপার্জ্জন করিতে ভারতবাসীর দেড় বৎসরেরও উপর সময় লাগে। একজন দৈন্য দশার চরম সীমায় অবস্থিত, এবং আর একজন ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে সুখে সুপ্ত ; এই দুইজনের তুলনা করা কি অতীব গর্হিত নহে ? একজনের যে টাকাতে প্রাণধারণ হয় আর একজন তাহার দ্বিগুণ কি তিনগুণ নেশাতে উড়াইয়া দেয়। ভারতে অধিকাংশ লোকের এক সন্ধ্যার বেশী অন্নের সংস্থান হয় না। কাজেই মৃত্যুসংখ্যা যে বেশী হইবে, এই হতভাগ্য দেশে ভূমিষ্ঠ শিশু যে অল্পায়ু হইবে এবং অনশন ক্লিষ্ট মাতা যে প্রত্যেক বার প্রসবের পর মৃত্যুপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে তাহার আর বিচিত্র কি ! একসন্ধ্যা বই আহার অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। সেই আহারও শুধু দুইটী ভাত কি দুখানি রুটি এবং কখনও বা একটু ডাল তৈল ; মাখন, ঘৃত প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য অধিকাংশ লোকের স্পর্শ করিবার ভাগ্যও হয় না। অতি শৈশবে অর্দ্ধাশন হেতু স্তন্যহীন মাতার মাতৃস্তন্য ছাড়া অধিকাংশ শিশু জীবনে কখনও দুধের স্বাদ পায় না। শুধু তাহাই নহে, ইহার উপর ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইয়া দুরবস্থা শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৮৭৮ হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত এই ২৫ বৎসরে সরকারী রিপোর্টেই প্রকাশ ১১ বার দুর্ভিক্ষ হইয়া লক্ষ লক্ষ লোক ও গবাদি পশু পঞ্চত্ব পাইয়াছে এবং যাহারা রহিল তাহারা সর্ব্বস্বান্ত ত হইলই অধিকন্তু তাহাদের স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য ভগ্ন হইয়া গেল। এই গুলি যাঁহারা দেখিতে পান না, কেবল দেখিতে পান যে সামাজিক রীতি নীতিই ভারতবাসীর যত দুঃখের আকর, তাঁহাদের যে কি আখ্যা দেওয়া উচিত ভাষায় খুজিয়া পাওয়া যায় না।

ভারতে বন্যার ফলে এমন দুর্দ্দশা হয় যে অন্যত্র তাহা কল্পনা করা যায় না। বৎসর বৎসর আমরা শুনিতে পাই বন্যায় বিস্তৃত জনপদ ধ্বংস করিয়া দিতেছে। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে উড়িষ্যা, উত্তর বঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গ, বোম্বাই, মাদ্রাজ—প্রত্যেক প্রদেশেই বন্যার অত্যাচারে শত সহস্র লোক একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতা ও ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত আমেরিকার কৃষকেরা যদি একবার মাত্র ক্ষণস্থায়ী বন্যার ফলে পেলেগ্রা নামক ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে দারিদ্র্যপীড়িত পুনঃ পুনঃ বন্যা ও দুর্ভিক্ষের অত্যাচারে বিধ্বস্ত ভারতবাসীর যে কি অবস্থা হওয়া উচিত সহজেই অনুমান করা যায়।

একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। উড়িষ্যা প্রদেশে সাত বৎসরের ভিতর সরকারী রিপোর্টেইপ্রকাশ দুইবার দুর্ভিক্ষ ও পাঁচ বার বন্যা হইয়াছে। যে অত্যাচারে পড়িলে ইউরোপ বাসীর চিহ্নও থাকে না সে অত্যাচার সহ্য করিয়া উড়িষ্যার কৃষক যে বাঁচিয়া আছে ইহা বড়ই সুখ্যাতির বিষয়। এই অবস্থায় যে অনেক শিশুর প্রাণবিয়োগ হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

ভারতবাসীর স্বাস্থ্যভঙ্গের আর দুইটী প্রধান কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে—ম্যালেরিয়া এবং খাদ্যদ্রব্যে অখাদ্যের মিশ্রণ (ভেজাল)। আধুনিক সভ্যতার ফল এই ভেজাল—ভেজিটেবল ঘি ও মিলের চাল। দেশের লোকে এমন একটী খাদ্য খুঁজিয়া পায় না যাহা স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর। প্রায় সকল খাদ্যদ্রব্যে অখাদ্য মিশাইয়া বিক্রয় হইতেছে। কাজেই লোকে ভাইটামিন আর মোটেই পাইতেছে না। একে ত খাইতেই পায় না, তাহার উপর যাহা পায় তাহাতে অখাদ্য কুখাদ্যই বেশী। এইরূপ অবস্থা

যদি অন্য কোনও দেশে হইত তাহা হইলে সে দেশের লোক একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইত অথবা আমেরিকার মত পেলেগ্রা রোগগ্রস্থ হইয়া পড়িত।

এই নিদারুণ দৈন্যদশা; তাহার উপর পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ এবং ঘন ঘন বন্যায় দেশ বিধ্বস্ত হইয়াও লোকের দুঃখের শেষ হইল না। ইহার উপর যমদূতের ন্যায় দারুণ ব্যাধি যাহা রেলওয়ের প্রসাদে আমাদের দেশে স্থান পাইয়াছে—ম্যালেরিয়া কি ইতর কি ভদ্র, কি ধনী কি দরিদ্র সকলকেই আক্রমণ করিল। কত লোক যে মরিল তাহার ঠিকানা নাই। যাহারা প্রাণে বাঁচিল তাহারা অন্তঃসারশূন্য হইয়া ছায়া মাত্র হইয়া রহিল। ১৮৬০ সালের পূর্ব্বে ভারতে ম্যালেরিয়া ছিল না বলিলেই চলে। বড় বড় রেলওয়ের জন্য দেশের জল নিকাশের পথ অবরোধ করিয়া বড় বড় বাঁধ দেওয়া হইল। তাহাতে সেতু করা হইল বটে, কিন্তু সে নিতান্ত ক্ষুদ্র। ফলে যে স্থান পূর্ব্বে স্বাস্থ্যকর ছিল তাহা এক্ষণে জলাজমিতে পরিণত হইল। ১০ বৎসর অতীত না হইতে ম্যালেরিয়া রাক্ষসী এই জলাভূমির আসনে বসিয়া তাহার বিরাট ভোজ আরম্ভ করিল। লোক মরিতে লাগিল—শত শত নহে, সহস্র সহস্র নহে, লক্ষ লক্ষ লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

ইহাতে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর মারা যায়; এবং ইহার কত গুণ লোক যে মৃতপ্রায় হইয়া থাকে তাহার নির্ণয় নাই। পশ্চিম বঙ্গে গ্রামের পর গ্রাম একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে; এবং জনশূন্য বাড়ীর ভিতরে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া ম্যালেরিয়ার প্রতাপ ঘোষণা করিতেছে। রেলওয়ে নির্ম্মাণের অল্প পরেই এদেশে এই ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। তাহার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এ অবস্থায় ছেলে মানুষ হওয়া দূরে থাকুক, বাঁচাই সঙ্কট। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পিতা মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ম্যালেরিয়ায় জরজর রক্তহীন মাতার স্তন্য পান করিয়া, এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে ম্যালেরিয়ার হাওয়া গ্রহণ করিয়া, শিশু যে কি করিয়া বাঁচে ও মানুষ হয় ইহাই বিস্ময়ের কথা।

পুনঃ পুনঃ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ এবং প্রবল বন্যায় বিধ্বস্ত, তদুপরি রেলওয়ের প্রসাদে উৎসন্ন ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জরজর হইয়া অর্থাভাবে অন্নাভাবে দেশ শ্মশান প্রায় হইয়াছে। সেই দেশের শিশু ও প্রসূতি কি কারণে মারা যাইতেছে তাহার কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া কেবল উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব ও দেশের অস্বাস্থ্যকর সমাজ নীতিই কারণ বলিয়া যাহারা চীৎকার করিয়া থাকেন, তাহাদের যে কি বলিতে হয় তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। চিকিৎসকের ত' কথাই নাই। তাঁহাদের পক্ষ হইয়া বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, তাঁহারা উন্মত্তবৎ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া কি বলিতে কি বলিয়াছেন বুঝিতে পারেন নাই। যদি দেশের পুরাতন রীতিনীতি ও কুসংস্কার পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকিত তাহা হইলে শিশু ও প্রসূতির মৃত্যুর হার এত বাড়িতে পারিত না। মৃত্যুসংখ্যা কমিবার কোনও লক্ষণই নাই এবং বৎসরের পর বৎসর সমভাবেই চলিতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে হিন্দুর সমাজবন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া গিয়াছে। এজন্য পল্লীগ্রামের পুরাতন ধাত্রীর পরিবর্ত্তে সহরের অনেক পরিবারে পাসকরা ধাত্রীর আবির্ভাব হইয়াছে। ফলে শিশু ও প্রসূতির মৃত্যু সংখ্যা পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে দ্বিগুণ হইয়াছে। ইহা হইতে সমাজনীতির ও অসহায় ধাত্রীর প্রতি দোষারোপ করা যে কত অন্যায় তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মান্দ্রাজের রিপোর্টে প্রকাশ সহরের শতকরা প্রায় ৩৩টী ডাক্তারী শিক্ষিত দাই প্রসব

করায়, কিন্তু প্রত্যেক স্থলেই সহরে শিশুর ও প্রসূতির মৃত্যু সংখ্যা পল্লীগ্রামের দ্বিগুণ। যুক্ত প্রদেশের সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ—পল্লীগ্রামে ১৫০, সহরে ২৪৪; পল্লীগ্রামে সহরের মৃত্যু সংখ্যার অর্দ্ধেক বলিয়া প্রমাণ হইতেছে যে, দেশীয় ধাত্রীবিদ্যার এবং ধর্ম্ম ও সমাজনীতির একেবারে অযথা নিন্দা করা হইয়াছে এবং প্রকৃত কারণের জন্য অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

কলিকাতা হেল্‌থ অফিসারের রিপোর্ট হইতে পাওয়া যায় যে কলিকাতায় শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যার শতকরা ২৯টী ব্রঙ্কাইটিস্ ও ব্রঙ্কোনিউমোনিয়াতে এবং জন্মগত দৌর্ব্বল্যের জন্য শতকরা ১৮টী। হেল্‌থ্ অফিসার বলেন যে এই পুনঃ পুনঃ শ্বাসযন্ত্রের রোগের কারণ প্রধানতঃ অস্বাস্থ্যকর বসতিতে বাস করা এবং দ্বিতীয়তঃ যথেষ্ট কাপড় চোপড়ের অভাবে ঠাণ্ডা লাগা। অতএব প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্থলে অর্থাভাবই মৃত্যুর কারণ। জন্মগত দুর্ব্বলতারও কারণ প্রায়ই অর্থের অভাব। অতএব শতকরা প্রায় ৪০টী মৃত্যুর কারণ অর্থাভাব। প্রসবের গণ্ডগোলের জন্য শতকরা ৮টী মারা যায়। অপরিষ্কার প্রসূতিচর্য্যা অপেক্ষা অর্থের অনাটনই তাহার প্রধান হেতু।

যাহা বলা হইল তাহা হইতে নিরপেক্ষ ব্যক্তির আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে না যে ভারতে শিশু-দিগের অকাল মৃত্যুর কারণ অর্থাভাব। শুধু তাহাই নহে, নিরপেক্ষভাবে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যে সমাজনীতির নিন্দা হইতেছে সেই সামাজিক রীতিনীতিই এতকাল বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। এই অবস্থায় অস্ত্যজাতির চিহ্নও থাকিত না। ভারতে শিশুকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে কয়েক ঘণ্টা রাখার প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। ইহাতে রক্তের ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফেট বৃদ্ধি করিয়া সতেজ করে এবং এই কারণেই এত অর্থকষ্ট সত্ত্বেও এদেশে রিকেট্‌স্ (rickets) রোগ নাম মাত্রই হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে বিলাতী চিকিৎসকগণ ইহার উপকারিতা এতদিন বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া এই প্রথা উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। সেইরূপ আমাদের দেশে দুধ জ্বাল দিয়া শিশুকে খাওয়ান হয় বলিয়া শিশুদিগের পেটের পীড়া (পৈত্তিক এবং আন্ত্রিক পীড়া—gastric intestinal disorder) এত কম। এ কথা হেল্‌থ্ অফিসার তাঁহার রিপোর্টেও লিখিয়াছেন। এমন কি বাল্যবিবাহ এবং অবরোধ প্রথা—যাহার নিন্দা করিতে কেহ ক্ষান্ত হন না, তাহার কল্যাণে আজও উপদংশ (ফিরিঙ্গ রোগ বলিয়া যাহা এ দেশে সর্ব্বত্র পরিচিত) প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। বাল্যবিবাহের সন্তানগণ যে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হয়—পাশ্চাত্য সমালোচকগণ যেমন বলিয়া থাকেন—তাহা নহে। তাহারা এমন বলিষ্ঠ ও তেজী হয় যে তাহাদের যে, দেশেই জন্ম হউক না কেন তাহারা দশের গৌরবস্থল বলিয়া আদৃত হইবে। পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে অতি অল্প দিন পূর্ব্বেও দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। তথায় ম্যালেরিয়া বা তৎপ্রকার কোনও ব্যাধি নাই বলিয়া, বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা সত্ত্বেও, এমন সবল ও সুস্থকায় পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদেশীগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যান। ম্যাক্ ক্যারিসন বলিয়া গিয়াছেন যে পশ্চিম পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এমন সুন্দর ও বলিষ্ঠ দেহ দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাদিগকে পৃথিবীর আদর্শ বলা যাইতে পারে। বিদেশী নিন্দকেরা এ বিষয়ে লক্ষ্য করেন না, কেননা অস্বাস্থ্যকর এবং নিন্দিত সমাজনীতিতে এমন অপরূপ ফল কি করিয়া হইতে পারে! হিন্দুদের এবং বোধ হয় মুসলমানদেরও ধর্ম্মে শারীরিক ও মানসিক আচার পালন করিবার বিশেষ নিয়ম আছে। পাশ্চাত্য দেশে আজ পর্য্যন্তও তাহার কিছুই

নাই। আমাদের আচারে প্রত্যুষে স্নান, খাইবার পূর্ব্বে ও পরে ভাল করিয়া হাত ধোওয়া, প্রত্যহ নিম বা অন্য কোন স্বাস্থ্যকর গাছের দন্ত কাষ্ঠ (দাঁতন) ব্যবহার করা, পায়খানা হইতে আসার পর শৌচাদি, মদ্যপান একেবারে বর্জ্জন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত স্ত্রীসঙ্গ হইতে বিরত থাকার (যথা ঋতু-কালে, গর্ভাবস্থায়, এবং প্রসবের পর কয়েক মাস, বিশেষ তিথিতে) নিয়ম আছে। এই সকল এবং অন্যান্য কল্যাণকর প্রথা, এত দৈন্য দশা সত্ত্বেও দেশকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে এই সদাচার হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই এ যাবতীয় দুঃখের কারণ।

কলিকাতায় ক্ষয় রোগের মৃত্যুর হার হইতে দেখা যায় যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে, যে হিন্দুর নিরামিষ ভোজন, বাল্যবিবাহ, অবরোধ প্রথা প্রভৃতি বিদেশীগণের চক্ষে অতি কুৎসিৎ কদাচার বর্ত্তমান তাহাদের মধ্যেই ক্ষয়রোগে মৃত্যুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম। বিলাতী পাদরী দিগের কৃপায়, যে সকল আচার ব্যবহারে তাহাদের আতঙ্ক জন্মে, খ্রীষ্টানগণ সকলই তাহা ত্যাগ করিয়া শিক্ষিত ও সভ্য হইয়াছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে ক্ষয়রোগে মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। যদি ঘটনা বা সংখ্যার দ্বারা কিছু প্রমাণ হয়, তাহা হইলে এই প্রতিপন্ন হয় যে, যাহারা এই সকল কদাচার ত্যাগ করিয়া সভ্য হইয়াছে, ক্ষয়রোগ তাহাদেরই বেশী ধরে এবং যাহারা এই সকল আচার ধরিয়া আছে তাহাদের তেমন ধরে না। ইহার এই অর্থ হয় যে, ক্ষয়রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে গেলে বাল্যবিবাহ এবং অবরোধপ্রথার আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। ইহা শুধু এক বৎসরের রিপোর্ট হইতে সংগ্রহ করা নহে, বৎসরের পর বৎসর এই ভাবে চলিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ দুই বৎসরের মৃত্যু সংখ্যা হাজারকরা নীচে দেওয়া হইল।

	হিন্দু	মুসলমান	খ্রীষ্টান
১৯২৬	২·৫	৩·৩	৩·৭
১৯২৭	২·৭	৩·৬	৪·৪

যে সকল দুঃখ কষ্টে পড়িলে অন্য জাতি নিঃশেষ হইয়া যাইত সেই দুঃখ কষ্টে পড়িয়া চিরকালের যে আচার ও প্রথা মানিয়া চলিয়াই রক্ষা পাইয়াছে, সেই আচার ও নীতিতে এখনও রত থাকার জন্য অযথা দোষারোপ করা নিতান্ত অন্যায়, আশা করি এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ করা হইয়াছে।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ল্যান্সেট্ পত্রিকার যে সংখ্যায় ভারতের শিশু দিগের অকাল মৃত্যুর শোকে তাঁহাদের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছে, সেই সংখ্যাতেই তাঁহাদের বার্লিনস্থ সংবাদ দাতার পত্রে প্রকাশ যে, বার্লিনে যতগুলি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, ততগুলি গর্ভপাত করা হইয়া থাকে, এবং সমাজের উচ্চ স্তরে গর্ভ নাশকরাই সচরাচর হইয়া থাকে। গর্ভনষ্ট করিবার জন্য কত যে কুৎসিৎ পাপ করে তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। গর্ভপাত করান হইয়াছে তাহার সংখ্যা গর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংখ্যার ৫ গুণ! ধর্ম্মের শাসন রূপ আশ্রয় হইতে সমাজতরী, দারুণ কামের প্রবল ঝঞ্চায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া নিরাশ্রয় ও কর্ণধার বিহীন হইয়া একমাত্র কুৎসিৎ ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা-রূপ সাগরে ইতঃস্ততঃ ভাসমান হওয়ার নিদারুণ কাহিনী শুনিলে ভারতবাসীর বুক কাঁপিয়া উঠে এবং নাড়ী ছাড়িবার উপক্রম হয়। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া পারা যায় না যে, ইহাদের নিকট মনুষ্য জীবনের কোন মূল্যই নাই এবং যতই কোন জাতি পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চ

হইতে উচ্চ স্তরে উঠিতে থাকে, ততই দেশে দেশে সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া শ্রদ্ধার সহিত পূজিত আচার ও রীতি নীতি হইতে দূরে চলিয়া যায়। অবিবাহিতা মাতার এবং গর্ভনাশ করার নিন্দা করিলে, তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে যে জাতি বিন্দু মাত্রও লজ্জা বোধ করে না, তাহাদের যে কি বলিতে হয় ভাবিয়া পাই না। আমরা কেবল এই মাত্র বলিতে পারি—যে সভ্যতায় সংযমের গৌরব নাই, সাধুতার আদর নাই এবং ধর্ম্মের সিংহাসনে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা অধিষ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছে, সে সভ্যতার কবল হইতে আমাদের রক্ষা কর।

যাহা বলা হইল তাহা হইতে বিদেশীয় সমালোচকদিগের নিন্দা যে কতদূর মিথ্যা তাহা বুঝিতে কোনও সত্যপ্রিয় ব্যক্তির কাল বিলম্ব হইবে না। আত্মাভিমানে প্রমত্ত হইয়া বিদেশীয় সমালোচকগণ আমাদের দেশের সত্যকে পদদলিত করিয়াছেন! স্বদেশের সন্নিকটে যাহা সত্য আছে তাহা দেখিতেও পাইলেন না। ভারতবর্ষে মানুষ মরিলে তাঁহারা দুঃখে আকুল হইয়া উঠেন, কিন্তু যখন নরহত্যা করা তাঁহাদের প্রয়োজন, তখন তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইতে দেখা যায় না। ভারতের সমাজকে নিন্দা করিবার আবশ্যক হইলেই মানব জীবন তাহাদের নিকট অমূল্য হইয়া উঠে।

আমাদের যাহা বক্তব্য বলা শেষ হইয়াছে। আশা করি ল্যান্সেটের সম্পাদকের ন্যায় বিজ্ঞানবিদ্গণ আমাদের কথাগুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন, পাশ কাটিয়া সরিয়া না গিয়া যেখানে সত্য বলা হইয়াছে তাহা স্বীকার করিবেন এবং যাহা যুক্তিবিরুদ্ধ বোধ করিবেন তাহার খণ্ডন করিবেন।

যাঁহারা অহমিকা-মদে একেবারে প্রমত্ত নহেন এবং সকল জ্ঞানের বীজ স্বরূপ দৈন্যের কণাও যাঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান্ এবং যাঁহাদের হৃদয়ে সত্যই একমাত্র অর্চ্চনীয়, তাঁহাদের নিকট সত্যে প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত সনাতন হিন্দু শাস্ত্রের যে কি প্রতিষ্ঠা আছে, তাহার পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রাচ্যদিগের বিদ্যায় সুপণ্ডিত স্যার জর্জ বার্ডউড্ কে-সি-আই-ঈ, সি-এস-আই, এল্-এল্-ডি, এম্-ডি, এম্-আর-সি-এস্, লিজান্-অফ্-অনার্—প্রণীত "স্ব" নামক গ্রন্থ হইতে দুই চারিটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"........আমার মাতৃভূমি শ্রীভারতের প্রতি এবং তথাকার চতুর্ব্বর্ণ-সম্বলিত দেবোপম পবিত্র অধিবাসীদিগকে ভক্তি বিনম্রচিত্তে এই পুস্তক উৎসর্গ করিতেছি।"

"সুন্দরী চিৎপাবনীদিগের (মহারাষ্ট্র মহিলা) পবিত্র মুখমণ্ডল দেখিলে তাঁহাদের অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যায়—আদর্শ কন্যা, আদর্শ পত্নী, আদর্শ মাতা।"

"ব্রাহ্মণদিগের অনন্ত জ্ঞান এবং সর্ব্বোতোমুখী প্রতিভা প্রসূত দেশের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না।"

"সরকারী রিপোর্ট ও কতিপয় হার-সম্বলিত হিসাব পড়িয়া যাঁহারা ভারতের পরিচয় লইয়া ভারতের যে মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন, সে হতশ্রী মূর্ত্তির সহিত প্রকৃত ভারতের কোনও সংশ্রব নাই।"

"আমার মনে হয় চারিশত বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ড কর্ণধারবিহীন হইয়া নিরাশ্রয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যে বিশ্বাসের বলে ভারত স্থির ও গম্ভীর ভাবে অটল হইয়া আছে ইংলণ্ডে তাহার বিশেষ অভাব। তথায় রাজনীতির ছুতায় হেন পাপ নাই যাহা অনুষ্ঠিত হয় না। প্রকৃত উন্নতি বা কল্যাণ পাশ্চাত্য জগৎকে স্পর্শও করে নাই।" ইত্যাদি।

সাধনা

ত্রিদণ্ডী ভার্গব

মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে সৃষ্টিকে মোটামুটি তিন পর্য্যায়ে বিভাগ করা যায়। জড়, জড়চৈতন্য ও কেবলচৈতন্য। মানুষ জড়চেতন পর্য্যায়ে অবস্থিত। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ প্রভৃতি জড়চেতন পর্য্যায়ের মধ্যে অবস্থিত হইলেও মানুষের মধ্যে আনন্দময় নামক একটি পঞ্চম কোষ বর্ত্তমান যাহা অন্য কোন জড় চেতনে নাই। মানুষ কেবল চলন, স্পন্দন, বুদ্ধিশক্তির অধিকারী নহে—তাহার আনন্দানুভব কোষ আছে—মানুষই হাসিতে পারে—অন্য কোন জড় চেতন হাসিতে পারে না। এই জন্যই মানুষজন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম বলিয়া পরিগণিত।

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"শুনরে মানুষ ভাই, শুনরে মানুষ ভাই, মানুষ সবার বড়, মানুষের বড় কেউ নাই।" মানুষ জীব-রাজ। আবার মনুষ্যত্ব লাভ না করিলে মানুষ হওয়া যায় না। সেই মনুষ্যত্ব লাভের যে উপায় তাহাকেই ভারতে সাধনা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। "ভারতের সাধনা" সঙ্কীর্ণ নামে আবদ্ধ নহে—উহা—মানবের সাধনা। এরূপ সর্ব্বব্যাপী ও উদার সাধন পথ আর কোন দেশের কোন সভ্যতায় দেখা যায় না।

সেই মনুষ্যত্ব কিসে লাভ হয় তাহার অনুসন্ধানের ফলে ষড়দর্শন ও পুরাণাদি। মনোবিজ্ঞান সাক্ষ্য দিতেছে যে মানস শক্তিকে যে যত কেন্দ্রীভূত করিতে পারে—সে সাধন পথে তত সহজে অগ্রসর হইতে পারে। তা ভাল পথেই যাক্—আর মন্দ পথেই যাক্। মানুষ জড়চেতন সুতরাং তার নিছক চেতন বস্তুতে অধিকার থাকা বিজ্ঞানে অপ্রতিপাদ্য। আবার একটা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত সম্মুখে না ধরিলেও সাধন পথে অগ্রসর হওয়া অস্বাভাবিক। এই জন্যই Mythology, এই জন্যই অবতার বাদ, এই জন্যই ভূদেব ব্রাহ্মণের সৃষ্টি। এই জন্যই পিতৃভক্তি, এই জন্যই মাতৃভক্তি। ভক্তির অন্য কোন অর্থ নাই—যে মানসিক অবস্থা একটা শ্রেষ্ঠতর জড় চেতনে—তাহা প্রত্যক্ষ হউক্ বা কল্পিত হউক্—পরানুরক্তি আনিয়া দেয় তাহাই ভক্তি নামে অভিহিত হইতে পারে। পরানুরক্তি কখনই উচ্ছৃঙ্খল মনে আসিতে পারে না। আজ একটা ধরিলাম, কাল আর একটা ধরিলাম—এই এক ভাবে মনকে চালিত করিলাম আবার পরক্ষণেই খেয়ালের বশে আর এক দিকে মনকে দিলাম—তাহাতে পরানুরক্তি আসিতে পারে না। মানুষ যখন কি শয়নে, কি জাগরণে, কি প্রস্থানে, কি উপবেশনে, কি উন্মেষণে কি নিমেষপরিত্যাগকালে—সকল সময়েই যখন সেই আদর্শের চিন্তায় মুগ্ধ হয়, তখন তার সেই আদর্শে অনুরক্তি আইসে। যেমন সতী স্ত্রী। এই জন্যই উন্নতি কল্পে অনুরাগের এত আদর।

অতএব দেখা যায় যে আমরা যাহা কিছু করিতে যাই না কেন—আগে আদর্শ ঠিক করা একান্ত প্রয়োজন। আদর্শের অনুশাসন অনুসারে না চলিলে আমাদের কোন দিকে উন্নতি নাই। এবং আমরা আদর্শ হারাইয়াই আজ এত অধঃপাতে গিয়াছি। যাঁহাদের নিঃস্বার্থ চেষ্টায় সেই আদর্শ

আবার ফুটিয়া উঠিবে—তাঁহারাই আমাদিগকে সত্য সত্য উন্নতির পথে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবেন। আদর্শ কি তাহাই প্রথম চিন্তা।

ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সেই আদর্শ সৃষ্টি বিষয়ে বহুল সাফল্য লাভ করিয়াছিল। নিঃস্বার্থপরতা, পরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগ (এমন কি অস্থি দান পর্য্যন্ত) ভূদেব ব্রাহ্মণে মূর্ত্তিমান্ ছিল। বীরত্বে ও সত্যপালনে ক্ষত্রিয় অদ্বিতীয়। বাণিজ্যে বৈশ্য দৃষ্টান্ত—সেবা ধর্ম্মে শূদ্র বিখ্যাত ছিল। আজ কাল-প্রভাবে আদর্শ হারাইয়া গিয়াছে—প্রকৃত বস্তু অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে—তাহার উদ্ধার এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। তবে ঈশ্বরানুগ্রহে সবই সম্ভব—হয়ত কিছু একটা আদর্শ আবার সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইবে। নিরাশ হওয়া মনুষ্যের অনুচিত।

বৈষ্ণবের কথা—বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু—তর্কে বহুদূর। শাস্ত্রের বাক্য—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেন যোজয়েৎ।

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথা-হনুমেয়মিতি চেদেবমপ্য নির্মোক্ষ প্রসঙ্গঃ। (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১)

নৈষা তর্কেন মতি-রাপনেয়া (শ্রুতি)

সমগ্র শাস্ত্র, সমস্ত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন ও বহু সজ্জন সংসর্গ করিলেও—আমরা যতক্ষণ না কোন আদর্শের অনুশাসন মানিয়া চলিব ততক্ষণ মনুষ্যত্ব লাভের পথে একটুও অগ্রসর হইতে পারিব না। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে কালোচিত আদর্শ মহাত্মা গান্ধী—তবে আমরা যতটা পারি তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া চলিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার প্রতি অনুরক্তির উদ্রেক হইলেই সামান্য যশোলিপ্সা, পাণ্ডিত্যাভিমান, হীন স্বার্থপরতা প্রভৃতি সরিয়া গিয়া—আপনা হইতে একটা সহযোগ বাহনের সৃষ্টি হইয়া পড়িবে। ব্যক্তিগত প্রাধান্য লাভের প্রবল ইচ্ছা—আদর্শের অনুশাসনে ডুবিয়া যাইবে। এই মনোভাবের নামান্তর গুরুভক্তি—গুরুভক্তি মনুষ্যপূজা নহে। উহা উন্নতির প্রধান ও একমাত্র সোপান।

মুখে মহাত্মা গান্ধীকে বড় বলিলে কিছুই হইবে না। তাতে একটা কাপট্য-পূর্ণ দলের সৃষ্টি হইবে মাত্র। দল লইয়া কখনও জগন্মঙ্গলকর কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই—হবেও না। পাতঞ্জল দর্শনে আছে—অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎ সান্নিধ্যে বৈরঃত্যাগঃ। ইহা গান্ধী হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত প্রায়। তাঁহার এই অহিংসা প্রতিষ্ঠাই তাঁহাকে আদর্শ স্থানে লইয়া গিয়াছে। আমরা সেই অহিংসাপ্রতিষ্ঠার জন্য সকলে আজ গান্ধীর অনুশাসনে সাধন করিতে প্রচেষ্ট হইলে—অন্ততঃ অনুরক্তি লাভের সহজ পথ পাইতে পারি। এই সূত্রে যদি এইখানে পাঠকের স্মরণার্থ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের একটা কথা উদ্ধৃত করি তবে বোধ হয় রসভঙ্গ হইবে না:—
The essence of religion is the strong and earnest direction of emotions and desires toward an ideal object recognised as of the highest excellence and is rightfully paramount over all selfish objects of desire."

আলোক ছড়াইয়া আছে তাহাকে ধরা যায় না। সেই আলোকে আগুন আছে। একটি লেন্স বা চকমকি-ধরিলে সেই বিচ্ছুরিত আলোক একটা স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া তাপ বৃদ্ধি করে ও পরিশেষে অগ্নিতে পরিণত হয়। সেই ঘনালোক তখন ধরা যায় ও তদ্বারা কত জীব মঙ্গলকর

কার্য্য করা যায়। আমাদের মন বিষয়াবদ্ধ থাকায় সহস্র মুখে প্রধাবিত। গুরুভক্তি রূপ লেনস্ না ধরিলে সে মনে আগুন হইবে না—সে মন যে প্রবল প্রতাপান্বিত তাহা বুঝা যাইবে না। এই জন্যই সাধন পথে গুরু ভক্তির এত আদর এত প্রশংসা। যে অতিশয় দুর্ভাগা সেই গুরুভক্তিকে মনুষ্যপূজা ভাবে। হয় গান্ধীকে না হয় কোন একটা শ্রেষ্ঠ-আদর্শকে জড়াইয়া ধরিতে হইবে নতুবা সকল প্রচেষ্টা বালকের হুল্লড় খেলা মাত্র—আজ আছে কাল নাই। পরিণাম বিবাদ—লোক হাসি।

যদি আদর্শকে খুঁজিয়া না পান, তবে আমার সঙ্গে আসুন—ভীষ্মদেব যাহা বলিয়া পূর্ণাদর্শপুরুষোত্তম বাসুদেবকে জড়াইয়া ধরিয়া—জগতে অদ্বিতীয় বীর অদ্বিতীয় ভক্ত অদ্বিতীয় মানব হইয়া ছিলেন, তাই বলিয়া আজ সেই ভারতের আদর্শের—মানবের আদর্শের শ্রীচরণে প্রণাম করি :—

সর্ব্ব ভূতাত্ম ভূতায় ভূতাদি নিধনায়চ।
অক্রোধ দ্রোহ মোহায় তস্মৈ শান্তাত্মনে নমঃ ॥

(পাঠক ইচ্ছা করিলে মহাভারত শান্তি পর্ব্বে ভীষ্মদেব শ্রীহরির যে অপূর্ব্ব স্তব করেন তাহা পাঠ করিতে পারেন। সে আদর্শ ফেলিয়া আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি মাত্র। একশত সিকার মাপ কাটী হারাইয়া ৩৬ইঞ্চি গজের মাপে নিজের পূর্ব্বসম্পত্তি মাপ করিয়া সবই নীলামে বিক্রয় করিয়া দিয়াছি!)

হিমাচল

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ রায়, বিদ্যার্ণব, এম-এ

হিমাচলের বিস্তৃত ভূমি আর্য্য ঋষিদিগের তপস্যার স্থান এবং সেখানেই প্রধানতঃ বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, পুরাণাদি রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল—প্রত্নতাত্ত্বিকের বিবিধ গবেষণা ও পরিকল্পনার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত হেয় হইতে পারে না। হিমালয়ের বহু স্থান বৈদিক যাগ যজ্ঞ ও পৌরাণিক ক্রিয়া কলাপের নিদর্শন দান করিয়া থাকে। হিমাচলকে আর্য্য সভ্যতার আদি ভূমি বলিয়া অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকও * নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক হিমাচল প্রদেশকেই ভারতীয় সাধনার মৌলিক জন্মভূমি বলিয়া ধরা যাইতে পারে; উত্তরকালে জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্র সকল দক্ষিণ দিকে গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

হিমাচল প্রদেশ এবং হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত ভূমি ঠিক এক কথা নহে। সত্য বটে পূর্ব্বে আসাম হইতে পশ্চিম পাঞ্জাবের উত্তর ভাগ পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের উত্তর সীমানা ব্যাপিয়া অদ্যাপিহ হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী এই ভূমিখণ্ডের মেরুদণ্ডরূপে অবস্থিতি করিতেছে; কিন্তু

* Pargiter's Traditional History of India)

হিমালয় এখানকার একমাত্র পর্ব্বত নহে, ইহার সহিত আরও কয়েকটি পর্ব্বতমালার বিচিত্র সমাবেশে প্রকৃতির রম্য নিকেতন এই জগৎ বরেণ্য ভূমিকে বাস্তবিকই জগতে অতুলনীয় করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রদেশ পূর্ব্বদিকে ৯২° ডিগ্রি হইতে পশ্চিমে ৭২° ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা, এবং উত্তরে ৩৬° ডিগ্রি ও দক্ষিণে ২৬° ডিগ্রি অক্ষ রেখা সীমানার অন্তর্গত। এই প্রদেশে মূল হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী ব্যতীত কারাকোরাম, কৈলাস, লাদক ও যস্কর এবং দক্ষিণ দিকে শৈবালিক পর্ব্বতমালার নাম উল্লেখ যোগ্য। আধুনিক ভৌগোলিক দৃষ্টিতে হিমাচল প্রদেশের অধিকাংশ স্থান ভারত বর্ষের সীমানার মধ্যে অবস্থিত; কেবল উত্তর পূর্ব্ব দিকে কৈলাস, লাডক ও যাস্কর পর্ব্বতান্তর্গত স্থান পূর্ব্ব-তিব্বতের এবং কারাকোরাম ও হিন্দুকোষ উত্তর-পশ্চিম তিব্বতের সীমানার অন্তর্গত। সমুদয় পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে কারাকোরাম সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ; উহা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সহিত মিলিত। বাস্তবিক এই উভয় পর্ব্বতকে একই পর্ব্বতের বিভিন্ন অংশ মাত্র বলা যাইতে পারে। কারাকোরাম সমগ্র তিব্বত দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে; তিব্বতের অধিত্যকা প্রদেশ ইহার উত্তরে অবস্থিত; এবং কাশ্মিরের উত্তরে উচ্চ পামির অধিত্যকা প্রদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই পর্ব্বতমালা পূর্ব্বদিকে ৯২° ডিগ্রি হইতে পশ্চিমে ৬৪° ডিগ্রি পর্য্যন্ত বিস্তৃত; আর ইহার সর্ব্বোত্তরাংশ ৩৬° ডিগ্রি হইতে ৩৭° অক্ষ রেখা ও ৭৬ হইতে ৭২ ডিগ্রি পরিমাণ দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত।

কাশ্মির প্রদেশে এই কারাকোরাম শ্রেণীর অনতিদূরে দক্ষিণ দিকে (৭২° দ্রাঃ ডিগ্রী—৩৬ অক্ষরেখা) কৈলাস পর্ব্বত আরম্ভ করিয়া কারাকোরামের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে তিব্বতের দক্ষিণাংশ দিয়া পূর্ব্বদিকে প্রায় ৯২ দ্রাঃ রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহারই আবার অনতিদূরে দক্ষিণ দিকে ৭৪ দ্রাঃ রেখা ও ৩৬ অঃ রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া লাডক পর্ব্বত শ্রেণী— কৈলাসের সঙ্গে সমান্তরালভাবে সমগ্র তিব্বত দেশ ভেদ করিয়া পূর্ব্বদিকে ৯৪ দ্রাঃ রেখা ও প্রায় ২৯ অঃ রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই তিনটী পর্ব্বতমালাই দৈর্ঘ্যে হিমালয় হইতে বৃহৎ।

লাডকের দক্ষিণে বৃহৎ হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী। ইহাই পশ্চিম দিকে কাশ্মীরে প্রায় ৭৩° দ্রাঃ রেখা ও ৩৫ অঃ রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষকে তিব্বত হইতে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্বদিকে আসামের পূর্ব্বাংশে ৯৪ দ্রাঃ রেখা ও ২৯ অঃ রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। লাডক ও হিমালয়ের মধ্যে যাস্কর পর্ব্বতশ্রেণী। ইহার পশ্চিম দিকে অনুমান ৭৭ দ্রাঃ রেখা ও ৩৫ অঃ রেখার সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকে ৮১ দ্রাঃ রেখা ও ৩০ অঃ রেখাতে হিমালয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এই **বৃহৎ হিমালয়** পর্ব্বতমালার দক্ষিণে এবং বাস্তবিক ইহারই অংশরূপে আর একটী পর্ব্বত-মালা এই হিমালয় প্রদেশে কাশ্মির অঞ্চলে ৭৪ দ্রাঃ রেখা ও প্রায় ৩৫ অঃ রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে ৮৮ দ্রাঘিমা ও ২৯ অঃ রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহাকে **ছোট হিমালয়** শ্রেণী বলা হয়, এবং ইহার দক্ষিণে আর উহার সহিত সমান্তরাল ভাবে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত থাকিয়া শৈবালিক পর্ব্বত মালা অবশেষে ছোট হিমালয় শ্রেণীর পূর্ব্বপ্রান্তে তাহার

সহিত মিলিত হইয়াছে। এই উভয় পর্ব্বতের সম্মিলন স্থানকে ভেদ করিয়া কোষী নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

হিমালয় প্রদেশ—বিশেষতঃ বৃহৎ হিমালয়—যে কেবল জগতের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহা নহে, এত গুলি উচ্চ শৃঙ্গের একত্র সমাবেশও আর কোনও স্থানে দেখা যায় না।

হিমালয় পর্ব্বত হইতে অনেক নদী প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষের উর্ব্বরতা সাধন করিতেছে। ইহাদের দ্বারাও হিমাচল প্রদেশের এক প্রকার বিভাগ সম্পাদিত হইয়াছে, যেমন—

১। সিন্ধু ও সটলাজ নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ **পঞ্জাব-হিমালয়**।

২। সটলাজ ও কালীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ **কুমায়ুন-হিমালয়**। (কালী নদী ক্রমে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া সার্দ্দা ও সরযূ নাম গ্রহণ করিয়াছে, এবং নেপাল হিমালয় হইতে বহির্গত কর্ণালির সঙ্গে মিলিত হইয়া বালিয়া জেলার পূর্ব্ব প্রান্তে গঙ্গাতে পতিত হইয়াছে।)

৩। কালী হইতে তিস্তা পর্য্যন্ত অঞ্চলকে **নেপাল-হিমালয়** বলে।

৪। তিস্তা হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত অঞ্চল **আসাম হিমালয়**।

বলা হইয়াছে যে—জগতের উচ্চতম পর্ব্বত শৃঙ্গ গুলি এই হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত। আবার এত গুলি উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের একত্র সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও দৃষ্টি গোচর হয় না। একাকী হিমাচলে যত গুলি উচ্চ শৃঙ্গ রহিয়াছে, ভূপৃষ্ঠের আর সমুদয় পর্ব্বত শৃঙ্গ গুলি একত্র করিলে তুলনায় তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। আমেরিকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত আকাঙ্কাগোয়া ২৩৯০০ ফুট্ উচ্চ। হিমাচল ব্যতিরেকে ভূপৃষ্ঠের অন্যত্র ইহাই সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ। আফ্রিকার কিলিমানজারো ২০৪০০ ফুট্; য়ুরোপের আল্পস্ পর্ব্বত শৃঙ্গ ইহা অপেক্ষাও কম উচু। আর হিমাচল প্রদেশে ৩টি গিরিশৃঙ্গ রহিয়াছে যাহারা ২৮০০০ ফুট হইতেও বেশী, দুইটী ২৭০০০ ফুটের মধ্যে, ১১টী ২৬০০০ ফুটের উপর, ৩২টী ২৫০০০ ফুটের উপর এবং ২৭টী ২৪০০০ ফুটের অধিক উচ্চ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এ প্রদেশে ৭৫টী শৃঙ্গ রহিয়াছে, যাহা য়ুরোপও আমেরিকা ও আফ্রিকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতেও উচ্চ। ২৪০০০ ফুটের অনধিক উচ্চ শৃঙ্গের সংখ্যা ইহা অপেক্ষাও অনেক অধিক; এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য শৃঙ্গ রহিয়াছে।

হিমাচলের সর্ব্বোচ্চ গিরি শৃঙ্গ তিনটীর মধ্যে দুইটী—এভারেষ্ট (২৯১৪১ ফুট) ও কাঞ্চনঝঙ্গা ১ সংখ্যক (২৮২৯৫ ফুট)—নেপাল হিমালয়ে অবস্থিত; ৩য়টি, কাঞ্চন ঝঙ্গা ২ সংখ্যক (২৮২৫০ ফুট) কারা কোরাম পর্ব্বতে অবস্থিত। সাধারণতঃ ভূগোলে এভারেষ্টেরউচ্চতা ২৯০০২ ফুট ও কাঞ্চন ঝঙ্গার উচ্চতা ২৮১৪৬ ফুট দেখান হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে পাঁচটী বিভিন্ন সমতল ক্ষেত্র হইতে এবং ১৮৫০ খৃঃ অব্দে অপর একটী সমতল ক্ষেত্র হইতে থিওডলাইট্ যন্ত্র সহযোগে এই শৃঙ্গের যে যে পরিমাপ লওয়া হইয়াছিল, সেই সকল গণনা হইতে দেরাদুন সার্ভে অফিসের একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী—বাবু রাধানাথ শিকদার—১৮৫২ খৃঃঅব্দে এভারেষ্ট শৃঙ্গের গড়পরতা উচ্চতা২৯০০২ ফুট নির্ণয় করিয়াছিলেন। তদবধি ভূগোলে এই গণনাই গৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই

সমুদয় পরিমাপ নানা কারণে ভ্রম-সঙ্কুল ছিল। প্রথমতঃ যে সকল স্থান হইতে মাপ লওয়া হইয়াছিল তাহার সর্ব্বোচ্চ স্থান সমুদ্র গর্ভ হইতে মাত্র ২৫৫ ফুট উচ্চ ছিল। তদ্ভিন্ন বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া সূর্য্যালোক প্রবেশ কালে ইহার গতি যে বক্র হইয়া যায় (Refraction), তখনকার পরিমাপ কালে তাহা গণনা করা হয় নাই। ইহার পর ১৮৮১ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত নানা স্থান হইতে যে মাপ লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে সূর্য্যালোকের তির্য্যকগতি নিবন্ধন যে ভ্রম হইতে পারে, তাহা সংশোধন করিয়া উহার গড়পড়তা উচ্চতা ২৯১৪১ ফুট স্থির করিয়াছে এই গণনাও একবার ভ্রম-প্রমাদ শূন্য বলা যাইতে পারে না। *

এত ভিন্ন আর একটী বিশেষ কারণ রহিয়াছে, যাহার জন্য থিওডলাইট্ যন্ত্র সাহায্যে উচ্চতার পরিমাণ সম্পূর্ণরূপ ভ্রম-প্রমাদশূন্য হইতে পারে না। তাহা হইতেছে উচ্চ পর্ব্বতগুলির সান্নিধ্য বশতঃ সাধারণ Normal line হইতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গতি রেখার (Line) বিচলিত হওয়া। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। পৃথিবী যদি স্থির অবস্থায় থাকিত তবে মাধ্যাকর্ষণ হেতু ইহার আকার ঠিক একটী গোলকের ন্যায় হইত ; কিন্তু ইহার দৈনিক আবর্ত্তন নিবন্ধন ইহার মেরু প্রদেশ চেপ্টা হইয়া ইহা অনেকটা কমলা লেবুর আকার (Spheroid) ধারণ করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তাহাও ঠিক নহে। পৃথিবীর যদি সর্ব্বত্রই একইরূপ পদার্থে গঠিত হইত, তবে ইহা একটী Spheroidএর ন্যায় দেখাইত বটে ; কিন্তু ইহার পর্ব্বত শ্রেণী, উপত্যকা ও অধিত্যকা প্রদেশ সকল এরূপ কঠিন ও দৃঢ় ভাবে সংস্থিত যে পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন ইহাদিগের আকৃতির কোন পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং এই সকল পর্ব্বতময় স্থান পৃথিবীর সাধারণ উপরি ভাগের (General surface of the Earth) সঙ্গে এক সমান্তরাল ভাবে না থাকিয়া, বক্র ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। সমুদ্রগর্ভ কিম্বা অন্যান্য স্থান যথায় বিশাল জলরাশি বিরাজ করিতেছে তাহাও সম্পূর্ণ

---

* The most serious source of uncertainty affecting values of height is the refraction of the atmosphere. A ray of light from a peak to an observer's eyes does not travel along a straight line, but assumes a curved path concave to the earth. The ray enters the abserver's eye in a direction tangential to the curve at the point, and this is the direction in which the observer sees the peak. It makes the peak appear too high. Refraction is greatest in the morning and evening and least in the middle of the day. It is different in the summer from what it is in winters—A sketch of the Geography of the Himalaya Mountains and Tibet. Col. S. G. Burrard, R. E. F. R. S. and A. H. Honyden, B. A. F. G. S.

A plumb line is a string supported at its upper end and stretched by a weight attached to its lower end. If there were no irregularities of matter, near the Earths surface a plumb line would hang truly normal ; but mountains exert a lateral pull, and tend to deflect it towards them. In the same way as plumb lines are pulled out of the normal, so is the surface of water near mountains pulled out of its spheroidal form.

Spheroid নহে। কারণ, বড় বড় পর্ব্বত ও মহা প্রদেশ সকল সমুদ্রের জলকে তাহাদিগের প্রতি নিরত আবর্ত্তন করিয়া জলের উপরি ভাগের বক্রতা সাধন করিতেছে। পৃথিবীর উপরি ভাগ যদি সম্পূর্ণ spheroid হইত তবে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির line জলের উপরি ভাগের উপর সম কোণে অবস্থিত হইত। পৃথিবী Spheroid নহে; সুতরাং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গতি (Vertical line) পৃথিবীর উপরি ভাগের উপর সম কোণে অবস্থিত নহে। যদি পৃথিবীর উপরি ভাগে অবস্থিত রেখাকে Normal line বলা যায়, অনেক স্থানে দেখা যাইবে যে Vertical line কতক পরিমাণে বক্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে—ইহা থিওডলাইট্ যন্ত্র সাহায্যে পরিমাণকে কিরূপ ভ্রমে পাতিত করে, উদ্ধৃত লেখা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

কোন পর্ব্বত শৃঙ্গেরই যথার্থ উচ্চতা নিরূপণ করা এক প্রকার অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন আরো অনেক কারণ রহিয়াছে যে জন্য গণনায় ভুল থাকিয়া যাইবেই। বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করা গেল না।

The attraction of the great mass of Himalayas and Tibet pulls all lequid towards itself, as the moon attracts the ocean, and the surface of water in repose assumes an irregular form at the foot of the Himalaya. If the ocean were to overflow northern India, its surfacc would be deformed by Himalayan attraction the lequid in levels; is similarly affected and *theodolites con:eq·ently cannot be adjus'ed.*

Their plates when levelled are still telted upwards the mountains and angles of elevation as measured as too small by the amount the horizen is inclined to the tangential plane. At Darjiling the surface of water in repose is inclined about 35· to this plane, at Kurseong about 51 at Siliguri about 23, at Dehradun and Mussoree about 37·

NB. The vertical line is the line that coincides with the direction of gravity. The line perpendicular to the mean surface of the Earth is the normal line The horizental is the plane that is tengential to the local surface of water however the latter may be deformed. The tangential plane is the plane that is tangential to the mean spheroidal surface.

শান্তির পন্থা।

("ও পারের কথা"র লেখক)

মানুষের বিষম গলদ স্ব স্ব বড় বড় গলদ সম্বন্ধেও ধারণা রহিত। অপরের বেলা যেমন সজাগ, নিজের বেলা তেমনি নিদ্রিত। এ গলদের গণ্ডিগুলা ব্যক্তিগত হ'তে সমাজ বা শ্রেণীগত হ'য়ে পরে জাতিগত ভাবে বিশাল হ'য়ে পড়ে। তখন সংস্কার-ভূমিতে, সঙ্গ-জলবায়ুতে ও শিক্ষা-উত্তাপে সেই জাতিগত গলদ প্রতিষ্ঠা-দম্ভে (প্রেসটিজে) পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠা-দম্ভ কিন্তু সহজে ঠাণ্ডা হবার পাত্র নয়! তিলকে তাল পাকায়ে তুমুল কাণ্ড বাঁধানই উহার ধারা। তাই প্রবল পক্ষ হীনবলকে অল্প বা সামান্য কারণে বিধ্বস্ত ক'রে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এই সময় প্রবল পক্ষ মুখে দড় ও কাজে দৃঢ় সুস্পষ্টভাবে দেখালেও তাদের বুকে ভয় ও মাথায় চিন্তাকুলতা স্তরে স্তরে স্ব স্ব আসন বিছায়। তখন সভ্য ও বর্ব্বরের, আর শিক্ষিত ও মূর্খের আচরণ নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন হয়ে পড়ে। সংযততা নিরপেক্ষভাবে উভয় পক্ষকে সেই সময় লাল নীল সিগ্‌ন্যাল দেখাতে ভুলে না। পতনোন্মুখ জাতির স্থূল বুদ্ধি কিন্তু প্রেসটিজ দম্ভে স্ফীতা হ'য়ে সেই সিগন্যালকে উপেক্ষা করায়। স্থূল দেহবুদ্ধিসংযুক্ত অহংবুদ্ধি যে মাত্রায় মোড়লগিরি ক'রতে সচেষ্টা হয় সে মাত্রায় জাতীয় চৈতন্য পদদলিত হ'তে থাকে। সুতরাং সেই জাতির যাবতীয় সুকর্ম্ম অর্থাৎ সত্ত্ব মিশ্রিত রজোগুণের কর্ম্ম—কর্পূরের মত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও তৎপরিবর্ত্তে এক তমোই জাতীয় ভোজ্য সেবা হয়। ফলে, সেই জাতি স্বজাতির মুণ্ডে ও রক্তে শোভিত ও রঞ্জিত হয়ে ধ্বংশের প্রতিমূর্ত্তি রূপে আপনাকে আপনিই অচিরে প্রতিষ্ঠিত করে।

ভারত, কোন এক যুগে 'বড়', 'খুব বড়' —এ খেতাব তুমি পেয়েছিলে। তা পাবারই কথা, কারণ চুরি ডাকাতি কাজ না সেধে যা-কিছু বৈভব ও বিদ্যা তুমি নিজেই অর্জ্জন করেছিলে। ভারত, তুমি সাহিত্য, গণিত জ্যোতিষ, ভৈষজ, রসায়ণ, কৃষি, কলাবিদ্যাদির প্রবর্ত্তক হয়েছিলে। তোমার সেকালের শৌর্য্য, বীর্য্য ও সত্যানুরাগের দৃষ্টান্ত সমূহ একালের গল্পকথা মাত্র। কিন্তু তোমার বিশেষত্ব ছিল ধর্ম্মতত্ত্ব উৎঘাটনায়। তুমি ব্যবস্থা করেছিলে আধার হিসাবে ধাপে ধাপে উঠাতে। তাই বিরাট প্রকৃতির যাবতীয় অঙ্গ সৌষ্টব বা গুণাবলী যেমন আদৃত ছিল, অব্যক্ত অব্যয় সচ্চিদানন্দময়ও তোমার তেমনি উপভোগ্য হয়েছিল। তাই তুমি সেকালে দেহ ও অহংবুদ্ধিদ্বয়কে লোভ, স্বার্থপরতা, দাম্ভিকতা, অসত্যাচার ও যাবতীয় বর্ব্বরতার সচল স্তম্ভ হয়ে বিচরণ করতে দাও নাই। কিন্তু তোমার শিক্ষা দীক্ষায় প্রভূত পরিমাণে ছিল, দেহ ও অহংবুদ্ধিদ্বয়কে মুষিকবৎ খর্ব্ব করা। সেকালের 'গণেশ' কতটা শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বর হয়ে ছিলেন, তুমিই জান। কিন্তু একালে যাঁকে সেই পদে বরিত ক'রতে উঠে পড়ে লেগে গেছ, তোমার চেষ্টার ফলাফল, তুমিই ভাল বুঝ। তবে এতকাল পরে, এত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে ও এত প্রতিকূলতা সর্ব্বাঙ্গে বহণ ক'রে, তুমি যে কর্ম্ম সম্পাদনে বদ্ধ পরিকর হয়েছে তার জন্য শুধু তুমি কেন—সমগ্র জগৎ—নিঃসন্দেহ বিশেষ উপকৃত হবে। এ ধারণা আশার দুরাকাঙ্খা নয়—নয়—কিছুতেই নয়। কিন্তু তোমারই অঙ্কিত চিত্রের রেখাপাত মাত্র!

হিন্দু ভারত সেকালে যে মাত্রায় 'বড়' বাচ্য হয়েছিল, একালে কিন্তু সুদে আসলে ততোধিক বিকায়ে গেছে। সেকালের ও একালের দুই ভিন্নতর চিত্র ভারতের কোনও সুসন্তানের দুখ-স্মৃতি

হওয়া সম্ভব নয়! উড়ে এসে জুড়ে বসাকে দণ্ড মুণ্ডের বিধাতা গড়ে তুলা ভারতের একালের ধারা। খেতাব বা নগণ্য প্রতিপত্তি টোপ খেয়ে গামলার জোয়াল মাছ হ'য়ে থাকা ভারতের একালের ধারা! এ অবস্থার জন্য ভারত কেবল মাত্র তুমি একমাত্র দোষী। ভারত তোমার তোমারই কর্ম্ম রাহু তোমার বড়ত্বকে গ্রাস করেছে! 'মুখের জোর', 'গায়ের জোর', ও 'পয়সার জোর' এই তিনটি জুয়াড়ি মিলে বাটোয়ারা করেছিল ভারতের মৌলিক ধন **"গুণ ও কর্ম্ম"**কে। সুতরাং **মুখের জোরের আচারি** হ'লেন ব্রাহ্মণ, **গায়ের জোরের স্বেচ্ছাচারী** হ'লেন ক্ষৈত্রিয় ও **টাকার জোরের বিলাসী** হ'লেন বৈশ্য। এই তিন ধরণের জাঁতায় পেশা হ'তে লাগলো অনার্য্য আদিমবাসীদের সহিত সেই সেই বিশেষ হতভাগ্য ভারতবাসী, যাদের উপরোক্ত তিনটা জোরের একটারও সম্বল ছিল না। বুদ্ধিবল, দেহবল ও ধনবল ব্যক্তিগত বা জাতিগতভাবে 'বড়' করে বটে, কিন্তু সে বড়ত্বের স্থায়িত্ব বালির বাঁধ মাত্র! যিনি প্রকৃত 'বড়' বা প্রকৃত পথপ্রদর্শক বা প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তিনি দশের, দেশের ও পতিত-পতিতার জন্য আত্মবলি দিতে অকাতরে প্রস্তুত। তাঁর সাধ, প্রাণের-সাধ, "গুণ ও কর্ম্ম" জীবের উপাস্য হয়ে তাদের যাবতীয় তমোগুণ প্রাধাণ্য আচার উচ্ছেদিত হয় ও তৎপরিবর্ত্তে রজো মিশ্রিত সত্ত্বাচার ধরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। "গুণ ও কর্ম্ম" যাঁর আরাধনার প্রধান উপকরণ, তিনি তিনিই একাধারে ব্রাহ্মণ, ক্ষৈত্রিয় ও বৈশ্য। আবার দশের ও দেশের সেবায় তিনি 'দাস'ও বটে। "গুণ ও কর্ম্ম" যাঁর প্রকৃত আরাধ্য, তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা যাবতীয় দুঃখের দুর্গম পন্থা ধরে সুখের সুগম পন্থার সন্ধান জীব পায়। তাই তাঁর তৃণ বা ভূমি শয্যা, রাজা মহারাজার সুখ শয্যাপেক্ষা কম আরামপ্রদ নয়! তাই তাঁর সামান্য পরিধেয় তাঁর হৃদয় সম্পদের বিশিষ্ট বরশয্যা। তাঁর সামান্য ইঙ্গিত সহস্র তোপধ্বনী অপেক্ষা অতিকতর কার্য্যকরী। বিরাট বিধান—দিতেও পাগল, আবার উন্মূল ক'রতে ততোধিক পাগল, কারণ বিধান বিরাট-কাবুলেওলা। ভারত, তুমি বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ পেয়েছিলে আত্মোদ্ধার ক'রে আশ্রিত-আশ্রিতাদেরকে গ'ড়ে তুলবার, শিক্ষার-দ্বার যথা বিহিত উৎঘাটন করবার, স্বাস্থ্যবিধির যাবতীয় বিধান যথোচিত পরিচ্ছন্ন করবার ও জাতিবর্ণের তিন-থেই সুতাকে যাবতীয় সংকোচের স্বরূপ না করে সৃষ্টি (উৎভাবনায়), স্থিতি (রক্ষণশীলতায়) ও লয় (উচ্ছেদ যোগ্য উপকরণের উচ্ছেদ সাধনে) তুমি **বিকাশের** সচল প্রতিমূর্ত্তি হয়ে কেবলমাত্র তোমার নয়, সমগ্র জগতের, কল্যাণ সাধন কর। তবে তবেই তুমি অযাচিতভাবে 'শর্ম্মা' (মঙ্গল বিধানকারী) বা 'হিন্দু' (হীনতা বিদুরণকারী) বাচ্য হবে। ভারত, তুমি যে বীজ ও যে মাটী হ'তে অঙ্কুরিত ও যে জল বায়ু ও উত্তাপে বর্দ্ধিত তোমার তোমারইত মুক্তিকামী হওয়া নিতান্ত সঙ্গত।

মহত্ত্বের মহত্ব আত্মসংযমে। প্রাণ, মন ও অহংবুদ্ধির ঐক্যতান বাদনের ফল—আত্ম সংযম। আত্ম সংযম—আত্মার সন্নিকটস্থ অবস্থা। দৃঢ়তা, নির্ভীকতা, কর্ম্মতৎপরতা কিন্তু উচ্ছ্বাস শুন্যতা, আত্মসংযমের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই সংযমের আসন—সহজ সাধ্য বিধি-বৈধ্য অনুষ্ঠান সমূহ। এই সংযমের উপভোগ্য—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম সম্ভূত বিকাশ। এই সংযমের কোশা কুশি—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি। এই সংযমের বারি—সরলতা। এই সংযমের নৈবিদ্য—'আমি'-'আমার' যাহা কিছু। ঐ সংযমের পূজারী

প্রাণ-মনসংযুক্ত সুপ্ত অহংবুদ্ধি। এই সংযমের অনল---আত্মমর্য্যাদাবোধ। এই সংযম-অনলের কাষ্ঠভার—দেহবুদ্ধি। এই সংযমের আহুতি—ভেদবুদ্ধিসংযুক্ত যাবতীয় কদাচার।

সাম্যাবস্থা---বিকাশের তাজমহল। অহংবুদ্ধিযুক্ত প্রাণের ও মনের আত্মার সহিত মিলনই সাগর সঙ্গম। অর্থকরী ও পুঁথিগত বিদ্যা—সংকোচের বিষম দামপূর্ণ জলা মাত্র। সংকোচ—মলিন বারি পূর্ণ স্পঞ্জ (sponge); বিকাশ—শুষ্ক ও পরিচ্ছন্ন স্পঞ্জ। জীবদেহস্থিত সুপ্ত চৈতন্য শক্তির জাগরণের সুফল—বিকাশ। বিকাশের মাত্রানুসারে সুপ্ত কর্ষিণী-শক্তি (drawing capacity) ব্যক্তিগত হ'তে জাতিগত ভাবে পরিবর্দ্ধিত হ'লে তবে জাতীয় জীবন প্রকৃত ভাবে গঠিত হওয়া সম্ভব। সংযমের পরিমান বৃদ্ধি ও অসংযমের হ্রাস হ'য়ে সঞ্চয়ের মাত্রানুসারে কার্য্যকারিণী শক্তি (working capital) যে মাত্রায় বর্দ্ধিত হয় সে মাত্রায় নিজের, দশের ও দেশের সর্ব্বপ্রকার 'হায়' 'হায়' ধ্বনী লুপ্ত হয়। ভারত, তুমিই—সেই সেকালে—সেই অল্পে পরিতুষ্ট কালে—পাদপ মূলের সহজ লব্ধ ফল ফুলে বিতৃষ্ণা দেখায়ে কেবল মাত্র বৃক্ষোস্থিত ফল ফুলেরই প্রত্যাশী হয়েছিলে। সুতরাং প্রবৃত্তির রাজ্যে বসবাস করে ও নিবৃত্তিতে প্রীতি দেখায়ে তুমি প্রবৃত্তিকে হতাদর ক'রেছিলে। তাই তুমি জাতীয় শিক্ষা বিস্তার ও আর আর বিশেষ সংস্কার কার্য্যে বীতরাগ ছিলে। সেই কর্ম্মফলে, কালে প্রবৃত্তিই তোমায় করায়ত্ত ক'রে তোমায় অনেক কাল যাবৎ স্থূল দেহ ও অহংবুদ্ধিসংযুক্ত যাবতীয় অনাচাররূপ আচারে আবদ্ধ করায়ে তার অভীষ্ট পূর্ণ করেছে। তাই তুমি প্রবৃত্তির প্রবল শাসনে তোমার শিরোস্থিত শিখারূপী ক্ষুদ্র চৈতন্যটুকুকে বিশেষ লাঞ্ছিত ক'রে কেবল মাত্র তিন-খেই সূতা ও পাঁজি-পুথি বলে প্রথমে আপনাকে বঞ্চনা করে, পরে সমাজ ও জাতিকে বঞ্চিত ক'রেছ। তুমি কি ক'রেছ বা না ক'রেছ তোমার আধুনিক আত্মসংযম ও আত্মমর্য্যাদাবোধ নিঃসন্দেহ তোমায় মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝায়েছে ও মনে হয় আরো বুঝাবে। তা না হলে, তোমার দাস খতের পাট্টাটুকু অতলে ডুবাতে, তোমার মুখের অন্ন হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে কঙ্কাল সার না হ'তে ও তোমার যা কিছু ফিরায়ে পেতে, কেন কেনই বা তুমি কালের করাল হাতে তোমার ধন ও প্রাণকে অযাচিত ভাবে তুলে দেবে? সেকালে তুমি এক ধরণের পথ প্রদর্শক হয়েছিলে। একালে কিন্তু তুমি বলিহারি ধরণের প্রবর্ত্তক হবার সাধ পুষেছ! এ কাজ সাধতে নেমেছ, শুধু নিজের জন্য নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্য। কোন দেশে ও কোনও যুগে যে কর্ম্ম কখনও সাধিত হয় নাই, এমন কি কল্পনায়ও যে কর্ম্মের সূচনা হয় নাই, তুমি—তুমিই সেই মহাযজ্ঞের পৌরহিত্য ভার নিজ স্কন্ধে বহন ক'রতে বদ্ধ পরিকর হ'য়েছ। দম্ভ—স্ফীত বক্ষে ও উন্নত মস্তকে আপনাকে শিক্ষিত ও সভ্য ব'লে পরিচিত করে। স্থূল দেহ ও অহংবুদ্ধি অপর পক্ষকে নগণ্য ও বর্ব্বর বাচ্য করে। বিরাট বিধান কিন্তু অচিরে অবশ্য প্রত্যক্ষ করাবে কোন্ পক্ষ কি ধাতুতে সৃজিত। বিধান—প্রবলের, সবলের ও দুর্ব্বলের, অর্থাৎ কোন পক্ষের কাহারও নিজস্ব নয়! বিধানের মধুভাণ্ড তমো প্রধান রজোর করতলগত হ'লেও সেই ভাণ্ডের অধিকারী হয়েছিল সত্ত্ব-প্রধান রজো। বিধানের বিধান—ব্যক্তি বা জাতিগত প্রাণ মন-অহংবুদ্ধি গোপ বালকগণকে সংযম,বিশিষ্ট সংযম,মন্ত্রে দীক্ষিত করা। তবে—তবেই বাক্য, কার্য্য ও চিন্তারূপিণী ত্রিফণায় হলাহল উদ্গীরণকারী ভীষণতম বিষধরের উচ্ছেদ সাধন শ্রীশ্রীচৈতন্যময়ের দ্বারা অনায়াসে সাধিত হবে। সেকালে যমুনার কোন এক স্থান আবর্ত্ত

হয়েছিল। একালের আবর্ত্ত ভারত হ'তে সূত্রপাত হয়ে সমগ্র মেদিনী বিস্তৃত। সংগ্রাম—প্রমত্ত প্রবৃত্তি—এক পক্ষ, আত্মসংযম—অন্য পক্ষ। জয়-পরাজয়—প্রবলেরও নয়, হীন-বলেরও নয়। ধর্ম্ম যথা, জয় তথা—এটা কিন্তু সেকালের কথা।

নারী হরি, নারী পীড়ি, বিভীষণে লাথি মারি,
রাক্ষস রাজ, হ'ল নির্ম্মূল, ঠাণ্ডা হ'ল লঙ্কাপুরী!

প্রকৃত শান্তি প্রিয়তার অঙ্গ সৌষ্টব সংযম, শিষ্টাচার, সত্যবাদিতা ও নিরপেক্ষতা। এই গুণাবলীর পরিপোষণের আন্তরিক চেষ্টা প্রবলের সাধুত্ব ও মহত্ব। প্রবলের দায়িত্ব অপরিসীম, কারণ রক্ষণশীলতার সহিত উৎকর্ষ সাধণ তাঁর বৈধ কর্ম্ম। তা আবার দশের, দেশের সহিত আশ্রিত-আশ্রিতাদের উন্নতি কল্পে নিয়োজিত করা নিতান্ত বিধেয়। এই আচরণের বৈলক্ষণতা প্রবলের যাহা কিছু বৈভবই তাহাকে পশুত্বে বা দারুণ বর্ব্বরত্বে পরিণত করায়। পরে, ইহা সংক্রামক ব্যাধিরূপে জাতিগত আকার ধারণ করে। তখন সেই মতিভ্রান্ত জাতির প্রত্যেক বাক্য ও কর্ম্ম তাহাদের অধঃপতনের দ্বার বিশিষ্ট ভাবে উন্মুক্ত করে। মনুষ্যত্বের বিধান—শক্তি সঞ্চয়—জাতীয় উৎকর্ষ সাধনে। মনুষ্যত্বহীনের ধারা স্বার্থ সিদ্ধি লালসায় শক্তির অপচয় করা। এই প্রকার জীবই পিশাচ শ্রেণী ভুক্ত। অপচয়ের প্রবৃত্তি অল্পায়াসে অপচয়ের দিকেই ধাবিত করায়। নিধনই অসংযুক্ত অপচয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

শান্তির আস্বাদ শান্ততায় (সংযমে) প্রাপ্তব্য। দেহ, বুদ্ধি, ধন ও জন ক্ষুদ্র চারিপদ বিশিষ্ট উচ্চাসনে উপবিষ্ট হয়ে অথচ শান্তির আস্বাদ অনুমাত্র লাভ না ক'রে আপনাকে শান্তিরক্ষক পদে বরিত করা নিতান্ত দম্ভ নির্দ্দেশক। এবম্বিধ দম্ভের কর্ম্ম ধরাকে সরাজ্ঞানে কেবল মাত্র নীচগামী আত্ম তৃপ্তি সাধনে তৎপরতা ও যাবতীয় বাহ্যিক চাকচিক্যতার পারিপাট্য। বিধানের কড়া হুকুম—"স্ব স্ব সাধ্যানুযায়ী সুবিধান প্রতিষ্ঠা কর"। প্রবল পক্ষ সে আদেশ পালনে বীতরাগ। বিধান ও যে-সেনন। অশান্তি—মোড়লণীকে তার বিহিত কর্ম্ম সম্পাদনে নিযুক্ত ক'রলেন। ফলে, শান্তিরক্ষকের শাসনাগার সজীব পদার্থে দিন দিন পরিপুষ্ট হ'তে লাগালো। এত ধরা পাকড়াওর দিনে, অনধিকার প্রবেশ দোষে প্রধান অপরাধিনী অশান্তি-মোড়লণী কিন্তু গা ফুলিয়ে বেড়াতে ছাড়চেন না! সুতরাং মহাপ্রবলের 'স্বাধীন ইচ্ছা' বা 'স্বাধীনতা', অশান্তি—মোড়লণীর নিকট পরাভূত! কোন্ হৃদয় বা মস্তিস্ক, ও কোন্ প্রাসাদ বা সাম্রাজ্য অশান্তি-মোড়লণীর অধিকার ভুক্ত নয়? সুতরাং জীবের 'স্বাধীনতা' বা 'স্বাধীন ইচ্ছা' কথার কথা মাত্র!

মানুষ অর্জ্জন কচ্চে—সাফল্য বা নিস্ফলতা। সাধারণতঃ নিস্ফলতাই জীবের ভাগ্যে বেশী মাত্রায় মাপচে! বিশেষ চেষ্টা, অল্প চেষ্টা ও এমন কি নগণ্য চেষ্টাও ছোট বড় সুফল বর্ষণ করে। আবার বিশিষ্ট চেষ্টা সত্বেও কেবল মাত্র নিস্ফলতাই লভ্য হয়। সুতরাং দৃশ্য বা অদৃশ্য ঘটনা চক্রের অনুকূলতায় সফলতা প্রাপ্তব্য। ঘটনা চক্রের অভেদ্য প্রতিকূলতা, নিস্ফলতার কারণ। তা হ'লে মানুষকে হাসাচ্চে বা কাঁদাচ্চে ঘটনা চক্রের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা। মানুষের স্বাধীন-ইচ্ছার কার্য্যকারিতা কতটুকু? তবে কি জীব পাঁজি-পুঁথি লিখিত শুভ মুহূর্ত্ত বা শুভ দিনের প্রত্যাশায় তাস, দাবা বা পাশা খণ্ডের শরণাগত হবে? তবে কি মানুষ অবগুণ্ঠণশূন্য গ্রন্থের (No veil) বা নিদ্রা দেবীর সেবক-সেবিকা হ'য়ে দিন যাপন ক'রবে? তবে কি নর-নারী সময়কে যা-তা ভাবে ব্যবহার ক'রে গলা টিপে উহাকে ধাৎ ছাড়া ক'রবে? না-না-কখনই না, বরং মানুষের প্রধান

ও মুখ্য কর্ম্ম, বাক্য, কার্য্য ও চিন্তার সহায়তায় রোজগারের যাবতীয় কৌশল উদ্ভাবনা করা ও সেই সেই পন্থা ধরে চলা। তা কিন্তু বিশিষ্ট ভাবে সংযমকে আশ্রয় ক'রে এ-কূল ও-কূল উভয় কূলের যা-কিছুর জন্তে। এই কাজ সাধবার মাল-মসলা প্রত্যেক জীবে খুবই আছে। তবে অভাব—বিশেষ অভাব—প্রকৃত শিক্ষার। বিকৃত শিক্ষার প্রভাবে প্রকৃত শিক্ষা নিতান্ত হীনপ্রভ হয়ে আছে। এই শিক্ষার গলদটুকু দিন দিন ভীষণ, ভীষণতর ও ভীষণতম হ'চ্চে। এই শিক্ষার আড়-কাঠিতে ভারত মানসিক ভোজ্য-সেব্যের অনুপযুক্তভাবে গড়ে উঠছে! অর্থকরী বিদ্যার চাকচিক্যতার কিন্তু অভাব নাই। এই গলদ অচিরে সংস্কৃত না হ'লে, ভারত হবে—নিঃসন্দেহ হবে—বাক্যে, কার্য্যে ও চিন্তায় পঙ্গু জীবের সমষ্টি মাত্র। আর যারা এই ভীষণতর আবর্ত্তে পা ডোবাবার সুযোগ না পাবে—তারা বিকৃত শ্রেণীর আচরণে—গুণ্ডা শ্রেণীতে পরিণত হবে! বিধানের দাবী—অমোঘ দাবী, প্রবল ও হীন বল উভয়েই এই গলদ সংস্কারে বিশেষ যত্নশীল হয়। বিধানের করাল-অসি তার দীন সন্তানদের রক্ষার্থে উন্মোচিত। হায় দম্ভ! তুমি এখন চক্ষু থাকতেও চক্ষুহীন, কিন্তু তাঁর অট্টহাসির প্রভাব কতটা প্রত্যক্ষ ক'রবে, জানবে ও বুঝবে তোমার কাল মুহূর্ত্তে, তোমার নিদানের দিনে! তাই বলি—শান্তি **চাও**ত শান্তি **দাও**—অকাতরে **দাও**। কিন্তু শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি বিছাবার আয়োজন ক'রলে, অশান্তি—চরম অশান্তি—তোমার ভাগ্যে মাপবে—নিঃসন্দেহ মাপবে। **শান্তি চাও ত—শান্ত হও।**

মানুষ **বিকাশ তীর্থের যাত্রী**। সেকালের ভারত এই বিকাশকে 'মুক্তি' আখ্যাত করেছিলেন। 'মুক্তি' মানে স্বাধীনতা। প্রকৃত **স্বাধীনতা** কি, সেকালের ভারত ভালই বুঝেছিলেন। একালের মত অষ্ট পাপে বদ্ধ পরাধীনতা ছিল না ব'লেই সেই স্বাধীনতার কথা বলবার ও সেই স্বাধীনতা লয়ে থাকবার সুযোগ ও সুবিধা সেই যুগের ভারত পেয়েছিলেন। **ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ** সেই সেকালের কথা। যার-যা করণীয় কর্ম্মে উৎকর্ষতা সাধনই ইহ জীবনের মৌলিক **ধর্ম্ম-কর্ম্ম**। 'ক', 'খ' 'গ' কিম্বা A. B. C. প্রভৃতি অক্ষরগুলা হ'তে ক্রমশঃ অগ্রসর হ'লে তবে একজন M. A., বা P. R. S., হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি জাগতীক কর্ম্মের উৎকর্ষতা সাধন ফলে ও বিধি-বৈধ শিক্ষার প্রভাবে বিকাশের চরম সীমায় উপনীত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সামান্য বা সাধ্যোপযোগী কর্ম্মে ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তির দৌলতে সেই ফাঁকি দেওয়া দেহও অহং বুদ্ধি যুক্ত মন-প্রাণ সম্বল ক'রলে, এ-পার—ও-পার উভয় পারেই কেবল মাত্র 'হায়' 'হায়'ই লভ্য হয়। একালের 'মহারাজ,' 'স্বামী' বা 'ঠাকুর, যদি প্রকৃত বিকাশের নিদর্শন হত, তা হ'লে নিশ্চয় এই ধরণের জীব ছালা ছালা পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হ'ত না। চাই কার্য্যতৎপরতা ও কর্ম্মপটুতা তৎসঙ্গে অপচয়ের যাবতীয় দ্বার রুদ্ধ ক'রলেই **অর্থ** অর্জ্জন ও সঞ্চয় করা অসাধ্য সাধন নয়। পরে সময়োপযোগী সুশিক্ষা প্রভাবে সেই উপার্জ্জিত ও সঞ্চিত অর্থের সহায়তায় অবৈতনিক চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, ধর্ম্মশালা, জলাশয় প্রভৃতি স্থাপন ও পল্লী সংস্কার যাবতীয় কামনাযুক্ত কর্ম্ম সাধন ফলে মস্তিষ্কের বিকাশ ও হৃদয়ের বিস্তার সুমহান ভাবেই সংসাধিত হয়। উপরোক্ত ত্রিবিধ বিকাশের ফলে, অহং ও দেহবুদ্ধিযুক্ত-প্রাণ-মন যাবতীয় গণ্ডি কাটায়ে ক্রমশঃ আত্মারূপ উৎসের সমীপে ও সান্নিধ্যে উপনীত হবার উপযোগী হয়। পরিশেষে,

এ অবস্থায় স্থিতি লাভ ক'রলেই সেই অহংবুদ্ধি যুক্ত প্রাণ-মন স্বাধীন-ইচ্ছার সহিত প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পায়।

এই দেহ শিশিতে অহংবুদ্ধি যুক্ত মন-প্রাণ দেহকে সম্বল ক'রে যাবতীয় খেলা খেলচে। অহং বুদ্ধিযুক্ত মন প্রাণের একমাত্র উৎস দেহস্থিত আত্মা। অহংবুদ্ধি, মন-কলসীর মুখ; মন, কলসীর আধারটুকু ও প্রাণ—বারি অর্থাৎ কার্য্যকারিণী শক্তি। অহংবুদ্ধির কর্ম্ম—অর্জ্জন বা ব্যয় করা, মনের কর্ম্ম—সঞ্চয় করা ও আবশ্যক হ'লে দিয়ে দেওয়া ও প্রাণের কর্ম্ম—অহংবুদ্ধি দ্বারা আহৃত ও মনের দ্বারা সঞ্চিত যাহা কিছুর কার্য্যকারিনী শক্তি প্রয়োগ বা হরণ করা। অহংবুদ্ধিযুক্ত মন দুইমুখো নলের মত। একটী ঊর্দ্ধমুখী, অপরটী নিম্নমুখী। ঊর্দ্ধতন মুখটী আত্মার সহিত সংলগ্ন। ইহাই বিবেকের স্থান। ইহারই নাম সাগর সঙ্গম। ইহাই জীবের **মৌলিক অবস্থা**। এই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করাই মানবজীবনের দুর্ল্লভতা। এই কর্ম্মফলে স্বাধীনতা বা স্বাধীন ইচ্ছা জীবের উপভোগ্য হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান জীবের স্বামীত্ব ঘুচায়ে আত্মাকেই স্বামীত্বে বরণ করায়। অহংবুদ্ধিযুক্ত মন প্রাণ তরল পদার্থের ন্যায় নিম্নগামী হয়ে **বোধশক্তি** ও **ইচ্ছাশক্তি** ভাবে প্রবুদ্ধ। ইহাই জীবের **দ্বিতীয় অবস্থা**। কামনা, বাসনা, ভাবনা ও ভয়, চিন্তাশীলতা দ্বারা বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধগামী হ'লে মৌলিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বাসনা, ভাবনা ও ভয় প্রায়শঃ নিম্নগামী হ'য়ে সংসার আবর্ত্তে থাকতে প্রয়াসী। ইহাই জীবের—**নিম্নতম অবস্থা**। ইহাই জীবরূপ তরল নিম্নগামী পদার্থের **কুলহীন** অবস্থা।

মানুষ **সচ্ছলতার** ও যাবতীয় **সচ্ছন্দতার** ভিখারী ভিখারিণী। প্রায়শঃ নিম্না-বস্থায় দাঁড়িয়ে ও অধঃমুখী অহংবুদ্ধিযুক্ত মন প্রাণের সহিত বাসনা, ভাবনা ও ভয় সম্বল করে মানুষ ভিক্ষার ঝুলি লয়ে প্রার্থী প্রার্থিণী হয়। ঘটনাচক্রের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা ভিক্ষা বণ্টন করে। তা কিন্তু জাগতিক যা কিছু। বিরাটের নিম্নস্থ ফটকে খাড়া হয়ে যখন 'প্রাণ যায়', 'প্রাণ যায়' এই হাল হয় কিম্বা সচ্ছলতা পেয়েও সচ্ছন্দতা ভাগ্যে মাপে না, তখন জীব মুখে 'ভগবান' 'ভগবান' ক'রলেও তাদের অহংবুদ্ধিযুক্ত মন প্রাণ তখনও ধন্না দেয় নিম্নস্থ ফটকে। এঁরাই 'দয়াময়' বা 'দয়াময়ী' বা 'ভগবান' এর গুষ্টিতিলক!

বাসনা-রূপিনী জীব ভাসছে ভাবনা-মহাসমুদ্রে। কিন্তু হরদম্ তাড়া খাচ্চে ভয় মকরের কাছ থেকে। সম্বলের মধ্যে আশা কুটাটুকু। ভাবনা মহাসমুদ্রের প্রচণ্ড তরঙ্গের ঢু মারার শেষ নেই ও ভয় মকরের হাঁ করে তাড়া দেবারও অবধি নাই। এত কাণ্ড কারখানার মধ্যেও আশা সময় সময় ফুরফুরে ঝুরঝুরে বাতাস বহায়। আবার কখন কখন স্বরচিত বাতি জ্বালায়ে সে বাতি তখনকার মত ম্লানমুখী হতে দেয় না। সেই বাতাসের প্রবাহে ও সেই বাতির আলোকে আছে, নিঃসন্দেহ আছে, এমন কিছু মাদকতা যার প্রভাবে যা-হবার-নয় বা যা-পাবার-নয় সেই সেই সুখ স্বপ্নে মানুষ বিভোর! সুতরাং মানুষের মনুষত্ব পাবার প্রতিকূলতা পদে পদে!

আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে মানুষের বিচার-বুদ্ধি প্রত্যক্ষ যা-কিছুতেই থমকা খায়। সেই থমকা খাওয়ার ফলে মানুষ **চিন্তাকুলতাকেই** ভর ক'রে একটা যা-কিছু সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলে। **চিন্তাশীলতা** কিন্তু বিশিষ্টভাবে প্রতীতি করায় যে প্রত্যক্ষের মত

অপ্রত্যক্ষও সমভাবে মানুষকে গ'ড়ে তুলতে উঠে প'ড়ে লেগে আছে। প্রত্যক্ষ যা-কিছু যা-তা ক'রে দেখা-শুনা সম্ভব, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ যা-কিছু কেবল মাত্র আত্মসংযমের দ্বারা উপলব্ধি করাও নিতান্ত সম্ভব। এমন কি উপভোগ করাও সাধ্যাতীত নয়। আত্মসংযমের মহা-অন্তরায় বাসনা-ডাকিনী, ভাবনা-পেতনী ও ভয়-ভূত। কিন্তু দেহবুদ্ধির সহিত অহংবুদ্ধিকে সামলাতে শিখলে, এই ডাকিনী, পেতনা ও ভূত, মহা সহায় হয় মানুষকে যাবতীয় সচ্ছলতা ও সচ্ছন্দতা দিয়ে নকল ও আসল উভয় স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত করাতে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারত চাইচে কেবল মাত্র **নকল স্বরাজ**। ভারত-মাতার সাধ কিন্তু তাঁর সন্তান আগে **আসল স্বরাজে** প্রতিষ্ঠিত হয়! তবেই নকল স্বরাজ পেয়ে রক্ষা করবার শক্তি ভারতের হবে। তা না হ'লে খেদ ক'রতে হবে "ফোসকে গেলরে আমার সাধের আমড়ার আটি"! আত্মসংযমে প্রকৃতভাবে ব্রতী হ'লে উল্লিখিত দ্বিতীয় কটকস্থ বোধ ও ইচ্ছাশক্তির সন্নিকটে থাকা নিতান্ত সম্ভব। তার পর প্রত্যেক বাসনা, প্রত্যেক ভাবনা ও প্রত্যেক ভয় মন-জলাশয়ে পানার মত দেখা দিলেই, বোধ ও ইচ্ছাশক্তিদ্বয়ের দ্বারা (অতীব গোপনে কিন্তু দৃঢ়ভাবে) বলা আবশ্যক যে সেই বাসনা, সেই ভাবনা বা সেই ভয় **মহাশক্তি, মহালক্ষ্মী ও মহা আনন্দের** —অর্থাৎ দেহস্থিত আত্মারই। এই অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য উপায়ে বোধশক্তি সহিত ইচ্ছাশক্তি বিকশিত হয়। তবে নির্জ্জন বাস এই কার্য্যের বিশেষ সহায়তাকারী। কিন্তু বিশিষ্ট ভাবে সংস্কার বদ্ধ করা চাই। যে বাসনা, ভাবনা ও ভয় নিম্নগামী হ'লে **জলের পানাবৎ** আকার ধ'রে অসচ্ছলতার ও অসচ্ছন্দতার বিশিষ্ট হেতু হয়। তবে উপরোক্ত বিধানে কেবল মাত্র চিন্তাশীলতা ও ধারণাশক্তি সম্বল ক'রে কর্ম্ম সাধন ক'রলে, উহারাই **বাষ্পীয়** আকার ধারণ ক'রে কর্ম্মতৎপরতার সহিত কর্ম্মপটুতা ও তৎপরে স্ব স্ব কর্ম্মে জাগতিক বা পারলৌকিক সাফল্য আনয়ন করে।

"জোর যার, মুল্লুক তার" এই ধারা চলতি হয়েছে বিরাটের বিধানে। তাই প্রবৃত্তির অনুচর-অনুচারিণী কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দম্ভ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মানুষের দেহ মুল্লুকটাকে দাপটে অধিকার ক'রে মানুষকে খেলনা-পুতুল সাজিয়ে চিরকালই খেলচে। তা হ'লে অবশ্য মানতে হবে যে যাঁরা প্রবৃত্তির অনুচর-অনুচারিণীদেরকে মাথা বাড়িয়ে দিয়ে ছুটেছেন স্বকার্য্য সাধনে, তাঁরা শুনেছেন—তা কিন্তু প্রাণে প্রাণে—সেই অদৃশ্য শক্তির ডাক। সেই ডাক, যে ডাকে হাঁকা-হাঁকি না থাকলেও কুম্ভকর্ণেরও নিস্তার নেই! সেই ডাক, যে ডাকে ক্ষীণ জীবীকেও পালোয়ান ক'রে তুলে! সেই ডাক, যে ডাকে হাতা-হাতি ও গুঁতো-গুতির ব্যবস্থা না থাকলেও অপর পক্ষকে "গেলরে গেলরে" ক'রে ডাক ছাড়াচ্চে! সেই ডাক, যে ডাকে সব সংকোচ, সব ব্যবধান ও সব বাঁধন শিথিল হ'য়ে পড়ে! সেই ডাক, যা স্পর্শ করে স্বার্থ-বধীর জীব ব্যতীত সমগ্র জগৎকে!

এত সাহস ও এত দাপট, ক্ষীণজীবীদের দেখানো কিছুতেই সম্ভব নয়—অদ্বিতীয় মহাশক্তির সহায়তা ব্যতীত। ভারত, তোমার অহংবুদ্ধিযুক্ত মন-প্রাণ বেজায় মরচেধরা; সুতরাং তুমি যা-চাও তা-পাবার ও রাখবার উপযুক্ত করবার জন্যেই বিরাট বিধানেরই ইচ্ছায় তোমায় সংস্কার কার্য্য ভীষণ ভাবেই চ'লচে! কর্ম্মফল হিসাবে বিরাটের জমা খচরের হিসাব খাতায় তোমার এতদিন জমা ছিল **গোল্লা**। তাই **শুন্যুই** পেয়ে এসেছ ও পাচ্চ। বিধান কিন্তু এতকাল পরে, ব্যবস্থা

করেছে যে জমার হিসাবটা অদল বদল হয়। এক পক্ষ, তার প্রবৃত্তিকে উর্দ্ধগামিনী করবার ব্যবস্থা কচ্চেন। অপর পক্ষ, প্রবৃত্তির ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী ভাবেই কর্ম্ম সাধন করে এসেছে এখন সেই কর্ম্ম বাড়িয়ে ফেলছে। সুতরাং বিরাটের অলক্ষিৎ বিধানে, হীনবল পাচ্চেন প্রবলের সত্বমিশ্রিত রজোগুণের বিষম সঞ্চয়টুকু; আর প্রবল সদর্পে নিঃশেষ ক'চ্চেন —হীনবলের তমোগুণের বস্তাগুলি!

সেকালের শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সাধিত একটা ঘটনার কথা বলা যাক্। বর্ষার-রাজা ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্তে নন্দ-উপনন্দ প্রভৃতি যাবতীয় যাদবগণ এক যজ্ঞের আয়োজন কচ্ছিলেন। কৃষককুলের কর্ম্ম যাদবকুল দ্বারা সাধিত হওয়া অনুচিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রমাণিত হওয়াতে, শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবিত গিরি সম্মিলনের ব্যবস্থা অনুমোদিত হ'ল। সেই সম্মিলনে যাবতীয় ব্রজবাসী-বাসিনী স্ব স্ব সন্তান ও গোবৎসাদিসহ যোগদান ক'রে ছিলেন। ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন ও তৎসহ গো সেবা এই মহোৎসবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেইদিন শ্রীকৃষ্ণের শক্তিমত্তায় ও অসাধারণত্বে সকলেই বিমোহিত বিমোহিতা হন। এই ঘটনার অল্পদিনের মধ্যে দারুণ বর্ষাজনিত যমুনা স্ফীত হ'ল। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্রজপুরী খালি করায়ে গোবর্দ্ধন গিরিতলে সকলের আশ্রয়স্থল নির্দ্ধারণ ক'রলেন। অতঃপর, স্বীয় বাম বাহুর কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর দ্বারা গোবর্দ্ধনগিরি উত্তোলিত ক'রে ব্রজপুরীস্থ সমস্ত প্রাণীকে অকাল মৃত্যু হতে রক্ষা করেন। আষাড়ে গল্প বলে অনুমিত হবারই কথা, কিন্তু এই প্রকার কর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্য (১) নিম্নগামী দেবতার আরাধনা হতে বিরত করা (২) স্বাস্থ্য, প্রাণ ও মনের সরসতার ও চিত্তের উৎকর্ষ্যের জন্য উন্মুক্ত প্রকৃতির উপভোগের ব্যবস্থা করা (৩) সম্মিলনীর ও নায়কের নিজ কর্ম্ম দ্বারা **একতা** সাধনের ব্যবস্থা করা; (৪) ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন সহ গো সেবার দ্বারা রজোমিশ্রিত সত্বগুণের অর্থাৎ জীবের কার্য্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধি করণের ইহাই সহজ সাধ্যবিধি। তবে একালের ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন প্রথা তমোগুণ বৃদ্ধি করণের সামিল। তমোগুণের প্রভাবই রোগ, শোক, তাপ, অর্থকৃচ্ছতা ও অকাল মৃত্যুর প্রকৃষ্ট কারণ। সত্বগুণ প্রধান মহাজনের ও বাস্তবিক দুস্থ-দুস্থার আন্তরিক সেবার ব্যবস্থা নিতান্ত করণীয় কর্ম্ম। আপদ বিপদ দুরীকরণের ইহা সমীচীন ব্যবস্থা। বিশ্বের তুলনায় পৃথিবী নগণ্য, সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় ভারত নগণ্য, সমগ্র ভারতের তুলনায় তৎকালের ব্রজপুরীও নগণ্য ও ব্রজপুরীর তুলনায় গোবর্দ্ধনগিরি অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এক স্থানের সমুদয় প্রাণীর মন-প্রাণ এক মহাপ্রাণের প্রতি ধাবিত হ'লে, সেই মহাজন সমবেত ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে নিতান্ত অসাধ্য কর্ম্মও অবহেলে সাধিত করতে সক্ষম হন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পন্থা ভারত মাতার প্রত্যেক সুসন্তানের নিতান্ত অনুকরণীয়। এ তা জল্পনা কল্পনায় প্রশ্রয় প্রদান না করে প্রত্যেকের নিতান্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম তাঁদের প্রত্যেক বাসনা, ভাবনা ও ভয়কে সম্বল ক'রে সকল সময়ে গোপনে কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলা যে সেই সেই **বাসনা, ভাবনা** ও **ভয়** মহাশক্তি, মহালক্ষ্মী ও মহা আনন্দ হ'তে উদ্ভূত। সুতরাং উহা নিঃসন্দেহ সুফল প্রসব কর'বে। এই উপায়ে যে মাত্রায় স্ব স্ব বোধ ও ইচ্ছাশক্তি প্রবুদ্ধ হবে, ব্যক্তিগত কর্ম্ম হ'তে জাতিগত কর্ম্ম ধ্রুব সুসম্পাদিত হবে। এই উপায়ে স্ব স্ব কর্ষিণী শক্তি (drawing capacity) র সহিত কার্য্যকারিণী শক্তি (working capital) অর্জ্জন করা খুবই সম্ভব।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ ও আলোচনা সাপেক্ষ]

প্রত্যুত্তরের উত্তরে—

আপনার "ভারতের সাধনা"র চৈত্রের সংখ্যায় (৩৭৭ পৃঃ) সরযূ, গোমতী, পঞ্চাল প্রভৃতির অবস্থানের আলোচনায় লিখিত হইয়াছে যে, গোমতী নদী বর্ত্তমান গোমাল নদী। যাহা সোলেমান পর্ব্বত হইতে উৎপন্নান্তর পূর্ব্ববাহিনী হইয়া সিন্ধু নদীতে পতিত হইয়াছে, এবং সরযূ নদী কাবুল দেশীয় হিরুরুদ নামীয় বর্ত্তমান নদী। হিরাট যাহার তীরে অবস্থিত। উহাই পারসিক গ্রন্থে 'হরয়ু'। ঐ হিরুরুদ নদী পূর্ব্বপশ্চিমে অবস্থিত দেখা যায়। 'হরয়ু' শব্দের অর্থ বহুগৃহাদিবিশিষ্ট অথবা বহুজলবিশিষ্ট। জেন্দাবস্তে মিহিরজাস্তে লবণাক্ত জলবিশিষ্ট সুগভীর হ্রদ আছে। উহা উচ্চ পর্ব্বতমালাবেষ্টিত সুগ্ধ দেশে (বর্ত্তমান তুর্কিস্থান) স্থিত। ঐ সুগ্ধ বক্ত্রিয়ার উত্তরস্থিত অক্সাস নদীর পার্শ্ববর্ত্তী।

আফগানিস্থান ও পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে পূর্ব্বাপর বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই এরূপ Rigvedic India গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। আপনার লেখক হরয়ু নদীকে আর্য্যদেশের পশ্চিম সীমা করিয়াছেন; পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রবাহিতা নদী কি প্রকারে পশ্চিম সীমা হয় তাহা বুঝিতে পারিলাম না। উত্তর সীমা হইলে স্বতন্ত্র কথা হইত। মিহিরজাস্তের কথিতমত ঐ প্রদেশে কোন হ্রদশ্রেণী দেখা যায় না, হ্রদগর্ভ মরুভূমি আছে বলিয়াও শোনা যায় না। আপনার লেখক চেদি রাজ্য বর্ত্তমান রাজপুতনার অন্তর্গত স্বীকার করিয়াছেন। উহা বুন্দেলখণ্ডের নামান্তর বটে। উহা যমুনা নদীর দক্ষিণে, চর্ম্মণ্বতী ও শোননদের মধ্যে অবস্থিত। তৎপশ্চিমে জয়পুর ইত্যাদি মৎসদেশের অন্তর্গত। মৎস দেশেশের উত্তর পূর্ব্বে শূরসেন অর্থাৎ যদু ও তর্ব্বসুর রাজ্য। যাঁহাদের বিষয় ঋগ্বেদের বহুস্থানে বর্ণিত আছে। শূরসেন রাজ্যের কতকাংশ চেদির উত্তরেও পড়িয়াছে। যমুনা ও গঙ্গার মধ্যে শূরসেনের পূর্ব্বে কুরু ও পাঞ্চাল রাজ্য স্থিত। সর্জনাবৎ অস্বীকার করিতে না পারিয়া আপনার লেখক কুরুরাজ্য স্বীকার করিয়াছেন। মৎস দেশের পশ্চিমে লেখকের স্বীকৃত মরুভূমি হইতে পারে এবং বর্ত্তমানেও তথায় বিকানীর প্রভৃতি রাজ্যে মরুভূমি আছে। যমুনা নদী ও সরস্বতী নদী যেমন সমুদ্রে পতিত বলা হয়, সেইরূপ চর্ম্মণ্বতী ও শোন আরাবল্লী পর্ব্বতমালার ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের জল বহন করিয়া উত্তরে সমুদ্রে পতিত হইত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তাহা হইলে চেদি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। এবং ঋগ্বেদে দাক্ষিণাত্যের উক্তি না থাকায়, আপনার লেখকের Rigvedic India নামক পুস্তকে 'আর্য্যগণ সমুদ্রের দক্ষিণে গমন করেন নাই' এই কথাটি অলীক হইয়া পড়ে; লেখকের মতে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দাক্ষিণাত্য প্রাচীন।

আরাবল্লী পর্ব্বত প্রাচীনতম বিন্ধ্যেরই অংশ মাত্র। অগস্ত্য দক্ষিণে থাকিতে অর্থাৎ অগস্ত্য নক্ষত্র দক্ষিণধ্রুব থাকা কালীন যে সকল ঘটনার উল্লেখ পুরাণাদিতে পাওয়া যায়—অথচ ঋগ্বেদে নাই—কিন্তু বর্ত্তমান ভূতত্ত্ব শাস্ত্রের উক্তির সহিত যাহার যথাযথ ভাবে সামঞ্জস্য হয়, তাহা এই—

১। বিন্ধ্যপর্ব্বত অবনত হয়:—ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন আরাবল্লী পর্ব্বতমালা ভূগর্ভে কিয়ৎপরিমাণে প্রোথিত হইয়াছে।

২। অগস্ত্য সমুদ্র শোষণ করেন:—অর্থাৎ Rigvedic India গ্রন্থের রাজপুতনা-সমুদ্র মরুভূমিতে পরিণত হয়।

৩। বাতাপি ইল্বনের ধ্বংস হয়:—বাতাপি শব্দের অর্থ বাহুল্যতাপ, বহুল-তাপ-যুক্ত; এবং ইল্বন শব্দের অর্থ—ইল্-বল, বড় ইলা বা বৃহৎ প্রদেশ। অর্থাৎ টরিড্‌জোনে গ্রীষ্মমণ্ডলে স্থিত একটী বৃহৎ জনপদ ভূগর্ভে নিমজ্জিত হয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণও একস্বরে ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। Rigvedic India গ্রন্থে বর্ণিত পূর্ব্ব সমুদ্রের বিবরণ মনুসংহিতায় এইরূপ উল্লিখিত আছে।—

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদ্ আসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোঽরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥

ঐ মানবীয় পূর্ব্বসমুদ্র লোহিত্য সাগর বটে, যাহার উল্লেখ রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থে বিস্তর দেখা যায়। মহাভারতে সভাপর্ব্বে ২৬ অধ্যায়ে ধনঞ্জয়ের উত্তরদিগ্বিজয় প্রসঙ্গে, বর্ণিত আছে যে, তিনি সপ্তদ্বীপবাসীগণকে পরাস্ত করেন এবং সাগরোপকূল পর্য্যন্ত গমন করেন। ইহাতে তিব্বতের উত্তরে প্রাগ্‌জ্যোতিষ সন্নিহিত সমুদ্র থাকা প্রমাণিত হয়। ভীমের পূর্ব্ব দিগ্বিজয়ে (৩২ অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোকে) বর্ণিত আছে।

ততো হিমবতঃ পার্শ্বং সমভ্যেত্য জলোদ্ভবং।
সর্ব্বমল্পেনকালেন দেশং চক্রে বশং বলী॥

এইরূপে হিমালয়ের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে জলোদ্ভব দেশের বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে। গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর (দুর্য্যোধন-প্রভৃতি) পৈতৃক দেশের কান্দাহার প্রভৃতি অঞ্চলের ইতিবৃত্ত তৎসমসাময়িক সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব যে অবগত ছিলেন না তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। চোলা সুহ্ম প্রভৃতি রাজ্য সরযূ নদীর নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারও ঝঙ্কার মহাভারতাদি গ্রন্থে থাকিত। মনিয়র উইলিয়ম্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ রামায়ণের সরযূ ও বৈদিক সরযূ একই নদী বলিয়াছেন। আহুরমসদা পারসীকগণের জন্য যে ষোড়শ স্থান নির্ম্মাণ করেন, হরয়ূ তন্মধ্যে নবম। তাহা ভারতীয় আর্য্যাবাস হওয়া কিম্বা ইক্ষাকু বা মান্ধাতার রাজ্যভুক্ত হইলেও, বসতভূমি হওয়া সম্ভবপর নহে; উহা রামায়ণাদির বিরোধী হইয়া পড়ে। ঐ সকল নাম জেন্দাবস্তেও পাওয়া যায় না।

শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত "রাজা বিদেহমাধব সদানীরা অর্থাৎ গণ্ডক নদ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন" এই বাক্য হইতে সরযূর বহু পূর্ব্বে অবস্থিত গণ্ডক পর্য্যন্ত জল না থাকা প্রমাণিত হয়। কোশল রাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক বিদেহ রাজ্য স্থাপিত হয়। তৎপশ্চাৎ সমুদ্র, ইহা লেখকের যেমন স্বীকৃত আমাদেরও তেমন; এই সমুদ্র মনুর উল্লিখিত পূর্ব্ব সমুদ্র অর্থাৎ লোহিত্য সাগর। শতপথ ব্রাহ্মণ
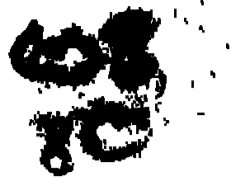
মহর্ষি বাজসনের যাজ্ঞবল্ক্য আখ্যাত, ইহা বৃহদারণ্যকে সুস্পষ্ট লিখিত আছে। এবং এই বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের দ্রষ্টা, মহর্ষি গৌতম কুলোদ্ভব উদ্দালক আরুণির শিষ্য। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বৈতহব্য অরুণের পুত্র। বীতহব্যও ঋগ্বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা শুনঃশেফ, (যিনি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক পুত্রত্বে গৃহীত হন এবং 'দেবরাত' উপাধি লাভ করেন) সেই দেবরাত শুনঃ শেফেরই পুত্র। এবং ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা মহর্ষি বিশ্বামিত্র হইতে একপুরুষ মাত্র অধস্তন। মহর্ষি উদ্দালকও একপুরুষ অন্তরে স্থিত। ইনি স্বয়ং শুক্ল যজুর্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। একপুরুষে বহু সহস্র বৎসর গত হওয়া পৌরাণিক আখ্যানে শোভা পাইলেও, আয়ুবিষয়ে 'শরদং শতং' বেদবাক্য স্মরণে লেখা সমীচীন বোধ হয় না। Rigvedic India নামক পুস্তকের লিখিত মতে পাঞ্জাব যাঁহাদের আদিনিবাস ও জন্মস্থান, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আর্য্যগণের আরল হ্রদের পার্শ্বে বাস করা কেমন কেমন বোধ হয়। ইক্ষ্বাকু ও মান্ধাতার সন্নিধানাতে বাস করার বিবরণ লেখকের স্বকপোলকল্পিত বলিয়া মনে হয়। মহাভারত ও রামায়ণের উক্তি ঐতিহাসিক বলিয়া গণ্য। লেখকের কল্পনার বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ইহা লিখিত। মনুসংহিতা— মনু বা ভৃগুরই উক্ত হউক—ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহা সূত্রকারগণেরও বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে আছে—যন্মনুনা উক্তং তদ্‌ভেষজম্; এবং সূত্রকারগণ শিষ্টবাক্য বলিয়া মনুবাক্যই গ্রহণ করিয়াছেন। মনু যজ্ঞ ও কৃষি শিল্পাদির প্রবর্ত্তক। সমাজের নেতা ও স্রষ্টা। রোমের রোমিউলাস্। সেই মনুসংহিতাতেও কুরুপাঞ্চাল ইত্যাদির উল্লেখ আছে। লেখকের আর্য্যাধ্যুষিত দেশের প্রধান নদীগুলির নামবোধক শ্লোকটী অত্যন্ত আধুনিক। লেখকের উল্লিখিত বিদেহমাথব গৌতম-রাহুগণের সমভিব্যাহারে সদানীরাতীরে গমন করেন। এই গৌতমরাহুগণ ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা। তৎপুত্র বামদেবাদি ৪র্থ মণ্ডলের দ্রষ্টা। কাজেই উহা যাজ্ঞবল্ক্যের বা বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। বামদেব ও বিশ্বামিত্র সমসাময়িক। বামদেবের পুত্রগণও ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। রাহুগণের কোন পূর্ব্ববর্ত্তীর নাম ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় না। শুক্লযজুর্বেদ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যদৃষ্ট বলিয়াই অর্ব্বাচীন নহে। কারণ উহাতে যে সমস্ত ঋষির নাম ও মন্ত্র পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহাদের অধিকাংশ ঋগ্বেদেরও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। কিন্তু পার্থক্য এই কেবলমাত্র শাকল শাখীয় ঋগ্বেদ—ঋগ্বেদসংহিতা বলিয়া বর্ত্তমান কালে সকলে গ্রহণ করিতেছেন; শুক্লযজুর্বেদে ঐ সকল ঋষিদৃষ্ট অনেক মন্ত্র আছে যাহা ঋগ্বেদে নাই। সুতরাং শুক্লযজুর্বেদ ঋগ্বেদের অপর অংশ বিশেষ মাত্র স্বীকার করিলেও অত্যুক্তি বা অসামঞ্জস্য হয় না। ঋকসংহিতা একাংশ গ্রন্থ। সুতরং কেবলমাত্র তৎদৃষ্টে জল্পনা কল্পনা করা অসমীচীন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহরাজ জনকের সভায় মহর্ষি উদ্দালক আরুণি গৌতম প্রভৃতি সহ সমবেত হন। এজন্য বিদেহ কিছু নব্য নহে। বিদেহের পর জলোদ্ভব দেশ, যাহা শতপথ ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে উভয়ত্র বর্ণিত আছে। সুতরাং রাহুগণও গৌতমের বিদেহগমনের বিবরণ ঋগ্বেদ হইতে পাঁচহাজার বৎসর পরবর্ত্তী ঘটনা নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী না হইলেও অন্ততঃ সমসাময়িক। লেখকের Rigvedic Culture নামক গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠায় সংলগ্ন যে মানচিত্র আছে, তাহাতে মনুর কথিত মত পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রই সমর্থিত হয়। এই বিষয়ে ঋগ্বেদের উক্ত ১০।১৩৬।৫ লিখিত পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদ্র, মনু-বর্ণিত লৌহিত্য বলিতে কোন বাধা দেখা যায় না। এবং তাহা বেদবিরোধীও হয় না। কাশ্মীর ও
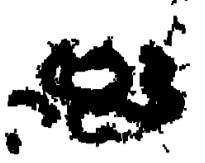
আফগানিস্তান বা বাহ্লীক ও গান্ধার পাঞ্জাব হইতে পৃথক গণ্য করিলে পাঞ্জাবের পার্ব্বত্য প্রদেশে কীকট অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। কারণ সিমলা টিরাই প্রভৃতি পাঞ্চাল বা পঞ্চজন দেশের অন্তর্গত। শুক্ল যজুর্বেদের ৩৪ অধ্যায়ে ১১ মন্ত্রে যাহা ঋগ্বেদের সমগ্র ২য় মণ্ডলের ঋষি গৃৎসমদ দৃষ্ট, তাহাতে আছে—

পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমপিযন্তি সস্রোতসঃ।
সরস্বতী তু পঞ্চধা সো দেশেঽভবৎ সরিৎ॥

এই পঞ্চস্রোতা সরস্বতীর নাম হইতেই পঞ্চনদ বা পাঞ্চাল নাম হইয়াছে। এই পঞ্চস্রোত গঙ্গা, যমুনা, শতদ্রু, বিপাসা ইত্যাদি হইতে ভিন্ন—ইহাতে সন্দেহ নাই। এবং ইহা সিন্ধু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তীই হইবে। উত্তরকুরু, দক্ষিণকুরু, উত্তর কোশল, দক্ষিণ কোশলের ন্যায় উত্তর পাঞ্চাল ও দক্ষিণ পাঞ্চাল ছিল। ইহাই পাঞ্জাপ্। সপ্তসিন্ধু পাঞ্জাপ্ নহে। মানচিত্রে বুন্দেলখণ্ডে চেদি নির্দ্দেশ করিলে এবং প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ যাহাকে কুরুরাজ্য বলেন, তাহা অঙ্কিত করতঃ তদ্দক্ষিণে সমুদ্রের অবস্থিতি দেখাইলে, পাঞ্চাল স্বতঃই স্থাপিত হয়, তজ্জন্য স্বতন্ত্র স্থান অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয় না। শতপথ ব্রাহ্মণ আখ্যাতা ও ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের কতিপয় মন্ত্রদ্রষ্টা শুনঃশেফ আজীগর্ত্তি দেবরাত পিতাপুত্র সম্বন্ধে স্থিত হওয়ায়, শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত বিদেহ ও কোশল প্রভৃতি জনপদ ও সরযু, গোমতী, গণ্ডকী প্রভৃতি নদী ঋগ্বেদের সময় হইতে যথাপূর্ব্বই আছে, ইহা বলাই বাহুল্য। কুশিকগণ কান্যকুব্জ দেশবাসী। সুতরাং বিশ্বামিত্র পাঞ্চালরাজ গাধির পুত্র ইহাতে সন্দেহ নাই। অবস্থামতে চেদির বহু উত্তরে স্থিত পাঞ্চালরাজ্য ঋগ্বেদের সময় ছিল না—বলা সঙ্গত হয় না। পঞ্চজনা শব্দ ঋগ্বেদে বহুস্থানে পাওয়া যায়। তাহাই পাঞ্চালের অধিবাসীগণকে উল্লেখ করিয়া লিখিত হইয়াছে মনে হয়। কারণ সরস্বতী পঞ্চস্রোতা, ও সিন্ধু সপ্তস্রোতা। লেখকের Rigvedic India পুস্তকে লিখিত মতবাদ স্বীকার করিলে গোমাল নদী ও ক্রমু লইয়া সিন্ধু সপ্তস্রোতা হইতে পারে। লেখকের উক্ত শতপথ ব্রাহ্মণের মন্ত্রই সরযূ যে হরযূ নয় তাহা প্রমাণিত করে। প্রয়োজন হইলে, বারান্তরে এই বিষয় সবিশেষ আলোচিত হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।—ভবদীয় স্বামী তারানন্দ,লালতারবাগ—হরিদ্বার।

বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম স্বরাজ-সঙ্ঘ।—বিগত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলিকাতাতে এই সঙ্ঘের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সঙ্ঘের পরিচয় এখনও দেশের সর্ব্বসাধারণে অবগত নহে। এই অল্প কালের মধ্যে হিন্দুর ধর্ম্মগত স্বাধীনতার উপরে নানাদিক হইতে যে আক্রমণ হইয়াছে, তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়াই সনাতনপন্থী হিন্দুগণ এই সঙ্ঘের আয়োজন করিয়াছেন। এজন্য প্রথমে কাশীধামে নিখিল ভারতীয় বর্ণাশ্রম স্বরাজ-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়, বঙ্গদেশ ও অপর বিভিন্ন প্রদেশে তাহার ২০টী শাখা-সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। প্রধানতঃ রাজনৈতিক শক্তি লাভের উপায় স্বরূপেই এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সঙ্ঘের নামেতেই তাহার প্রকাশ। সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান রাজনীতিক ক্রিয়া কলাপের কতখানি সামঞ্জস্য হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদিগের বিস্তর সন্দেহ আছে—ভারতের নিজ সাধনামূলক স্বরাজ ও বর্ত্তমান আন্দোলনের রাজনৈতিক স্বরাজ এক কথা নহে। বর্ণাশ্রমের সহিত প্রথমটীর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, দ্বিতীয়টী তাহার ঘোর বিরোধী। বর্ণাশ্রমী একান্তভাবে নিজ স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলেই, তাহার স্বরাজ—প্রকৃত

ভারতের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। একজন লোকও যদি তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, তবে তাহা দ্বারা যে ফল লাভ করা যাইবে, সহস্র প্রকারের রাজনৈতিক অধিকার আন্দোলন দ্বারা তাহা হইবে না। নানাকারণে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এখন বিপর্য্যয়ের বিপদ্‌পাতে অভিভূত হইয়াছে। আধুনিক রাজনীতির সংমিশ্রণে তাহার আরও বিপদের আশঙ্কা আছে।

উপস্থিত বঙ্গীয় সঙ্ঘের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণটী উল্লেখযোগ্য ও নানা বিষয়ের সরল আলোচনায় পরিপূর্ণ। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সকলে এ যুগের একজন কর্ম্ম-কুশল বিষয়ী লোক বলিয়াই জানে; অভিভাষণে তিনি যে ধর্ম্মনিষ্ঠা, শাস্ত্রে বিশ্বাস ও আস্তিক্যবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনেকের পক্ষেই অনুকরণীয়। উদার মতবাদ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তিনি যে দিক দর্শাইয়াছেন, তাহাও সবিশেষ প্রণিধান। যোগ্য বলিতেছেন—

"বিগত ইউরোপীয় আন্তর্জ্জাতিক মহাসমরের পর জগৎ একটা বিশাল রাজনীতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। এই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কত দেশের রাজনীতিক অবস্থায় যে কত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে—তাহা মনে করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।...যে মূল রোগে এই ঝটিকা উঠিয়া সমগ্র জগতকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, সেই মূল রোগের যদি প্রতীকার না হয় তাহা হইলে এই ঝটিকা আরও প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় পরিণত হইয়া জগতের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাও ধ্বংস করিয়া ফেলিবে; কেহ তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। কারণ, ইহার মূলে রহিয়াছে জগদ্ব্যাপী সংঘবদ্ধ অধর্ম্মহেতু বিক্ষুব্ধ মহারুদ্রের তাণ্ডবলীলা। কৃতপস্বী ত্রিলোকবিজয়ী হিরণ্যকশিপুর উদর বিদারণপূর্ব্বক তাহার নাড়ীমালা পরিধান করিয়া ত্রিভুবন হুহুঙ্কারে প্রকম্পিত করিয়া শ্রীভগবান নরসিংহের নৃত্য বর্ণাশ্রমী হিন্দুর মানসচক্ষে সর্ব্বদাই রহিয়াছে। দেবগণপ্রমুখ বিশ্বচরাচর সে নৃত্যে ভীত ত্রস্ত হইয়া পড়িলেও ভক্তবালক প্রহ্লাদ তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাঁহার প্রাণের :হরিকে জগন্মঙ্গলে রত দেখিয়া সভক্তি স্তব করিয়া জগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজিও আবার সেই লীলার পুনর্ভিনয় হইতে চলিয়াছে।"

—"ইওরোপীয় মহাসমর—বহুকাল হইতে পুঞ্জীভূত সঙ্ঘবদ্ধ পাপের ষোলকলায় পূর্ণতার পর—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় বহির্বিকাশ। প্রতীচ্যদেশ জড়বিজ্ঞানের শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া—তাহার প্রতি অত্যাসক্তি বশতঃ ধর্ম্মবিজ্ঞানকে অনাদর করিতে আরম্ভ করিল। জড় শক্তির দ্বারা বলবান হইয়া তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে জগতের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দেশসমূহের উপর আপতিত হইয়া নানা ছলে বলে কৌশলে তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক দেশে প্রচুর ধনাগম করিতে লাগিল। সুতরাং এই সকল জড়বিজ্ঞানবিশারদদিগের সম্মান যেরূপ দেশে বাড়িয়া যাইতে লাগিল, ধর্ম্মযাজকদিগের শক্তি সেই পরিমাণে ক্ষীণ হইয়া পড়িল। ভগবানের উপর লোক শ্রদ্ধা হারাইল। কাজেই মানুষ জড়শক্তিকেই ভগবানের স্থানে বসাইয়া পূজা করিতে লাগিল। ধনী ধনগর্ব্বে দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ভুলিয়া গেল। যাহার যেদিকে শক্তি আছে যে সেইদিকে শক্তি প্রয়োগ করিয়া দুর্ব্বলকে যথাসাধ্য শোষণ করিয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। উৎপীড়িত দরিদ্রগণ ক্রমশঃ বুঝিতে আরম্ভ করিল যে, ধনীর শক্তির মূল তাহাদের নিজেদের শ্রম। সুতরাং যদি তাহারা সংঘবদ্ধ হইতে পারে তবে তাহারা ধনীদের শোষণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। এই বুদ্ধি হইতে নানা প্রকার সঙ্ঘ উদ্ভূত হইল এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে একটা ঘোর শত্রুতা চলিতে লাগিল। এই সময় দেশের রাজশক্তি যদি ধর্ম্মকে অবলম্বন পূর্ব্বক ধনি দরিদ্রের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিতেন, তাহা হইলে ইহা অধিকদূর যাইত না;

কিন্তু ধনবান রাজশক্তি সাধারণতঃ ধনীদিগেরই পক্ষ সমর্থন করিয়া নির্দ্দয়ভাবে দরিদ্রদিগকে কঠোর শাসন করিতে থাকায় দরিদ্র প্রজারা রাজশক্তির উপরও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল এবং রাজশক্তির ধ্বংসের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপ একদিকে প্রত্যেক রাজ্যে, রাজায় প্রজায় একটা বিরোধের সৃষ্টি হইল। তাহার পর পাপ, রাজাদিগের হৃদয়ে পরস্পরকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। একদিকে ধর্ম্মশক্তি পঙ্গু, অপর দিকে পাপ রাজায় প্রজায় ও রাজায় রাজায় বিদ্বেষ-বহ্নি ধূমায়িত করিয়া দিল। সামান্য একটু ফুৎকারে তাহা প্রজ্জলিত হইয়া সমস্ত ইওরোপ খণ্ডকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।...ধর্ম্মের দ্বারা অরক্ষিত সমাজের মধ্যে পাপস্রোত প্রবলবেগে প্রবেশ করিয়া গার্হস্থ্য প্রথা কলুষিত করিয়া তুলিল। আজ ধর্ম্মবলহীন ইওরোপ ক্রমে ধনবলহীন জনবলহীন হইয়া শিল্প বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উত্তমর্ণ আমেরিকার পানে চাহিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে বসিয়া আছে। ইওরোপের রাজশক্তি ধর্ম্মহীন হইয়া পড়াতেই অতি অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের এই শোচনীয় অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এখনও যায় নাই। যদিও নানা প্রকার সন্ধি, নৌবলনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির দ্বারা রোগের বাহ্য উপসর্গ দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু তাহাতে ভিতরের রোগ (যাহা একমাত্র ধর্ম্মশক্তির দ্বারা নিবারিত হইতে পারে) এই যথার্থ ঔষধ—ভগবদ্ভক্তি ও মানব-প্রীতির অভাবে কিছুমাত্র উপশম না হইয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে—আর হয়ত কিছুদিন চাপা থাকিয়া আবার ভীষণভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া জগতে মহাপ্রলয়ের সূচনা করিবে।

যে রোগে ইওরোপের এই দুরবস্থা, সেই রোগ আজ ভারতবর্ষেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে; তবে এখনও সর্ব্বস্তরে বিসর্পিত হয় নাই; উপরিভাগটা আক্রমণ করিয়াছে মাত্র। ইহার ফলে রাজার প্রজায় একটা অবিশ্বাস, যাহা পূর্ব্বে ছিল না—তাহা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। ভিন্ন জাতীয় প্রজাদিগের মধ্যে পূর্ব্বে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে থাকিয়া স্বধর্ম্মপালন রীতি প্রচলিত ছিল; তাহার পরিবর্ত্তে আজ ধর্ম্ম লইয়া রাজনীতি লইয়া প্রাণান্তকর ভ্রাতৃদ্রোহের সৃষ্টি হইতে বসিয়াছে! ভারতের প্রত্যেক প্রান্ত হইতে এই সংঘর্ষের সংবাদ প্রতিনিয়তই আসিতেছে। ভারতে এমন কোন শক্তি দেখা যাইতেছে না যাহা, এই বিবদমান শক্তিগুলির মধ্যে বিশ্বাস ও প্রীতি আনয়ন করিতে পারে। বর্ণাশ্রমী হিন্দুকেই এই শক্তিসামঞ্জস্যের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

—"ভারতের শাসন-তন্ত্রের ভিতর ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে। সংখ্যা বাহুল্য হিসাবে ২২ কোটী হিন্দুর এই শাসন-চক্রের মধ্যে প্রাধান্য অনিবার্য্য বুঝিয়া, ভারতে আবার হিন্দুরাজ্য আসিল ভাবিয়া, অন্যান্য জাতি বিশেষ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কেবল সংখ্যাবাহুল্যে কোন কাজ হয় নাই, হইবেও না। "সংঘ শক্তি কলৌ যুগে" এই মন্ত্রের সাধন করিতে হইবে। যদি আমরা অভ্যুদয়ে দৃপ্ত না হইয়া ভারতীয় হিন্দুর "বসুধৈব কুটুম্বকং" এই আদর্শ বিস্মৃত না হইয়া ধীরভাবে ধর্ম্মের ভিত্তিতে সমস্ত ভারতীয়ের প্রতি জাতিনির্ব্বিশেষে প্রীতির ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হই, তাহা হইলে অচিরকালের মধ্যেই আবার হিন্দুর সৌভাগ্যসূর্য্য—পূর্ব্বগগনে উদিত হইবে এবং হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে জগতের ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইয়া পৃথিবী শান্তির আলয় হইবে। বর্ণাশ্রমী হিন্দু! সংযম-পরায়ণ তপস্বী হিন্দু! জগতের এই পরমানন্দময় অবস্থা আনিবার জন্য তোমাকেই তপস্যা করিতে হইবে। উদ্দেশ্য ভগবানের চরণে ঢালিয়া দিয়া তপস্যা দ্বারা নিজে শক্তিমান হও এবং আত্মশক্তিতে সকলকে প্রীতির সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের বিজয় নিশান উড্ডীন কর। ঐ শুন ভগবান্ পার্থসারথীর অভয় বাণী তোমাকে আশ্বাস দিতেছে——

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

মাস-পঞ্জি—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে।—নিখিল ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যকরী শাখার এক অধিবেশন প্রয়াগে বসিয়াছে; অনেক প্রদেশে ভূমিকর ও অন্যত্র চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধ করিবার প্রস্তাব বিশেষরূপে আলোচিত হয়—ফরাসী রাজ মন্ত্রী মঃ ব্রায়েণ্ড ইউরূপীয় রাজ্য সমুহের এক যুক্ত-রাষ্ট্রের পরিকল্পনা উপস্থিত করিলেন, এতদ্বারা আমেরিকার যুক্তরাজ্য সমূহের (U. S. of America) ন্যায়, ইউরোপে রাজ্যগুলি ইউরোপীয় যুক্তরাজ্য (U. S. of Europe) এতে পরিণত হইয়া একত্র আত্মসংরক্ষণ ও আত্ম প্রসারন করিবে—সত্যাগ্রহীদল শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ধর্ষনাতে আরও সমবেত হইতেছেন—পঞ্জাবের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃগণ ধৃত হইলেন—ভারতবর্ষের উপস্থিত গোলযোগের শান্তিকামনায় বিলাতের প্রধান ধর্ম্ম যাজক কেন্টেরবেরীর আর্চ্চ বিশপ সমুদয় খৃষ্ট ধর্ম্ম মন্দিরে এক সাধারণ প্রার্থণা দিন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—বিলাতে সাইমন কমিশনের কার্য্য বিবরণ ছাপিয়া প্রকাশিত করিবার আয়োজন চলিতেছে, ইংলণ্ডেশ্বর তাহার প্রথম ভাগ দেখিয়া দিয়াছেন—৪৭২ জন সত্যাগ্রহী বোম্বই প্রদেশের বাদালা নামক স্থানের নিমক-গুদাম দখল করিতে যাইয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন—ইটালীর রাজ-মন্ত্রী বা নবযুগের ভাগ্যবিধাতা মুসোলিনী প্রকাশ্য সভায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 'এ সময়ে ইটালীর নৌ-শক্তির বৃদ্ধির আয়োজনে বিরত থাকা ইটালীবাসীর পক্ষে ঘোর অবমাননার বিষয় হইবে; ইটালীয়গণ প্রাচীন রোমের অধিকৃত সমুদ্র রাজির মধ্যভাগে আর বন্দীর ন্যায় অবস্থান করিতে পারে না।' ফরাসীর সংবাদপত্র সমূহে এই কথা লইয়া তুমুল সমালোচনা চলিতেছে;—বর্ত্তমান শতাব্দীত শান্তির সময়ে অশান্তি আনয়নের এমন প্ররোচনা নাকি আর শুনা যায় নাই—বঙ্গদেশের জলবিভাগের শাসনার্থে নূতন বোর্ড সৃষ্টি হইল, জল সিঞ্চন (irrigation) জলবন্ধন (embankment) ও জল নিষ্কাসন (drainage) সম্মিলিত ভাবে এই বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হইবে, জলপথও ইহাদের তত্ত্বাবধানে থাকিবে—ডাঃ রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানব-ধর্ম্ম' নামক তাহার হিবার্ট লেক্‌চার আরম্ভ করিলেন—বিলাতে ভারতের জন্য খুব উচ্চ হারের সুদে ঋণ তোলা হইতেছে, ভারতের বর্ত্তমান আন্দোলনের পরিণামে রাজস্বের যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত রূপেই নাকি ভারতীয় করদাতাদিগকে এই ভার বহন করিতে হইবে—হিসাব বাহির হইয়াছে যে বিগত ১৯২৮-২৯ অব্দে ভারতীয় আয়কর (Income-tax) বিভাগে ১৭ কোটী টাকা আদায় হইয়াছে—শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ও আরও অনেক প্রতিষ্ঠিতে দেশ নায়ক গ্রেপ্তার হইলেন ও প্রায় ৩৫০ জন সত্যাগ্রহী ধর্ষনাতে আহত হইয়াছেন—শ্রীযুক্তা নাইডুর প্রতি নয় মাস সাধারণ কারাবাস ও মণিলাল গান্ধীর প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। কাঞ্চনজঙ্ঘার 'ইউরোপীয় যাত্রীদলের উপর তুষারপ্রবাহ বহিয়া এবারের যাত্রাও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে—সোলাপুরে সামরিক আইন এখনও চলিতেছে—ভারতীয় সংবাদ পত্রের উপর কড়া নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়াতে বিলাতের বক্তৃ-সম্প্রদায় (Speaking union) ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন ... ... ঢাকা সহরে ভীষণ দাঙ্গার সূচনা হইল—নূতন সংবাদ পত্র দলন নীতির প্রতিবাদ করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত এন, সি কেলকার পুণাতে প্রকাশ্য সভায় কোনও নিষিদ্ধ পুস্তিকা পাঠ করিয়াছেন—জেড্ডার যাত্রীবাহি 'এশিয়া' নামক পোতে অগ্নি-সংযোগ হইয়া বহু লোকের প্রাণনাশ ঘটিয়াছে—ভারতীয় বিমানবীর মনোমোহন শিং ও চাবলা সিমলা সহরে অভ্যর্থিত হইতেছেন—ঢাকার দাঙ্গা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে—সাইমন কমিশনের প্রধান বা শেষ ভাগ সকল সভ্য এক মত হইয়া সাক্ষর করিলেন—বোম্বাই ও লক্ষ্ণৌ সহরে গোলযোগ চলিতেছে, পুলিশ গুলি বর্ষণ করিতে বাধ্য হয়—পার্লেমেন্টের উভয় রাজনৈতিক দল সমবেত ভাবে ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতির সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন—রেঙ্গুন সহরে ভীষণ দাঙ্গা উপস্থিত হয়, ৫২ জন লোকের মৃত্যু ও হাজার লোক জখম হইয়াছে—

উদয়পুরের মহারাণার মৃত্যু হইয়াছে—ঢাকার দাঙ্গার ফলে হাট বাজার বন্ধ ও খাদ্য দ্রব্যের অভাব ঘটিয়াছে—লিলুয়াতে নূতন দাঙ্গার সৃষ্টি হইয়াছে—রেঙ্গুণের ও ঢাকার গোলযোগ বর্দ্ধিত হইয়াছে, —বড়লাট আর দুইটী নূতন অর্ডিন্যান্স জারি করিলেন, একটী তে যাবতীয় রাজকর বন্ধ করিতে প্ররোচনা ও অপরটী সরকারী কর্ম্মচারীগণকে কার্য্য করিতে বাধা প্রদান লক্ষ্যে—ইংলণ্ডে একটী জাহাজ নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে তাহা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নৌযান হইবে বলিয়া পরিকল্পনা, ইহার ব্যয় ৯ কোটী টাকা ও নির্ম্মাণে তিন বৎসর কাল লাগিবে—দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় বিবেচনায় ভারতীয় ফুটবল খেলোয়ারগণ এ বৎসর কোনও খেলাতে যোগ দান করিবেন না—ঢাকা সহরের হিন্দুগণ আতঙ্কে সহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে—ইংলণ্ডের দৈনিক পত্রিকা 'ডেইলী ক্রনিকল ও ডেইলী নিউজ' অতঃপর একত্র হইয়া প্রকাশিত হইবে—সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে বৎসরের নূতন উপাধি বিতরণ হইল—কাঞ্চনজঙ্ঘা যাত্রীগণ এবৎসরের জন্যও উহার শিখর দেশ অবরোহণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন—পেশোয়ারের গোলযোগে একদল গাড়োয়ালী সৈনিক কার্য্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সামরিক আইনে অভিযুক্ত হইয়াছে—পাতিয়ালা রাজ্যের জন সাধারণ রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রকাশ্য অনুসন্ধান প্রার্থনা করিতেছে—উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে পার্ব্বত্য দলের লোকেরা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছে, পেশোয়ারের সীমানা পর্য্যন্ত তাহাদের আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, ভারত গভর্ণমেণ্ট স্থল ও আকাশ হইতে তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতেছেন—পশ্চিম বঙ্গে লবণ-তৈয়ারী করণ ব্যাপার লইয়া তুমুল কাণ্ড চলিতেছে; মেদিনীপুর বালিসাইতে দেড় সহস্র সত্যাগ্রহীর উপর পুলিশের গুলি চলে; দাসপুরের নিকট গ্রাম্য লোকেরা একত্র হইয়া পুলিশের উপর আক্রমণ করে; দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারীর খোজ পাওয়া যাইতেছে না; স্বয়ং বঙ্গের ইনসপেক্টার জেনারেল-অব-পুলিশ একশত সামরিক পুলিশ লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন—সাইমন কমিশনের বিবরণী ১ম ভাগ প্রকাশিত হইল; দ্বিতীয় বা প্রধান ভাগ এক পক্ষ কাল পরে বাহির হইবে; —আফ্রিদী আক্রমণকারীরা পেশোয়ারে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, চট্টগ্রামের নৈশ আক্রমণ কারীর প্রধান দলের সন্ধান পাওয়া যায় নাই; কয়েক জন লোক উহার সংশ্লিষ্ট বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে—কলিকাতা পুলিশ বিভিন্ন স্থান খানাতল্লাস করিয়া ৮৬ জন কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন—বঙ্গলাট সার ষ্টানলী জ্যাকসন তিন মাসের ছুটীতে স্বদেশ গমন করিলেন; তাঁহার স্থানে বিহার ও উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তা সার হিউগ ষ্টিফেনসন বঙ্গের শাসন ভার গ্রহণ করিলেন—দেশের প্রায় সর্ব্বত্র ও সকল দলের লোক সাইমন কমিশন রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করিতেছে—শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, ডাঃ আনিবেসেণ্ট ও শ্রীযুক্ত এম এন যোশী ইংলণ্ডে আছেন; ইহারা তিন জনই ভাবী গোলটেবিল বৈঠকে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ—সিমলার মহম্মদ সফী ও জিন্না প্রভৃতি মুসলমান নেতৃগণ সমবেত হইয়াছে, দেশের অবস্থাতে ভাইস-রয়ের সহিত পরামর্শ করিতে ইহারা আমন্ত্রিত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেল পথে মাল চলা-চলতি অনেক কমিয়া গিয়াছে—নূতন সংবাদ পত্রে 'অর্ডিন্যান্স' আইন বিষয়ে বঙ্গীয় সরকার একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন—পিকেটিং অর্ডিন্যান্স বলবৎ রাখিবার জন্য বোম্বাই সহরে সৈনিক সংযোজনা করা হইয়াছে—৩২এ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত।

Regd. No. C—1789.

Printed Cover at the Rameswar Press, 16-1A Ghose Lane. Forms 1—4, 8 at the Mazumdar Press, 2, Shampukur Lane & 5—7 at the Kaliganga Press, 190 Upper Circular Road by Jatindra Mohan Biswas and published by him from 4, Bechu Chatterjee Street, Calcutta.

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনামূলক ভাব-ধারার বাহক সময়োপযোগী
মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম এ সম্পাদিত

বিষয়

প্রথম বর্ষ } শ্রাবণ ১৩৩৭ { দশম সংখ্যা

ভারতের সাধনা—নিয়মাবলী

সাধারণ

১। প্রতি বাঙ্গলা মাসে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয়।

২। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র এবং বৈশাখ হইতে আশ্বিন—দুই ষাণ্মাসিক হিসাবে বৎসর গণনা হইয়া থাকে। গ্রাহকগণ ষণ্মাসের প্রথম হইতে অথবা বৎসরের যে কোনও সময় হইতে পত্রিকা লইতে পারেন। মূল্য বার্ষিক ৪৲, ষাণ্মাসিক ২৷৷০, প্রতি সংখ্যা ।৵০, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

৩। পত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন।

৪। টাকা-কড়ি ও চিঠি-পত্র ম্যানেজার বা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন

দেশের ধর্ম্ম, অর্থ, জ্ঞান ও স্বাস্থ্য সাধনার নির্দ্দেশক সমুদয় বিষয়ের বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে গৃহীত হয়; অশ্লীল ও সমাজের অনিষ্ট-কর বিষয়ের বিজ্ঞাপন পরিত্যজ্য। বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ—কার্যাধ্যক্ষের সহিত স্থির করিবেন

এজেন্সী

মাসে অন্ততঃ ১০খানি পত্রিকা লইলে কেহ এজেন্ট হইতে পারেন। উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্টগণ নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশী বা কম দরে পত্রিকা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। প্রতি মাসের হিসাব ঐ মাস মধ্যে পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে; না করিলে পর মাসের পত্রিকা পাইবেন না। পার্শেল পাঠাইবার খরচ আমরা বহন করি; কিন্তু মনি-অর্ডার কমিশন বা পত্রাদি লিখিবার খরচ এজেন্টকে বহন করিতে হইবে।

৮৪নং বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। | কার্য্যাধ্যক্ষ ভারতের সাধনা কার্য্যালয়

অভ্যুদয় ও নিউপ্রেস

প্রথম বর্ষ] শ্রাবণ—১৩৩৭ [দশম সংখ্যা

সাধনার পথে

বর্ত্তমান জগতে রাষ্ট্রের মাহাত্ম্য অত্যধিক। সকলেই রাষ্ট্র-নীতি বা রাজ-নীতি লইয়া ব্যস্ত। সর্ব্বত্র রাজনীতিক অধিকার লাভের নিমিত্ত শ্রেণী ও গণের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলিতেছে। রাষ্ট্রে খ্যাতি ও পদবী লাভ লোকের প্রধান আকাঙ্খার বিষয় হইয়াছে। আবার রাষ্ট্রের গঠন ও উন্নতি সাধনই নাকি মানবীয় সাধনার চরম পরিণতি—জাগতিক ব্যাপারের সর্ব্বশেষ অভিব্যক্তি। এ অংশটুই পাশ্চাত্যের অভিমত; আর তাহা দ্বারাই সমগ্র পৃথিবীর লোক আজ প্রভাবিত হইয়া চলিয়াছে। পাশ্চাত্য বিবর্ত্তবাদের ইহাই শেষ কথা—মৌলিক কোনও জড় স্বভাব হইতে এ বিশ্বের উৎপত্তি; এবং তাহারই কোনও অনির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিভিন্ন স্তরে জড়জগৎ, প্রাণী জগৎ, মনোজগৎ ও সর্ব্বশেষ সমাজ-জগৎ বা রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই হইল বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একটা স্থূল কথা; কঠোর বৈজ্ঞানিকগণ এ মতেরই অনুসরণ করেন। যাহারা তাহা করিতে পারেন না, তাহারা সমাজকে ব্যবহার শাস্ত্রের (ethics এর) নিয়মে বুঝিতে চাহেন—মানবের স্বাধীন চিন্তা ও বাসনা এবং সুখান্বেষণ প্রবৃত্তি আদিমকাল হইতে সমাজ গঠন করিয়া চলিয়াছে; এবং লোকের ব্যক্তি বা জাতিগত স্বার্থ ও লাভালাভের বিচারক্রমে তাহা হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে; আজিও বিবিধ সমাজ তন্ত্র-রাজ্য, সাম্রাজ্য, জাতীয়তা, সঙ্ঘ প্রভৃতির নামে তাহার প্রসারসাধন হইতেছে।

রাষ্ট্র-মাহাত্ম্য

বাস্তবিক কিন্তু রাষ্ট্রকে কোনও অলঙ্ঘনীয় নিয়মে বাঁধিয়া রাখা কঠিন। ইহার উৎপত্তিও রহস্যময়। এজন্য কত সিদ্ধান্তই উদ্ভাবিত হইয়াছে; কোনটাই শেষ পর্য্যন্ত সন্ধান দিতে পারিয়াছে, বলা যাইতে পারে না। বর্ত্তমানকালের বিভিন্ন দেশের আইনজ্ঞ পণ্ডিতগণের ন্যায়, প্রায় সকল যুগের দার্শনিকগণ রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ বিচার করিয়াছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে সমাজ বা রাষ্ট্রকে একটা কঠিন দৃঢ়সংবদ্ধ বস্তু বলিয়া মনে হইতে পারে—ধীর, শান্ত, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজ তরল বা বায়বীয় পদার্থের ন্যায়ই চলায়মান ও টলায়মান—সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের ঘূর্ণাবর্ত্ত অপেক্ষাও অধিক। কোনও একটা চির স্থির কেন্দ্র ত নাইই, বরং যে কোনও স্থান বা কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া যে কোনও সময়ে ভীষণ আবর্ত্ত উঠিতে পারে। সমাজদেহের নানা পরিবর্ত্তন, আন্দোলন, বিপ্লব, যুদ্ধ, বিগ্রহ, ঐরূপে হইয়াছে ও হইবে। এক এক জন নেপোলিয়ন, আলেকজাণ্ডার বা ক্রমওয়েল আসিয়া হঠাৎ বিপুল পরিবর্ত্তম ঘটাইয়া গিয়াছেন; আবার বুদ্ধ, যীশু ও মহম্মদ, প্লেটো ও শঙ্কর এক একটা ভাবপ্রবাহ ছুটাইয়া দিয়াছেন। আজিও কাইজার বা গান্ধীকে এক একটা ঘূর্ণাবর্তের কেন্দ্র বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

তথাপি সমাজকে বাঁধিয়া চালাইবার চেষ্টা সর্ব্বকালে চলিয়াছে, তাহাতেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও রাজনীতিজ্ঞের কৃতিত্ব। রাষ্ট্রের প্রধান সাধন বিধিনিষেধ বা ব্যবস্থাপত্র—আইন কানুন। ইহা প্রধানতঃ দুই লক্ষ্যে ব্যবস্থিত—লোকের ধন ও প্রাণের সংরক্ষণ—সমাজের বস্তু ও ব্যক্তি দুইটী অঙ্গের সংরক্ষণ ও উন্নতিবিধান করা। একটীকে বহিরঙ্গ ও অপরটীকে অন্তরঙ্গ বলা যাইতে পারে; অবশ্যই ইহারা পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়, বরং প্রত্যেক বিষয়ে পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সমাজের বাহ্যিক বস্তুগত ধন ঐশ্বর্য্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে গিয়া শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও ভূম্যধিকার সত্ত্বের বিবিধ প্রকার ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত হইয়াছে; আর ব্যক্তির উন্নতির জন্য শিক্ষা, নীতি ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই দুই দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলেই সমাজের স্থিতি অপেক্ষাকৃত অধিক সংরক্ষিত হইতে পারে। নচেৎ একের অত্যধিক আধিক্য বা অপচয় ঘটিলে, সমুদয় সমাজের সমতা নষ্ট হয় বা বিপ্লব ঘটে; সামান্য কারণে মহৎ অনিষ্টের সূত্রপাত হয়। প্রাচীন রাজ-নীতিজ্ঞেরা এই উভয় কুল দেখিয়া বিচার করিতেন ও তদনুসারে রাষ্ট্রব্যবস্থা করিয়া চলিতেন। ভারতীয় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা তাহার সর্ব্বোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রাচীন গ্রীসের রাজ-নীতি শাস্ত্রেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভারতীয় সাধনায় জগতের মৌলিক তত্ত্ব, মানব প্রকৃতি ও স্বভাবের অবস্থার বিচার যেরূপ তুল্যরূপে করা হইয়াছে, পৃথিবীর আর কোনও জাতির মধ্যে বা স্থানে সেরূপ দেখা যায় না। সেজন্যই ভারতের সাধনামূলক সমুদয় বিষয়ে এক অসাধারণ সাম্য রহিয়াছে এবং তাহা চিরন্তন সত্য বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। ভারত সেই সাধনা বলেই বিভিন্ন যুগের নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়াও এযাবত আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে ও রক্ষা করিবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

ব্যক্তি-প্রাধান্য ও বস্তু-প্রাধান্য

ইহুদী জাতি ও এই দুইএর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অনেকটা চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাই তাহাদের সামাজিক অস্তিত্ব এখনও ক্ষীণভাবে বিদ্যমান। গ্রীস প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, অতীত ও বর্তমানের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। পাশ্চাত্যের বর্তমান সমাজনীতি ও রাষ্ট্র

নীতির অনেক কথার বীজ প্রাচীন গ্রীসের চিন্তা ধারায় নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রসংস্থার যেমন বিভিন্নতার অন্ত ছিল না, তাহার চিন্তা ধারাতেও বিভিন্ন মতের প্রাবল্য অত্যধিক—সমগ্র জাতির অন্তরে কোনও একটী মৌলিক সত্যের উপলব্ধি কখনও হয় নাই। ভারতে যে সত্যের উপলব্ধি বেদের আপ্তবাক্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র দেশের সাধনাকে চিরন্তন কাল নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিয়াছে, গ্রীসে তাহার একান্ত অভাব। সেখানে সক্রেটিসের মত শ্রেষ্ঠ পুরুষেরও সমসাময়িক শত্রুর অভাব ছিল না, এবং তাহাদের চক্রান্তে তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল; আর তাঁহার আপন শিষ্যগণ মধ্যেও বিভিন্ন মতেরই পুরিপষ্টি সাধন হইয়াছিল। গ্রীসের চিন্তাধারায় রহিয়াছে, নানা 'মুনির নানা মত'; আর ভারতীয় সত্যানুভূতিতে 'ঋষির দৃষ্টি'। রাষ্ট্রতত্ত্বের চর্চ্চায় গ্রীস অগ্রণী—আর তাহাতে সিদ্ধ দুইজন মনীষী, প্লেটো ও এরিষ্টট্‌ল—গুরুশিষ্যের সম্বন্ধে সম্পর্কিত হইয়াও, মতপার্থক্যের চূড়ান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। প্লেটো ছিলেন ব্যক্তিপ্রাধান্যের পক্ষপাতী—রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্বের উন্নতি ও চরমফল প্রাপ্তি ছিল তাহার লক্ষ্য; আর এরিষ্টটল্ বস্তুপ্রাধান্যের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন—ধন-ঐশ্বর্য্যে ও ঐহিক সুখ সম্পদে মানুষ কিসে সুখী হইতে পারে, ইহাই তিনি তাহার প্রসিদ্ধ রাজনীতি শাস্ত্রে দেখাইয়া গিয়াছেন। এ দুইই একদেশদর্শী। এজন্য পেটো অতি শীঘ্রই উপেক্ষিত হইয়াছিলেন; আর ঐহিকসর্ব্বস্ব সুখবাদী বর্ত্তমান জগৎ এরিষ্টটলকে রাষ্ট্রনীতির জন্মদাতা বা গুরু বলিয়া পূজা করিতেছে। এরিষ্টটলের রাজকীয় ছাত্র আলেকজন্দর ইউরোপের অন্তরে সর্ব্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদের বীজ বপন করিয়া যান। পরে রোমকরা উহাকে সুদৃঢ় মহা মহীরুহে পরিণত করিয়া, তাহার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিবার নিমিত্ত অপূর্ব্ব রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন; তাহাই আধুনিক জগতের ব্যবহার শাস্ত্রের মৌলিক তন্ত্র। মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্র দৃষ্টিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাবে ও নানা রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে পড়িয়া উহাকে অপসারিত হইতে হয়। এবং প্রাচীন গ্রীসের বস্তুপ্রাধান্যমূলক নীতিশাস্ত্র সমূহ পুনরুন্মীলিত হয় (Renaisance); এবং তাহার প্রতিধ্বনিতে ইউরোপীয় বিভিন্ন রাজ্যে অনেক বিধি-বিদের (বেনথাম, হলাণ্ড, অষ্টিন প্রভৃতি আবির্ভাব হয়। ইহারা সকলেই বস্তুপ্রাধান্য বা রাষ্ট্রের ধনৈশ্বর্য্য সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির দৃষ্টিতে রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রভূত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন ও তদনুযায়ী রাষ্ট্র-বিধানের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। অবশ্যই প্রাচীন প্লেটোর আদর্শে ইউরোপের কয়েকজন দার্শনিক (লায়েবনীজ, ষ্টামলার, ক্যাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি) জগতের মৌলিক তত্ত্বের লক্ষ্যে ব্যক্তি-প্রাধান্যের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রতন্ত্রকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ব্যবহারে তাহাদিগের কথা কেহ শুনে নাই।

বর্ত্তমান রাষ্ট্র নীতিতে বস্তু প্রাধান্যের প্রগতি ও প্রতিষ্ঠা।

এরূপ একদর্শীতার চূড়ান্ত অবস্থায় যাহা ঘটিতে পারে, জগতের উপস্থিত রাষ্ট্রিক অবস্থা তাহারই দৃষ্টান্ত স্থল। সমাজে বিভিন্ন স্তরের সাম্য নষ্ট হইয়াছে। সেজন্যই সাম্রাজ্যবাদীর সহিত গণমতের, ধনিকের সহিত শ্রমিকের, উচ্চ ও নিম্নবর্ণের, সম্প্রদায়ে, শাসক-সম্প্রদায়েশাসিতে, ছাত্র শিক্ষকে, বিরোধ অনবরত চলিতেছে। যে স্থলে সক্ষম হয় এক পক্ষ অপরকে নিপীড়িত নিষ্পেষিত বা বিদূরিত করিয়া দিতেছে, অথবা প্রবল দুর্ব্বলকে দৈহিক শক্তি বা পশুবলের সাহায্যে নির্য্যাতিত করিয়া রাখিতেছে।

ভারতের অশান্তির কথা আজ জগৎ ব্যাপিয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে। শাসক ও শাসিত উভয়েই একরূপ ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যে ভারত একদিন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে থাকিয়াও শান্তিতে অবস্থান করিত—সমাজ ও রাষ্ট্র সুস্থ ও সবল ভাবে চলিত, সে আজ স্বায়ত্ব শাসন, ডমিনিয়ান ষ্টেটাস, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ নামে শিহরিয়া উঠিতেছে! কেবল ভারত নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র কোনও না কোনও রূপে এইরূপ ত্রাস, এরূপ আশঙ্কা ও সন্দেহ বিরাজমান। ভারতীয় বাণিজ্যের যে অবসাদ অন্ত দেশীয় ও বিদেশীয় বণিককুলকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহা সমুদয় পৃথিবীর সাধারণ প্রশ্ন; যে বেকার সমস্যা ভারতবাসী আজ বহু বৎসর ধরিয়া নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে, তাহাতে এক্ষণে ইংলণ্ড, আমেরিকা জারমেনী সকলেই উদ্ব্যস্ত। সু-রাষ্ট্রের যাহা লক্ষ্য—ব্যক্তি ও বস্তুতন্ত্রের সম্যক্ বিকাশ ও তাহাতে সাম্যপ্রতিষ্ঠা, তাহা সমাজ হইতে নষ্ট হওয়াতেই মানব সমাজ আজ নানা দিকে বিপ্লবের মুখে ছুটিয়াছে।

শান্তির সমীক্ষা

ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এ যুগের অনেক ঐতিহাসিক এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। লেখা পড়া জানা লোকেরা তাহা মান্ত করিয়া লইয়া চলিয়া আসিয়াছেন; ইংরেজ রাজপুরুষদিগেরও ইহাতে গর্ব্ব করিবার হেতু আছে। কারণ ইহার নামেই তাঁহারা এদেশে যাহা কিছু করিয়া থাকেন। ঘটনাচক্রে এক্ষণে এই বাক্যের সত্যতা যাচাই করিবার সময় আসিয়াছে। প্রথমতঃ ইংরেজ এদেশে যে শান্তি আনয়ন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক শান্তি কি না এবং উহা কোন্ স্তরের শান্তি, সেরূপ বা তাহা হইতে উচ্চ বা নিম্ন স্তরের শান্তি এদেশে ছিল, বা হইতে পারে কি না, এ সকল বিষয় বুঝিতে হইবে—ইংরেজ রাজপুরুষ ও দেশীয় লোক এতদুভয়েরই ইহা তুল্যরূপে বুঝা আবশ্যক। তারপর বাস্তবিকই এদেশে শান্তি বিরাজ করিত কি না, এবং করিয়া থাকিলে তাহার স্থিতি বা স্থায়িত্ব কত দূর, ইহাও দেখা উচিত। পরিশেষে বর্ত্তমান সময়ে এদেশের অশান্তি (Indian Unrest) বলিয়া যে কথাটা বিদেশীয়দিগের মধ্যে বিশেষ করিয়া শুনা যাইতেছে, তাহার অর্থ কি—তাহার হেতু ও প্রতিকার কি হইতে পারে—তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

(১) ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে যে শান্তি বা শৃঙ্খলা আসিয়াছে, তাহা ইংরেজের দান নহে—ইংরেজ এদেশে শান্তির সমাচার লইয়া আসেন নাই (পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে হয়ত সেণ্ট টমাস সেরূপে আসিয়া থাকিবেন ; কিন্তু তাঁহার বহু পূর্ব্বে ভারতে শান্তির বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশ বিদেশে

প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল; সেণ্ট তমাসের সমাচার তাহারই এক ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র, জাগতিক ধর্মের ইতিহাস সেই প্রমাণ দেয়)—রাজ্যস্থাপন করিবার জন্যও নহে। রাজ্য লাভ হইয়াছে দৈবাৎ—কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ তার নির্দ্দেশ করা যায় না। এরূপ ঘটনা ইতিহাসে বিরল (ডাঃ সিলী কৃত 'Expansion of England' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য); তবে দেশীয় লোকের সহযোগিতা ও স্বেচ্ছায় বশ্যতা গ্রহণই নাকি তার প্রধান হেতু। দেশের শান্তিরও কারণ দেশীয় লোকের শান্ত-প্রকৃতি বা শান্তিপ্রিয়তা। শাসনপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আইন কানুন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, বিচারাদালত শাসনযন্ত্রাদি সংস্থাপিত হইয়াছে, নিরস্ত্র ও শক্তিহীন হইয়া লোকে জীবন যাত্রায় চলিয়া যাইতেছে, মারপীঠ দাঙ্গা হাঙ্গামা তেমন হইতেছে না—একথা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে উহা প্রকৃত শান্তির লক্ষণ নয়, লোকের দুর্ব্বলতা ও নিরুপায় হইয়া থাকারই ফল মাত্র। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেও এদেশে শান্তি ছিল—প্রায় সকল সময় ও সর্ব্বত্র অত্যধিকই ছিল (মুসলমান আক্রমণ কালের উৎপীড়ন—যাহা সর্ব্বত্র বিজিতের উপরে হইয়া থাকে—ও মুসলমান রাজশক্তির অধঃপতন কালে দেশের অরাজকতায় অশান্তির কথা ছাড়িয়া দিলে, এদেশে অপর সকল সময়ই শান্তি বিরাজ করিত)। কিন্তু সে শান্তি দুর্ব্বলের পদাবনতি নয়—শক্তি সম্পন্নের ধীরভাব। আইন কানুনের কড়াকড়ি ও বিভিন্ন ধাপের শাসন চক্রের চাপে না থাকিয়াও এদেশীয় লোকেরা যে বিজাতীয় বিধর্ম্মী রাজার অধীনে সৈনিক ও শাসন বিভাগে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার ও ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন, তাহাতেই সেই শক্তি ও শান্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্ব্বসাধারণ লোকের মধ্যে তখন যে মিল ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান ছিল, একালে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র শাসনের গুণেই এখন লোকের মধ্যে অর্থঘটিত, পদবী-ঘটিত, শিক্ষা ও আচারঘটিত যে কৃত্রিম পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে এদেশের সমাজের স্বভাবগত সাম্য চিরকালের জন্য বিনাশ পাইতে বসিয়াছে। (২) এদেশের যে শান্তির ব্যাখ্যা এক্ষণে করা হইয়া থাকে, তাহা দণ্ডবিধির অনুযায়ী শান্তি। লোকের প্রকৃতিগত, সমাজগত ও পরিবারগত শান্তির সন্ধান ইহাতে নাই। যদি অনাহার ও দুর্ভিক্ষ, রোগ ও মৃত্যুর আধিক্য, অশিষ্টাচার বা ব্যভিচার, ঘৃণা, দ্বেষ ও কলহাদি লোকের অশান্তির কারণ হয়, তবে তাহা একালে কত বাড়িয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু যে অশান্তি বর্ত্তমান দণ্ডবিধির মাপকাঠিতে পরিমাপ করিতে হয়, তাহার সংখ্যাও এক্ষণে কম নয়। নতুবা আইন ও বিচারাদালত বৃদ্ধি পাইয়া চলিবে কেন? পুলিশ ও সৈনিক বৃদ্ধিরই বা এত আয়োজন কি জন্য? (৩) বর্ত্তমান সময়ে এদেশের যে অশান্তির—Indian unrest—কথা বলা হয় তাহার ভাবগত অর্থ এক নহে। এক ভাবে এই যুগে ভারতবর্ষের লোকদিগের মধ্যে যে রাজনীতিক জাগ্রতি দেখা দিয়াছে, তাহাতে বৈদেশিক রাজশক্তি ও বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিয়াছে, তাহাই বুঝা যায়। ইহাকে 'ভারতীয়' বা ভারত সম্বন্ধে অপরের অশান্তি বলা যাইতে পারে। অন্যভাবে হিন্দু-মুসলমানের, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের, ভূম্যাধিকারী ও কৃষাণ, বণিক ও শ্রমিক প্রভৃতির মনোমালিন্য ও বিরোধকে 'ভারতের' আপন অবস্থাগত অশান্তি বলা যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই কাল ধর্ম্মানুসারে জগতের সাধারণ অশান্তি। হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ কতকটা বিশেষ অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, সন্দেহ

নাই। এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বার বার বিভিন্ন স্থানে হঠাৎ দাঙ্গা, লুঠ, হত্যা প্রভৃতি দানবীয় কাণ্ড ঘটিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি ঢাকা প্রভৃতি স্থানের শোচনীয় ঘটনা তাহার দৃষ্টান্ত! হিন্দু মুসলমানের এই বিরোধের মূল স্থিতি কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন বিষয় নহে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সহিতই উহা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ব্যক্তি বা দলবিশেষের স্বার্থ ও প্রচেষ্টায়ই ইহা এখন বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মগত বিরোধ মুখ্য নহে। ধর্ম্মগত বিরোধ পূর্ব্বে প্রায় ঘটে নাই। একজন বিশিষ্ট ইংরেজ লেখকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আছে,—"Religious quarrels between the Hindus and Mahomedans are of rare occurence. These two classes live in perfect peace and concord, and a majority of the individuals belonging to them have overcome there prejudices, etc.…(Dr. Taylor: The Topography of Dacca). হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মে পরস্পরের বিরোধ অপেক্ষা ঐক্যের ভাগই অধিক ছিল: "Settled in India the Mahomedans were strongly influenced by the philosophic toleration of Hinduism which embraces all shades of religious thoughts from Pantheism to Fetishism. On the other hand, the uncompromising monotheism and brotherhood of the Mahomedans exerted a strong and wholesome influence on Hinduism. It was chiefly this influence that produced that galaxy of earnest reformers who shed such lustre on India for three centuries from the fourteenth to the seventeenth. "(P. N. Bose: Hindu Moslem Amity). কি হিন্দু কি মুসলমান ভারতে সকল রাজ্যেরই রাজশক্তি এই সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও মৈত্রীর লক্ষ্যে শাসননীতি পরিচালন করিতেন। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ও মহারাষ্ট্র সম্রাজ্যের নির্ম্মাতা শিবাজীর রাষ্ট্রনীতিতে ইহার লিখিত প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

হিন্দুমুসলমানের বিবাদ বাস্তবিক গুরুতর বিষয় নহে। উপস্থিত ইহার কুফল হইতেই তাহার চূড়ান্ত সমাধান হইবে। এ দেশের সাধারণ জনতা—কি হিন্দু কি মুসলমান—শান্তিপ্রিয়। যাহারা প্রথমতঃ এই গোলযোগের চালক ছিলেন, তাহারা অনেকেই এক্ষণে তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিতেছেন। সাধারণতঃ সহরবাসী দুষ্ট প্রকৃতি লোকেরাই এই সকল দাঙ্গা হাঙ্গামায় যোগ দেয়। ইহাদের উপযুক্ত রূপ শাসনের ব্যবস্থা থাকিলে, এরূপ গোলমাল হয়ই না। শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। ঢাকাতে যখন অতি সামান্য কারণে গণ্ডোগোল চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছে, কলিকাতাতে তখন আরও গুরুতর হেতুতে সহস্র চেষ্টা ও প্রয়োচনা সত্বেও, গত মহরম ও ঈদের সময় কোনও গোলযোগ হইতে পারে নাই, আর ইহাতে হিন্দুদিগের কোনও চেষ্টাই ছিল না—শিক্ষিত যুবক মুসলমান সম্প্রদায়ই ইহার সমাধান করিয়াছিলেন। শিক্ষার সমুচিত প্রচার সাধন হইলে, দেশ-প্রীতি ও জাতীয় স্বার্থ-দৃষ্টি আরও পরিস্ফুট হইলে, হিন্দু মুসলমানের এই বিরোধ অচিরে অতীত ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়া থাকিবে। রাজনীতিক্ষেত্রে যে অশান্তি এখন গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে, তাহাই রাজা-প্রজা শাসক শাসিত সকলের পক্ষে বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়াছে। ইংরেজ রাজনীতিতে পরিপক্ক, হয়ত ইহার সমাধান করিয়া তুলিতে পারিবেন। পরস্পরে বিশ্বাস ও সহানুভূতির অভাবই এই বিবাদের কারণ। তাহা প্রতিষ্ঠিত হইলেই, এ অশান্তি নিরাকরণ হইতে পারে—নতুবা নহে।

শিক্ষক ও সমাজ

শিক্ষকগণ সমাজের নিয়ন্তা—ভবিষ্যৎ মানবের সংগঠন কর্ত্তা। যে সমাজ শিক্ষকের নির্দ্দেশ বা নেতৃত্বে চলিতে সক্ষম,—শিক্ষক যেখানে সর্ব্বোচ্চ সম্মান পায়, সে সমাজকেই প্রকৃত সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন বলা যাইতে পারে। শিক্ষককে উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন, ত্যাগী ও পরহিতকামী হইতে হয়। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সমাজের শিক্ষক; গ্রীস দেশের দার্শনিকগণ শিক্ষকরূপে সমাজ পরিচালনা করিতেন; মধ্যযুগের ইউরোপীয় ধর্ম্ম গুরুগণ শিক্ষকের কার্য্য করিতেন, এবং তাহারাই ইউরোপের ভবিষ্যৎ—বর্ত্তমান এই অবস্থার সূচনা করিয়া গিয়াছেন। আজ সর্ব্বত্র শিক্ষক অনাদৃত।—কেবল ভারতে নহে, জগতের সর্ব্বত্রই ঐরূপ; অবশ্য ভারতের সকল অবস্থাই এখন অধিক শোচনীয়, ভারতীয় শিক্ষকদিগের অবস্থাও তদনুরূপ।

শিক্ষকের এই দুরবস্থা বর্ত্তমান জগতের দুরবস্থারই নিদর্শন—লোকের এই আর্থিক উন্নতিপ্রয়াস ও ভোগবিলাস-লালসার পরিণাম। উচ্চ চিন্তাধারা বা তথ্যানুসরণ সমাজ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। ফলে সমাজশিক্ষক, দার্শনিক ও ধর্ম্মগুরুগণ অবজ্ঞাত হইতেছেন। বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে বলিয়া যে কথা আছে, তাহাও অর্থ-মূলক শিল্পোন্নতি ও লোকের ভোগ বিলাসের নিয়োগেই ব্যস্ত।

বিদ্যালয় ও শিক্ষকের দুরবস্থা ও অনাদর সর্ব্বত্র দেখা গেলেও, কোনও গোলযোগ বা আপৎ পাতের সময় শিক্ষক সমাজপতিদিগের নজর এড়াইতে পারেন না। কথায় বলে, 'ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলা।' বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পর সকল জাতির মধ্যেই নূতন এক চেতনার উন্মেষ হইয়াছে। অবশ্য যে জাতির মধ্যে জীবনীশক্তি যত বেশী, তাহার মধ্যেই উহা অধিক হইয়াছে। এ বিষয়ে আমেরিকা সকলের অগ্রণী। তখন হইতেই নাকি আমেরিকার কাছে ইউরোপের সকল গুমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে (আজ আমেরিকা সমুদয় ইউরোপের মহাজন বা উত্তমর্ণ—অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য সকল বিষয়ের নেতা ও নির্দ্দেশকর্ত্তা।) ধনৈশ্বর্য্যের বিপুল অধিকারী হইলেও আমেরিকার রাজ সরকার সেই বিপদ্‌কালে শিক্ষককুলকে ভুলিতে পারেন নাই—বিগত ১৯১৭ সালের ২৩শে আগষ্ট তারিখে রাষ্ট্র-নায়ক উড্রু উইল্‌সন্ যুক্ত রাজ্যসমূহের সমুদয় স্কুল সমূহের শিক্ষকগণের নিকট একখানি বিজ্ঞাপন দেন। তাহাতে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহার মর্ম্মার্থ*

* 'The war is bringing to the minds of our people a new appreciation of the problem of national life and a deeper understanding of the meaning and aims of democracy. In these vital tasks of acquiring a broader view of human possibilities the common school must have a large part. I urge that teachers and other school officers increase materially the time and attention devoted to instruction bearing directly on the problems of community and national life......Such a plea is in no way foreign to the spirit of American public education or of existing practices. Nor is it a plea for a temporary enlargement of the school program appropriate merely to the period of the war. It is a plea for a realisation in public education of the new emphasis which the war has given to the ideals of democracy and to the broader conception of national life. (Letter to school officers: Duties of Teachers : War and Peace, Vol 1, P 90).

এই :—'উপস্থিত এই যুদ্ধের ন্যায় মহা ঘটনা জাতীয় জীবন সমস্যার নূতন দিগ্ দর্শাইতেছে, তাহাতে রাষ্ট্রের মর্ম্ম ও লক্ষ্য আরও গম্ভীরভাবে তলাইয়া দেখিতে হইবে। এজন্য সাধারণ বিদ্যালয় সমূহের কর্ত্তব্য অতি মহান্। শিক্ষকগণকে জাতীয় জীবন সমস্যার প্রত্যক্ষ লক্ষ্যে আরও অধিক কার্য্যতৎপর হইতে হইবে। এরূপ হওয়া সাধারণ শিক্ষানীতির প্রতিকূল নহে। যুদ্ধের দরুণ অস্থায়ীভাবে কাজ বাড়াইয়া লইবার জন্যও এই প্ররোচনা নয়—যুদ্ধের দ্বারা রাষ্ট্র-সংস্থা ও জাতীয় জীবনের আদর্শে যে নূতন ভাব জাগরিত হইয়াছে, তাহাকে শিক্ষা পদ্ধতিতে বদ্ধমূল করিয়া প্রকৃত ফললাভের জন্যই এই নিবেদন।'

বিগত মহাযুদ্ধের ধাক্কা অবশ্যই ভারতবর্ষের উপরেও কম লাগে নাই—নিঃস্বার্থ লোকক্ষয় ও অর্থ ব্যয় ভারত আরও অধিকই করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে জাতীয় জীবনের উন্মেষ কত খানি হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। অন্ততঃ তাহাতে শিক্ষকগণকে কেহ কখনও উদ্বুদ্ধ করিতে যান নাই। শিক্ষকগণও নিরপেক্ষ ও অলসভাবেই পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য চালাইতে ছিলেন। কদাচিৎ কেহ সংবাদপত্র পড়িয়া যুদ্ধের সংবাদ বন্ধুমহলে প্রচার করিবার কৃতিত্ব গ্রহণ করিতেন মাত্র; আর যাহারা পারিতেন ক্যাস্-সার্টিফিকেট বা ওয়ারবণ্ড কিনিয়া ভবিষ্যৎ লাভালাভের খতিয়ান করিতেন! লোকের আর্থিক ক্লেশ, দুর্ভিক্ষ ও ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারী তখন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেদিকেও কোনও চৈতন্য বা প্রতিকারের কথা তখন উঠে নাই। দেশীয় সৈনিকগন লইয়া একটা আন্দোলন তখন হইয়াছিল বটে; কিন্তু শিক্ষককুলের তাহাতে কোনও হাত ছিল না। বাহিরের লোকেই তাহার নেতৃত্ব করিতেন; পরে তাঁহারাই পদোন্নতিতে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন।

আজ আমেরিকার পার্শ্বে ভারতের কথা বলিতে যাওয়া বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা—ছোট মুখে বড় কথা—সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ কাল ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে অনেক কথাই শুনা যায়। এবং মহাযুদ্ধের ন্যায় এক মহাপরিবর্ত্তনের সূচনাও এদেশে দেখা যায়। রাষ্ট্র ও সমাজের কতকগুলি সমস্যা বা লক্ষণ সাধারণ। তাহাতে বড় ছোট প্রভেদ নাই। ভারতের জাতীয় জীবন সমস্যা কম নহে। এই মহা পরিবর্ত্তনের সময় তাহারও নূতন দিক দেখিয়া চলিবার অবসর আছে, এবং তাহারও মর্ম্ম এবং লক্ষ্য আরও গভীর ভাবে দেখা আবশ্যক। এবং সে জন্য এদেশের শিক্ষকগণের কর্ত্তব্যও মহান্। তাঁহারাও জাতীয় জীবন সমস্যার লক্ষ্যে অধিকতর কার্য্যতৎপর হইতে পারেন। আজ জগতের মহা পরিবর্ত্তনের অবস্থার মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনের আদর্শে যে নূতন ভাবের উদ্রেক হইয়াছে, তাহাকে জাতির শিক্ষা-পদ্ধতিতে বদ্ধমূল করিতে পারিলেই প্রকৃত ফল লাভ ও কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এজন্য শিক্ষকগণের আবাহন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

ভারত-প্রজ্ঞা

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

—০:*:০—

মহাভারত—ভারতবর্ষের মহাকাব্য। ভারতবর্ষ মহাভারতের কাব্যকাহিনীর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারতের যাহা লক্ষ্য, ভারতের যাহা সাধনা, ভারতের যাহা আদর্শ—মহাভারত তাহারই বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি। মহাভারতকে কাব্য না বলিয়া, মহাকাব্য না বলিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি, বিপুল সৌন্দর্য্য এবং জ্ঞানের আকর বলিয়া সমালোচনা না করিয়া ভারতের বাঙ্ময় বিগ্রহ বলিলেই যথার্থ আখ্যায় অভিহিত করা হয়। মহাভারতের অধ্যায়ে অধ্যায়ে—পর্ব্বে পর্ব্বে মহা ভারতই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

মহাভারতের বিচিত্র চিত্রগুলির মধ্য দিয়া মানব জীবনের—মানব জাতির যে বিচিত্র সংঘাত, যে বিচিত্র পতন উত্থান, যে পর্য্যবসান, যে আদর্শ পরিকল্পিত এবং পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে কবি কল্পনার কারুতা যত খানি, তাহা অপেক্ষা মহিম্ন ভাবের অভিভাবই চিত্তকে মহনীয় করিয়া তোলে। মহাভারতের মধ্য দিয়া যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা কোন বিশেষ ধর্ম্মমত নহে, কোন একটা দার্শনিক মতবাদ নহে, কোন একটা মাত্র আদর্শ নহে; মহাভারতে বিশ্বমানবতাই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মানুষের যাহা কিছু আছে, মানুষের যাহা কিছু হইতে পারে, মহাভারত সে সমস্তই লোকচক্ষুর কাছে তুলিয়া ধরিয়াছে। আবার এমন করিয়া ধরিয়াছে যাহাতে আকৃষ্ট করে, অভিভূত করে, উদ্বুদ্ধ করে, মৃত্তিকাতল হইতে স্বর্গের কাছে উন্নীত করিয়া দিয়া স্বর্গকে অতিক্রম করিয়া যাইবারও সামর্থ্য দান করে। মহাভারত নর-চিত্তকে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণাবর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া তাহাতে অনায়াসে অনুদ্বিগ্ন রহিবার অচ্যুত-শক্তি জাগরিত করিয়া দেয়।

অসীম আকাশ মণ্ডলে অনন্ত কোটী নক্ষত্র রহিয়াছে; মানুষের লক্ষ্যে পড়িতেছে কেবল তাহার সৌর মণ্ডলটী—কয়েকটী গ্রহ এবং উপগ্রহ মাত্র। মহাভারতেও অসংখ্য চরিত্র, অজস্র ভাব চিত্রিত রহিয়াছে; এক একটী করিয়া তাহার আলোচনা অসম্ভব প্রায়; তাহার আবশ্যকতাও নাই। কয়েকটী ঘটনার আলোচনা করিলেই বোঝা যাইবে—মানুষ কোথায় রহিয়াছে—মহাভারত তাহাকে কোথায় টানিয়া তুলিতে চাহে।

মহাভারত—ভারতবর্ষের একটা বিস্তৃত যুগের সম্পূর্ণ ইতিহাস। মহাভারতে সে দিনের ধর্ম্ম-নীতি, লোকাচার, দর্শন, অধ্যাত্মবিদ্যা, শৌর্য্য বীর্য্য, আশা আকাঙ্ক্ষা, বাস্তব মানবচরিত্র, আদর্শ মনুষ্য জীবন; তখনকার সুখ শান্তি, সেদিনের দুঃখ দুর্ভোগ, সে দিনে যা কিছু ছিল—যাহা কিছু হইতে পারে, সে সমস্তই বিস্তৃতভাবে বিবৃত রহিয়াছে। মহাভারতে তাহা ছাড়া আরও রহিয়াছে,—

তাহা কোন যুগের জন্ম নহে, কোন বিশেষ কালের জন্ম নহে—তাহা বিশ্ব-মানবের শাশ্বত কালের জন্ম অনন্ত জীবন যাত্রার অপরিমেয় পাথেয়।

মানুষ আজও যেমন আছে, কাল প্রায় তেমনি ছিল, পরশ্বও প্রায় তেমনই থাকিবে। সেই জন্ম মহাভারতের মহিম কাহিনী মানবের সহজ স্বভাব ধর্ম্মের উপর অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে সমুচ্চ সাধনার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। মানুষকে মহৎ করিতে গিয়া কোথাও অস্বাভাবিক করে নাই; আবার স্বভাবসংযত রাখিতে যাইয়া তাহার সমুন্নত সিদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নাই। মানুষকে অসঙ্গত রূপে ক্ষুদ্রও করে নাই, অস্বাভাবিক ভাবে নিষ্কলঙ্কও করে নাই। মানবকে সত্যকার মানুষ করিয়াই আঁকিয়াছে।

মানুষ ক্ষুধার্ত্ত হয়, ক্রুদ্ধ হয়, হিংসা ব্যভিচার করে, মানবের অপরিণতির দিকটা—ক্ষুদ্রতার দিকটাই সমধিক প্রকটিত; তথাপি সেই ছোট মানুষ যখন আত্ম পরিচয়ের জন্ম জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে, তখন সে এই প্রশ্নের উত্তর পায়—"তৎ ত্বমসি", তুমি সেই—তুমি ক্ষুদ্র তুচ্ছ খণ্ডীকৃত নহ, তুমি সেই "মহতো মহীয়ান্।"

মানব স্বরূপতঃ ঈশ্বর, অথবা অংশতঃ ঈশ্বর। ভারতের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ইহাই সিদ্ধান্ত, ভারতের সত্য দৃষ্টির ইহাই প্রত্যক্ষ অনুভূতি। মানুষের অন্তরে যত নিকৃষ্টতাই থাকুক, কেহই নিছক অধঃপতিত নহে; পতিতের মধ্যেও পবিত্রতা রহিয়াছে, ছোটর মধ্যেও বৃহত্তম ভাবের স্ফুলিঙ্গ রহিয়াছে। মহা-ভারতের পর্ব্বে পর্ব্বে এই সিদ্ধান্ত রূপ পাইয়াছে। এবং পরিশেষে ইহা তাহার চরম বিকাশে গিয়া উপনীত হইয়াছে! দেখিতে না জানিলে পাপের আধিক্য পুণ্যের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেখা যায়; তাহাতে মানববিদ্বেষ প্রজ্জলিত হয়, জগতের উপর ঘৃণা হয়, ঈশ্বরত্বে অবিশ্বাস আসে। সেই জন্ম পতিত মানবের মধ্যেও মহাভারত পুণ্যের দীপ্তি দেখাইয়াছে, ক্ষুদ্রতার মধ্যেও মহত্বের সম্ভাবনীয়তা প্রকটিত করিয়াছে। মহাভারতে শান্তনু মহারাজের ভোগলোলুপতা এবং মহারাজ পাণ্ডুর অসংযমের ঠিক পাশাপাশিই দেবব্রত ভীষ্মের বিস্ময়কর অতিলৌকিক সংযম শক্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। মোটের উপর মহাভারত যে ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা এপারে ওপারে সম্বন্ধ-যুক্ত, তাহা মানব ও ভগবানে ওতপ্রোত।

মহাভারতে কোন বিশিষ্ট সংস্কারের (Tradition) বন্ধন নাই; উহাতে যাহা একমাত্র ও চিরন্তন—যাহা সনাতন, তাহাই সুপ্রতিষ্ঠিত।

মহাভারতের প্রধান ঘটনা একটী বৃহৎ বংশের—কুরু ও পাণ্ডব দুই শাখার—বিভীষিকাময়ী বিরোধ। এ বিবাদ রাজ্য লইয়া সংঘাত; কিন্তু ইহা কেবল সিংহাসনের মধ্যেই নিবদ্ধ নহে। ইহা শুধু রাজ চরিত্র চিত্রণ নহে। নৃপতির মধ্যে যে চিরন্তন মানুষ আছে—যশোলিপ্সা, রাজ্য কামনা, প্রভুত্ব ব্যতীতও যে মানব বৃত্তিগুলি চিরন্তন মানব প্রকৃতি, রাজ-কাহিনী হইলেও মহাভারত তাহারই ইতিহাস। সেই জন্ম রাজার রাজকীয় গুণের পাশাপাশি নরপতির মানবতা, যোদ্ধার শৌর্য্য বীর্য্যের কাছাকাছি তাহার মানব চিত্ত; মহাভারতে বনে, সিংহাসনে, স্বর্গে, সমরক্ষেত্রে, ক্ষত্রিয়ে ব্রাহ্মণে, উল্লাসে অশ্রুতে, ত্যাগে ভোগে, মানবে ঈশ্বরে, একত্র সমাবেশ। মহাভারতে

মানবের সকল অবস্থার, সকল চরিত্রের সকল সম্ভাবনীয়তার বিমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। এবং তাহা কুরু পাণ্ডবের বিরোধকেই কেন্দ্র করিয়া অপর সমস্ত কিছুকে পারিপার্শ্বিকতার অন্তর্গত করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

মহাভারতের আরম্ভ কয়েকটী স্খলিত মানবের চরিত্র লইয়া। প্রথম ঋষি পরাশরের ব্যভিচার, তাহার পর মহারাজ শান্তনুর কামতৃষ্ণা, তৃতীয়তঃ পাণ্ডুর মৃত্যুকে অবধারিত জানিয়াও প্রাণান্তকর অসংযম। এখানে পাত্র ও পাত্রীর কিছু বিশেষত্ব আছে; এখানে পরাশর ঋষি, শান্তনু ও পাণ্ডু নর-শ্রেষ্ঠ নরপতি, পরাশরের উপভোগ্যা—ধীবর কন্যা, শান্তনুরও তাহাই; পাণ্ডুর ধর্ম্মপত্নী সাধ্বী মদ্রদুহিতা মাদ্রী।

এই পতনের কথা লইয়া মহাভারতের সূচনায় একটা বিশেষ ইঙ্গিত আছে; সে ইঙ্গিতের অর্থ— মানুষ সর্ব্বাবস্থায়ই মানুষ। মানুষের মধ্যে যে দুর্ব্বলতা আছে, তাহা সর্ব্বাবস্থাতেই আছে; তাহা ঋষিদেরও আছে, নরপতির অন্তরেও আছে; তাই সত্যদ্রষ্টা ঋষি এবং অনূঢ়া ধীবর কন্যার অবৈধ মিলন, তাই ধর্ষিতা ধীবর দুহিতা রাজেশ্বরের ধর্ম্মপত্নী। এই কারণে সতী মাদ্রীর সহবাসে পাণ্ডুর অকাল মৃত্যু!

এই পতন ও মোহ সারা মানবের উপর বজ্রভৈরব সাবধান বাণী। ইহা নির্দ্দেশ করিতেছে— ঋষি হইলেও মানুষ এই! সম্রাট হইলেও মানুষ এই! ক্ষণিকের তাড়নায় স্খলিত হইয়া পড়ে। সাবধান! সাবধান! ঋষি হইলেও সাবধান! ভূপতি হইলেও সাবধান! পতিব্রতা হইলেও সাবধান! সর্ব্বাবস্থায় সজাগ্রত রহিতে হয়, নহিলে পতন অনিবার্য্য।

এই পতন কুহেলিকার অব্যবহিত ঘটনা—দেবব্রতের অমানুষিক আত্ম-উৎসর্গ!—বিশ্বজগতে যাহা অভূতপূর্ব্ব,—মানুষের পক্ষে তাহা কল্পনারও অতীত। ভীষ্মের চিরকৌমার্য্য, একটা অব্যর্থ আশ্বাসের মত, বিপুল শক্তিসঞ্চারের মত। পূর্ব্বোক্ত পতন এবং ভীষ্মের কৌমার্য্য ব্রত, দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনার সমাবেশে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, দুর্ব্বলতাই মানব জীবনের চরম নহে; মানুষ স্খলিত হয় বটে, কিন্তু এমন অটল প্রতিজ্ঞায় দণ্ডায়মান হইতে পারে যে, সে দার্ঢ্য পর্ব্বতের অপেক্ষাও অটল, আকাশের অপেক্ষাও অক্ষুব্ধ। মানুষ ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু সে ঈশ্বরের মতই মহিম হইতে পারে; দুর্ব্বলতা তাহার আদি হইলেও ঈশ্বরত্বই তাহার পূর্ণতা। ঋষি চিত্তকে ব্যভিচারের পঙ্কে নিক্ষেপ করিয়া, নরশ্রেষ্ঠকে অসংযত উচ্ছৃঙ্খল কামুকতার ক্রীতদাস করিয়া এবং তাহার নিকটে ভীষ্মের সংযম শক্তির দীপ্তি প্রজ্জ্বলিত করিয়া মানব জীবনের সমুচ্চ সম্ভাবনীয়তার অভয় মন্ত্র উদ্‌ঘোষিত করা হইয়াছে। ইহার পর মানুষ কি পারে না, কি পারে, কি পারিতে হইবে, তাহাই বিবিধ আখ্যানের মধ্য দিয়া পরিব্যক্ত হইয়াছে।

মানবের যত প্রকারের চিত্তবৃত্তি হইতে পারে—স্নেহ বাৎসল্য, মৈত্রী, মমতা, ক্ষমা ঔদার্য্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা—আবার হেয়তম হিংসা বিদ্বেষ, লোভ মোহ—মহাভারতে সে সমস্তই একসঙ্গে স্থান পাইয়া পরিণতির অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। মহাভারতে বাৎসল্য বিগলিত মাতৃবক্ষে সুমহান ধর্ম্মবুদ্ধির অভিব্যক্তিও দেখা যায়, আবার ক্রূর প্রতিহিংসা পরায়ণ চরিত্রেও উদার বীর্য্যবত্তার বিকাশ রহিয়াছে।

এ সব কি নিরর্থক? কবিকল্পনার নিরর্থক বিলাস? বুদ্ধির চাতুর্য্য? প্রতিভার শিল্প-সমারোহ?

অনর্থক নহে। মহাভারত জীবনকাব্য, জীবন সঞ্জীবন, জীবন যাত্রার আলোক-বর্ত্তিকা।

মহাভারতে আলোকের মাঝে যেমন ছায়ার আভাস আছে, তেমনি গাঢ় অন্ধকার চিরিয়া চিরিয়া এক একটা দীপ্তিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। এর একটা নিগূঢ় কারণ রহিয়াছে। মহাভারতে ধীবর বালা রাজবধূ রাজমাতা রাজলক্ষ্মী। যেখানে ব্যাস ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণ, তাহার মাঝেই দীন দুঃখী একান্ত রিক্ত বিদুর। পার্থ দ্রোণ প্রভৃতির মাঝখানে কিরাত একলব্য। এই যে মিশ্রণ,—এই যে অভিজাতে অখ্যাতে, মহামানবে সাধারণ মানুষে—এক ক্ষেত্রে সম্মিলন, ইহা কেবল কাব্যের আদর্শ চরিত্রগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার পরিপ্রেক্ষা (back ground) নহে। ইহা নিন্দনীয়কে পশ্চাতে রাখিয়া অনিন্দনীয়কে অধিকতর উদ্ভাসিত করিবার জন্য কবির কলাকৌশল নহে। মহাভারতে ব্রাহ্মণ গুরু দ্রোণাচার্য্য উন্মার্গগামী সম্রাটের পক্ষে; দীনদাসীপুত্র বিদুর মহাজ্ঞানী; বিদ্বেষ কলুষিত কর্ণ মহাত্যাগশীল; আবার ভগবানের প্রিয় সখা পার্থ ব্যর্থ দাম্ভিক বলিয়া স্বর্গ গমনে অসমর্থ। এমনই আলোক আঁধারের নিরবচ্ছিন্ন সম্মিলন।

কুরুক্ষেত্রের ভৈরব সমর কোলাহলের মাঝেই গীতার শান্তি-গীতি উদ্গীত হইয়াছিল; সে মহা সঙ্গীত "সমত্বং যোগ উচ্যতে"। এবং তাহার অমোঘ অনুশাসন—"তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন"। গীতার বিজ্ঞান মহাভারতের কেন্দ্র; "সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি" এবং "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এই ভগবদ্বাক্যর অনুসরণেই মহাভারতের পাপে পুণ্যে সংমিশ্রণ এবং ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পর নিরুদ্বিগ্নে ভোগ করিবার সময়ে মহাপ্রস্থান!

মহাপ্রস্থান একটা খেয়াল নহে—বিয়োগান্তক কাব্যের লক্ষণ নহে; কর্ম্ম ফলে যে মানুষের অধিকার নাই, মহাপ্রস্থানে সেই তত্ত্বই সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এবং পাপে ও পুণ্যের মিশ্রণেও তাহাই—

"বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনী"
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শিনঃ॥" গীতা

সর্ব্বত্র সমদৃষ্টির প্রচেষ্টা! সেই জন্য হিংস্র কর্ণ মহাদানবীর। দাসীপুত্র বিদুর মহাধর্ম্মনিষ্ঠ। চতুর্ব্বর্ণের অবজ্ঞাত নিষাদ একলব্য অদ্ভূত সমরবিজ্ঞানসিদ্ধ। আর নীচকুলোদ্ভবা মৎস্যগন্ধা—পদ্মগন্ধা হইয়া রাজলক্ষ্মীর বরণীয় পদে অভিসিক্ত। ইহা সমস্তই ঐ সমত্ব বুদ্ধির উদ্বোধক—ঐ "সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি"র পরিপূর্ণ অনুসরণ।

মহাভারতের পূর্ব্বে বা পরে ঠিক এমনি ভাবে, উচ্চে নীচে, ভগবানে ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয়ে শূদ্রে এমন করিয়া একাকার হয় নাই। ভারতবর্ষে পূর্ব্বেও ও পরে তপোবনের শান্ত সমাহিত ধ্যান-প্রবুদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যেই অধ্যাত্মক বিদ্যার অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা হইয়াছে, হিংসা-সংক্ষুব্ধ রণপ্রাঙ্গণে কখনও হয় নাই। ভারতের চিরাচরিত রীতি—ব্রাহ্মণই ধর্ম্ম প্রবক্তা। মহাভারতে ক্ষত্রিয় কুরুবীর ভীষ্ম; মহাভারতে ব্যভিচারী পতিত ঋষির কামজ সন্তান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি ব্যাস। পঞ্চস্বামী-

সেবিতা পাঞ্চালী পরম পতিব্রতা। মহাভারত যেন ভারতের চিরন্তন সংস্কার ও সভ্যতার উৎকট উদ্ভট প্রতিবাদ। সামান্য দৃষ্টিতে ইহাই অনুমান হয়; অন্ততঃ এই সব দেখিয়া সংশয় উপস্থিত হয়।

ইহাতে সন্দেহের কিছুই নাই, ইহাতে ভারতের সাধনা বিকৃত হয় নাই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

"ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্ব, যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"।

ইহার বিবৃতি গীতোক্ত

"সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

এবং তাহারই সাকার প্রতিষ্ঠা মহাভারতে পরিস্ফুট—

"সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম"। সেই কারণে

উপনীত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ছাত্রকে উপদেশ

"তৎ ত্বমসি"।

এবং সেই একই কারণে মহাভারতে কল্যাণ অকল্যাণে, পাপে পুণ্যে, পবিত্রাত্মা ও পতিতে একত্রীভুত।

সমজ্ঞান, সমবুদ্ধি একটা কথা নহে, একটা দার্শনিক মতবাদ নহে, বুদ্ধিজগতের উপভোগ্য একটা সুগভীর চিন্তাচাতুর্য্য নহে—সমত্ব মহা সত্য। উহাকে প্রাণের অন্তরঙ্গ অনুভূতির সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। প্রত্যেক দিনকার জীবন যাপনায়, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের আচারে অনুষ্ঠানে, প্রত্যেক নিমেষের অনুভূতি ভাবনায় উহাকে প্রত্যক্ষ স্পষ্ট, সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। সমজ্ঞান বুদ্ধির লীলা বিলসন নহে, উহা জীবনের চরম সাধ্য। ইহাতে একটু ফাঁক থাকিলে জীবন অসম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। সেইজন্য সমজ্ঞানকে বুদ্ধির ক্ষেত্র হইতে উন্নীত করিয়া প্রাণের স্পর্শে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হয়। আর তাহার জন্য চিরাচরিত সংস্কার সামাজিকতা, লৌকিকতা, ধর্ম্ম বুদ্ধি সমস্তকেই সমর্পণ করিয়া সমস্ত সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হয়। মহাভারত তাহাই করিয়াছে।

মানবের সহজ দৃষ্টির উপরে একটা আবরণ পড়িয়া আছে; সেই হেতু সে সুন্দর দেখিতে পায় না, ভাল বাসিতে পারে না, বিয়োগ দৃষ্টির কুয়াসা কালিমায় আবৃত করিয়া বিশ্বনিখিলকে অসুন্দরই দেখে, অবজ্ঞা করে, ঘৃণা করে, স্নেহ না করিয়া শত্রুতা করে; অন্যকে ব্যতিব্যস্ত করে, আপনি দগ্ধ হয়। আর এ সমস্তই বৈষম্যের ফল এবং দৃষ্টিহীনতার মূঢ়তম পরিণাম।

মহাভারতে সেই বৈষম্যের নিরসন এবং দৃষ্টি উন্মেষের চেষ্টায় বিদুর মহাপ্রাজ্ঞ, দ্রৌপদী কুন্তী প্রাতঃস্মরণীয়া সাধ্বী, দুষ্কৃত দুর্য্যোধন স্বর্গ ভোগী। ইহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য সমত্ববুদ্ধি জাগরণের চেষ্টা। ভগবান সর্ব্বের মধ্যে রহিয়াছেন; অতএব মন্দ কিছুই নাই, ঘৃণার কেহ নাই। খণ্ড দৃষ্টিতে পাপী এবং সাধুতে প্রভেদ। সকলের মধ্যেই ভাগবত প্রকাশ অভিব্যক্ত হইতেছে। যোগদৃষ্টিতে দেখিলে তাহা দেখা যায়, এবং প্রত্যেকের মধ্যে ভাগবত সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে করিতে "সর্ব্বংখলু ইদং ব্রহ্ম"—ইহা সিদ্ধ সত্যরূপে জীবনের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

মানুষকে ভগবানকে সত্য করিয়া পাইতে হইবে। সে পাওয়ার একটী সাধনা আছে এবং সেই সাধনার ক্রমও আছে। সেই সাধনার রূপ এবং ক্রম সম-দর্শন, প্রত্যেক সত্ত্বার মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধির অভ্যাস। ভগবান আছেন বলিলেই হয় না; তিনি যদি সর্ব্বময় হইয়া আছেন, তবে

সর্ব্বের মধ্যেই তাঁহাকে পূজা ও ভক্তি করিতে হইবে। মহাভারত সেই নর-নারায়ণ পূজার নির্দ্দেশ করিয়া পতিতে মহতে একত্র গ্রথিত করিয়া দিয়াছে। ইহাই গীতার :—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি"।

সর্ব্বভূতের অন্তরে নারায়ণ এবং নারায়ণই সর্ব্বভূত। মহাভারতের বৈচিত্র্যের সার্থকতা এইখানে!

গীতা কথা।

("ও পারের কথা"র লেখক)

আমরা এসেছি এ রাজ্যে মানুষ সেজে। এই সাজ-সজ্জা কিন্তু খুঁজে বার করবার জন্যে আমাদের **হারাণো-ধন**। হারাণো-ধন খুঁজতে এসে, আমরা সাধারণতঃ কে-নেয়-কার-মাল (unclaimed property) ভাবে বিক্রিত হ'তে বসেছি। বিক্রি-ব'লে-বিক্রি, মাটির দরে বিক্রিত হয়েছি বা হ'তে বসেছি! ধারণা কিন্তু টন টনে কত না সংস্থান করেছি ও কচ্ছি! এই আত্মপ্রসাদটা কিন্তু দোবরা চিনির রসের মত—কিস্-কিচ্ শূন্য! যে কাজই সাধি না কেন, আমাদের সম্বল **দেহ, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি** (বোধশক্তি)। বুদ্ধি মোড়লনী হয়ে আছে প্রাণ ও মনকে সঙ্গিনী ক'রে। এই হাড়ের-খাঁচায় ঢুকে ও চামড়ার ঘেরাটোপ প'রে, বুদ্ধি কিন্তু খাপ-ছাড়া অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। যেই মোড়লনী হওয়া, অমনি নাম হ'ল—**অহংবুদ্ধি**। আবার নিজেকে দেহ ব'লে ঠাউরাণোর জন্যে নাম হ'ল **দেহবুদ্ধি**। **প্রাণ** হয়েছে রসদ-যোগাণী ও **মন** সেজে আছে ভাঁড়ার-গিন্নী! এই সঙ্গে আছে—**নিবৃত্তি**—ধামা ধরাণী, আর **প্রবৃত্তি**—পাকা ওস্তাদনী। নিবৃত্তির এ ক্ষেত্রে কাজ 'হাঁ-না' ক'রে ঢেকুর তুলা, কারণ প্রবৃত্তিরই দাপট বেজায় রকমের। বিরাট কবিরাজ —আমাদের কবিরাজ মহাশয়দের মত—অরিষ্ট তৈরি করাতে ব্যস্ত। তা কিন্তু মানুষ-মসলা নিয়ে, সংসার-চুলায়, প্রবৃত্তি—অনলে, সত্ত্বগুণ-ঢাকনায় ঢাকা দেহ-হাঁড়িতে ও নিবৃত্তি-জলে। স্থূল দেহবুদ্ধি ও স্থূল অহংবুদ্ধিযুক্ত মন-প্রাণকে উৎকৃষ্ট অরিষ্টে পরিণত করাণই ব্যবস্থা। 'চড়িয়ে দিলুম, আর নাবিয়ে নিলুম'—এ ব্যবস্থা মোটেই নেই। বরং 'রাবণের চুলি, নিব্বার নয়' এই হ'চ্চে মার্কা মারা বিধান। বুদ্ধির এই অবস্থার দরুণ ইচ্ছাশক্তি থেকেও নেই এই হালে দাঁড়িয়েছে। তাই—চাই যা, পাই-না তা, আর চাইনা-যা, পাই তা—এই ধরণের গোঁজামিলন ভাবেই এই জন্মটাকে কাটাতে হ'চ্চে। তাই মানব জীবন হৈজবৎপূর্ণ সৃষ্টিছাড়া কারবার হ'য়ে প'ড়েছে। তাই ঘটনাচক্রের অ[illegible]চিত দান রং-বেরঙের হৈজবৎ আকারে ধ'রে দেহবুদ্ধি ও অহংবুদ্ধিকে পালাই পালাই ডাক ছাড়াচ্ছে

তাই শোক, তাপ প্রভৃতির চাপে প'ড়ে এই দুই বুদ্ধির খানিকটা বাষ্পীয় আকারে মিশে যাচ্ছে সূক্ষ্ম দেহ ও সূক্ষ্ম অহংবুদ্ধিদের সঙ্গে যা সকল জীবেই কম বেশী মাত্রায় মজুদ।

তা হ'লে বুঝা গেল যে বোধ শক্তি প্রত্যেক মানুষে চারটা নিম্নগামী ধাপযুক্ত হ'য়ে আছে। যথা, (১) সূক্ষ্ম অহংবুদ্ধি, (২) সূক্ষ্ম দেহবুদ্ধি (৩) স্থূল অহংবুদ্ধি, ও (৪) স্থূল দেহবুদ্ধি। প্রাণ ও মন সর্ব্ব ঘটেই থাকে, কিন্তু হাল ফিলের অবস্থায় তাদের ঝোঁকটা বেশী স্থূল দুই বুদ্ধিদের সঙ্গে প্রবৃত্তির দিকে। **স্থূল দেহবুদ্ধির** ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিজের ও আত্মীয়-আত্মীয়াদের দেহের জন্যে ব্যতিব্যস্ত থাকা ও শোক তাপাদিতে মুশড়ে পড়া। এই বুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণা **দেহটাই আমি**। **স্থূল অহংবুদ্ধির** প্রধান লক্ষ্য 'আমি-আমার' লয়ে হরদম ব্যতিব্যস্ত থাকা ও স্থূল যা—কিছু কসে অর্জ্জন করে সাধ মিটায়ে উপভোগ করা। এই বুদ্ধিরও ভ্রান্ত ধারণা যা যা আমি নিয়ে আছি সবই **আমার**। **সূক্ষ্ম দেহবুদ্ধির** সাধনা স্থূল দেহকে টন টনে ভাবে জানা যে এটা **বিহার ভবন** বা **সচল রথ** আত্মারূপী আমার বাবার বা আমার মায়ের বা আমার সখার। সেই সঙ্গে যার-যা করণীয় জাগতিক ও পারলৌকিক কর্ম্ম **তাঁরই** কর্ম্ম এই সিদ্ধান্ত ক'রে মন-প্রাণ ঢেলে ও দেনা চুক্তি হিসাবে সাধন করা। **সূক্ষ্ম অহংবুদ্ধির** কর্ম্ম স্থূল দুই বুদ্ধির সঙ্গে সূক্ষ্ম দেহবুদ্ধিকে সহায়তা ক'রে আত্মার দিকে সকলের মুখ ফেরাবার ব্যবস্থা করা। তা হ'লে মানব জীবন-কারবারের লক্ষ্য হ'চ্চে (১) স্থূল বুদ্ধিদেরকে সূক্ষ্মত্বে পরিণত করা ; (২) যথাসম্ভব সূক্ষ্ম উপাদান সম্বল ক'রে আত্মারূপী চূড়ান্ত বিকাশের চূড়ান্ত সংক্ষিপ্তকে (Perfection in perfect conciseness) খুঁজে বাহির করা ; ও (৩) পরিশেষে, 'আমি-আমার'গুলাকে আত্মাতে হারিয়ে ফেলে, আমার অর্থাৎ প্রাণ-মনযুক্ত বোধ শক্তির সহিত দেহস্থিত আত্মারও খেলা 'ইতি' করা—পরমাত্মার এক হয়ে। এই কর্ম্মের লাভ—অনন্ত জীবন, অটুট আনন্দ, অব্যক্ত জ্ঞান, অফুরন্ত প্রেম ও অতুলনীয় শক্তি। সুতরাং এই কারবারে আছে—নিঃসন্দেহ আছে—হরদম তাজা থাকবার ব্যবস্থা।

এই স্থূল রাজ্যের একজন সেজে থেকে, এই স্থূল দেহের মারফৎ হরদম স্থূল সঙ্গ ক'রে, স্থূল যাহা কিছু কর্ম্ম সেধে ও স্থূল যাহা কিছু উপভোগ ক'রে উপরোক্ত অবস্থা পাবার প্রধানা সহায়তা-কারিণী **বোধ ও ধারণা** শক্তিদ্বয়। যা করবার-নয় ক'রে, যা ভাববার-নয় ভেবে, যা বলবার-নয় ব'লে, যা দেখবার-নয় দেখে ও যা শুনবার-নয় শুনে, মানুষ যা ভাংড়াবার-নয় তাঁংড়ায়েছে ও তাঁংড়াচ্ছে। ফলে, হীরা মাণিক তাংড়াতে এসে, জীব ধূলা-বালি বা নোড়া-নুড়ি-গুলাই হরদম তাংড়ায়েছে বা তাংড়াচ্ছে। সুতরাং ও-পারের ত দূরের কথা, এ-পারের কার্য্য-কারিণী শক্তি ও সম্বল দুইই হারায়ে অন্তরে বাহিরে হায় হাএর বোঝাগুলাই সার করেছে। বিশ্বের যাবতীয় কার্য্যকারিণী-শক্তি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম উপাদান হ'তে উদ্ভূত। স্থূল হ'লে নিম্নগামী ও সূক্ষ্ম হ'লেই ঊর্দ্ধগামী হওয়া বিরাটের বিধান। সুতরাং স্ব স্ব কার্য্যকারিণী শক্তি—জাগতিক ও পারলৌকিক—বৃদ্ধি করবার প্রয়াসী হ'লে নিতান্ত আবশ্যক বোধ ও ধারণা শক্তি-দ্বয়ের অপচয় বন্ধ করা ও যাতে উহারা সূক্ষ্মত্বের দিকে ধাবিতা হয় সেই ব্যবস্থা করা। ইহাই প্রকৃত বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতীদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। ইহাই তাঁদের শিক্ষার, সভ্যতার ও উন্নতাবস্থার

পরিণাম। ইহাই আপনার সহিত দশজনকে ও দেশকে প্রকৃত ভালবাসার ব্যবস্থা। নকল রাজ্য হ'তে নকল মানুষের দ্বারা আমদানি করা নকল হীরা, নকল মুক্তা ও নকল সোণার মত থিয়েটারী ভালবাসা, সাহেবী সহৃদয়তা ও নবাবী হাব্ভাব্ সোণার ভারতে বিছিয়ে পড়েছে ও প'ড়ছে। ফলে, ভারতকে ঠেলে ঠুলে দাঁড় করায়েছে ও করাচ্চে অসত্যের আঁস্তাকুঁড়ে। এই আঁস্তাকুঁড় আয়তনে বৃদ্ধি হচ্চে সূক্ষ্ম ভোজ্য সেব্যের অনাদরে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম—সাধন—নামে বিশেষ বিকৃত কর্ম্ম সাধনে ও স্থূল যা-কিছুর বিশেষ আদরে।

মানুষ ও মানুষের রোগ সবই ভিন্নতর। তাই এমন ব্যবস্থা থাকা চাই, যা সকলেরই উপযোগী। এই ব্যবস্থা পত্র (prescription) গুচ্ছের নাম **গীতা**। সুতরাং **গীতা** মানে **মানুষ-গড়া বিজ্ঞান**। এই বিজ্ঞানের বিশেষত্ব কোনও করণীয় কর্ম্ম তুচ্ছ নয়। কিন্তু প্রত্যেক কর্ম্মের আদর্শ স্ব স্ব কার্য্যকারিণী শক্তি বাড়ায়ে হৃদয় বিস্তার ও মস্তিষ্ক বিকাশ করা। অর্থাৎ স্থূল যা-কিছুকে সূক্ষ্মত্বে দাঁড় করায়ে আপনাকে দশের, দেশের ও জগতের কাছে বিলায়ে দেওয়া। মানুষ এর-তার গোয়েন্দাগিরি কাজ সেধে মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বৎসর ও এমন কি সারা জীবনটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিচ্ছে। চাই—স্ব স্ব গলদ কি কি ও কোন উপায়ে আপনাকে গড়ে তুলা সহজ সাধ্য, অবকাশ পেলেই সেই চিন্তা গোপনে পোষণ করা। চাই—প্রতি হাতে নিজেকে যাচাই করা কি প'ড়লুম বা কি শুনলুম, কি বুঝলুম ও কি তাংড়ালুম। যাঁর অভ্যাস-চৌকিদার এই কাজ সাধতে সদাই সজাগ, তাঁর কাছে বিদ্যাভিমানীদের টীকা-টিপ্পনি 'গোলে হরিবোল' দেবার সুযোগ পায় না। কিন্তু জীব সাধারণ গোঁজামিলনের ষাঁড়া ষাঁড়ি বন্যায় প'ড়ে স্থূল বুদ্ধির আবর্ত্তে তলিয়ে যাচ্ছে। উপরোক্ত বিধানে চ'লতে সচেষ্ট হ'লে, **চিন্তাকুলতা** অলক্ষ্মী পিট্টান দেয় ও তার বদলে **চিন্তাশীলতা** লক্ষ্মীশ্রী সাধক-সাধিকার পেট, বুক ও মাথা জুড়ে বসে। তবে গীতা পাঠ সার্থক হয়। পাখী কপ্চানো অভ্যাসকে ঘৃণ্য ব'লে বর্জ্জন করা ও প্রত্যেক ভাবকে মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা জীবের স্থূলত্ব রোধের প্রকৃষ্ট বিধান। সেই ধরণের শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকের প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের মত উচ্চতম উপদেষ্টার অর্জ্জুনের মত উচ্চাধার বিশিষ্ট শিষ্যকে ও-পার সম্বন্ধে যাবতীয় শিক্ষা প্রদান করাই নিতান্ত সঙ্গত। ও-কুলের যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন ক'রতে ক'রতে বিকাশ-তীর্থের প্রকৃত যাত্রী হওয়া যে কতটা আয়াসসাধ্য কর্ম্ম, যাঁকে আত্মা-রূপী শ্রীকৃষ্ণ এই কর্ম্ম সাধান তিনি সেই কর্ম্মকে কুরুক্ষেত্র সমর বাচ্য করবেন তাতে আর বিচিত্রতা কি!

অহংবুদ্ধি যুক্ত-মন-প্রাণের স্থূল ভাবই উহার **হতশ্রী** অবস্থা। কিন্তু উহাদের উর্দ্ধতন গতি **লক্ষ্মী-শ্রী** অবস্থা। প্রকৃত গুরুর করণীয় কর্ম্ম শিষ্যের বোধ ও ইচ্ছা-শক্তি দ্বয়কে স্থূল না হ'তে দিয়ে যা'তে সূক্ষ্মাবস্থায় স্থিতি হয় সেই ভাবের শিক্ষা প্রদান করা। তাই শ্রীকৃষ্ণের কথায় আহা- উহুর এক ছিটে ফোঁটাও ছিল না। বরং তিনি সুদৃঢ় ভাবে বল্লেন "তুমি ক্ষত্রীয় হ'য়ে কোন্ মুখে লড়াই ক'রতে গররাজি! তুমি স্বধর্ম্ম ছেড়ে ক্লীবত্ব পেতে চাও"! বোধ-শক্তিতে ক'সে ঘা দিতে সক্ষম হ'লে ধারণা শক্তিতে দাগ পড়ে ও সেই সঙ্গে আত্মমর্য্যাদা বোধটা গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে। এটা কিন্তু হয় সত্ত্ব মিশ্রিত রজো গুণের প্রভাবটা যাদের

লোক দেখানো ভাবগুলো যে বেজায় মিথ্যাচার এ ধারণা যাঁদের অভাব, তাঁদের গীতা, চণ্ডী বা কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করা অনেকটা ভস্মে ঘি ঢালার সামিল। মিথ্যাচার ক্লীবত্বকে অর্থাৎ মানসিক শূদ্রত্বকে ক্রমশঃ বিদায় না দিতে পারলে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া নিতান্ত অলীক আশা।

শ্রীকৃষ্ণের সারথ্যে অর্জ্জুন যুদ্ধের আসরে নেমে দেখলেন যাবতীয় আয়োজন। যুদ্ধে জয় লাভ ক'রবেন এ ধারণা পাকা থাকলেও তিনি বিষম ফাঁপরে প'ড়লেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ভেবে ফেললেন যে রাজ্য লোভে (১) তাঁকে নিধন ক'রতে হবে গুরুজন ও আত্মীয় স্বজনদেরকে। (২) আত্মীয় স্বজনশূন্যা কুলকামিনীগণকে ভ্রষ্টাচারিণী করবার কারণ হ'তে হবে ও (৩) বর্ণ সঙ্করের উৎপত্তির হেতু হ'য়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপেরও কারণ হ'তে হবে। **স্থূল দেহ-বুদ্ধির** সহিত **স্থূল অহং বুদ্ধি** একজুটী হওয়াতে দুর্য্যোধন কদাচারী, অত্যাচারী ও বেজায় লোভী হ'য়ে পাণ্ডবদের অশেষ জ্বালার ও ব্যথার কারণ হয়েছিল। অর্জ্জুনের **সূক্ষ্ম অহং বুদ্ধি** প্রবল হওয়াতে তিনি মুছে ফেল্লেন আপনাদের সব জ্বালার ও ব্যথার কথা। তাই তাঁর মনে-প্রাণে লোভ ও প্রতিহিংসা স্থান পেল না। স্থূল দেহ ও অহংবুদ্ধির প্রধান কর্ম্ম একজুটী হ'য়ে এই স্থূল দেহকে রক্ষা করা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অর্জ্জুনের দেহ-বুদ্ধিকে একক এ কাজ সাধতে হয়েছিল—কারণ তাঁর স্থূল ও সূক্ষ্ম অহংবুদ্ধি একজুটী হ'য়ে সর্ব্বত্যাগী হবার সাধ পুষেছিল। অহংবুদ্ধিমুক্ত মন-প্রাণ হাল্ ফিলের অবস্থায় বিশেষ বিক্লিষ্ট হ'য়ে যখন একতানে কেঁদে কেঁদে উঠে উহাই **বিষাদ** বা **বৈরাগ্য**। এই প্রকার বৈরাগ্য যাঁদের সম্বল, তাঁরাই প্রকৃত উন্নত বা বৈরাগী বাচ্য। ফলে অর্জ্জুনের শরীর অবসন্ন হ'য়ে কাঁপতে লাগলো, দেহে জ্বালা দেখা দিল, জিহ্বা ও মুখ শুকিয়ে এলো, মন বেজায় অস্থির হ'ল, ও এমন কি গাণ্ডীব ধনুক তাঁর হাত থেকে খসে প'ড়লো। তখন তিনি যা যা ভেবেছিলেন সব কথা শ্রীকৃষ্ণকে জানায়ে বল্লেন "আমি যুদ্ধ ক'রব না ও এ অবস্থায় আমার ভিক্ষাজীবী হওয়াই শ্রেয়ঃ।" লৌকিক বা ব্যবহারিক বিচারে অর্জ্জুন অসঙ্গত কথা বলেন নাই। তাঁর বিষাদও কথার কথা নয়! সে জ্বালায় এমন ঐকান্তিকতা ছিল যে তিনি স্থূল দেহ ও অহংবুদ্ধিদ্বয়কে সম্বল ক'রে রাজ্য লাভ ক'রতে ইচ্ছুক হন নাই। সে জ্বালায় এমন ত্যাগশীলতা ছিল যে তিনি আপন পক্ষের সব আশা জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সে জ্বালায় এমন ব্যাকুলতা ছিল যে তিনি আপনাকেও উৎসর্গ দিতে প্রয়াসী ছিলেন। সে জ্বালায় এত তীব্রতা ছিল যে সেই জ্বালার প্রভাবে তাঁর দৈহিক ও মানসিক বল নগণ্য হয়েছিল। সেই জ্বালায় বিশেষত্ব জীবের কল্যাণ সাধন ও ধর্ম্ম রক্ষা। শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের জ্বালার ফলে যোগবাশিষ্ট রামায়নের উৎপত্তি। শ্রীমতীর জ্বালার ফলে তাঁর সামাজিক বন্ধনের উচ্ছেদ। শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের জ্বালার ফলে তাঁর সর্ব্বত্যাগ ও উৎকট সাধনা। শ্রীশ্রীকবীরের জ্বালার ফলে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জ্বালার ফলে তাঁর তীব্র প্রেমোন্মাদ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জ্বালার ফলে তাঁর কাম কাঞ্চনে বৈরাগ্য ও অতুলনীয় সাধনা। শ্রীশ্রীবিবেকানন্দের জ্বালার ফলে তাঁর প্রতিভার ও কার্য্যকারিতা শক্তির অপরিসীম বিকাশ। চুলা ধরায়ে আহার্য্য যাহা কিছু প্রস্তুত করা হ'লেই চুলা-ধরানো কর্ম্ম সার্থক হয়; কিন্তু আগুন জ্বালায়ে কোন কর্ম্মে সে আগুন নিয়োজিত না ক'রলে উহা কেবল মাত্র ভস্মে পরিণত হয়।

অর্জ্জুনের প্রাণে-মনে তীব্র জ্বালা দেখা দিলেও কার্য্যকারিতার মাপ কাঠিতে উহা পূর্ণভাবে মূল্য হীন—কারণ তিনি যুদ্ধ ক'রতে নেমে, যুদ্ধ ক'রতে অনিচ্ছুক হ'য়ে ভিক্ষুকতা গ্রহণ ক'রতে ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিলেন। উচ্ছ্বাসপূর্ণ জ্বালা শ্মশান বৈরাগ্যের সামিল। এই দেশের কীর্ত্তনকারীদের, কীর্ত্তনভোগীদের, বক্তাদের, বক্তৃতাভোগীদের ও পুস্তক পাঠকারীদের মধ্যে অধিকাংশই এই শ্রেণীর। অর্জ্জুনের কর্ম্ম জীবনের সহিত ধর্ম্ম জীবন গঠনের প্রভূত মালমসলা থাকায় সেই কুরুক্ষেত্র বিশাল সমর প্রাঙ্গণে, সেই কর্ম্ম ও ধর্ম্ম একত্র সাধনের উপযোগী ক্ষেত্রে ও সেই সেই কর্ম্ম সুসম্পাদনের শুভ মূহূর্ত্তে, মাহেন্দ্রক্ষণে ও অমৃতযোগে শ্রীকৃষ্ণ পরম চৈতন্যযুক্ত হ'য়ে অর্জ্জুনের মারফৎ জগৎকে—বিশেষতঃ ভারতকে—কি অমূল্য, কি উপাদেয় ও কি ধারণা-গম্য ভোজ্য পেয় দিয়াছেন। কিন্তু হায়! একালে শিক্ষা নেবার তুলনায় শিক্ষা দেবার প্রকৃত মানুষের বিশেষ অভাব! কারণ কোন তত্ত্ব যথাযথ হজম না করে গোঁজামিলন দিয়ে কাজ সাধবার ও সাধাবার প্রবৃত্তিটা এ কালের বিষম ব্যাধি।

মানুষের বিষম রোগ—দেহ-বুদ্ধি। এ বুদ্ধির প্রধান দোষ:—(১) যে মাত্রায় বাহ্যিক সৌষ্ঠবে আকৃষ্টা সে মাত্রায় আভ্যন্তরিক সৌষ্ঠবে লক্ষ্য শূন্যা; (২) জাতি ও বর্ণ ভেদ-বুদ্ধির আধিক্যবশতঃ "গুণ ও কর্ম্মে" দৃষ্টিশূন্যা; (৩) প্রবৃত্তি সমূহের বিশেষ অনুগামিনী; (৪) আত্মীয় আত্মীয়াদের দেহের জন্য অত্যধিক চিন্তাকুলা; (৫) শোক তাপাদিতে অল্পে অভিভূতা; (৬) ধন-জন প্রাচুর্য্যতায় বিশেষ স্বেচ্ছাচারিণী।

বর্ত্তমান কাল—অতীত ও ভবিষ্যৎকালের মধ্যস্থিত। এই অল্পক্ষণ স্থায়ী কালে জীব দেহধারী, কিন্তু এই স্থূল-দেহ বোঝাটা কর্ম্ম হিসাবে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অবস্থায় ছিল ও থাকবে। সুতরাং এ স্থূল বোঝাটাকে একাল ছাড়া আর দুই কালে গভীর তিমিরে হারায়ে দেওয়াই বিধানের ব্যবস্থা। মানব জীবনের মহা সুযোগ এ স্থূল বোঝার দৌলতে জীবআত্মারূপ পূর্ণত্বের চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত (Perfection in perfect conciseness) কে কৌশল খাটায়ে গ্রেপ্তার করা। তাঁর সহিত ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ স্থাপন ক'রলে তিনিই কৌশল শিখায়ে প্রাণ-মনসংযুক্ত বোধশক্তিকে আপনার ক'রে লন। এই হচ্চে শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম বর্ণের আদৎ কর্ম্ম। তা না ক'রে বোঝাগুলা ধরে টানাটানি করা বা এই বোঝাগুলার জন্য হা হুতাশ করা বা এই বোঝাগুলার উপভোগের জন্য বোঝা বাড়ান গণ্ড মূর্খের কর্ম্ম। ইহাই জীবের **শূদ্রাবস্থা** বা মানসিক ক্লীবত্ব। **"আমি দেহী"** এ সংস্কার পোষণ করাও **শূদ্রাবস্থা**। সুতরাং দেহের দৌলতে জাত্যাভিমান ও ভেদ-বুদ্ধি পোষণ করা **শূদ্রোচিত** কর্ম্ম। স্থূল দেহ বুদ্ধির প্রাবল্যের জন্য সেকালে শূদ্র বর্ণের ও রমণী কুলের ৺নারায়ণ পূজায়, ওঁকার সাধনে ও বেদাদি শাস্ত্র পাঠে অধিকার ছিল না। **গুণ ও কর্ম্ম** প্রকৃত বর্ণাশ্রমের মাপ কাঠি। জীবের মৌলিক সম্বল বোধ—শক্তি। বোধ-শক্তি বিকাশের নাম **চিন্তাশীলতা**। বোধ-শক্তির সহচরীদ্বয়—**স্মৃতি ও ধৃতি** কার্য্যকারিতা শক্তি বিকাশের মহা সহায়তাকারিণী। **স্মৃতি**—বোধ-শক্তির শ্রী-চুপড়ি ও **ধৃতি** শ্রীচুপড়িস্থ সংগৃহীত উপাদান। বোধ, স্মৃতি ও ধৃতি এই তিন শক্তির সহিত সূক্ষ্ম দেহ ও অহং-বুদ্ধিযুক্ত মন-প্রাণ একজুটী হ'লে প্রকৃত ইচ্ছা-শক্তি

বিকশিত হয়। এই চার শক্তির উৎকর্ষের মাত্রা হিসাবে **বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ** এই তিন জাতি **ভাগবৎ বর্ণ** শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ যে যে বর্ণ স্থূলত্ব ছেড়ে প্রকৃত সূক্ষ্মত্ব বিকাশের জন্য বাস্তবিক সচেষ্ট তাঁরাই **ভাগবৎ বর্ণ**। কালের দারুণ প্রতাপে ধুয়ে মুছে গেছে ভাগবৎ বর্ণ কিন্তু 'বিষ নেই কুলো পানা চক্কর' ভাবে গজিয়ে উঠেছে ভেদাভেদ দস্তটা—জাতি বর্ণাকারে। জাগতিক যার-যা কর্ম্ম সাধতে সাধতে আত্মোন্নতি সাধনের জন্য চিন্তাশীলতা বা মস্তিষ্ক কর্ষণের ব্যবস্থা **প্রকৃত বৈশ্য** বা দ্বিজাবস্থা। এই নব সংস্কারের প্রথম ধাপের বাহ্যিক উপাদান ছোট খাট যজ্ঞোপবীত। একদিকে আত্মোন্নতি সাধনের জন্য ব্যাকুলতা, অপর দিকে জাগতিক করণীয় কর্ম্ম সাধনের যত্নশীলতা এই দুই বিরোধী ভাবের মধ্যে আপনাকে গঠন করাই **প্রকৃত ক্ষত্রিয়** বা বিপ্রাবস্থা। এই দ্বিতীয় সংস্কারের বাহ্যিক উপাদান অপেক্ষাকৃত বড় যজ্ঞোপবীত। অর্জ্জুন এই শ্রেণীভুক্ত জীব। কিন্তু তিনি ও-পারের লোক হ'য়েও ঘটনা চক্রের প্রাবল্যে এ-পারের মর্ম্ম বেদনার কথা শ্রীকৃষ্ণকে জানায়ে ছিলেন। যিনি যে আধারের তাঁকে সেই ধরণের শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকের প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের মত উচ্চতম উপদেষ্টার অর্জ্জুনের মত উচ্চাধার বিশিষ্ট শিষ্যকে ও-পার সম্বন্ধে যাবতীয় শিক্ষা প্রদান করাই নিতান্ত সঙ্গত কর্ম্ম।

এ কুলের যাবতীয় কর্ম্ম সুসম্পন্ন ক'রতে করতে বিকাশ-তীর্থের প্রকৃত যাত্রা, যে কতটা আয়াস সাধ্য কর্ম্ম, যাঁকে আত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ এই কর্ম্ম সাধান তিনি সেই কর্ম্মকে কুরুক্ষেত্র সমর বাচ্য ক'রবেন তাতে বিচিত্রতা কি!

অহং বুদ্ধিযুক্ত-মন-প্রাণের স্থূল ভাবই উহার **হতশ্রী** অবস্থা। কিন্তু উহাদের ঊর্দ্ধতন গতি **লক্ষ্মী-শ্রী** অবস্থা। প্রকৃত গুরুর করণীয় কর্ম শিষ্যের বোধ ও ইচ্ছা-শক্তিদ্বয়কে স্থূল না হ'তে দিয়ে যাতে সূক্ষ্মাবস্থায় স্থিতি হয় সেই ভাবের শিক্ষা প্রদান ও ব্যবস্থা করা। তাই শ্রীকৃষ্ণের কথায় আহা-উহুর এক ছিটে ফোঁটাও ছিল না। বরং তিনি সুদৃঢ় ভাবে বল্লেন "তুমি ক্ষত্রিয় হ'য়ে কোন্ মুখে লড়াই ক'রতে গর-রাজি! তুমি স্বধর্ম্ম ছেড়ে ক্লীবত্ব পেতে চাও"। বোধ-শক্তিতে ক'সে ঘা দিতে সক্ষম হ'লে ধারণা শক্তিতে দাগ প'ড়ে ও সেই সঙ্গে আত্মমর্য্যাদা বোধটা গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে। এটা কিন্তু হয় সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণের প্রভাবটা যাদের অধিক তাঁদেরই। অর্জ্জুন সেই ধাতের জীব। সুতরাং তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝলেন যে তাঁকে ক্লীবত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব ছেড়ে প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের করণীয় যাবতীয় কর্ম্ম সুসম্পন্ন ক'রতে হবে। একালের গুরু হ'লে শ্রীকৃষ্ণ হয় তো এ ক্ষেত্রে ওৎ বুঝে কোপ্ মারবার ব্যবস্থা ক'রতেন। লোটা-কম্বলের পরিবর্ত্তে যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে রাজ্য লাভ করা চাইই চাই—এই হ'ল শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। আসল স্বরাজ আগে লাভ ক'রে নকল স্বরাজ লাভ করা শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার বিশেষত্ব। এই জন্যে প্রত্যেক উপদেষ্টার নিতান্ত বিহিত কর্ম্ম শিষ্যের অহং-বুদ্ধিযুক্ত-মন-প্রাণে বিশিষ্ট ধারণা দেওয়া "তুমি বড় আছ ও আরো বড় হ'বে।" তবেই প্রত্যেক হৃদয়ে, মস্তিষ্কে ও সংসারে মহাশক্তি ও মহালক্ষ্মীর আসন বিছানো অসম্ভব হয় না।

কর্ম্ম সাধন ব্যতিরেকে জীবের অন্যগতি নাই। কিন্তু কর্ম্মই জীবকে কর্ম্মঘানিতে ঘোরাবার

মহা ওস্তাদ্! তবে নিম্নোক্ত বিধানে যাবতীয় কর্ম্ম সাধিত হ'লে উহারা বিশেষ সুফল প্রদান করে।

১। দেহস্থিত আত্মার সহিত আপনার বাবা, আপনার মা, আপনার স্বামী বা সখা এই সম্বন্ধ পাতানো। ঠাকুর, দেবতা, ঈশ্বর, ভগবান প্রভৃতি দূরত্ব সূচক কথা মুখেও আনার ফলে কর্ম্ম চক্রে ঘূর্ণিত হ'বার বিষম ব্যবস্থা করা।

২। ছোট—বড় যা কিছু করণীয় কর্ম্ম আমার বাবার, মায়ের বা সখারই কর্ম্ম। এই ধারণা পাকা করে ও দেনা চুক্তি হিসাবে মন-প্রাণ ঢেলে সেই সেই কর্ম্ম সাধন করা।

৩। স্ব স্ব যা কিছু ভোগ্য-সেব্যের **ভালটুকু** ও যাবতীয় কর্ম্মের **বাহাদুরী**গুলা নিজে আত্মসাৎ না করে দেহস্থিত মা, বাবা বা স্বামীকে প্রাণ খুলে দেওয়া। এই উপায়ে দেহস্থিত আত্মা **"ভোক্তা"** হন ও জীব কর্ম্ম ফল হ'তে অব্যাহতি পায়।

(৪) প্রত্যহ প্রাতে (অন্ততঃ দশবার) দৃঢ় ভাবে বলা "তুমি এই দেহে, প্রাণে, মনে, অহংবুদ্ধিতে বাক্যে, কর্ম্মে, চিন্তায় ও সংসারে **মহা-লক্ষ্মী, মহা-শক্তি** ও **মহা-আনন্দময়ী** হ'য়ে অধিকার ক'রে তোমার যাবতীয় কর্ম্ম সুসম্পন্ন কর।"

ঘটনা চক্রের অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা অদৃশ্য শক্তির অবোধ্য লীলা। অদৃশ্য রাজ্যবাসী-বাসিনীগণ এই লীলার পৃষ্ঠপোষক-পোষিকাভাবে অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা উভয় কর্ম্ম সাধন করেন। প্রতিকূলতা হটায়ে অনুকূলতা আনয়নে প্রয়াসী হ'লে আবশ্যক তাঁদের প্রীতির জন্যে করণীয় কর্ম্ম সাধন করা। এই প্রকার কর্ম্ম সাধনই **যজ্ঞ** বাচ্য। দশের ও দেশের হিতে সাধিত কর্ম্মও **যজ্ঞ** বাচ্য। বস্তুতঃ অদৃশ্যবাসী-বাসিনীগণ জীবকে সহায়তা ক'রতে বিশেষ প্রস্তুত ও এমন কি তা করেন। অর্জ্জুনের এ-কূলের সহায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। উপরন্তু, প্রিয় শিষ্য যাতে অদৃশ্য রাজ্যের যথাসম্ভব অনুকূলতা পান এই উদ্দেশ্যে অর্জ্জুনের দেহও অহংবুদ্ধিযুক্ত প্রাণ-মনের গতি শ্রীকৃষ্ণ ফিরায়ে দিলেন অদৃশ্য রাজ্যে। এ-পারে থেকে ও-পারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করবার ব্যবস্থা—**সাংখ্যযোগ**।

মানসিক শূদ্রত্ব হ'তে বৈশ্যত্বে স্থিতি হওয়ার পর ক্ষত্রিয়ত্বে প্রমোসন্ পাওয়া সেকালের বিধান। ঘটনা চক্রের ফাঁদে পড়ে অর্জ্জুন তলিয়ে যেতে বসেছিলেন—শূদ্রত্বে। তা কিন্তু দেহ বুদ্ধির প্রভাবে। অর্জ্জুনের এ ছার বুদ্ধি খণ্ডন করায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিষ্কাম ভাবে সব করণীয় কর্ম্ম সাধতে উপদেশ দিলেন—কি হাতে বিচার-বুদ্ধিকে সম্বল ক'রে। তা হ'লে ইহা বুঝা আবশ্যক যে কোন তত্ত্ব বিচার দ্বারা জেনে ও বুঝে, তারপর সেই সেই বিধানে কর্ম্ম সাধন করাই প্রকৃত **জ্ঞান** বাচ্য। জানা—বুঝা মানে বোধ-শক্তিতে গেঁথে, স্মৃতি-খাতার 'জমার' পাতায় লিখে ও পরে ধৃতি (ধারণা শক্তি)র লোহার সিন্দুক যাৎ করা। তখন ধারণা শক্তির প্রভাবে **সংস্কার** দেখা দিয়ে ও অহং বুদ্ধিযুক্ত মন-প্রাণে এক-বগ্‌গা ঝোঁক এনে সেই সেই করণীয় কর্ম্ম সাধায়। এই ঝোঁক বা এক মুখী চিন্তার নাম **ধ্যান**। **জ্ঞান**, নব-সংস্কার ও ধ্যানের ফলে ক্রমশঃ উপলব্ধি হয় সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম তত্ত্ব সমূহ। এবম্বিধ উপলব্ধিই **বিজ্ঞান** আখ্যাত। সুতরাং বিজ্ঞান মানে—প্রত্যক্ষ-জ্ঞান। জ্ঞান—মানে কর্ম্ম সাধনের ফলে অভিজ্ঞতা।

ফাঁকি দেওয়া স্বভাব বিশিষ্ট অহং বুদ্ধিযুক্তমন-প্রাণ সম্বল ক'রে স্ব স্ব করণীয় কর্ম্ম যা তা ভাবে সাধন ক'রলে সেই ফাঁকি দেওয়া অভ্যাসের জন্ত ফাঁকি-লাভটা মাত্রায় বাড়ে। যে যে কর্ম্ম ও চিন্তা দ্বারা যাবতীয় সঙ্কীর্ণতার পরিবর্ত্তে জীব বিকাশ-তীর্থের যাত্রী হন—উহাই **কর্ম্ম বা পুণ্য কর্ম্ম** বাচ্য। লৌকিক, ব্যবহারিক বা যে কোন করণীয় কর্ম্ম সাধন ক'রেও জীব সঙ্কীর্ণতা অলক্ষীর খেলনা-পুতুল সেজে থাকে ব'লে উহা **বিকর্ম্ম বা বিকৃত কর্ম্ম** বাচ্য। কেবল মাত্র সংকোচই যে যে কর্ম্মের সম্বল—উহা **অকর্ম্ম** বা **পাপ কর্ম্ম**। এ কালের যাবতীয় কর্ম্ম যে ভাবে সাধিত হয় উহা প্রায়শঃ **বিকৃত কর্ম্মের** সামিল। বাহ্যিক আচরণের প্রাবল্যে ও লোক দেখানো বা নাম-কেনা ভাবের প্রাচুর্য্যে উহারা নিঃসন্দেহ **বিকৃত কর্ম্মভুক্ত**। সুতরাং সঙ্কীর্ণতা শূন্য কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্মবাচ্য। সেই সাধন ফলে ধ্রুব লভ্য হয় মনে ও প্রাণে সরলতা ও উদ্বেগ শূন্যতা। সেই সাধন ফলে নিত্য নব নব বিকাশের পন্থা উদ্‌ঘাটিত হয়। সেই সাধন ফলে সংসারে হা হা রব বিদূরিত হয়। সেইকর্ম্ম ফলে সংসারের জঞ্জাল সমূহ ক্রমশঃ অপসারিত হয়। কিন্তু কেবল বিধি-বিধানের গণ্ডির মধ্যে অবস্থিত হয়ে পূণ্য কর্ম্মও সাধিত হ'লে সাধক ফেল ডিভিসনেই পাশ হন ও পরে অবিশ্বাস ও সংকোচের গাঁটরি আকারে তাঁকে ভবলীলা সাঙ্গ করতে হয়। একালে গীতা বা শ্লোক কপ্‌চানো কাজটা বিষম বিকৃত কর্ম্মের তালিকাভুক্ত হ'তে চ'লেছে। মন-মুখ এক না করাই আত্ম প্রবঞ্চনা। **প্রবঞ্চক** সর্ব্বতোভাবে **শুদ্র শ্রেণী ভুক্ত**।

এই ধরাটা স্থূল দেহ ও অহংবুদ্ধির বিষম লীলাক্ষেত্র। ভারতের কোন এক যুগে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু ও নিশম্ভু-শম্ভু সহোদর সেজে এই দুই বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে গেছে। সেই যুগের মত এ যুগেও ভারতে এ খেলা সুরু হয়েছে। এই দুই বুদ্ধির কিন্তু সকল যুগেরই ধারা যে ডালে বসা, সেই ডালটা শুধু নয় গাছটারও চিহ্ন না রাখা। সেকালের দেহবুদ্ধি আয়ানঘোষ গদা ঘাড়ে ক'রে তেড়ে এলেও বুঝালে বুঝতো। একালের জাত্যাভিমানী বা সম্পদাভিমানীরা ধরাটাকে সরা ঠাউরেই ও নাসিকা-ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে আমদানি করা শিষ্টাচারে যা কিছু কাজ অধিকাংশ হলে সাধেন। অহংবুদ্ধি আবার এক-কাটি সেরা। এটা—কথায় ফোয়ারা, কাজে বোকা ম্যাড়া; সাজে মানোয়ারী, কাজে ফক্কিকারী! বাংলা দেশের ব'নেদি বাবুদের দেউড়িতে টাঙ্গানো তরোয়ালগুলা সেই বাবুদের এই বুদ্ধির নমুনা। বিদ্যা-বুদ্ধির খাপটা সামান্য খুল্লেই তাঁদের ভোঁতা মারা দশা জল্ জল্ ক'রে চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আবার আধুনিক পয়সাওলা বাবুদের দেউড়ির শান্ত্রীরা বাবুরা যে কি উপাদানে গঠিত তাও দেখাতে ছাড়চে না। ভোঁতা ছুরি কাঁচি শান্ দেবার মস্ত মস্ত কারখানাগুলা একালে এই বুদ্ধির কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হ'য়ে গজিয়ে উঠেছে। ভারতের এ হাল না হওয়াই আশ্চর্য্যের কথা—যখন শিক্ষার গুরু ও রক্ষক এই দুই বুদ্ধির চলয়মান আগ্নেয় গিরি। এই বুদ্ধির প্রাচুর্য্যই রাবণ, দুর্য্যোধন, কর্ণ, নেপোলিয়ন প্রভৃতি বীরদের বীরত্বের খর্ব্বতার একমাত্র কারণ। এই বুদ্ধির ঐরাবতত্ব খর্ব্ব ক'রেই গনশাছোঁড়া শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বর বাচ্য হ'য়ে ভারতে পূজিত। এই বুদ্ধিদ্বয়ের খর্ব্বতাই হনুমানের কার্য্যকারিতা শক্তি ও বীরত্ব বিকাশের মূল কারণ। এই বুদ্ধিদ্বয়কে যাঁরা খর্ব্ব করণে প্রকৃত সচেষ্ট

তাঁরা 'বৈরাগী' ব'লে আখ্যাত। খাটি বৈরাগ্যের নিদর্শন—কামে বৈরাগ্য, অথবা ক্রোধে বৈরাগ্য, লোভে বৈরাগ্য, দম্ভে বৈরাগ্য, হিংসায় বা ঈর্ষায় বৈরাগ্য, কুৎসায় বৈরাগ্য, অধৈর্য্যে বৈরাগ্য, মিথ্যাচারে বৈরাগ্য, আলস্যে বৈরাগ্য, অকৃতজ্ঞতায় বৈরাগ্য, উচ্ছ্বাসে বৈরাগ্য, শঠতায় বৈরাগ্য, স্বার্থপরতায় বৈরাগ্য, আত্মশ্লাঘায় বৈরাগ্য, তোষামোদ-করণে বৈরাগ্য, নিজ তোষামোদ-শ্রবণে বৈরাগ্য, যা-তা চিন্তা-করণে বৈরাগ্য, যা-তা বাসনা-পোষণে বৈরাগ্য, যা-তা কর্ম্ম-সাধনে বৈরাগ্য, যা-তা বাক্যব্যয়ে বৈরাগ্য, যার-তার সঙ্গ-করণে বৈরাগ্য, সময়ের অযথা ব্যবহারে বৈরাগ্য, ও পর মস্তকে হস্ত বুলায়ে উদরান্ন বা পাথেয় বা অর্থ সংস্থানে বৈরাগ্য। সুতরাং বাহ্যিক সাজ সজ্জা বৈরাগ্যের অর্থাৎ সন্ন্যাসের ভান মাত্র। জাগতিক যাবতীয় জ্বালা বা দায়িত্ব হ'তে নিষ্কৃতি পাবার ব্যবস্থা সন্ন্যাস বাচ্য হ'লেও উহা বস্তুতঃ মানসিক ক্লীবত্ব অর্থাৎ শূদ্রত্ব। তদ্রূপ "আমার সংসার" ও "আমি যা-কিছু ক'রেছি ও কচ্চি" এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে সংসারে মজে-ডুবে থাকাও বিষম শূদ্রত্ব। ফলকথা, সংসারী বা সংসার ত্যাগী যিনি যা হ'ন্ না কেন, প্রতি হাতে প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য—তাঁর "আমি আমার"গুলা কি ভাবে নিজের সঙ্গে আর দশ জনকে শিংওয়ালা-জানোয়ারের মত গুঁতাচ্চে। এই গুঁতানো হ'তে নিজের সঙ্গে দশ জনকে রেহাই দেবার ব্যবস্থা করাই প্রকৃত সন্ন্যাসবাচ্য। মানুষের হাল্ ফিলের অবস্থা—খেলেও দোষ, না-খেলেও দোষ; বাহ্যে-প্রস্রাব ক'ল্লেও দোষ, তা না-কল্লেও দোষ; ঘুমালেও দোষ, না-ঘুমালেও দোষ; দেখলেও দোষ, না-দেখলেও দোষ; শুনলেও দোষ, না-শুনলেও দোষ; বল্লেও দোষ, না-ব'ল্লেও দোষ প্রভৃতি। সুতরাং মাঝা-মাঝি পন্থা ধ'রে কর্ম্ম সাধনই বিরাট বিধানের বিধান। ইহা **সাম্যাবস্থা** (Harmony)। সাম্যাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই **স্থিতপ্রজ্ঞতা**। ভেদবুদ্ধি শূন্যতা—সাম্যাবস্থার ও ত্রিকালজ্ঞতা—স্থিতপ্রজ্ঞের পরিণাম। দুঃখের মধ্যে সুখ ও সুখের মধ্যে দুঃখ নিঃসন্দেহ নিহিত কেবল মাত্র সাম্যাবস্থায় উপভোগ্য। প্রতিষ্ঠা বা জাগতিক যাহা কিছু লাভে বিতৃষ্ণা অথচ গুরু বা পুরোহিত ভাবে দশের হিতাকাঙ্ক্ষিতার ফলে সেই মহাজন **'শর্ম্মা'** বাচ্য হন। সুতরাং শূদ্রত্ব ঘুচায়ে **ব্রাহ্মণত্বে** অধিষ্ঠিত হওয়া "গুণ ও কর্ম্ম" হিসাবে মুখের কথা নয়। অতীব নিকৃষ্ট সামগ্রীই বেজায় সস্তা। "কি ক'রতে এসে কি করেছি ও কচ্চি বা অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে কাজ সাধতে হচ্চে বা ঋণ শোধ ক'রতে এসে ঋণ হ'তে অব্যাহতি পাওয়া দূরের কথা উহা বৃদ্ধি করে গেলুম" এই প্রকার চিন্তায় যে হৃদয় ও মস্তিষ্ক পরিপূরিত বা দশের ও দেশের মঙ্গলকামনায় যিনি চোখের জলে ভাসেন তাঁরই সংসারত্যাগ প্রকৃত **সন্ন্যাস**-বাচ্য। যিনি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এই প্রকার বৈরাগ্য অসনে-ভূষণে ভূষিত তিনি "আমার যা যা সাধা উচিত তা সাধতে পাল্লুম না" এই ধারণায় বাহ্যিক যাহা কিছু সাজ সজ্জায় বিভূষিত হয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করতে বিশেষ অনিচ্ছুক। যিনি উপরোক্তভাবে চিন্তাশীলতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, চিন্তাশীলতাই তাঁকে কালে সমাধি বৈশ্যের মত কেবল মাত্র ব্রাহ্মণের উপভোগ্য সমাধি-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করে। অর্থাৎ সমাধি বৈশ্য ডবল প্রোমোশন পেলেন, কিন্তু স্থূল দেহ ও অহংবুদ্ধির প্রভাবে সুরথ রাজা ক্ষত্রিয়সন্তান হয়েও সমুন্নত বোধ ও ধৃতি শক্তির নিদর্শক মেধস মুনীর আনুকূল্য লাভ করেও

আবার মুমিক্ষু সাজে জাগতিক খেলা খেলতে প্রবৃত্ত হ'লেন। তবে কিছুকাল আত্মস্থ হয়ে থাকাতে (well-centred in himself) তাঁহার লাভ হয়েছিল কার্য্যকারিণী শক্তির বিকাশ। এই বিকাশের ফলে, তাঁর পুনরায় রাজ্য লাভ হ'ল। আত্মস্থতাই প্রকৃত শিক্ষিত, সভ্য, উন্নত, বৈরাগী বা ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

তা হ'লে এই প্রবন্ধে বুঝা গেল :—

(১) জাগতিক ও পারলৌকিক সাফল্য লাভ ক'রতেই হবে।

(২) তা ক'রতে হ'লে, আপনাকে আপনি সময় পেলেই কিন্তু গোপনে বসে পড়া দরকার। আপনাকে **পড়া** মানে নিজের গোয়েন্দাগিরি ক'রে, নিজের বাক্যে, কার্য্যে ও চিন্তায় আপনাকে বসে সামলানো। এই কাজের লাভ :—

(১) এই দেহের মধ্যে আত্মারূপী **আমার আদৎ বাপ, আদৎ মা বা আদৎ স্বামী বা সখা** যিনি **শক্তি, শান্তি, জ্ঞান, প্রেম, লক্ষ্মীশ্রী ও আনন্দের আকর** হ'য়ে গোপনভাবে আছেন, তাঁর সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপন করা। এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, অবকাশ পেলেই নির্জ্জনতার আশ্রয় লওয়ায় ও গোপন ভাব পোষণ করায়।

(২) এই সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে, লাভ হয় (ক) মন প্রাণের সহিত অহংবুদ্ধি শান্ত হ'য়ে ক্রমশঃ প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, (খ) যে মাত্রায় প্রশান্ত ভাব এসে যায় সে মাত্রায় কার্য্যকারিণী শক্তির সহিত কার্য্যকারিণী শক্তির সম্বলও বৃদ্ধি হয়, (গ) পরে আদৎ শক্তি, লক্ষ্মীশ্রী ও আনন্দ দেখা দিয়ে পুস্তকের বা এর-তার সাহায্যের জন্যে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রতে হয় না ও (ঘ) সাধারণতঃ যা শুনবার-নয় শুনা যায়, যা দেখবার-নয় দেখা যায়, ও যা পাবার-নয় পাওয়া যায়।

(৩) প্রত্যক্ষ করা যায় যে সাধারণতঃ স্থূল দেহ ও অহংবুদ্ধি নকল কর্ত্তা গিন্নী সাজে যা করবার-নয় ক'রে, যা ভাববার-নয় ভাবে, যা শুনবার-নয় শুনে, যা দেখবার-নয় দেখে, ও যা বলবার-নয় বলে, যা ভাংড়াবার নয় ভাংড়ায়েছে ও ভাংড়াছে। তাই (ক) সঞ্চিত কার্য্যকারিণী শক্তির অপচয় করেছে ও করাচ্চে; (খ) আমাকে চিনতে ও আমার আপন জনা (আত্মা)র সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে দেয়নি; (গ) আমাকে গোঁজামিলন ভাবে যা কিছু কাজ সাধায়ে ও বাসনা ভাবনা, ভয়, মন মরা ভাব, আলস্য প্রভৃতি সঞ্চয় করায়ে আমার যাবতীয় জ্বালার কারণ হয়েছে।

তা হ'লে আমার প্রধান সহায় সম্বল এই **দেহ**, কিন্তু **মহাশত্রু** আমার **স্থূল দেহ ও অহংবুদ্ধি**। সুতরাং দেহের অভ্যন্তরকে আমার মা বা বাবা বা সখার বিহার ভবন বলে সযতনে সাজানো ও দেহবুদ্ধির সহিত অহংবুদ্ধির খর্ব্ব করবার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক কর্ম্ম। তখন আমার প্রধান কর্ম্ম **বোধ ও ধারণাশক্তি** দ্বয়ের দ্বারা নিম্নলিখিত ভাব পোষণ করা :—

(১) আমি যা যা চাই আছে এই দেহের মধ্যে আমার আপন বাপ বা মা বা সখার কাছে; (২) আমি ঠিক ঠাক ভাবে তাঁর কাছে থাকলেই যা চাই তা না চাইতেই পাব, কিন্তু চাইলেই ঠকে যাব; (৩) এই দেহটা **আমি** নয় বা স্থূল দেহ ও অহংবুদ্ধি **আমি** নয়—নয়—কিছুতেই নয়

ও (৪) আমি যা করি না কেন বিশেষতঃ বাহাদুরী নেবার ও যা কিছু উপভোগ করবার বেলা (দেহস্থিত মা বা বাবাকে উদ্দেশ ক'রে) হরদম বলা "তুমি কর", "তুমি খাও", "তুমি উপভোগ কর" "তোমারই এটা প্রাপ্য" প্রভৃতি। এইগুলা প্রত্যেকবার দৃঢ় অথচ গোপন ভাবে বলা চাই। এবম্বিধ উপায়ে ঘটনাচক্রের প্রতিকূলতা ও কর্ম্মচক্রের গতি রোধ করা নিতান্ত সম্ভব।

ফল কথা, বিধি বেঁধে যাঁর যা করণীয় কাজ সাধা, সত্যানুরাগ ও আভ্যন্তরিক শান্ত ভাব জীবকে সূক্ষ্ম অহংবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করায়ে তাঁর যাবতীয় 'হায় হায়' ঘুচাতে সক্ষম হয়। পরমুখাপেক্ষী-পেক্ষিণী জীবের কিন্তু একমাত্র প্রাপ্য যাবতীয় নিষ্ফলতার সহিত দারুণ জ্বালা।

বিচার মালা

কলি ও কল্কি

কলি অধর্ম্ম জাত বলিয়া অধর্ম্মের প্রসারে নিযুক্ত আছে, এবং ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া অধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবে। ইহাই তাহার প্রচেষ্টা। পরন্তু ধর্ম্মের অপার দয়া, কলির ঈদৃশ শত্রুভাব সত্ত্বেও তিনি তাহাকে মিত্রভাবে দেখিয়া থাকেন, এবং কলির প্রাণ স্বরূপে আসিয়া তিনি তাহাকে জীবিত রাখিয়াছেন। তথাপি শত্রুভাবে থাকিয়াও কলি নিজ প্রাণকে ভালবাসে, সে প্রাণকে অন্তর মধ্যে রাখিয়া নিজে অলঙ্কার স্বরূপে চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া আছে। প্রাণের সাহায্যে অলঙ্কার উদ্ভাসিত হইতেছে, তথাপি কলি অকৃতজ্ঞ—সে নিজ হিতকামীর অনিষ্ট করিবে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য। সে কারণ তাহার চেষ্টা হইতেছে যে ধর্ম্মরূপ প্রাণের প্রকাশ নষ্ট করিয়া সে নিজে প্রকাশমান হইবে। তদুদ্দেশে স্বয়ং প্রকাশকের ভাব অবলম্বন করিয়া সে ধর্ম্মভাণে চলিয়াছে, এবং জীব হৃদয় তমোভাব দ্বারা আবৃত করিয়া জীবকে বুঝাইয়া দিতেছে যে অধর্ম্মই সব, ধর্ম্মনামে অপর কিছু নাই, এবং তদীয় সত্তা অলীক ও মিথ্যা কল্পনা মাত্র—"অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।" (ভগবদ্গীতা ১৮।৩২)।

কলির প্রজাগণও সেই প্রাণস্বরূপ ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া আছে, তাহারা দেহরূপ অলঙ্কার দ্বারা প্রাণকে অলঙ্কৃত করিয়া আছে, পরন্তু প্রাণকে উপেক্ষা করিয়া সেই অলঙ্কার রক্ষণের জন্য তাহারা সদাই ব্যস্ত আছে; অলঙ্কারের মাহাত্ম্যই তাহারা বুঝে, কারণ অলঙ্কার দর্শনে তাহারা সুখ ও পরিতৃপ্তি অনুভব করে; তথাপি প্রাণের আশা তাহারা ছাড়ে না, প্রাণের অভাবে অলঙ্কার নষ্ট হইবে ইহা তাহারা বুঝে, সে কারণ পাছে প্রাণ চলিয়া যায়, সেই ভয়ে তাহারা ত্রস্ত ভাবে আছে, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে অলঙ্কাররূপ দেহের অনুরোধে তাহারা প্রাণকে রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে, নচেৎ প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তরস্থিত প্রাণের সহিত কাহারও

ভালবাসা নাই। অলঙ্কারের প্রভায় বিকাশ-দেহের বাহ্য রূপে প্রকটিত রহিয়াছে, তদ্রূপ প্রভা দর্শনে জীব মুগ্ধ হইয়া তদীয় সূক্ষ্ম সংস্কার গ্রহণ করিয়া প্রাণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিতেছে, প্রাণ সংস্কার মধ্যে লুক্কায়িত রহিল বলিয়া সে প্রাণ বিষয়ে অন্ধ হয়, তখন সংস্কারের সূক্ষ্ম রূপ লইয়া জীব ভাব-সমন্বিত হয়, এবং ভাবের উচ্ছ্বাসে সে কখন পুলকিত, কখন বা বিষাদযুক্ত হয়; পরন্তু প্রাণের সাহায্যে যে হর্ষভাব সমুৎপন্ন ও রূপের বিকাশ হয়, এবং উহার সাহায্যাভাবে যে বিষাদ আসিয়া জুটে, তাহা জীব জানে না, সে অলঙ্কার চিন্তনে অন্ধ হইয়াছে, সুতরাং অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব সে বুঝিয়া থাকে, এবং অলঙ্কার দৃষ্টে সে হর্ষান্বিত হইতে চাহে। পরন্তু হর্ষ কোথায় ?—প্রাণ সংযোগেই সংস্কারগণ প্রভাযুক্ত হইয়া হর্ষ প্রদান করে, এবং সংযোগাভাবে সংস্কারগণের স্বভাবগত মলিনতা প্রকটিত হয়, তখন জীব আর সংস্কার সম্পর্কে সুখভাব অনুভব করে না, তখনই সে বিষাদযুক্ত হয়। সংস্কারের বাহ্য দৃশ্যের প্রকাশভাবের বশীভূত বলিয়া জীব রূপকের রূপ কথা শুনিতে ভাল বাসে, এবং রূপকের সারসত্ত্ব—আধ্যাত্মিক ভাব—গ্রহণে সে অসমর্থ বলিয়া সে প্রাণের কথা শুনিতে চায় না, অথবা চিন্তার ধারার মধ্য হইতে অপ্রত্যক্ষ প্রাণের কল্পনা গঠন করিয়া সে তাহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; তিমিররূপ সংস্কারান্ধ হইয়াছে বলিয়া সে আলোকে আসিতে চাহে না; সে পেঁচকরূপ সংস্কারকোটরে বাস করিতেছে, সংস্কার সেবাই তাহার ধর্ম্ম হইয়াছে; পরন্তু শাস্ত্র উহাকে অধর্ম্ম বলিতেছেন, কারণ সংস্কারের দ্বারাই তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া জীবকে কলির কন্যা মৃত্যুর আধীনে যাইতে হইবে। ইহাই কলি-জীবের ধর্ম্ম, সে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জানে, এবং শাস্ত্র বলিতেছেন—"অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা। সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী" ॥

ঈদৃশ অজ্ঞানান্ধ কলি-জীবের চক্ষুঃস্ফুরণের জন্য গুরু-কল্কির আবির্ভাব হয়, তিনিই অজ্ঞান তিমিরান্ধ জীবের জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন; "অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" তখন জীবের গুরু দর্শন। গুরু সমীপে থাকিয়া গুরু মুখোচ্চারিত বাক্যলব্ধ জ্ঞানকে উপনিষৎ জ্ঞান বলে, এবং গুরু দর্শনান্তর স্বতঃ প্রকাশিত দৃশ্যমান সৃষ্টিতত্ত্ব এবং অদৃশ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক লব্ধ জ্ঞানকে দার্শনিক জ্ঞান বলে। অলঙ্কার দ্বারা আবৃত বলিয়া প্রাণস্বরূপ ব্রহ্ম দৃষ্টি গোচর হয় না, এক্ষণে অলঙ্কারস্বরূপ আবরণের উন্মোচন করিয়া, শুদ্ধ ব্রহ্মকে জীবের সমীপস্থ করিয়া, দর্শন তত্ত্বকথা বুঝাইয়া দিবে, তাই গুরু কল্কির আবিভাব হইয়াছে। শ্রুতি বা দর্শনের দ্বারা উপলব্ধ পুরাকালের মুনি ঋষিগণের জ্ঞান প্রত্যক্ষ ভাবে লব্ধ হইত বলিয়া, তাঁহাদের উক্তিকে অভ্রান্ত বিবেচনায় আপ্ত বাক্য বলা হয়, পরন্তু বর্ত্তমান সময়ে মুনি ঋষির অভাব বলিয়া আবিপশ্চিৎগণ মুনি ঋষির পদাবলম্বী হইতে চায়, তাহারা মুনি-ঋষি মধ্যে মতদ্বৈধ দেখিতে পায়, এবং সময়োপযোগী করিয়া সমাজ-সংস্কার বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। তাহার ফলে ধর্ম্ম ও সমাজে বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, ইহা কলিরাজত্বের মহিমা, সৃষ্টি নাশই কলির ধর্ম্ম, এবং সেই ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকরূপে কলিদূতগণের আবির্ভাব হইয়াছে।"—শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারী শক্তি

এই সংসাররূপ কর্ম্ম ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে গেলে প্রথমেই দরকার আত্মশক্তি। এই আত্মশক্তিরূপ কবজ পরিয়া এই সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে যে নামিতে পারে সেই জয়ী, সমগ্র বিশ্ব তাঁহার নিকটে শির নত করে, শত্রু মিত্র, আত্ম পর ভেদাভেদ থাকে না। আমরা মায়ের জাতি সকল লোক সন্তান, মাতৃশক্তির স্ফুরণেই আমাদের আত্মশক্তি বিকাশ পাইয়া থাকে।

মাতৃত্বই আমাদের কবজ—বর্ম্মস্বরূপ। মাতৃ অঙ্গে কেহ হস্তক্ষেপ করে না এবং আঘাত করিলেও লাগে না, কারণ সর্ব্বংসহা মাতাই সন্তানের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিতে সক্ষম। আমার মাতৃ শক্তির দ্বারাই সন্তানের তাড়ন ও পালন হইয়া থাকে—অন্য কাহার দ্বারা হইতে পারে না। কিন্তু বহুকাল আমরা অজ্ঞানতার গৃহ পিঞ্জরে আবদ্ধা থাকিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি ; আত্মশক্তি দূরের কথা, আত্মরক্ষা করিবারও ক্ষমতা হারাইয়াছি। কিন্তু এরূপ পড়িয়া থাকিলে চলিবে না, আত্মশক্তির বিকাশ চাই, আত্ম রক্ষার জন্য আত্মসাধনা করিতে হইবে, তবে সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করা চলিবে। আত্মসাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে না পারিলে আত্মশক্তির বিকাশ হইবে না। কন্যাগণ, ভগ্নিগণ, কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নাচিলে চলিবে না—সংসারক্ষেত্রে শান্তি আনিতে হইবে, শক্তি আনিতে হইবে, অন্নহীন বুভুক্ষিতদের অন্ন বিতরিতে হইবে। তবে তো শক্তি জাগিবে। বুভুক্ষু অনটনের দেশে অনটনের সংসারে অন্নপূর্ণা হইয়া, মা অন্নপূর্ণার রূপ ও ভাবটিকে মনে প্রাণে জাগাইয়া তুলিতে হইবে ; তবে তো আমাদের স্বামী পুত্রের মুখে হাসি ফুটিবে। আত্মশক্তি সাধনা করিতে গেলে আত্মাকে প্রথমে চিনিতে হইবে, আত্মা স্ত্রী নহেন,আত্মা পুরুষ নহেন, তিনি নপুংসকও নহেন। তিনি কি ? তিনি অমূর্ত্ত, তিনি দ্রষ্টা, তিনি দৃশ্য, তিনি সাক্ষী। তিনিই জীবদেহ ধারণ করিয়া সকল দেহে দেহে বিরাজ করেন। এই দেহকে যে নারীদেহ জ্ঞানে ঘৃণা করে বা মোহ বশে ভালবাসে, সে অজ্ঞ—সে সৃষ্টিতত্ত্ব কিছুই জানে না, কিছুই শুনে না, কিছুই বুঝে না। যখন এক পঞ্চভূত হইতে সকল দেহ সৃজিত বা গঠিত, একই আত্মা যখন সর্ব্ব দেহে অবস্থিত, তখন সকলেই এক, স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদ স্থান কোথায় ? তিনি কখন স্ত্রী কখন পুরুষ রূপে লীলা সৃষ্টি করিতেছেন, কখন বহু থেকে এক হইতেছেন, কখন এক থেকে বহু হইতেছেন। এ পঞ্চ ভৌতিক দেহ ক্ষণ বিধ্বংসি এবং জড়ের মতন, ইহার আবার সুখ দুঃখ কোথা ? যেমন ঘরগুলা ধ্বংস হইয়া গেলেও ঘরের মধ্যে অবস্থিত আকাশের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, তেমনি দেহের জন্ম মৃত্যু, সুখ-দুঃখ মান-অপমানে আত্মার কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু যে দুঃখে আমরা অহরহ জ্বলিতেছি, যাহার জ্বালা আমরা নিরন্তর অনুভব করিতেছি সে দুঃখ নাই, এ কথা আমরা সহজে বিশ্বাসই করিতে পারি না। মনে হয়, কেহ যেন জীবকে সুখ-দুঃখ দিবার জন্যই আছেন। এই মধ্যস্থ যিনি ইনিই মায়া বা তমো—এই মায়াই জগতে মহাশক্তি বা প্রকৃতিরূপা। এই মায়া বিশ্বের উপাদান কারণ, মায়াই নিমিত্ত কারণ, এই মায়া মানুষের কাছে দুর্ব্বোধ্য—মায়া কি জিনিষ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। আত্মশক্তি লাভ করিতে গেলে মায়াকেই ভাল করে বুঝিতে হইবে। এই মায়া আমাদিগের অতি নিজস্ব জিনিষ।

এই মায়াই বিশ্ব জগতে মহাশক্তি, মায়াই সর্ব্বশক্তিমতী এই মায়ার দ্বারাই সৃষ্টি স্থিতি ও

প্রলয় সংসাধিত হইতেছে। অতি বিকট মূর্ত্তিতে শক্তি, অতি মোহিনী মূর্ত্তিতেও শক্তি, অতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতেও শক্তি, অতি মোহকরী। মূর্ত্তিতেও শক্তির অসংখ্য রূপ। এই নারী শক্তিকে সেই মহাশক্তির প্রতিরূপ বলিয়াই অবগত থাকিবে।

এস কন্যাগণ, এস ভগ্নিগণ, আমরা সাধনার দ্বারা এই আত্মশক্তিকে জাগ্রত করি। এই আত্মশক্তি জাগ্রত হইলে নিখিল বিশ্বে আর আমাদের অপ্রাপ্য কিছুই থাকিবে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ভারত যে উন্নতির শীর্ষ স্থানে ছিল সে স্ত্রী-পুরুষের এই সাধনার বলেই ছিল। এই মহাশক্তিই জ্ঞান বিজ্ঞান দাত্রী ও প্রজ্ঞারূপিণী। সেই সাধনা ভুলিয়াই ভারত এত অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছে—আবার সাধনার আরম্ভ হইলেই মহাশক্তি জাগ্রতা—হইবে সকল দুঃখ কাটিয়া যাইবে।

ভারতে নারীশক্তি জাগ্রতা না হইলে প্রকৃত উন্নতি আসিবে না—এখন কিছু কিছু সূচনা দেখা দিতেছে। এই নারী শক্তিকে ভারত যত দিন হেয় জ্ঞান করিবে, ততদিন দুঃখ কাটিবে না। এই বিশ্ব যে সম্পূর্ণ প্রকৃতিশক্তি প্রভাবেই চলিতেছে—পুরুষ নির্লিপ্ত এ কথা ভুলিলে চলিবে না। নারীর উন্নতি ও নারীজাগরণের সূচনা দেখিয়া আনন্দ হইতেছে। কিন্তু এ শক্তিকে সংযত রাখিয়া সাবধানে চালাইতে হইবে। যেমন অগ্নিকে সংযত ও সাবধানে রাখিয়া ব্যবহার করিলে জগতের মঙ্গল কার্য্য সাধিত হয় কিন্তু অসাবধানে সকলভস্ম স্তূপে পরিণত করে—এ নারী-শক্তিও সেই প্রকারের। সেইজন্য সংযম সর্ব্বত্র আবশ্যক।—শ্রীযুক্তা শকুন্তলা বসু।

সেবা-কর্ম্মী

প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের দুইটি দিক আছে—একটা ধ্বংস-মূলক অপরটি গঠন-মূলক। সংগঠন যদি না হয় তবে শুধু ধ্বংসেরই পরিণাম ফলে একটি জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মুছিয়া যাইবার কথা। যদি সংগঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকে তবে ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের ফলে দেখা যায় যে কোন শক্তিশালী ব্যক্তির উদ্ভব হয়, এবং তাহারই অদম্য শক্তি বলে সেই সমাজ নব কলেবর ধারণ করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। ফরাসীবিপ্লবে এইরূপ হইয়াছিল, এবং সংগঠনের কোনরূপ স্থূল মূর্ত্তি বিশিষ্ট ব্যবস্থা না থাকাতে মহাবীর নেপোলিয়ন অদম্য প্রভাবে নিজ দেশকে পুনর্গঠিত করিয়াছিলেন। বিগত রুষ বিপ্লবেও লেনিনের দ্বারা এইরূপ সংগঠন কার্য্য সমাধা হয়। কিন্তু সকল স্থলে ইহার আবশ্যক হয় না। যে দেশে গঠন মূলক পরিবর্ত্তনের উপযুক্ত সূচনা হয়, সেখানে ঐরূপ মহাশক্তি বীরের আবির্ভাবের আবশ্যক হয় না। যে বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে তাহার মধ্যে ধ্বংস এবং গঠন দুইটি ভাবই বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও বাহ্যতঃ ধ্বংসাত্মক কার্য্যই অধিক হইতেছে। চরকা ও খদ্দরপ্রচলন, আবগারীত্যাগ এবং বিদেশীবর্জ্জন, এবং সত্যাগ্রহের আদর্শ প্রচার করিয়া জাতির গঠন কার্য্য সমাধা হইবে কিনা অনেক স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি এ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। অসহযোগ আন্দোলনের নেতি-ভাবের কার্য্যে লোকের আস্থা অনেকটা থাকিলেও জাতির সর্ব্বস্তরে তাহা প্রবেশ লাভ করে নাই, সে আদর্শে জাতি মজিয়া তাহা নিজস্ব করিয়া লইতে পারে নাই। মহাত্মার প্রভাব যতই প্রবল যতই মহৎ হউক না কেন, স্বদেশীযুগের অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ প্রভাবের স্বাভাবিকতা তাহাতে কম। ইহাতে জাতির নৈসর্গিক অভাবের প্রতীকার অপেক্ষা মহাত্মার

অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাবই অধিক। সেই কারণে জাতি সহজেই তাহা হইতে বিচলিত হইয়া মহাত্মাকর্ত্তৃক রুদ্ধগতি হইয়া পড়িল। দেশবন্ধুর কার্য্যে অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাভাবিকতা ছিল।

আজি মহাত্মার আইন অমান্যরূপ মহাযজ্ঞের শুভাশুভ ফল একবার সুধীজন কর্ত্তৃক ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। ভারতের বিরাট দেহে এরূপ সমগ্রপ্লাবী আন্দোলন এ পর্য্যন্ত কখনও আবির্ভূত হয় নাই। স্বাধীনতালাভের এরূপ অব্যর্থ উপায়ও কখনও আর আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমলাতন্ত্রের শত প্রকারের বাধা সহ্য করিয়া জাতি এপথে ধীরে ধীরে গভীর নিষ্ঠা সহকারে অগ্রসর হইতে পারিবে, তাহাও না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু তবুও একটা কথা আছে। পাশ্চাত্য দেশ হইতে ইংরাজরাজ আসিয়া এ দেশের উপর প্রবল দৈহিক শক্তি, গভীর রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং অন্যান্য বহুপ্রকার ঐশ্বর্য্যের দ্বারা রাজত্ব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে সত্য, কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলা নামে যে প্রভাবের দ্বারা তাহাদের সিংহাসন অটল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ খুব কম। আজ আইন অমান্যের দ্বারা ইংরাজের যে আসন বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে নিশ্চিত, কিন্তু তাহার সহিত দেশে কি অন্য কোন বিপদের আশঙ্কা নাই? উদ্দীপনার প্রভাবে দেশবাসী কি সকলেই অহিংসা নীতিকে রীতিমত অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবে? আইন অমান্য স্বদেশ ভক্তের কাছে যাহা, দুর্ব্বৃত্তের কাছে কি ঠিক তাহাই? দস্যুতস্কর, নারীহরণকারী, এবং অন্যান্য শত প্রকারের দুর্ব্বৃত্ত প্রকৃতি যদি দেশ ভক্তির প্রভাবের মধ্যে না আসিয়া আইন অমান্য করিতে আরম্ভ করে? দেশের মধ্যে যাহাদের সংখ্যার আধিক্য আছে সেই সকল দুর্ব্বলচিত্ত শান্তিপ্রয়াসী জনবৃন্দ সে উচ্ছৃঙ্খল অরাজকতা যদি সহ্য করিতে না পারে! জানি না, যদি এ ভাব খুব বাড়িয়া যায় তবে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব কি দাঁড়াইবে—দেশবাসীর চিত্তে সুপ্ত হিংসা প্রবৃত্তির উদ্রেক হইবার সম্ভাবনার শতবার স্বীকার করিলেও অহিংসার একনিষ্ঠ সাধক দেশে সে উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করিতে দিতে অসম্মত হইয়া কি উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন?

অথচ, ইহার প্রতীকার আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সূচনাতেই তাহার প্রস্তাবনা করা গিয়াছে। বিপ্লবের দুইটি অঙ্গ—ধ্বংস এবং সংগঠন। মহাত্মার কর্ম্মচক্রে দুইটি অঙ্গই সূক্ষ্ম নৈতিক ভাবে সম্পাদন হইতেছে, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু স্থূলদৃষ্টি মানবের কাছে তিনি ধ্বংসকার্য্যেই প্রধানতঃ ব্রতী। এই বিপ্লবের কালে যে সকল দুর্নিবার অশান্তির সৃষ্টি হইবে তাহার জন্য একটা গঠনাত্মক কর্ম্মসূত্রও আবশ্যক। একটা স্থূল বাস্তব গঠনাত্মক অবলম্বন কিছু না পাইলে দেশবাসী ভরসা পাইবে না। যখন নানা উদ্বেগে দেশবাসীকে তাড়না করিতে থাকিবে, তখন তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া, সেবা করিয়া, কর্ম্ম পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার ব্যবস্থা আবশ্যক। তখন "পালিতে শরণ্যে রক্ষিতে কাতরে" একটি কর্ম্মী-সম্প্রদায় আবির্ভূত না হইলে দুর্ব্বল শান্তিপ্রিয় লোকসমূহ আস্থা পাইবে না।

এই কর্ম্মীসম্প্রদায়ের প্রথম কাজ হইবে অহিংসস্বভাব রক্ষা করিয়া ধীর নিশ্চিত ভাবে জাতীয় কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি করা। তারপরে তাহাদের লক্ষ্য হইবে যে স্থানে যত প্রকারের অশান্তির (বিপত্তির) সৃষ্টি হইবে তাহা নিবারণের—প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। সেবার ভাব

লইয়া এই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে। যেখানে যত প্রকার (দুর্ব্বৃত্তাদির লীলাপ্রসঙ্গে) অশান্তি অরাজকতা এবং অত্যাচারাদি হইবে তাহার জন্ত রক্ষীদল গঠন চাই। সংগঠনের সূত্রে আরও অনেক প্রকার কার্য্যেরই আবশুক হইবে। সে সকলই এই সংগঠন-ব্রতী সেবক কর্মীদলকে করিতে হইবে।—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ নন্দী।

সাধনার বাণী

ভারতের-সাধনা শাশ্বত চির পুরাতন এবং নিত্য নূতন। কাল প্রভাবে ইঁহার জ্যোংতির হ্রাস বৃদ্ধি হইলেও ইহা "চিরন্তন" বিকার শূন্ত।

ভারতবাসী আজ কর্ম্ম দোষে নিজ সাধনা হইতে অনেক দুরে সরিয়া পড়িয়াছে, তাই তাহার "সাধনা" ছোট বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কর্ম্ম-পুষ্ট, সাধনা-বলে বলীয়ান ভারত সন্তান কিঞ্চিত অগ্রসর হইলেই দেখিবেন তার "সাধনা" কত বিরাট ও মহান্।

"ভারতের-সাধনা" নূতন সাজে আজ যে মহামন্ত্র লইয়া অবতীর্ণ হইতে চাহে, তাহ বর্ত্তমান এই মুহ্যমান ভারতবাসীর কর্ণে প্রবেশ লাভ করিতেছে কিনা, এ সন্দেহ অবশুই হইয়া থাকে। এখনও ভারতে সেই সাধনার নূতন বীজ বপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ—ভারত ক্ষেত্র মহাকালের তাণ্ডব নৃত্যে ধর্ষিত এবং কর্ষিত হইতেছে মাত্র। ভারত কিন্তু সেই সাধনার শুভ মুহূর্ত্তের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াই আছে—পাছে সেই সাধনামন্ত্রের বীজ সময়ের স্রোতে ভাসিয়া নষ্ট হইয়া যায়, এই জন্ত সর্ব্বকালের বোঝা সকল দুর্য্যোগের সময় সমুদয় ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের মাঝে মহা ভারত আপন জীবনের পর্ব্বে পর্ব্বে বুকের আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়া সময়ে তাহা ভারতের ও জগতের ঘরে ঘরে বিলাইয়া দিবার জন্তই সযত্নে সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছে।

ভারতবাসী স্বতঃশুদ্ধচিত্ত, ত্যাগনিরত, তপঃক্লিষ্ট ঋষির সন্তান; কালপ্রভাবে আজ হৃতসর্ব্বস্ব দুর্ব্বল, অক্ষম এবং হিতাহিত, বিবেচনাশূন্ত হইলেও অচিরকাল মধ্যেই মহাশক্তির উদ্বোধনে সংগঠিত হইয়া সেবাব্রত, অহিংসাচার এবং সাম্য নীতির সহায়ে ঋষিগণ প্রদর্শিত 'সাধন-মার্গে' অগ্রসর হইয়া মুক্তির পথ বাহির করিয়া লইবে—ইহা বিধাতার অমোঘ নির্দ্দেশ।—ওঁ শান্তি! —শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব রায়।

অদ্যকার ভারত

শ্রীযুক্তবাবু দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ

১। জাতি গঠনের প্রধান উপকরণ দুইটি—শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। এই দুইটি আবার আর্থিক অবস্থার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। জাতির উন্নতি বিধানার্থ অর্থনীতি সমস্তার সমাধান অগ্রে আবশুক।

২। ভারতবর্ষ বহুদিন যাবৎ রাজনৈতিক বিষয়ে পরাধীন হইলেও অর্থনীতিক ও সামাজিক হিসাবে তাহার স্বাধীনতা ছিল। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের জন্য তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। পূর্ব্বে এদেশে চাউল আটা ও সরিষার তেলের দর কি প্রকার ছিল এবং ক্রমে ক্রমে ঐ সকল জিনিষের দর যে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা হইতে আর্থিক দুরবস্থা অনুমান করা সহজ হইবে।

সাল	চাউল মণ—সের (প্রতি টাকায়)	আটা মণ—সের (প্রতি টাকায়)	সরিষার তৈল মণ—সের (প্রতি টাকায়
১৭৫০	২—১০	২—১০	০—১০
১৮৫০	০—১৫	০—১৯	০—৫
১৯৩০	০—৫	০—৫	০—১॥

১৮০০ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশে লবণের দর ছিল প্রতিমণ আট আনা কি দশ আনা; আর এখন লবণ ৩৲ টাকা দরে মণ বিক্রী হইতেছে। এক্ষণে কাপড়ের সম্বন্ধে অর্থনীতিক ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা মনে করিতেছি।

৩। জগতে আমেরিকায়ই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তুলা হয়, তৎপরে ভারতবর্ষে। ভারতে এত তুলা হইত যে তাহার তৃতীয়াংশ সমগ্র ভারতবাসীর বস্ত্রের জন্য যথেষ্ট ছিল। তাই ভারতবর্ষ চিরকাল নিজের কাপড় নিজে যোগাইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে কোরিয়া অবধি এবং স্থলপথে পারস্য, প্যালেষ্টাইন, আরব, মিশর, গ্রীস ও রোমে সুন্দর সুন্দর কাপড় সরবরাহ করিয়াছে। Pitt's Despatchএ পাওয়া যায় যে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দেও কোটী কোটী টাকার খদ্দর বিদেশী বণিকেরা বিক্রয়ার্থ তাহাদের দেশে ভারতবর্ষ হইতে লইয়া যাইত ১৮১৪ সালেও কলিকাতার বন্দর হইতে ২॥০ কোটি টাকার কাপড় বিদেশে চালান হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালে বিলাত হইতে ৩৪ কোটী টাকার কাপড় কলিকাতার বন্দরে আসিয়াছে। ইহা হইতেই আমাদের দেশের পূর্ব্বকার মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সচ্ছলতা প্রমাণিত হয়।

৪। পূর্ব্বে সামাজিক জীবনে গ্রাম যে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর ছিল—স্বাধীন-গণতন্ত্রে পরিচালিত সুখের গ্রাম, আদর্শের গ্রাম ছিল, তাহা ১৮৩০ সালের ৭ই নভেম্বরের নথিতে ইংরাজেরাই স্বীকার করিয়াছেন :—

"The village Communities are little republics having nearly every thing they want within themselves and almost independent of foreign relation."

৫। কয়েকমাস পূর্ব্বে দিল্লী নগরীতে সম্মিলিত ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য সভার (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries) সভাপতিরূপে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় ব্যবসায়ী মিঃ জি, ডি, বীরলা যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সুস্পষ্টরূপে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবৃত করিয়া ভারতবর্ষ দিন দিন যে কিরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে এবং ইহার কোন প্রতিকার না হইলে উত্তরোত্তর অবস্থা আরও কিরূপ হীন হইবে

তাহা হিসাব পত্রের দ্বারা দেখাইয়াছেন। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী মহোদয় হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তখন ভারতের বাৎসরিক আয় জন প্রতি ২০৲ টাকা ছিল। কয়েক বৎসর পরে বড়লাট লর্ড কার্জ্জন মহোদয় বলিয়াছিলেন প্রত্যেক ভারতবাসীর জন প্রতি বাৎসরিক আয় ৩০৲ টাকা। বর্ত্তমানে সরকার বলেন ভারতের জন প্রতি বার্ষিক আয় ৫৩৲ টাকা।

৬। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের আর্থিক অবস্থা কত শোচনীয় তাহা নিম্নের স্থচী হইতে প্রতিপন্ন হইবে।

দেশের নাম	বাৎসরিক আয় জন প্রতি পাউণ্ড হিসাবে	বাৎসরিক আয় জন প্রতি টাকা হিসাবে
ভারতবর্ষ	৩॥ (বর্ত্তমান ভারত সরকারের মতে)	৫২॥—৫৩
জাপান	৬	৯০৲
ইটালী	২৬	৩৯০৲
জার্ম্মাণী	৩০	৪৫০৲
ফ্রান্স	৩৮	৫৭০৲
ইংলণ্ড	৫০	৭৫০৲
অষ্ট্রেলিয়া	৫৪	৮১০৲
আমেরিকা যুক্তরাজ্য	৭২	১০৮০৲

উপরি উদ্ধৃত তালিকা হইতে প্রমাণিত হয় জগতের মধ্যে ভারতবর্ষের চেয়ে দরিদ্র আর বোধ হয় কোন দেশই নাই। এই দরিদ্রতার প্রথম কারণ পরাধীনতা এবং দ্বিতীয় কারণ ভারতবাসীদিগের অলসতা ও অকর্ম্মণ্যতা।

৭। জাতির ধনবৃদ্ধির মাত্র দুইটি পথ আছে—বাণিজ্য ও চাকুরী। ইহাদের কোনটাতেই ভারতবাসী বর্ত্তমানে অর্থোপার্জ্জনের স্থবিধা করিতে পারিতেছে না। চাকুরী হিসাবে ধরিতে গেলে সরকারী বড় বড় চাকুরী প্রায় সকলই বিদেশীয়ের হাতে—যদিও আজকাল সরকার ২।৪টী বড় চাকুরীতে দেশীয় লোক নিয়োগ করিতেছেন। বাস্তবিক নিজেদের দেশে আমরা কুলি মজুরের মতই জীবন কাটাইতেছি। তাই দুঃখের সহিত কবি গোবিন্দ দাস গাহিয়াছেন :—

"স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে
এদেশ তোদের নয়"।

৮। ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের ঐশ্বর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও আকবর বাদসাহের আমলে ভারত যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিল তাহা পরবর্ত্তী সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনীতে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে চারিশত দাড়িপাল্লা সংগ্রহ করিয়া আগ্রার রাজকোষের স্বর্ণ পাঁচ মাসকাল অনবরত ওজন করিয়াও উক্ত রাজকোষের স্বর্ণ ওজন করা শেষ হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

নিরুদ্দেশ যাত্রা

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ শেঠ

পাণ্ডব কৌরব যখন যুদ্ধের জন্য সমবেত, গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, ঠিক সেই সময়ই অর্জ্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ বিচার করিতে বসিলেন স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম কি? সেই কারণে আজ যদি আমাদের জনগণ মতের গতি ও লক্ষ্য কোন পথে তাহার আলোচনা করিতে বসা যায় তাহা যে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে তাহা মনে হয় না। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা একটা না একটা কার্য্যে দেশের কার্য্য করিতে অগ্রসর। শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালীও সাহায্য করিয়াছিল। একদিক দিয়া দেখিলে মনে হয় যে দেশ যেন আজ নড়িবার চড়িবার আনন্দ উপভোগ করিতেছে, নিদ্রার ঘোর কাটাইবার জন্য হাত পা নাড়িতেছে। ভাবের দিক দিয়া আমাদের একটা আত্মাভি-মান সন্তোষ লাভ করিতেছে। আর একদিক দিয়া দেখিলে মনে হয়—কিন্তু করিতেছে কি, চলিতেছে কোথায়, গতি কোন্ লক্ষ্যাভিমুখী, শক্তি উন্মার্গগামিনী কিনা—এই সকল সন্দেহ যাহাদের মনে উঠিতেছে তাহাদের কথা কি ফেলিয়া দিতে পারা যায়?

আমরা জানি কংগ্রেস বলিয়া দিয়াছে ইংরেজ প্রাধান্য বর্জ্জিত স্বাধীনতাই ভারতবাসীর লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য উপায় নির্দ্ধারণ হইয়াছে আইন অমান্য আন্দোলন। কংগ্রেসের মতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা এক ধাপ তফাৎ। কংগ্রেস বহুদিন ধরিয়া ঐ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনই লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছিল; বৎসরের পর বৎসর রাজনীতির গতিতে রাজশক্তি সেই লক্ষ্যে পৌঁছিয়া দিবার কোনই আয়োজন উদ্যোগ করিল না দেখিয়া লাহোরে ৭ মাস পূর্ব্বে ভারতের শত শত প্রতিনিধি ঠিক করিয়াছেন যে ইংরেজের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আমরা আমাদের স্বতন্ত্র শাসন সংস্থান গড়িয়া তুলিব। এই কথা পাড়িয়া যাঁহারা দেশের গতি ও লক্ষ্য ঠিক আছে এই ধারণা করিতে বলিবেন তাঁহাদেরই বিবেচনা করা উচিত—সত্যই কি গতি ও লক্ষ্য ঠিক আছে।

হঠাৎ কেহ হয়ত বলিবেন যে আমরা চাই গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্র কি ও তাহার যন্ত্রটা কি, তাহার সহিত জনমনের ও জনজীবনের সম্পর্ক ও সংশ্রব কি তাহাও ত বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাহা দেখিতে বা ভাবিতে গেলেই দেখা যায়, আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন যাঁহারা করিয়া বেড়ান তাহাদের জ্ঞান ও ধারণা এই সম্বন্ধে যথার্থ ও সত্যোপলব্ধ সঠিক কিনা সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বর্ত্তমান। আর যদি সেই জ্ঞান ও ধারণা যথার্থ ও সত্যোপলব্ধ না হয় তবেই আমাদের বর্ত্তমানের আন্দোলনের গতি ও লক্ষ্য যে ঠিক হয় নাই তাহাও সুনিশ্চিত।

আর একবার বলা ভাল যে দেশের যে তমসাচ্ছন্ন বিমূঢ়তা তাহা হইতে যে কোনও চাঞ্চল্য বা অবস্থান্তর ঘটে তাহা শুভ—কেন না মৃতবৎ বা মৃতপ্রায় রোগী যখন চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখে, হাত পা একটু নাড়িতে থাকে, তখন যে তাহার গতপ্রায় জীবনীশক্তি পুনরুদ্দীপিত হইতেছে তাহার লক্ষণ সূচিত হয়। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই ভাবিতে হয় রোগী কি করিয়া, কোন্ সাবধানতার সহিত পুনরায় সুস্থ ও স্বস্থ হইয়া উঠিবে।

আমাদের রাজনৈতিক নেতাদিগের মতে আমরা চাই—বরাবর চাহিতেছিলাম ডমিনিয়ন ষ্টেটস—আর তাহা না দিলে চাই একেবারে স্বাধীনতা; কিন্তু যাহা কিছুই চাহি না কেন—আমাদের সঙ্গে ইংরেজের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে একটা বৈঠকে বসিতেই হইবে। বৈঠক যখন বসিবে তখন ইংরেজ কি বলিবে তাহার জল্পনাও করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইংরেজ তাহার অর্জ্জিত সাম্রাজ্য যে বদান্যতার খাতিরে ছাড়িয়া দিবে না এটা ত নিশ্চিতই। তবেই এখন বিচার্য্য বিষয় হইতেছে ডমিনিয়ন ষ্টেটস বা ঔপনিবেশিক অধিকার।

এই ঔপনিবেশিক অধিকার জিনিষটা কি? ১৯২৬ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা বৈঠক বসে। তাহাতে ইংলণ্ড ও উপনিবেশগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের একটা সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ হয়। ডমিনিয়ন অর্থে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বাধিকারভোগী জনসংঘ, মর্য্যাদায় সমভূমে অবস্থিত, অন্তর্ব্যবস্থা বা বহির্ব্যবস্থায় কেহ কাহারও কোনও প্রকারে অধীন নহে, রাজ মুকুটের প্রতি সমশ্রদ্ধাপূর্ণ বলিয়া একসূত্রে গ্রথিত এবং ব্রিটিশ জাতি সংঘের স্বার্থ-সমবায়ে স্বাধীনভাবে সম্মিলিত। (১)

ভারতবর্ষকে যদি স্বাধিকার ভোগী জনসংঘ হিসাবে ধরিতে হয় তবে কেবল যে ইংলণ্ড মত দিলেই চলিবে-তাহা নহে। ঐ স্বার্থ-সমবায়ে যে কয়টী ডমিনিয়ন আছে তাহাদের সকলের মত থাকা আবশ্যক। যে সংজ্ঞায় উহারা পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ সেই সংজ্ঞায় ইংলণ্ডের অধিকারের সহিত প্রত্যেক অংশীদারের অধিকার তুল্য। কাজেই ইংলণ্ড যাহাকে ডমিনিয়ন বলিতে চাহিবে অপর সকল ডমিনিয়নও যদি তাহাকে ডমিনিয়ন বলিতে না চাহে তবে যাহাকে তাহাকে ঐ স্বার্থসমবায়ে তুল্যাধিকার দান করা চলে না। ভারতের পক্ষে ডমিনিয়ন বলিবার ইহা একটী দুর্লঙ্ঘনীয় অন্তরায়।

আরও একটী প্রকাণ্ড অন্তরায় বর্ত্তমান আছে। autonomous communities বা স্বাধিকার-ভোগী জনসংঘ লইয়া ব্রিটিশ সমবায় গঠিত। ইহার ভিতর রক্তের সম্পর্ক, ইতিহাসের সম্পর্ক, ধর্ম্মাচরণের সম্পর্ক, সমাজশৃঙ্খলার সম্পর্ক, শিক্ষাদীক্ষার সম্পর্ক ও সাধনধারার সম্পর্ক সমস্তই মানিয়া লইয়া এই ব্রিটিশ জাতি সমবায় গঠিত। যেখানে সেই সম্পর্ক নাই, সেখানে কোন সূত্রে সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে, আর যাহারা সম্পর্ক রাখে তাহা গড়িতে দিবেই বা কেন? ভারতবাসীর রক্ত কালা আদমির রক্ত, ইতিহাস নাই বলিয়াই আজকাল আমাদের স্কুল কলেজে ছাত্ররা ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের ইতিহাসকেই ইতিহাস বলিয়া জ্ঞান লাভ করে, ধর্ম্মাচরণ ত কুসংস্কার মাত্র, সমাজ ত বর্ব্বরোচিত, শিক্ষা দীক্ষা সবে মাত্র ১১৫ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে; সাধন ধারা যাহারা লাট বেলাটের সহিত কর মর্দ্দন করে তাহাদের মধ্যেই বর্ত্তমান—আর তাহাদের সংখ্যানুপাত শতকরা ২এর অধিক ধরা যায় না। কাজেই এ হেন জনসংঘকে স্বাধিকার দিতে কোন্ সভ্য জাতি পারে? অষ্ট্রেলিয়া, কানেডা প্রভৃতির ভারতের লোকের প্রতি যে ভাব ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছে,

---

(১) "They are autonomous communities within the British Empire, equal in status, in no way subordinate to one another in respect of their domestic or external affairs, though united by a common allegiance to the Crown, and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations."

তাহাতে ইহা মনে করা বাতুলতা মাত্র যে তাহারা কোনও দিন ভারতের সহিত তুল্যাধিকারের ভ্রাতৃসূত্রে গ্রথিত হইতে রাজি হইতে পারে।

ঠিক এই দুই কারণে বিলাতের "ডেলীমেল" পত্রিকায় আলোচনা হইতেছে যে গোলটেবিল বৈঠকে প্রত্যেক ডমিনিয়নের প্রতিনিধিকে নিমন্ত্রিত করা উচিত—সাম্রাজ্যের সমস্ত ভবিষ্যৎ যে বৈঠকে বিবেচিত হইবে তাহা হইতে প্রধান ডমিনিয়নদের দূরে রাখা উচিত নহে।

কাজেই বাস্তব লইয়া যদি বিবেচনা করিতে হয় তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে ভারতের পক্ষে ডমিনিয়ন ষ্টেটস পাওয়াও অসম্ভব। এইখানেই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে ভারতের চাপের ঠেলায় অসম্ভব সম্ভব হইবে। যাহারা এই কথা বলে তাহারা ভাগীরথীর স্রোতে ঐরাবতের ভাসিয়া যাওয়ার গল্পও আবৃত্তি করিতে পারে। কিন্তু যাহারা এই সকল ভাবের কথা কহে, তাহারাই কার্য্যের দ্বারা প্রমাণ করে যে কোনও ভাবকে তাহারা ধারণা করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না। কংগ্রেসের প্রস্তাব পাশ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ধাপ গণিয়া উঠা, অহিংস নীতির গণ্ডীতে ধৈর্য্য সহগুণের শিক্ষানবিশী, ঠিক ভাবের কথা নহে, বরং হিসাবি খতিয়ানধারী বুদ্ধি জীবীর কথা। কাজেই আমরাও হিসাব খতিয়ান ধরিয়া বিচার বিবেচনা করিতেছি। আমরা

নারদ কীর্ত্তন পুলকিত মাধব বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া
ব্রহ্ম কমণ্ডলু উচ্ছলি ধূর্জ্জটী জটিল জটাপর ঝরিয়া

যে স্রোত প্রবাহিত হয় তাহা শিরে লইয়া "পাপহারি পুনাতু মাম্" বলিয়া গললগ্নী কৃতবাসে প্রার্থনা করিয়া থাকি। পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করান যিনি, মূককে বাচাল করান যিনি তাঁহার চরণারবিন্দকে সার করিতে যেন কখনও বিস্মৃত না হই। কিন্তু কথা হইতেছে কি, রাজনীতির হিসাবনিকাশে জমা খরচ খতাইয়া বিবেচনা করিতে হয়। ঠিক সেই হিসাবেই ডমিনিয়ন ষ্টেটস অসম্ভব।

তবে সম্ভব কি? সম্ভব ভারতবর্ষের একটা প্রতিনিধি সংস্থান মঞ্জুর হওয়া মাত্র। ইংরেজ সওদাগরের ব্যবসা বজায় রাখিয়া, ইংরেজ সিভিল সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিসের অধিকার অটুট রাখিয়া, ইংরেজ কর্ত্তার ফোঁপলদালালির সুযোগ সুবিধা ক্ষুন্ন না করিয়া, এ দেশের ভোটাভুটীর দলাদলির সাহায্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন দ্বারা যতটা এ দেশের মত জাহির হইতে পারে তাহার ঢাক পিটাইয়া এমন কোনও সংস্থানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব যাহাতে এ দেশের হৈ চৈ কারীদের মনে ধারণা জন্মে যে একটা কিছু হইতেছে। ধরিয়া লওয়া যাউক যে সেটা পার্লেমেণ্টের অনুরূপ একটা সভা সংগঠন এবং প্রদেশে প্রদেশে তদনুরূপ ক্ষুদ্র সভার অনুষ্ঠান। ভুলিলে চলিবে না যে দিল্লীর ব্যবস্থা পরিষদকে ভারতের পার্লেমেণ্ট বলিয়া একটা ধাপ্পার সৃষ্টি বহুদিন হইতে চলিয়াছে। এবং সেই মোহে স্বনামধন্য বিঠ্ঠল ভাই পেটেল নিজেকে পার্লেমেণ্টের স্পীকার বা সভাপতি মনে করিয়া অনেক কাণ্ডই করিয়াছেন। তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্য যে অধিকারপ্রমত্ততার লক্ষণ তাহা সাইমন কমিশনের সদস্যরা বুঝাইবার জন্য ব্যস্ত। তথাপি ধরিয়া লওয়া যাক্ যে ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রসংস্থানে ভারতের জনগণপ্রতিনিধি লইয়া একটী সভা হইবে এবং তাহা পার্লেমেণ্ট সভার অনুকরণে একটি ভারতীয় সংস্করণ স্বায়ত্ত্ব শাসন সভা।

কাজেই জানিতে ও বলিতে ইচ্ছা করে এ হেন যে পার্লেমেণ্ট সভা তাহারই বা সার্থকতা কি?

প্রথমেই জিজ্ঞাস্য এই—প্রতিনিধি সভায় যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তাহার মূলসূত্র হইল যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই কাজে লাগাইতে হইবে। সম্প্রতি জর্ম্মাণ লেখক স্যর লেনার্ড নেলসন "রাজনীতি ও শিক্ষা" বিষয়ক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা তুলিয়াছেন—"একটী ব্যক্তি বিশেষের অত্যাচারের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার এমন কি বেশী সুবিধার কথা"। (২)

এই অত্যাচারের কথা জন ব্রাইট জনমর্লিকে বলিয়াছিলেন। ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটের মন্ত্রিসভা দেখাইয়া তিনি বলেন—"এই দেওয়ালের ভিতর যত অপরাধ ও প্রমাদ করা হইয়াছে, ব্রিটেনে অন্য কোথাও তত হয় নাই"। (৩)

সম্প্রতি হ্যামিল্টন ফাইফ নামে এক লেখক "শাসন তন্ত্রের ভবিষ্যৎ" (৪) সম্বন্ধে এক পুস্তিকায় এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া পার্লেমেন্টের অধোগতির কথা স্পষ্টই স্বীকার করেন। তিনি স্পষ্টই বলেন রাজনৈতিক নীচতার একমাত্র কারণ হইল Party system বা দল বাঁধা। দলবাঁধার হেতুতেই হাউস অফ কমন্‌স্ আজ দেশের প্রকৃত শাসক নহে। যে দল যখন শাসনভার গ্রহণ করে সেই দলের দল-বাঁধার ও নিয়ন্ত্রণ করিবার যে অদৃশ্য যন্ত্রটী আছে তাহাই দেশকে শাসন করিতেছে। পার্লেমেন্টের সভ্যদের আলোচনায় উপস্থিত থাকিবার আবশ্যকতা নাই, কেবল যখন ভোটের ঘণ্টা বাজে তখন শুনিতে পাইলেই হইল। যখনই দেখা যায় যে দলছাড়া ভোট দিবার সুবিধা দেওয়া হয় তখনই আলোচনার মর্য্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। দলাদলি যে একটা আধুনিকতম অত্যাচার তাহার উদাহরণ স্বরূপ লেখক বলেন যে ১৮৩২ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নয়বার মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহাদের সমর্থকদিগের দ্বারা ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু ১৮৭৪ অব্দের পর মাত্র একবার এই ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহার ফলে সদস্যরা নিজেদের কার্য্যে শ্রদ্ধা হারাইয়াছে, আত্মসম্মান হারাইয়াছে এবং দেশ পার্লামেন্টের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে।

ইহা যে কেবল বিলাতের দলবিশেষের কথা তাহা নহে বা কোনও উদ্দাম সংস্কার কামীর (radical) মত নহে। লণ্ডনের "ইংলিশ রিভিউ" রক্ষণশীলদলের মাসিক পত্রিকা। এই জুলাই মাসের পত্রিকায় এই বিষয়ে তিনটী প্রবন্ধ আছে।

সার্জ্জেণ্ট সলিভান বিখ্যাত ব্যবহারজীবী "পার্লেমেন্টের সংস্কার" বলিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "অদৃষ্টের পরিহাসে যেখানে জাতীয় অস্তিত্বের সত্য কথা ঘোষিত ও আলোচিত হইবার কথা সেই পার্লেমেন্ট নামধেয় স্থান হইতেই অপ্রীতিকর সত্যকে বহির্ভূত করা হইয়াছে" (৫)।

(২) What advantage is there in being oppressed by a majority as compared with oppression by an individual ?

(৩) More crimes and blunders had been committed within its walls, than in any other place in Great Britain.

(৪) "Archon or the Future of Government" by Hamilton Fyfe.

(৫) "There is only one place from which enunciation of unpleasant truth

কিন্তু পার্লেমেণ্ট সভায় এককালে যথার্থ বিচার আলোচনা হইত। তবে এই দুর্নীতির মূল কি? সার্জেণ্ট সলিভান বলেন—"আয়র্লণ্ডের দলবাঁধা হইতেই মস্তিষ্ক চর্ব্বণ আরম্ভ হইল"। ইহা ১৮৮৫ সালের কথা। "মনোনীত সদস্যকে ঐ দলের এইরূপ অঙ্গীকার পত্র সহি করিতে হইত যে একসঙ্গে বসিবে, কাজ করিবে ও ভোট দিবে।" ঐ আইরিশ দলের একটা অংশ রথো জনতার ব্যবহার দ্বারা শিক্ষিত লোককে দলের বাহিরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। "বর্ত্তমান দলবাঁধার বন্দোবস্তে অতি অল্প লোকই কথা কহিতে পায়; বক্রী সকলকে ভোটার সন্তুষ্টির জন্য প্রশ্নাবলীর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সময় কাটাইতে হয়, আর ভোট দিবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়" (৬)।

ইনি বলেন যে পার্লেমেণ্টের ইজ্জৎ নষ্ট হইয়াছে দুইটী কারণে—ইহার সদস্য সংখ্যা বাড়াইয়া আর দলের শৃঙ্খলে সদস্যদিগকে দাস করিয়া! কিন্তু সদস্য সংখ্যা কমাইতে গেলে ভোটের স্থানীয় পরিমাণ (Constituency) বাড়াইতে হয়। বর্ত্তমান স্থানীয় পরিমাণেই নির্ব্বাচন ব্যাপার খুব ধনীরও পয়সার খেল দাঁড়াইয়াছে। আবার পরিমাণ বাড়াইলে তাহা দলো যন্ত্রের ক্ষমতা আরও বাড়াইয়া তুলিবে। সদস্য সংখ্যাধিক্যও একটা কু এবং দলো যন্ত্রও একটা কু কিন্তু দলো যন্ত্রের কু-টী অধিকতর ভয়ানক। কাজেই দেখা যাইতেছে সদস্য সংখ্যা এখন ৬০০; এই ৬০০ পুত্তলিকার সংখ্যা কমান একরকম অসম্ভব অপর দিকে মত-স্বাধীনতা বিপন্ন। "দলের অত্যাচারের পিছনে অজ্ঞ মূর্খ লক্ষ লক্ষ লোকের অত্যাচার, যাহাদিগকে ক্রমাগত আকাশের চাঁদ দিবার প্রলোভন দিবার টক্করা টক্করিতে দুর্নীতি-পরায়ণ করিয়া তোলা হইয়াছে" (৭)। লেখক স্পষ্টই বলেন যে পার্লেমেণ্টের ৬০০ সদস্য কোনই দরকার নাই; তাহারা নিজেদিগকে ৩৪টী দলে ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে ১০০।১৫০ সদস্য হইলেই যথেষ্ট। তিনি চাহেন ভোটের স্থানীয় পরিমাণ কাজ কর্ম্মের স্থানে (সহরে) আবদ্ধ রাখিয়া প্রতিনিধিত্বের যথার্থ্য জানাইয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ স্থানীয় পরিমাণ বাড়ানও যেমন কুফল আনে, সদস্যের সংখ্যা বাড়ানও তেমনি কুফল আনে। পার্লেমেণ্টের প্রতিনিধি-শাসন-ক্ষমতা সত্য ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে এই দুই কুফল প্রতিরোধ করিতে হইবে।

পাঠকগণ মনে রাখিবেন সাইমন সপ্তক স্থানীয় পরিমাণও অধিক করিতে বলিয়াছেন এবং সদস্য সংখ্যাও বাড়াইতে বলিয়াছেন। হয় সার্জেণ্ট সলিভান মূর্খ, নয় সাইমন সপ্তক—কি?

---

is barred, and that place is ironically named the Parliament, the place where truths affecting the national existence are supposed to be proclaimed and discussed."

(৬) "Under the present party system only a few men are allowed to address the house; the rest have to waste their time addressing questions to Ministers, in order to amuse constituents, and awaiting orders to vote."

(৭) The tyranny of the party is reinforced by the tyranny of the millions of ignorant people who have been utterly demoralised by competitive assurances that government can give everybody everything he likes."

পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনটী প্রবন্ধ আছে। ডারহামের বিশপ দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ব্রিটিশ "লজ্জারণি"। "লজ্জারণি" কথাটা ইতালীয়। নেপলসের একটী নীচশ্রেণী। তাহারা রাস্তার রাস্তায় ঘুরিয়া সুদ কাড়িয়া বা ভিক্ষা করিয়া খায়! ব্রিটেনে বেকার সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। বেকার সংখ্যা বর্ত্তমানে সাড়ে সতের লক্ষ, তারের খবরে প্রকাশ বিশ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে।

সলিভান এই বেকারের কথায় লিখিয়াছেন পার্লেমেণ্টের কোনও সদস্য ভোটারদিগকে বলিতে সাহস করেন না যে ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগকে বাঁচিতে হইলে আরও অধিক কাজ করিতে হইবে এবং আমোদ প্রমোদে আরও কম খরচ করিতে হইবে। * * সমস্ত দলো সভাসমিতি সাধারণকে একসুরে জানাইতেছে যে বারফটকা খরচ বাড়াইয়া আর শ্রম কমাইয়া রাষ্ট্র আরও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

ডারহামের বিশপ ইহার ফল বর্ণনা করিয়াছেন। বেকারগুলি ভিক্ষা পাইয়া অলস হইয়া উঠিতেছে, আত্মসম্মান হারাইতেছে, কার্য্যের প্রবৃত্তি লোপ হইতেছে, বৃত্তির সহিত ভিক্ষার বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে, ভবিষ্যৎ যুবক যুবতীর ইহপর কাল নষ্ট করিতেছে, সমাজের আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত হইতেছে। বেলা ১১টা পর্য্যন্ত যুবকরা ঘুমায়। একটা শ্রেণীই তৈয়ারী হইয়াছে যাহারা অলসতাকেই চলতি অবস্থা মনে করে, কাজ কর্ম্ম যেন বিশেষ বিধি। (৮)

সলিভান বলেন যে, ভোটাররা ইহাই চায়। সকল দলই ভিক্ষার মাত্রা বাড়াইয়া দেয় ও কাজ কর্ম্মে নিরুৎসাহ দেয়। (৯)

ডারহামের বিশপ দুঃখ করিয়াছেন যে যখন ব্রিটিশ রাষ্ট্রে নিছক পূর্ণ গণতন্ত্র জয়লাভ করিল তখনই কিনা ব্রিটিশ "লজ্জারণি"র প্রকট হইল।

তৃতীয় প্রবন্ধ—"বর্ত্তমান গণতন্ত্রের উদ্ভব" লইয়া লিখিত। লেখক মাননীয় ষ্টিফেন কোলরিজ বলেন খৃঃ ১৮৭০—৭৫ সময়ে পার্লেমেণ্টের এমন হীনতা ছিল না; তখনকার আন্দোলন আলোচনা জগৎ সমক্ষে ইংলণ্ডের ইজ্জৎ দান করিত। কিন্তু আজ?

প্রত্যেক দল ভোটারদের কিছু পাওয়াইয়া দিতে চায়। এই ভোটারদের প্রত্যেক বিশটীর ভিতর তিনটী মাত্র টেক্স খাজনা দেয়। কাজেই দিতে হইলে বন্দোবস্ত এই রকম দাড়াইয়াছে যে ঐ তিনটীকে সদস্যের বাৎসরিক ৪০০ পাউণ্ড যোগাইতে হইবে আর বক্রী ১৭টীর সুখ সুবিধার ভিক্ষাও যোগাইতে হইবে। রাজনীতির দৃষ্টিতে এমন কিছুই দেখা যায় না যাহাতে অল্প সংখ্যকের সাংঘাতিক লুঠ ও বহুসংখ্যকের কাঙ্গালকরা বন্ধ করা যায়। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম প্রথমে ঐ তিনজনের সর্ব্বনাশ তারপর বক্রী সতের জনেরও তাহাই। (১০)

---

(৮) "There is growing up a class which regards work as an exception, idleness as the normal state"

(৯) "What the electorate would like is still more doles and still less work......all parties will go on increasing doles and discouraging work."

(১০) There is nothing in sight politically that can stem this disastrous robbery of the few to pauperize the many. * * * Total irremediable ruin, first of the three electors, and then of the other seventeen.

ইহার পর লেখক ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গূঢ়নাশের (১১) উদাহরণ দিয়াছেন। যখন তখন ইহাদের আমলা কোথাকার একটা কানুন বা বাই-ল ধরিয়া যাহার তাহার উপর হুকুম জারি করিতেছে। আজ এর বাড়ীর পুকুরের জল উঠাইয়া ফেল, কাল উহার বাগানের গাছ সব নির্মূল কর এইরূপ রকমওয়ারি অত্যাচার চলিতেছে।

"যতদিন না বর্ত্তমানের গণতন্ত্র আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছে ততদিন পুরুষানুক্রমে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই এদেশের প্রত্যেক লোকের গর্ব্বের কথা ছিল। একজন আধুনিক প্রধান মন্ত্রী এই দেশকে বীরের বাসযোগ্য ভূমি করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে আমরা এমন একটা দেশ পাইয়াছি যেখানে স্বাবলম্বী থাকাই অপরাধ আর সম্পত্তি থাকা দণ্ডনীয় অপরাধ"। (১২)

এখন আমার পাঠকবর্গকে জিজ্ঞাস্য—এ হেন পার্লেমেণ্ট কি আমাদের দেশের লক্ষ্য না আদর্শ? উদ্ধৃত কথাগুলি আমাদের নহে, যে দেশের ব্যথা সেই দেশেরই কথা। তথাকার চিন্তাশীল মনস্বীরা সমস্যা পূরণের হদিশ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। মনে রাখিতে হইবে যে আধুনিক গণ-তন্ত্রের প্রধান সভা হইল পার্লেমেণ্ট—পার্টি বা দলের প্রাধান্য এই অনুষ্ঠানের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। দার্শনিক এমারসন প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন যে ইংরাজের রাজ-নৈতিক ব্যবহার কোনও সাধারণ সত্য লইয়া নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হয় না বরং তাহার মূলে থাকে অন্তর্নিহিত যোগাযোগ ও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ। (১৩)
মার্কিন দেশেও ব্যক্তিমাত্রই দলকে নিয়ত কলঙ্কিত করিতেছে। (১৪)
ইউরোপে বহুদিন পূর্ব্বে ইতালীর মন্ত্রদাতা ম্যাট্সিনি যে সাবধান বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহা যদি ইউরোপ ও ইংলণ্ড বুঝিত তবে আজিকার অবস্থার প্রতিবিধান বহুপূর্ব্ব হইতেই করিতে পারিত। তিনি বজ্র গম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন যে "ঐহিক স্বার্থ ও ক্ষুদ্র দলের খাতিরে যদি জীবন যাত্রা কর তবে তোমাদের ভিতর সহস্র সহস্র যথেচ্ছাচারীর উদ্ভব হইবে"। তাই আমাদের পাঠকবর্গকে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি ইহাই কি আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ ও আন্দোলনের লক্ষ্য?

একটা কথা মনে রাখিতে যে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট মহাসভা ইংলণ্ডের সজীব জনমতে ভাঙ্গিয়া

---

(১১) Subtle destruction of personal freedom.

(১২) "Personal freedom was every man's pride for generations, until this democracy rose upon us. One of our modern Prime Ministers promised us all a country fit for heroes to live in, but what we are getting is a place where to be independent is an offence and to own property a crime."

(১৩) Their poltical conduct is not decided by general views, but by internal intrigues and personal and family interests.

(১৪) A party is perpetually corrupted by personality.

চুরিয়া আবার সুস্থ সবল হইয়া উঠিতে পারে এবং আমার বিশ্বাস উঠিবে। কেন না ইংলণ্ড দলাদলি বা সাময়িক দ্বন্দ বিরোধে যতই সংঘর্ষ-মত্ত হইয়া উঠুক না কেন, তাহার সমস্ত স্বার্থের সমন্বয় সূত্র সে ভুলিবে না। উপরোক্ত তিনটী প্রবন্ধের মধ্যে সার্জেণ্ট সলিভান পার্লামেণ্টকে ঢালিয়া সাজিবার পরামর্শই দিয়াছেন এবং কালে ঢালিয়া সাজিবার বীরের অভাব ঐ দেশে হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইংরেজের স্বাজাত্য-বোধ, জাতীয় আত্ম সম্মান জ্ঞান, উপস্থিত বুদ্ধি ও সমন্বয় সূত্রের প্রতি শ্রদ্ধা তাহাকে পার্লামেণ্টকে ঢালিয়া সাজিবার পথ দেখাইয়া দিবে। যে সকল সমাজ তত্ত্ব বিদ্‌গণ পার্লামেণ্টের তথা গণতন্ত্রের এই সমস্ত গলদ বুঝিতে পারিতেছেন তাহারা ক্রমে ক্রমে মত পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিত দিতেছেন। যুদ্ধের পরই এম পি ফলেট নামক একজন লেখক সামাজিক সংঘ শক্তিতে ছোট ছোট সমষ্টি বন্ধনই রাষ্ট্রোন্নতির পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৯২৬ সালে হবসন এই সামাজিক ক্ষুদ্র সঙ্ঘ বন্ধনের শান্তিপূর্ণ পন্থা ও স্বাধীন মত প্রচার সৃষ্ঠু সাধন বলিয়াছেন। ১৯২৯ সালে অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজের মাষ্টার এ, ডি, লিণ্ডসে রাজনীতির বহির্ভূত সভা সমিতি দ্বারাই প্রকৃত নিঃস্বার্থ জনমত সৃষ্টি হইতেছে বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

এই সকল চিন্তাধারা দ্বারা ইহাই মানা উচিত যে আমরা কংগ্রেস মারফত আমাদের জাতীয় দাবি বলিয়া যাহা জগতে ঘোষণা করিয়াছি, তাহা দ্বারা আমরা পরের সোণা কানে দিবার লোভ মাত্র দেখাইয়াছি কি না তাহা বোধ হয় বিবেচনা করি নাই। নেহেরু রিপোর্ট বলিয়া যাহা প্রচারিত তাহার সহিত ভারতের ঐতিহাসিক পারম্পর্য্যের কোনই সম্পর্ক নাই—তাহা কানেডার রাষ্ট্রতন্ত্রের নকলনবিশী কাগজে কলমে মক্স করা একটা প্রবন্ধ মাত্র। আর সাইমনি জল্পনা কল্পনা হইল জাতির স্বচ্ছন্দ-সংঘশক্তির অন্তরায় সৃষ্টি করিবার একটা অমানুষিক চেষ্টা মাত্র। এই সমস্ত কেতাবতি মস্তিষ্ক-কসরৎ যদি কেতাবেই নিবদ্ধ থাকিত তবে আলোচনার বিশেষ কোনও আবশ্যক থাকিত না। কিন্তু আজ সমগ্র দেশে সহস্র সহস্র লোক কারাবরণ করিতেছে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে এমন লোকেরও অভাব নাই, দৈন্য দুর্দ্দশার হাহাকারে আকাশ পবন মুখরিত, বেদনার ভারে সমস্ত জাতি পর্য্যুদস্ত, লাঞ্ছনার অপমানে লোক ক্ষিপ্তপ্রায়, আজ কি ভাবিবার সময় আসে নাই—ভারতের ভাগ্য বিধাতার অঙ্গুলী নির্দ্দেশে অমাবস্যার ঘনঘোর তমিস্রা ভেদ করিয়া ক্ষণপ্রভার আলোকে দিঙ্ নির্ণয় করিতেছে কি না?

অধিকাংশ ইংরাজী শিক্ষিতের ধারণা যে রাষ্ট্র সম্বন্ধে ভারতের ঐতিহাসিক পারম্পর্য্যে যাহা আছে তাহা গণতন্ত্রের অনুকূল নহে। অথচ ইতিপূর্ব্বে ফাল্গুন মাসের পত্রিকায় দেখাইয়াছি যে পাণিনির সময় হইতে এদেশে গণতন্ত্র বর্ত্তমান ছিল। তাহা ঠিক আজকালকার মত মাত্র দেশভাগে নিবদ্ধ ছিল না, বেশীর ভাগ গুণ ও কর্ম্ম ভেদে তাহার শ্রেণীবিভাগ ও কর্ত্তব্যাধিকার-বিভাগ ছিল। রাষ্ট্রের কর্ম্মকৌশলের জন্য দেশভাগেও নানা প্রকার গণপতি ছিল। শুক্রাচার্য্য দশ গ্রামের অধিপতিকে নায়ক বলিয়াছেন, শত গ্রামের অধিপতিকে সামন্ত বলিয়াছেন, অযুত গ্রামের অধিপতি আশাপাল ও স্বরাট ছিলেন। মনুর সময় একশত গ্রামের অধীনে সৈন্যগুল্ম প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। নির্ব্বাচনে চারিজন ব্রাহ্মণ, আট জন ক্ষত্রিয়, একুশ জন বৈশ্য, তিন জন

শূদ্র ও এক জন সূত ইহারা অমাত্য হইতেন। পরন্তু রাজার খাস মন্ত্রিসভা চারি জন ব্রাহ্মণ, তিন জন শূদ্র ও এক জন সূত লইয়া গঠিত হইত। বলা বাহুল্য রাষ্ট্রের এই ব্যবস্থা হিন্দু আমলের হইলেও মুসলমান সম্রাটগণ গ্রাম জনপদে ঐ ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। তাহার ফলে আকবর বাদশাহের আমলে আইনী আকবরীতে ভারতের অতুলনীয় সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। আর ইংরাজ আগমনের পরও সেই সমৃদ্ধির কথা জগতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। অনেকেই হয়ত বলিবেন যে ঐ সমৃদ্ধি ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই। পারে নাই—ইহাও যেমন কঠোর সত্য, পার্লেমেণ্টের অনুরূপ লোকমত প্রতিনিধির রাষ্ট্রীয় সংস্থান সংগঠনও পারিবে না ইহাও তেমনি কঠোর সত্য। যাহারা ভারতের কোটি কোটি টাকায় দেশের স্বর্ণ সৌধ গড়িয়াছে, গত যুদ্ধের বিবদমান শক্তিসংঘের উপর টেক্কা দিয়াছে, ইউরোপের জাতি-সংঘের প্রধান যন্ত্রী ও সূত্রধার, সেই জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি সংস্থান আজ ভাবিয়া পাইতেছে না কি উপায়ে ৪ কোটি লোকের ভিতর ২০ লক্ষ লোকের বেকার অবস্থা ঘুচান যায়, আর ৬০ লক্ষ নারীর অনূঢ়া যাতনার উপশম করা যায়! হয়ত তাহারা তাহাদের সমস্যা পূরণ করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে ঐ অনুষ্ঠান স্বাধীনতা ও কল্যাণের আদর্শে সমাজশৃঙ্খলা রক্ষা করিবার সার্থক সাধন নহে।

তবে আমাদের উপায়? উপায় চিন্তা করিতে গেলেই অপায় ও চিন্তন করিতে হয়। সেই কারণে এত কথা বলিলাম। প্রথম স্বীকার করিতে হইবে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটা সামাজিক আদর্শ আছে। রাষ্ট্র স্বাধীন অর্থে সমাজ কল্যাণের সাধন পথে সর্ব্ব-বাধা-বিনির্মুক্ত। রাষ্ট্র স্বাধীন অর্থে রাষ্ট্রান্তর্গত মানব মণ্ডলীর ভিতর গৃহে শান্তি শৃঙ্খলা ও আত্ম শক্তির অবাধ স্ফুরণ, সম্পর্কের ভিতর প্রকৃতির স্বচ্ছন্দানুবৃত্তি, লোক মিলনের ভিতর প্রীতি, আতিথ্য ও অন্যোন্যের শ্রদ্ধা, বৃত্তির স্বাধীন অনুসরণ, যুবশক্তির শ্রমশীলতায় সৃষ্টি বৈচিত্র, শিল্প সম্ভারের ঐশ্বর্য্যে নর নারীর দেহ মনের বিকাশ, প্রতিভার সূর্য্যোপম তেজোবিকাশ, মানীর মান রক্ষা, ধনীর ধন রক্ষা, বিদ্বানের বিদ্যা বিতরণ এক কথায় সভ্যতার একটা বিরাট আদর্শকে বজায় রাখা। আমি ইতিপূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি সার উইলিয়ম জোন্স বাঙ্গালাদেশে, সার টমাস মনরো মদ্রদেশে ও সার জর্জ্জ বার্ডউড বোম্বাই অঞ্চলে ভারতীয় সমাজে সভ্যতার এই সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইয়াও যে রাষ্ট্র-বহির্ভূত সংঘবদ্ধ হইবার শক্তিতে রাজনৈতিক শক্তি বজায় থাকে বলিয়া অধ্যাপক লিগুসে ইঙ্গিত করেন, সেই শক্তি ভারতের সমাজ সংগঠনে বর্ত্তমান ছিল। এই ১৯১৪ সালে সার জর্জ্জ বার্ডউড বলেন তাহার মূলে ভারতের বর্ণাশ্রম-তত্ত্ব। আজ আমাদের ভাবিবার কথা নহে কি যে সত্য সত্যই আমরা সোণা হারাইয়া আচলে গিরা দিবার প্রয়াস করিতেছি কি না? তাহাই যদি হয় তবে আমাদের সমস্ত গতিই নিরুদ্দেশ যাত্রা কি না?

দিগ্‌-দর্শন

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

"প্রাচ্যের যাঁহারা প্রতীচি হইতে দূরে অবস্থান করেন, তাহাদের বর্ত্তমান সময়ে বুঝা উচিত যে পূর্ব্বে এশিয়া-বাসীগণ ইউরোপীয় লোকদিগের নৈতিক প্রতিষ্ঠায় যে মর্য্যাদা দান করিত, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণরূপেই চলিয়া গিয়াছে। ইউরোপকে আর কেহ মানব-জগতে ন্যায়পরতা বা উচ্চ কোনও নীতির সংরক্ষক বলিয়া গণ্য করে না; বরং উহারা যে এক্ষণে নিজেদের জাতিগত শ্রেষ্ঠতার সংরক্ষণ ও আপন সীমানার বাহিরের অপর সকলের লুণ্ঠন ও নিষ্কাষণে ব্যস্ত, সকলেরই এ ধারণা। ইউরোপের পক্ষে বাস্তবিকই এক মহা নৈতিক পরাজয় ঘটিয়াছে। যদ্যপি এশিয়া এখনও বাহ্যিক বলে বলীয়ান্ নয়—যে সকল বিষয়ে তাহার অতি বড় জীবনগত স্বার্থের ব্যাঘাত বাহির হইতে হইতেছে, তাহাতেও আত্মরক্ষায় অসমর্থ—তবুও তার এখন এতটুকু শক্তি দেখা যায় যে, সে ইউরোপকে এখন ঘৃণার চক্ষে দেখে। ইতিপূর্ব্বে কিন্তু অতিশয় শ্রদ্ধার ভাবই পোষণ করিত।

এই যে অভিনব মন কষাকষি চলিতেছে, তাহা এক সুদীর্ঘকাল ব্যাপী বিরোধ ও সঙ্কটের অবস্থারই সূচনা করিতেছে। ইউরোপের জাতিসকল এই ক্রম বর্দ্ধনশীল মনোমালিন্যের বিপদ আশঙ্কা করিয়া এক্ষণও কেবল কতকটা কৃত্রিম মিলনের বিষয়ে ভাবিতেছে—নানা বাহ্যিক উপায়ের খোজ করিতেছে মাত্র। প্রধান প্রধান জাতিগুলি নিজেরা কি প্রকারে একত্র হইয়া কার্য্য করিতে পারে, এই কথাই তাহারা বলে; মনে রাখে না যে, এই সকল শক্তি গুলিই—এই সকল প্রধান প্রধান জাতিগুলিই প্রত্যহ জগতের শান্তি ভঙ্গ করিতেছে—নিজেদের জাতীয় শ্রেষ্ঠতার দম্ভে প্রতীচ্যের অস্তিত্বই মানিয়া লইতেছে না। তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, এই যে তাহাদের দাম্ভিকতা ও নিজ শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদনের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা, আজ হউক্ কাল হউক্, তাহাতেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভূখণ্ডের সর্ব্বনাশ আনয়ন করিবে।

আমি যতই বয়োবৃদ্ধ হইতেছি, ততই এই ভাব আমার নিকট অধিকতর স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে আমাকে অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, এই ঘোর সঙ্কটের সময়ে কি করা উচিত? আমি তার একই উত্তর দিয়াছি যে, যে ক্ষেত্রে লোকের আন্তরিক ভাবের মধ্যে এত গোলমাল, সেখানে বাহ্যিক কোনও প্রতীকারের উপায়ে আমি বিশ্বাস করি না। এজন্য বাস্তবিক কোনও সহজ পন্থা আমি নির্দ্দেশ করিতে পারি না—এই অন্তঃস্পর্শী ব্যাধির নিরাকরণের ঔষধ সহজসাধ্য নয়। এইজন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক, লোকের মনোবৃত্তির—ইচ্ছা, আকাঙ্খা ও হৃদয়ের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করা।

আমার বাস্তবিক বিশ্বাস আছে একটী বিষয়ের উপর—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ একত্র হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মন খুলিয়া ভাবের আদান প্রদান করিতে পারেন

এবং শ্রদ্ধার সহিত পরস্পরকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে পারেন। যদি একবার এই প্রকারের পরস্পর ভাব বিনিময়ের কোনও প্রণালী খুলিয়া যায়—যাহাতে আন্তরিক চিন্তা ধারা অবাধে আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হইতে পারে—স্বার্থ-চিন্তা জাতিগত দম্ভ তাহাতে প্রতিবন্ধক না হয়—তবেই এই মিলনের সেতু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা।"—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ম্যান্চেষ্টার গার্ডিয়ান্ প্রতি)

লবণ-করে ইংরেজের বিক্ষোভ

আজ এ দেশের সর্ব্বত্র লবণ-কর আইন অমান্য লইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এবং তাহাতে নানা স্থানে যে ভীষণ গোলযোগ চলিয়াছে, তাহাতে 'লবণ-কর' বিষয়টী লোকের চিত্ত কতখানি অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহা নিতান্তই সন্দেহের বিষয়। লবণ-কর ত লোকে সহিয়াই গিয়াছে; এ দেশের অধিকাংশ লোকেই ইহার বিষয়ে কিছু জানে না। তাহারা জানে অন্যান্য জিনিষের ন্যায় মূল্য দিয়া লবণও কিনিয়া আনিয়া খাইতে হয়; ইহাই নিয়ম। ইহার পেছনে যে কোন আইন-কানুন আছে, সে খবর কয় জনে রাখে? কেবলমাত্র অজ্ঞ ও মূর্খ লোকের কথা নহে, যাঁহারা আইন কানুন নাড়া চাড়া করেন, আইনকে জীবিকার উপায় বলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাদেরও লবণ আইনের কথা ভাবিবার প্রয়োজন হয় না—লবণ-আইন এদেশে এক্ষণে রাষ্ট্রীয় আইনের অন্তর্গত না থাকিয়া প্রায় প্রাকৃতিক আইনের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই সেদিন দেশের একজন অতি বিচক্ষণ ব্যবহার-জীবী রাষ্ট্র পরিষদের সদস্য বলিয়াছিলেন "এত কাল দেশের আইন-কানুন লইয়া নাড়াচাড়া করিলাম; লবণ-আইনের মর্ম্ম কখনও বুঝি নাই—মহাত্মা গান্ধী তাহাতেও নূতন দৃষ্টি দান করিয়াছেন।"

"বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত" জাতি; ভারতবাসীও তাহাই। তবে এ বিষয়ে বাঙ্গালীর স্থান যে সর্ব্বোপরি, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছোটখাট বিষয় ছাড়িয়া বড় বিষয় ও বৃহৎ কথা লইয়া মাতিতে ইহাদের মত আর দ্বিতীয় কেহ নাই। এ কালের অনেক জঞ্জালই বাঙ্গালী চরিত্রের এই দুর্ব্বলতার অবসরে আসিয়া এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছে। ছোট ছোট লাভালাভের বিষয় যাহা অন্তরে প্রবেশ লাভ না করিল, তীব্র অনুদৃষ্টির সৃষ্টি না করিল, সে বড় কথা লইয়া কি করিবে? জাতীয় জীবনের প্রায় সকল কর্ম্মক্ষেত্রে—আহার, বিহার, ব্যবসা, বাণিজ্যে এজন্য বাঙ্গালী এক্ষণে উপহাসের পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটু চাহিলেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

লবণ আইন যখন এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন এদেশের কয়জন লোক কি ভাবিয়াছিলেন তাহা জানি না; তখনও বোধ হয় কেহ জানিত না। তবে একজন ইংরেজ তখন এ বিষয়ে যে ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা একালেও অনেকে ভাবিয়া দেখিতে পারেন। ইং ১৮৪২ সালে জর্জ্জ তম্সন্ নামক এক ব্যক্তি লণ্ডনের 'রিফর্ম্ম ক্লাব' হইতে কতকগুলি বক্তৃতা করেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—'Lectures on the Conditions, Resources and Prospects of British India.' তাহাতে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন ইতিহাস বিবৃত করিতে গিয়া তাহাদের প্রবর্ত্তিত লবণ আইনের একচেটিয়া ভাব সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন*—

*A word now with regard to the present revenue of India. The revenue raised by the East

ইহাদের বর্ত্তমানে রাজস্ব-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে রাজস্ব আদায় করেন, তাহার পরিমাণ দুই কোটি পাউণ্ড। ইহার মধ্যে এক কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভূমির উপরে কর; পঁচিশ লক্ষ পাউণ্ড লবণকর হইতে আইসে। আর এই লবণের ব্যবসায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্পূর্ণ এক-চেটিয়া। লবণ প্রস্তুত করণ ও বিক্রয় করা সমুদয়ই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। ভারতবর্ষের লোকেরা ভাত খায়, আর ভাতের পক্ষে লবণ অতি আবশ্যক উপকরণ। লবণ না খাইলে ইহারা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে; ইহাদের এক প্রকার প্রায় সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোজনের দরুণ স্বাস্থ্যের পক্ষে যে ক্ষতি হয়, তাহা লবণের দ্বারা পরিপূরিত হয় বলিয়াই লবণ ভারতবাসীর পক্ষে এত অত্যাবশ্যক।

"ভারতবাসীর সাধারণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও মঙ্গলের দৃষ্টিতেই এই লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই ঘোর অন্যায়কর নিয়মের অন্তরালে যে গূঢ় রহস্য রহিয়াছে, তাহা ভেদ করিয়া সমুদয় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিবার অবসর আমার এখন নাই; তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, এমন একটা অস্বাভাবিক, অন্যায় ও অত্যাচারজনক নিয়ম বোধ হয় জগতের আর কোনও রাজ্যের রাজস্ববৃদ্ধিকল্পে আর কখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বিশ হইতে ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড বৎসরে এমন একটী জিনিষের উপর থেকে উদ্ধৃত করা হয়, যাহাকে ঐ দেশের রাজা রামমোহন রায়ের মতন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন।

"সকলেই জানে যে, ভারতবর্ষের লোকেরা প্রধানতঃ জলে সিদ্ধ চাউল বা ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে; উক্ত খাদ্য এক প্রকার আলুনী স্বাদবিহীন বস্তু; লবণ দিয়া বা লবণ সংস্পৃষ্ট অন্য বস্তু মিশাইয়া উহাকে স্বাদযুক্ত করিয়া লইতে হয়। এই লবণসংমিশ্রণ কার্য্য এতই আবশ্যক যে দরিদ্র লোকেরা আপন ঘটি বাটি বা অপর সকল বস্তু বিক্রয় করিয়াও লবণ খরিদ করিয়া থাকে। ভারতের লোকের পক্ষে লবণ এত আবশ্যক বলিয়াই প্রকৃতি উহাকে তাহাদের পক্ষে অতি সহজে ও প্রচুর-পরিমাণে প্রাপ্তব্য করিয়া রাখিয়াছে—ভারতের সুবিস্তৃত সমুদ্র-বেষ্টিত ভাগের সর্ব্বত্র সমুদ্রের জল বালুকা ভূমি বা চটানেতে সূর্য্যের উত্তাপে শুকাইয়া লইলেই লবণ পাওয়া যায়। এই প্রণালীতেই অতি বিশুদ্ধ ও সুন্দর দানার আকারে লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

India Company is less than twenty millions of pounds sterling About eleventh millions of this is raised by a direct tax upon the land ; about two millions five hundred thousand pounds by the salt monopoly—that is to say, the cultivation, the manufacture, and the sale of salt, is an exclusive monopoly in the hands of the East India Company. The people of India are a rice fedpopulation, and salt is an essential ingredient to their food. Without salt they become diseased ; it is necessary to correct the influence of an almost exclusively vegetable diet.

The comfort and welfare of the people of India require the total abolition of the salt monopoly. I have no time at present to enter into this mystery of iniquity. A more unnatural, unjuist, or oppressive system was, perhaps, never invented to increase the revenue of any government. Between two and three millions of pounds sterling are anually raised by the monopoly of an article, which the enlightened Raja Rammohon Ray, denominated *"an absolute necessary of life"*.

সমুদ্রের জল অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়াও লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। প্রথমোক্ত প্রণালীটিকে লবণের খেতী বা চাষ (cultivation) বলা হয়; দ্বিতীয় উপায়কে লবণ নির্ম্মাণ বা প্রস্তুত করণ (manufacture) কহে। এই লবণের ক্ষেতী, নির্ম্মাণ ও বিক্রয় ব্রিটীশ ভারতে অতি কড়া একস্বামিত্বের নিয়মে আবদ্ধ। ব্রিটীশ ভারতের কোনও প্রজা যদি তাহার গৃহ দ্বারের সম্মুখে স্বভাবের নিয়মে সূর্য্যের উত্তাপে আপনিই উৎপন্ন লবণের একটুকু মাত্র তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে লইয়া আইসে, অথবা তাহার এক কণা মুখে তুলিয়া দেয়, তবে তাহাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়। ভারতীয় নূতন দণ্ড বিধির বিধানে আমরা দেখিতে পাই—লবণ শুকাইয়া লইলে, লবণ প্রস্তুত করিলে, বা লবণ সংগ্রহ করিয়া আনিলে তিন মাস কাল কারাবাস অথবা পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা এতদুভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। আর যে ব্যক্তি ঐরূপে লবণ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত: হাড়ি বা কড়া প্রস্তুত করিবে তাহাকেও ঐরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে! যে লবণ স্বভাবের নিয়মে আপনা আপনি তৈয়ার হয়, তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত আছেন। আবার প্রতি বৎসর কতখানি লবণ দেশের লোক খাইবে, তাহার পরিমাণ নিরূপিত করিয়া দিবার অধিকারও গভর্ণমেণ্টের! এই প্রথা দ্বারা অনেক পাপ সমাজ প্রবেশ করিয়াছে—চোরাই মাল চালান তাহার মধ্যে একটী; লবণের সঙ্গে মৃত্তিকা (কখন এক তৃতীয়াংশ কখনও বা অর্দ্ধেক পরিমাণে) মিশ্রিত করিয়া ভেজাল দেওয়া আর একটী। লবণের দর এমন চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে যে তাহাতে ভারতের প্রজাকুল নিজ পরিজনগণের পরিপোষণের

It is well known that the food of the people of India consists chiefly of boiled rice —an insipid dish, to season which salt, or something impregnated with salt is required. So highly is the seasoning valued, that the poorest individual will purchase it at the sacrifice of every other article. For this want nature has provided in a manner the most simple and bonutiful. In every part of India, washed by the ocean, salt is obtained by the evaporation of sea-water upon the sand or rocks, by the heat of the sun. By this process, salt in a pure and perfect state of crystallisation is procured. It is also made by boiling sea-water. The first process is called *cultivation*, the second *manufacture*. The culti vation, manufacture, and sale of salt, in British India, is a strict monopoly, The native of British India can be severely punished for daring to place upon his tongue, or remove into his hut, a single grain of the sunevaporated salt, left by nature at his own door. In the *new* penal code for India, I find that the cultivation, collection, or manufacture of salt may be punished by three months imprisonment or a fine of five hundred rupees, or both. And that the same penalty may be inflicted upon the person who makes a salt-pan for the purpose of collecting salt. Officers of government are employed, to destroy the salt naturally formed. The government also claims the right of determining what shall be the amount of salt consumed by the population during the year. Many are the evils created by this system. *Smuggling* is one. The practice of adulterating the salt, by mixing it with *one-third*, or even *one-half* of earth, is another. *The raising of the price* of the article to such an extent as to oblige the Indan peasant, in order to supply his family, to sacrifice one-seventh part of his entire wages, is another. The *encouragement of fraudulent speculators* is another. The employment of an extensive vexatious, and *corrupt preventive service* is another. These, with every description of *evasion, lying* and *robbery* are among the effects produced by the salt monopoly in India.

Six Lectures : p, p. 7-8. Reform Club, London, May, 1842.

নিমিত্ত তাহাদের নিজ মজুরির এক সপ্তমাংশ তাহাতে উৎসর্গ করিতে বাধ্য হয়—ইহা অন্যতম। ইহাতে এক প্রকার প্রতারণাপূর্ণ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাও আর একটী পাপ। আবার এজন্য অতি ব্যয়বহুল, উত্যক্তকারী, ঘুষখোর, নির্য্যাতনকারী চাকুরিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা আর এক দোষ। ভারতের লবণ-আইনের এগুলি—এবং ইহাদের সঙ্গে সকল রকমের কর্ত্তব্যবিমুখতা, মিথ্যা, চৌর্য্য প্রভৃতি—অবশ্যম্ভাবী ফল।"

ভিক্ষুকের ঝুলি।

ত্রিদণ্ডী ভার্গব

(১)

যঃ স্থাপয়তু-মুদ্যুক্তঃ শ্রদ্ধয়ৈ বাক্ষমোঽপি সঃ।

সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ সাক্ষাৎ জ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ॥ (শঙ্কর)

অর্থাৎ অশক্ত হইয়াও যে বৈদিক মার্গের স্থাপনার্থ চেষ্টা করিবে, আমি তাহাকে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত করিব।

ব্রাহ্মণগণ ঐশ্বর্য্য, সুখ ও সম্পদ প্রভৃতি সকল গুলিই অন্য তিন বর্ণকে প্রদান করিয়া নিজেরা যাহার অপেক্ষা অপকৃষ্ট বস্তু পৃথিবীতে কিছু মাত্র নাই, সেই ভিক্ষাবৃত্তিটি নিজেদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে ঐশ্বর্য্যাদিতে মন গেলে পরোপকার ব্রতের উদ্‌যাপন করা যায় না। বিদ্যা চর্চ্চাও তাঁহারা দ্বিজাতিত্রয়ের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন—নিজেদের জন্য তাহা এক চেটিয়া করিয়া রাখেন নাই। কি দূর দর্শন! পাছে নিজেরা ক্ষমতা-মদে যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন তজ্জন্য নিজেদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণের প্রত্যেক কার্য্যে এক পঞ্চম শক্তিকে প্রত্যক্ষরূপে সম্মুখে ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই জন্যই ব্রাহ্মণের প্রত্যেক দৈনিককার্য্যে—দেবতা। সব কার্য্য ঈশ্বরোদ্দেশে। ব্রাহ্মণের সেই অপূর্ব্ব ভিক্ষার ঝুলি খুঁজিয়া যাহা কিছু আজও পাওয়া যায়, তাহাই দেখিবার জন্য চেষ্টা করিব। সদাশয় পাঠক মহোদয়গণ অবহিত হইয়া তাহা পাঠ করিবেন, ইহাই লেখকের একান্ত প্রার্থনা।

বিনয়। পরিমল—তুমি কোথায় যাইতেছ?

পরিমল। শ্রীশঙ্করের নিকট যাইতেছি; তথা হইতে আমাদের এক জায়গায় যাবার কথা আছে।

বি। কোথায়?

পরিমল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট।

বি। সেই টিকিওয়ালা ভিখারী ব্রাহ্মণের নিকট ?

পরি। ও কথা বলিও না। তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলে তোমার এই অবজ্ঞার ভাব চলিয়া যাইবে।

বি। রাগ কর কেন ভাই! আমি কিছু ভাবিয়া ও কথা বলি নাই। লোকের কাছে যাহা শুনি—তাহাতেই ঐরূপ ধারণা হইয়াছে।

পরি। তুমি এম-এ পাশ করিয়া...অবিনয় শিক্ষা করিয়াছ। যাঁহাকে অগ্রাহ্যের চক্ষে দেখিতেছ—তাঁহার সহিত আলাপ করিলে তোমার এই অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি বৃদ্ধ—বয়োবৃদ্ধকে অবজ্ঞা করা বড় দোষের।

বি। তোমার যে কেন মতিভ্রম হইল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। "ডু কৃঞ করণে" বলিতে—যাদের বিদ্যার শেষ হয়, তাহাদের নিকট খুব কমই জানিবার বা শুনিবার থাকে।

পরি। অবশ্যই শ্রীশঙ্কর তোমার চেয়ে কম বিদ্বান্,—নতুবা সে ঐ বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বোকা বনিয়ে যাবে কেন ?

বি। বল কি! শ্রীশঙ্কর সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুকের জ্ঞানে মুগ্ধ!

পরি। আজ্ঞা, হ্যাঁ মহাশয়।

বি। আমিও তবে তোমাদের সঙ্গে যাইব।

পরি। বড় অনুগ্রহ ; বৃদ্ধ ভিখারী আজ উদ্ধার হইয়া যাইবেন। আচ্ছা তবে এস।

এই বলিয়া শ্রীযুক্ত পরিমল গুপ্ত ও শ্রীমান বিনয়ভূষণ ঘোষ—দুই ইংরাজী নবীস বিশ্বম্ভর... মুখোপাধ্যায় নামক বৃদ্ধ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন তথায় শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় তৎপূর্ব্বেই আগমন করিয়াছেন ও বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিতেছেন।

শ্রীশঙ্কর। মনস্বী উদারহৃদয় সার জন উড্রফ সাহেব ভারতবর্ষ কি সভ্য, (Is India civilised) নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কি সুন্দর পুস্তক—কি সত্য অনুসন্ধিৎসা!

মুখো। বাবা—আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার ভিক্ষাই সম্বল। ভিক্ষার শত ছিন্ন ঝুলিতে কোন বড় বড় গ্রন্থ নাই। দু-চারি খানি ছেঁড়া পুঁথীর পাতা রেখেছি—তাহাতে যা বিদ্যা তাই আমার সম্বল। বড় কথায় কি, আমার উদরান্ন জুটিবে—না আবার আর্য্যদের সেই পূর্ব্ব সম্পত্তি ফেরৎ আসিবে ?

শ্রীশ। বিদ্যা যে বিনয় দেয় আপনি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমাকে আর প্রতারণা করিবেন না।

মুখো। মানুষের যেমন শৈশব, কৈশোর যৌবন ও বার্দ্ধক্য আছে তদ্রূপ জাতির ও আছে। আমার বোধ হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকার মনুষ্য মণ্ডলীর শৈশব ও কৈশোর কাল গত হইয়াছে। এখন তাহারা যৌবনের প্রবল উদ্যমে ছুটিয়াছে। সত্যের অনুসন্ধানে সকলেই ব্যস্ত। বাহ্যের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া প্রায়ই শতকরা নিরানব্বই জন অন্তঃকরণের দিকে দৃষ্টিপাতও করে না। কাজেই পথহারা হইয়া হা হা রবে দানবিক চিৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। উড্রফ সাহেব বোধ হয় ভিতরের দিকে লক্ষ্য করিতে শিখিয়া একটু আধটু সত্যের আভাস পাইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিধর্ম্মী ও বিজাতি হইয়াও আমাদের সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। শুনিয়াছি তিনি স্বর্গ গত শিবচন্দ্র বিত্তার্ণব মহোদয়ের নিকট আর্য্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ পাইয়াছিলেন।

শ্রী। উলিয়াম আর্চার নামক পাদরী সাহেব ভারতবাসীকে বর্ব্বর বলিয়া গালি দিয়া পুস্তক লিখিয়াছেন। উড্রফ সাহেব তাহারই প্রত্যুত্তরে ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

মু। হবে বাবা। ভারতবাসী হয়ত বর্ব্বরই বটে। তবে আমাদের কুশিক্ষার ফলে আমি দেখি এখন সবই উল্‌টো। ভাল যাহা তাহা মন্দ, আর মন্দ যাহা তাহাই ভাল। ভারতের পিতামহগণ সভ্য ছিলেন বা অসভ্য ছিলেন তাহা আর্চার সাহেবের কথায় বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া আমায় বোধ হয় না। উড্রফের ন্যায় আরও কত বড় লোক নাকি এ বিষয়ে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আমার এই ঝুলিতে সে সব গ্রন্থ থাকার সম্ভাবনা নাই। কেন না প্রয়োজনাভাব। বহু পুরাকাল হইতে পিতৃগণ কিরূপে কি উচ্চ সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার তথ্য সংগ্রহের সম্ভাবনা কম। সেই সনাতন সভ্যতার ইতিবৃত্ত রচনার উপাদান অপ্রচুর, কিন্তু ইহার অভ্যুদয়, দীর্ঘকাল প্রশান্তভাবে অবস্থিতি ও বর্ত্তমান অধঃপতন শোচনীয় হইলেও বোধ হয় বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

শ্রী। আমরা কুশিক্ষা (১) পাইয়াছি। স্বাধীন চিন্তার কোন ধারই ধারি না। অথচ ভাবি আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বেশ সতেজ হইয়াছে। জানি না কবে আমার এই ভ্রম ধারণা যাইবে—কবে আমি সত্য চিন্তা করিতে শিখিব—কবে আমি আমার পৈতৃক ধনে অধিকার প্রাপ্ত হইব।

মু। যদি কোন দিন ভারতে আবার মনুষ্যত্ব ফিরিয়া আইসে! তবে সে এই ইতিবৃত্ত আলোচনার ফলে। কি ভাল কি মন্দ যদি চিনিতে চাই তবে সে এই ইতিবৃত্ত অধ্যয়নের ফলে; যদি কোন দিন আমরা স্বধর্ম্ম কি ও পরধর্ম্ম কি এবং স্বধর্ম্মে মরণও কেন ভাল তাহা বুঝিতে পারি, তবে সে এই ইতিবৃত্ত হৃদয়ঙ্গমের ফলে; যদি কোনদিন আমরা আবার পৃথ্বীতলে পূজনীয় হইতে পারি তবে সে এই ইতিবৃত্ত মজ্জাগত হইবার ফলে। (২)

১৮১৭ খৃষ্টাব্দ * ভারতের পক্ষে বড় দুর্দ্দিন। কোথায় বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদ বাক্য—

"সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেতাৎ—
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য,"

আর কোথায় তোমার 'সার্ভাইভেল অফ্ দি ফিটেষ্ট' (Suivival of the fittest.) আর্য্যপুত্র আর্য্য ভাবে শিক্ষিত না হইলে উন্নতি অসম্ভব।

---

(১) বর্দ্ধমানের স্বনাম খ্যাত উকীল পরলোকগত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (পাঁচু ঠাকুর) নিজ জীবন চরিত্রে লিখিয়া গিয়াছেন যে, যদি তাঁহার পিতা তাঁহাকে কুশিক্ষা না দিতেন তবে তাঁহার অধঃপতন হইত না। অথচ ইন্দ্র বাবু একজন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী লোক ছিলেন।

(২) ভট্ট মোক্ষমূলার বলিয়াছেন—A people that could feel no pride in the past in its history and literature, has lost the ma'n stay of its national character. When Germany was in the very depth of its political degradation it turned into ancient literature and drew hope for the future from the study of the past. (Max-Muller's Addresses) মহামতি বর্ক (Burke) বলিয়াছেন :—By respecting our fore-fathers we learn to respect our-selves.

* এই সময় এদেশে ইংরাজী ভাষা প্রধান ভাবে প্রচলিত হউক ইহাই স্থিরীকৃত হয়।

শ্রী। তবে কি আপনি বলিতে চাহেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত নহে।

মু। না গো, তা কেন! শিক্ষা কখনই অবহেলার জিনিষ নহে। শিক্ষার শেষ নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা অতিশয় প্রয়োজনীয় কিন্তু তা বলে আমাদের নিজ শিক্ষা পদ্ধতি ভুলিয়া যাইতে হইবে না। আপনাকে না চিনে অন্যকে চিনি বার চেষ্টা যেমন উপহাসের, তদ্রূপ ভারতীয় শিক্ষা উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রাধান্য দান অধঃপাতের হেতু। হিমালয় না দেখিলে বড় লোকের প্রাসাদে কৃত্রিম শৈলকে খুব বড় পাথর বলে ধারণা হওয়া অতি স্বাভাবিক।

শ্রী। পাশ্চাত্য জাতি উন্নতিশীল—তাহাদের অনেক বিষয় অনুকরণীয়।

মু। আমি তাহা অস্বীকার করি না—কিন্তু তাহা বলিয়া নিজের জিনিষের মূল্য কত তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব না,—ইহা অতি বালকের কথা। আমি বুঝিতে পারি না যে আপনার জন্ম, আপনার বংশ, আপনার জন্মগত যাহা কিছু তাহা সবই যে অনুকরণ প্রিয়তায় ভুলিয়া যাইতে হয় তাহার প্রকৃত মূল্য কি! সভ্যতা বা অসভ্যতা কেবল বাহ্যিক চাক্‌চিক্যে বা অপরিচ্ছিন্নতায় আবদ্ধ নহে। আগে সৃষ্টি তারপর সমাজ বন্ধন, তারপর তৃতীয় স্তরে সভ্যতা। যে মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যে সমাজ বন্ধন হয় নাই তথায় সভ্যতা বলিয়া কোন জিনিষ আসিতে পারে না।

শ্রী। সমাজ ও সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বোঝা যায় কিন্তু সৃষ্টির সঙ্গে সমাজ বন্ধনের সম্বন্ধ কি তত ঘনিষ্ঠ?

মু। যেমন ভিত্তি না হইলে গৃহাদি নির্ম্মাণ অসম্ভব, যেমন আকাশে গৃহ নির্ম্মাণ করা বাতুলতা মাত্র, তদ্রূপ সৃষ্টিতত্ত্বকে উপেক্ষা করিয়া সমাজ ও সভ্যতা গঠিত করা যায় না। এই জন্যই হিন্দু গ্রন্থে সৃষ্টি প্রকরণ আগে। তোমরা সেই গুলিকে গুলীখোরের উপন্যাস ভাব। কি মনোবৃত্তি! দেখে দুঃখে বুক ফেটে যায়।

শ্রী। মনুষ্য মাত্রেই কি তবে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিয়া চলে?

মু। কোন মনুষ্যই সৃষ্টি দর্শনে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। এবং তাহার ফলে তাহার মনে একটা অচিন্তিত পূর্ব্ব-ভাব উপস্থিত হয়। সেটা আর কিছুই নহে "এর পরে কি" "এ সব কোথা হইতে আসিল" এইরূপ তর্ক। কাজেই তুমি সৃষ্টি বুঝিতে চাও বা না চাও, তোমাকে এই "কি" ও "কেন"র জ্বালায় অস্থির হইতে হইবে। যে মানব বা যে জাতি যত বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি বা সে জাতি সৃষ্টিতত্ত্ব আগে প্রতিষ্ঠা করিয়া—জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রয়াসী হয়।

শ্রী। হিন্দুর সৃষ্টি-তত্ত্ব বেদে। কিন্তু তাহাতে যে কিছু সত্য আছে তাহা ত বুঝা যায় না।

মু। সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থেই (বাইবেল, কোরাণ, বেদ) পরব্রহ্মের ইচ্ছায় সৃষ্টি একথা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু বেদে সৃষ্টিকে যে ভাবে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে—অন্য শাস্ত্রে ঠিক সেই ভাবে দেখিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রী। বাইবেলে আছে আদি মানব (Adam) ও আদি মানবী (Eve) শয়তানের পাপে প্রলুব্ধ হইয়া পড়িলে—মনুষ্য জাতির উৎপত্তি।

মু। অর্থাৎ যৌন সম্বন্ধ প্রথম হইতেই। তুমি আর্য্য সন্তান তুমি ভারত সন্তান। আর্য্যত্ব বজায় রাখিয়া চিন্তা করিতে চেষ্টা কর। হিরণ্যগর্ভ বা পরব্রহ্ম হইতে পিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তি—ব্রহ্মা হইতে বিরাট—, বিরাট হইতে মনু—ইনি স্বায়ম্ভুব অর্থাৎ বিরাটের ইচ্ছাপ্রসূত। মনুর

মানস পুত্র দশ জন। সেই দশের নাম—প্রজাপ্রতি। এতদূরে যৌন সম্বন্ধ ও এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি। হিন্দুর সৃষ্টিতত্ব মধুময়—সেখানে আদি মানব মানবীর সহিত শয়তানের বিদ্বেষবীজের লেশ নাই। সেখানে পাপ বা প্রলোভনের কোন কথা নাই। যদি তুমি সব ছেড়ে দাও—সব ভুলে যাও, তথাপি একমাত্র হিন্দুর সৃষ্টিতত্ব অনন্ত কালবক্ষে সভ্যতার মৈনাকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। বেদ সেইজন্য এত বড়—এত মহান্—এত পূজ্য।

শ্রী। হিন্দুত্বের প্রতি আপনার অগাধ বিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া যুক্তি বিচার পরিত্যাগ করিয়া অন্ধ বিশ্বাসে চলা যায় না। হিন্দুত্বের বিশেষত্ব কি?

মু। তুমি পাশ্চাত্য বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া জানিয়াছ যে চিন্তা (thought) মূলশক্তি। বেদ বলিয়াছেন "তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন" এবং সর্ব্ব জগৎ সৃষ্ট হইল। এই থেকে চিন্তাই সকল শক্তির মূল। এখন বুঝিয়া দেখ—শয়তান্, আদম, ইভ, স্বর্গের উদ্যান এবং হিন্দুর সেই অমৃতময় বাক্য—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দেন জাতানি জীবন্তি—আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিঃ সংবিশন্তি" অর্থাৎ আনন্দ হইতেই সর্ব্বভূত জগৎ জন্মিতেছে—আনন্দই সকলের জীবন—সকলেই আনন্দে বিলয় প্রাপ্ত হয়। কি অপরূপ সৃষ্টিতত্ব দেখ দেখি। এখানে শয়তানের চিহ্ন নাই—আদম ইভের পাপ লিপ্সা নাই—স্বর্গ বা স্বর্গেতর কোন দ্রব্যের অস্তিত্বের আভাস নাই। কাজেই শয়তান ও আদি পিতা মাতার মধ্যে বিদ্বেষ বীজ নাই—প্রলোভনের লেশ নাই। স্বর্গ-নরকের ইতর বিশেষ নাই। যদি চিন্তাই শক্তি হয় (১) তবে বাইবেল ও বেদের সৃষ্টিতত্ত্বে কি পার্থক্য তাহা বুঝিয়া দেখ। সৃষ্টিতত্ত্বে বিদ্বেষ বীজ থাকার অবশ্যম্ভাবী ফলে আজ বাইবেল চালিত পাশ্চাত্য মানব—প্রবঞ্চনাপর—প্রলোভনপ্রবণ, স্বার্থপর, স্বজাতিপর, পরবিদ্বেষপর, পরদ্রব্যলোলুপপর। আর বেদ-মার্গী আর্য্যসন্তান সত্যপর, বিশ্বপ্রেমিক, পরার্থপর, পরদ্রব্যে লোষ্ট্রজ্ঞানপর। উপস্থিত কালের হিন্দুগণের কথা ভুলিয়া যাও—চীন ও অন্যান্য দেশের পরিব্রাজকগণ ভারত সম্বন্ধে যে ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া দেখ—হিন্দু কত বড় হইয়াছিল। কি উচ্চ আদর্শে সমাজ গঠিত করিয়াছিল। সৃষ্টি-প্রকরণ সমাজ ও সভ্যতার মূল।

শ্রী। আপনার মতে দেখছি—পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে গলদ, আর আমাদের সবই ভাল।

মু। তুমি বিচার কর। তুমি কি ভাল ও কি মন্দ স্থির করিতে চেষ্টা কর—তারপর এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিও। এসব এত বড় গুরুতর বিষয় ও এত দীর্ঘকাল চিন্তার দরকার যে দু ছত্র লিখিয়া তাহা বুঝান অসম্ভব। দুর্ভাগ্য আমাদের এই যে আমরা নিজেদের গ্রন্থাদি পাঠ করিবার সুযোগ পাই না এবং সুযোগ পেলেও তাহা পড়িবার প্রয়োজন বোধ করি না। আর্য্যগণ

(১) Thought is the force underlying all your acts. Every conscious act is produced by a thought. Your dominating thoughts determine your dominating actions. The acts repeated crystallise themselves into habit. The aggregate of your habits is your character building (Thought Power—by R. W. Trine).

When we think we set into motion—vibration of a very high degree—just as real as the vibrations of light, heat, sound, electricity (Thought Vibrations—by W. W. Atkinson).

সমস্ত জয় করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইবে না যে তাঁহারা দুর্ব্বলের ধন অপহরণ করিয়াছেন বা দুর্ব্বলের রাজত্ব কাড়িয়া লইয়াছেন। দেখিতে পাইবে না যে কোথাও প্রতারণা করিয়া নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিয়াছেন। দেখাতে পারিবে না যে বাহ্য বেশের উপরই তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। প্রাচীন হও—পুরাণ পাঠ কর—তারপর পুরাতন তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিও।

আজ আর সময় নাই। আমার নিত্য কার্য্য করিবার সময় হইল। এখন তোমরা যাও। এই বলিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীশঙ্কর ও আর দুইজনকে বিদায় দিলেন।

পথে তিন জনের কথা বার্ত্তায় বুঝা গেল যে বিনয় ও পরিমল বৃদ্ধের কথা শুনিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান ও হিন্দুবিদ্বেষ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যদি বলা যায়—একই পরমাণু চারিপ্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট, তবে কোন পরমাণুতে খরধর্ম্ম প্রধান বা ব্যক্ত, অপর ধর্ম্মগুলি অপ্রধান বা গুপ্ত, এবং কোন পরমাণুতে স্নেহধর্ম্ম প্রধান বা ব্যক্ত, এবং অন্য ধর্ম্মগুলি অপ্রধান বা গুপ্ত, এইরূপে প্রাধান্য বা ব্যক্ততা নিবন্ধন এক একটী পরমাণু চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াও ক্ষিত্যাদি পৃথক্ পদার্থের জনক হয়। অতএব সকল পরমাণুই চারিপ্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট, ইত্যাদি—বলা বাহুল্য এই পক্ষটী পণ্ডিত ইয়ামাকামী কল্পনা করিতে বিস্মৃত হন নাই। কারণ, তিনি ১২৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন—Accordingly although all material things have the quality of the four elements, it happens that certain elements in one case display active energy, while the others possess but a potential energy, which does not act. কিন্তু ক্ষণিক পরমাণুবাদে একথা বলিলেও নিস্তার নাই। কারণ, পরমাণুধর্ম্ম ব্যক্ত বা প্রধান—গুপ্ত বা অপ্রধান বলিবার 'হেতু' কি? উহাদের কার্য্য দেখিয়া অনুমানই ত সেই 'হেতু'। আচ্ছা, কোন পরমাণু তাহার কোন ধর্ম্ম-প্রধানরূপে উৎপন্ন হইয়াই তাহার কার্য্য করিয়াই পরক্ষণে বিনষ্ট হইলে তাহার অপর ক্ষণে অন্য কার্য্য দেখিয়া ত অপর ধর্ম্মের অব্যক্ততা বা গুপ্তভাব অনুমান করিতে পারা যায় না। তাহা আর এক ক্ষণ না থাকিলে ত তাহার অপর কার্য্য সম্ভবপর হয় না। তাহা ত এক ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে এক ক্ষণে তাহার কার্য্য করিয়াই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব পরমাণু ক্ষণিক স্বীকার করিলে পরমাণুধর্ম্মের ব্যক্তা-ব্যক্ততা সম্ভবপর হয় না। আর নিত্য পরমাণুর ব্যক্তাব্যক্ততাজন্য পার্থক্য স্বীকার করিলে কোন

এক ক্ষণে চারিটী পরমাণু চারি প্রকারই বলিতে হইবে; কারণ, যাহার খরত্ব-ধর্ম্ম ব্যক্ত এবং স্নেহাদি অপর ধর্ম্মগুলি অব্যক্ত, তাহার সহিত যাহার স্নেহ ধর্ম্ম ব্যক্ত এবং অপর ধর্ম্মগুলি অব্যক্ত, তাহার কোন এক বিশেষ ক্ষণে পার্থক্যই থাকিবে। অতএব ধর্ম্মের ব্যক্তাব্যক্ততা স্বীকার করিয়া ক্ষণিক এক প্রকার পরমাণুর চারি প্রকার ধর্ম্ম, অথবা নিত্য এক প্রকার পরমাণুর চারি প্রকার ধর্ম্ম—এরূপ কোন মতই স্বীকার করা যায় না। এরূপ স্বীকার করিলে আপাতদৃষ্টিতেও যুক্তিসহ বৌদ্ধমত হয় না। এরূপ স্বীকার করিবার পক্ষে যুক্তি যে কতদূর অসার, তাহা বালকেও বুঝিতে পারে। এ জন্য শঙ্কর এরূপ অসার বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন নাই। চারি প্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট চারি প্রকারই পরমাণু এই কথঞ্চিৎ যুক্তিসহ মতই খণ্ডন করিয়াছেন।

আর যদি বলা যায়—এক প্রকার সকল পরমাণুরই চারি প্রকার ধর্ম্ম আছে, তবে তাহাদের সংখ্যা ও সংস্থানভেদে যে অণু উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে কোনটীতে খরত্ব-ধর্ম্ম, কোনটীতে স্নেহ-ধর্ম্ম—ইত্যাদি চারি প্রকার ধর্ম্ম প্রকটিত হয়, আর তজ্জন্য পরমাণুজাত অণুই চারি প্রকার হয়, পরমাণু চারি প্রকার নহে। আর সেই অণু হইতে জাত এই স্থূল ক্ষিতি জল প্রভৃতি চারি প্রকার হইয়াছে। বৌদ্ধমতপক্ষপাতী আবার কেহ কেহ বলেন—এ কথা নাকি বর্ত্তমান বিজ্ঞানশাস্ত্রও সমর্থন করিবে। তাহা হইলে বলিব—এ কথাও অসঙ্গত। কারণ, বর্ত্তমান বিজ্ঞান এ মতেরও সমর্থন করে না। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মতে পরমাণু একই প্রকার এবং Positive ও Negative এই দ্বিবিধ ধর্ম্মাক্রান্ত, খরাদি চারি প্রকার ধর্ম্মাক্রান্ত নহে। গ্রহগণপরিবেষ্টিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় উক্ত পরমাণুর সংখ্যা ও সংস্থানভেদে অণু সকল বহুপ্রকার হইয়াছে।

যদি বলা হয়—সংখ্যা ও সংস্থান ত দ্রব্য নহে যে, খরাদিকে তাহার ধর্ম্ম বলিতে হইবে? অতএব বর্ত্তমান বিজ্ঞানকেও পরমাণুতেই উক্ত-ধর্ম্ম চতুষ্টয় থাকে—বলিতে হইবে? তাহা হইলে বলিব—উহা কার্য্যদ্রব্যের ধর্ম্ম, কারণের ধর্ম্ম নহে। যেমন মৃৎপিণ্ডরূপ কারণে জলাহরণ করিবার সামর্থ্য নাই; কারণস্বরূপ মৃৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন যে ঘটরূপ কার্য্যদ্রব্য, তাহারই জলাহরণরূপ সামর্থ্য আছে। আর কারণ ও কার্য্য যে অভিন্ন নহে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব সংখ্যা ও সংস্থানজন্য খরাদি ধর্ম্ম না বলিলেও কার্য্যদ্রব্যেই খরাদি চারি প্রকার ধর্ম্ম জন্মে—বলিলে বর্ত্তমান বিজ্ঞানমতের উপপাদন হইতে পারে; সুতরাং সকল পরমাণুই চারি প্রকার ধর্ম্মাক্রান্ত—ইহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। Negative ও Positive ধর্ম্মাক্রান্ত একপ্রার পরমাণুই সংখ্যা ও সংস্থানভেদে অসংখ্য প্রকার অণুর জনক হয়। এই মতের কোন হানি হয় না। আর তজ্জন্য এতদ্বারা উক্ত বৌদ্ধমতের পুষ্টি হয়—স্বীকার করা যায় না।

তাহার পর সকল পরমাণুই চারি প্রকার ধর্ম্মাক্রান্ত বলিলে পরমাণুজাত অণুও, তাহার কারণ পরমাণুর ন্যায়ই চারি প্রকার ধর্ম্মাক্রান্তই হইবে, কোনটী খরপ্রধান, কোনটী স্নেহপ্রধান—এরূপে অণুভেদ হইবে কেন? কারণভেদেই কার্য্যভেদ হয়; কারণ একপ্রকার হইলে কার্য্যেও এক প্রকার হইবে। এ কথা পূর্ব্বেও একবার বলা হইয়াছে।

আর চারি প্রকার ধর্ম্মাক্রান্ত এক প্রকার পরমাণু, সংখ্যাসংস্থানভেদে চারি প্রকার অণু হয়—এই কথা বলিলেও নিস্তার নাই, সমান চারি প্রকার ধর্ম্মাক্রান্ত পরমাণুর যতই সংখ্যা বৃদ্ধি

করা যাউক, সমগ্রও সেই সমান ধর্ম্মাক্রান্তই হইবে। আর সংস্থানভেদ স্বীকারদ্বারা উপপত্তি করিলে পরমাণুর দেশভেদ স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু দেশভেদ স্বীকার করিলে পরমাণু সাবয়ব হইবে। আর সাবয়ব স্বীকার করিলে পরমাণুরও অংশ স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং অনবস্থা দোষ ঘটিবে। অতএব পরমাণু সকল এক প্রকার ও চারি প্রকার ধর্ম্মাক্রান্ত, সংখ্যাও সংস্থানভেদে চারি প্রকার অণুতে পরিণত হয়—এ কথা নিতান্তই অসঙ্গত। আর এ জন্য এই মত একেবারেই বিচারসহ হয় না। এরূপ মত আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত বৌদ্ধমতই হয় না। অণুরূপ কার্য্যদ্রব্যে যদি চারিপ্রকারতা স্বীকার করা হয়, তবে তাহার কারণ পরমাণুরও চারিপ্রকারতা অবশ্যস্বীকার্য্য। আর এই মতই অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত বৌদ্ধমত হয়। আর এই মতই খণ্ডনযোগ্য মত হয় বলিয়া শঙ্কর এই বৌদ্ধমতই খণ্ডন করিয়াছেন। পণ্ডিত ইয়ামাকামী বৌদ্ধমতের গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া বৌদ্ধমতের হীনতাই প্রদর্শন করিয়াছেন। যে সব বৌদ্ধ পণ্ডিত বৌদ্ধমতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পুষ্টিকর্ত্তা তাঁহারা হিন্দুরই সন্তান, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহও কদাচিৎ কোন সম্পূর্ণ অসঙ্গত বৌদ্ধমতের প্রচারও করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মত খণ্ডনকারী হিন্দু পণ্ডিত কেন সেই সম্পূর্ণ অসঙ্গত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবেন? যদি করেন ত আপাতদৃষ্টিতে সঙ্গত বৌদ্ধমতই খণ্ডন করিবেন। বস্তুতঃ, এক প্রকার পরমাণু খরাদি চারি প্রকার ধর্ম্মাক্রান্ত আর তাহা হইতে উৎপন্ন অণু এক প্রকার নহে, কিন্তু চারি প্রকার এ কথা বাতুলেরই মুখে শোভা পায়; পণ্ডিত ইয়ামাকামী কি করিয়া এ কথা বলিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। শুধু তাহাই নহে, তিনি এই কথা বলিয়া জীবিত বৌদ্ধধর্ম্মের ধুরন্ধর পণ্ডিতগণের সমসাময়িক অমিতবুদ্ধি শঙ্করকে অজ্ঞাদি বলিয়া উপেক্ষা করিলেন—ইহা বাস্তবিকই বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। খুব সম্ভব আমরাই তাঁহার কথা বুঝিতে পারিতেছি না।

তাহার পর এ বিষয়ে আর একটী কথা না বলিয়া এ বিষয়টী পরিত্যাগ করা উচিত নহে। সে বিষয়টী পরমাণুর নিত্যতাপক্ষ। অর্থাৎ পরমাণু নিত্য কিন্তু অণু প্রভৃতি তাহার কার্য্যগুলি অনিত্য অর্থাৎ ক্ষণিক ইত্যাদি। বস্তুতঃ, একথাও যে পণ্ডিত ইয়ামাকামী বলেন নাই, তাহা নহে। কারণ, তিনি বলিয়াছেন—"But the Sarvastitvavadins do admit the permanence of respective substratum of things while maintaining the momentary character of their various phases. The very name of this school points out this fact which Sankara ignores, p. 137.

অন্যত্র আবার ঐ পৃষ্ঠার শেষে দেখা যায়—"This objection is essentially un-Buddhistic being based, as it is, on a misconception of the real significance of the doctrine of universal momentariness, which only applies to the phenomenal phases of a thing and not to its substratum which according to the Sarvastitvavadins, is parmanent and unchangeable. আবার ১৪০ ও ১৪১ পৃষ্ঠায় দেখা যায়—The Sarvastitvavadins understands by that (i. e. Universal Impermanence) the phase of a thing or person changes every moment but that its substratum is eternal and permanent."

আচ্ছা, তাহা হইলে জানা গেল—সর্ব্বাস্তিত্ববাদীর মতে পরমাণু নিত্য আর তাহার কার্য্যগুলি ক্ষণিক, ইত্যাদি।

যদি বলা হয়—এ স্থলে পরমাণুকে নিত্য বলা হয় নাই, কিন্তু phenomenal world অর্থাৎ কার্য্যভূত জগতের মূলকে অর্থাৎ substratum কে নিত্য বলা হইয়াছে, ইত্যাদি? কিন্তু তাহাও বলা চলে না। কারণ, কার্য্যভূত জগতের মূল পরমাণু—ইহা তিনি অন্যত্র উদ্ধৃত বাক্যেই স্বীকার করিয়াছেন—বুঝা যায়।

কিন্তু ইহা বলিলেও এক প্রকার পরমাণু খরাদি চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মাক্রান্ত, আর তাহা হইতে জাত বস্তু সকল নানা প্রকার, অথচ চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মাক্রান্ত ইহা কি করিয়া বুঝা যায়? যদি বলা যায়—কালভেদে স্বীকার করিয়া ইহার উপপত্তি করিব! অর্থাৎ নিত্য পরমাণু সকলের মধ্যে কতকগুলি কোন সময়ে খরত্বধর্ম্মবিশিষ্ট এবং কোন সময়ে স্নেহধর্ম্মবিশিষ্ট, কোন সময়ে উষ্ণত্বধর্ম্মবিশিষ্ট, ইত্যাদি।

আর কতকগুলি নিত্য পরমাণু সেই সময়ে অন্য স্নেহাদিরূপ অন্য ধর্ম্মবিশিষ্ট হইতেছে এমন সময় কতকগুলি খরত্বধর্ম্মবিশিষ্টপরমাণু মিলিয়া পৃথিবী অণু হইল এবং স্নেহত্বধর্ম্মবিশিষ্ট অপর নিত্য পরমাণুগুলি মিলিয়া জল হইল—এইরূপে একই সময়ে পরিবর্ত্তনশীল বিভিন্ন খরাদি ধর্ম্মানুসারে ক্ষিতি জলাদি চারি প্রকার অণু হইয়াছে, ইত্যাদি। তাহা হইলে বলিব—ইহাও আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত বৌদ্ধপরমাণুবাদ হইতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত পরমাণুবাদ বলিতে হইলে চারি প্রকার নিত্য পরমাণু হইতে চতুর্ব্বিধ অণু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়—এইরূপ পরমাণুবাদই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, এক প্রকার বহু নিত্য পরমাণুর পরিবর্ত্তনশীল খরাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিলে খরাদি ধর্ম্মকে সেই সকল পরমাণুর ধর্ম্ম বলিয়াই স্বীকার করা যায় না। কারণ, ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়, আর ধর্ম্মীর পরিবর্ত্তন হয় না—ইহা বলা অসঙ্গত। বলিলে সে ধর্ম্ম তাহার আগন্তুক বা আরোপিত ধর্ম্ম বলিতে হইবে, সে ধর্ম্ম তাহার নিজ ধর্ম্ম হয় না। বস্তুতঃ শঙ্কর যে বৌদ্ধবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে খরাদি ধর্ম্মকে স্বভাব বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা—"পৃথিব্যাদিপরমাণবঃ খরস্নেহোষ্ণেরণস্বভাবাঃ" ইত্যাদি। অতএব এই খরাদি ধর্ম্ম উদ্ধৃত বৌদ্ধমতে আগন্তুক বা আরোপিত ধর্ম্মই নহে। সুতরাং পণ্ডিত ইয়ামাকামী যে বৌদ্ধমত বলিতেছেন এবং শঙ্কর যে বৌদ্ধমত বলিতেছেন, তাহা পৃথক্ পৃথক্ মত। আর পণ্ডিত ইয়ামাকামী যে বৌদ্ধমত বলিতেছেন, তাহাতে ধর্ম্ম ধর্ম্মীকে ছাড়িয়া থাকে বলিয়া স্বীকার করা হয় বলিয়া ইহা নিতান্ত স্পষ্ট অযৌক্তিক বৌদ্ধমতই বলিতে হইবে, স্বাভাবিক ধর্ম্ম ধর্ম্মী ছাড়িয়া থাকে—একথা শুনিলে বালকেও বুঝিবে—অসঙ্গত কথা বলা হইতেছে।

যদি বলা যায়—নিত্য পরমাণুর এই খরাদি ধর্ম্মের যে পরিবর্ত্তন, তাহা আত্যন্তিক নহে, কিন্তু তাহা ব্যক্তাব্যক্ততারূপ; সুতরাং ধর্ম্ম ধর্ম্মীকে ত্যাগ করে না। তাহা হইলেও বলিব—খরত্ব ধর্ম্ম ব্যক্তকালে পরমাণুর যে অবস্থা, তাহার অব্যক্তকালে সে পরমাণুর সে অবস্থা নিশ্চিতই নাই। ব্যক্তাব্যক্ততায় পরমাণুর অবস্থান্তর অবশ্য স্বীকার্য্য; আর তজ্জন্য পরমাণু অনিত্যই হইয়া পড়ে। অতএব পরিবর্ত্তনশীল বা ব্যক্তাব্যক্তভাবযুক্ত চারি প্রকারধর্ম্মাক্রান্ত পরমাণু সকল—এ কথা বলিলে পরমাণু-সকলকে অনিত্য বা ক্ষণিক বলিতেই হইবে। নিত্য বা ক্ষণিক একপ্রকার পরমাণুর পরিবর্ত্তনশীল ব্যক্তাব্যক্তভাবশীল চারি প্রকার ধর্ম্ম—ইহা কিছুতেই বলা চলে না। ইহা শুনিবামাত্র ইহা অসঙ্গত

বোধ হয়, আর তজ্জন্য ইহা আপাতদৃষ্টিতে ও যুক্তিসহ মতই নহে। এ ক্ষেত্রে ক্ষণিক চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মাক্রান্ত, আর তাহাদের মিলনে জগতের উৎপত্তি—ইহা বলিলে কতকটা যুক্তিসঙ্গত মত বলিয়া বোধ হয়। বলিতে কি, ইহা বিচারযোগ্য খণ্ডনযোগ্য মত বলিয়া বিবেচিত হয়, আর তাহাই আচার্য্য শঙ্কর খণ্ডন করিয়াছেন। রুশ দেশীয় বৌদ্ধশাস্ত্রের পণ্ডিত চারভাট্স্কি—সৌত্রান্তিকমতে পরমাণুর অনিত্যতাই বুঝিয়াছেন; তিনি তাঁহার Soul theory of the Buddhist গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"Contrary to the Vaisheshika system they (Soutrantikas) do not admit the eternal atom. Like all other realities (dharmas) atoms are momentary existences having no duration."

অতএব পরমাণুনিত্যতাপক্ষকে যে শঙ্কর খণ্ডনযোগ্য বৌদ্ধমত বলিয়া উদ্ধার করিয়া তাহার খণ্ডন করেন নাই, তাহা তিনি ভালই করিয়াছেন। অবশ্য পরমাণুনিত্যতাপক্ষ যে কোন কোন বৌদ্ধ স্বীকার করিতেন, তাহা শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহ গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। আমরা জানি না, পণ্ডিত ইয়ামাকামী এ সকল কথা বিবেচনা করিয়া শঙ্করকে বৌদ্ধমতানভিজ্ঞ বলিয়াছেন কি না। বস্তুতঃ, তিনি যে ভাবে তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়—তিনি এ সব চিন্তা করিবার সময় পান নাই। কারণ, তাঁহার অবজ্ঞাপ্রদর্শনের মাত্রাটা ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তিনি, "Sankara's actual reasoning is based on untenable hypothesis, reasonings are just but the premises are false" এইরূপ বলিয়াও যখন নিম্নলিখিতভাবে আক্রমণ করিতে পারেন, তখন তাহার অশ্রদ্ধার মাত্রা সহজেই বুঝা যায়। আরও যথা :—"But Sankara ignores this elementary fact and yet ventures to criticise Buddhism" 127 p. "After making these mistakes in his thesis, he proceeds to criticise the doctrine of the Sarvastitvavadins" 126 p.

"The difficulty raised by Sankara is rather irrelevent." 127 p.

"This is the real truth but Sankara ignores the fundamental princeples of Buddhism and goes on to make further mistakes" 127 p.

"Such being his errors, we see that the Buddhist can support his philosophy or more properly speaking, his atomic theory, without accepting a sentient supreme and permanent Brahama like that of the Vedantins." "The rest of the criticism is a mere fighting with shadows, based upon improbable objections which are answered by equally improbable and erroneous statements". 128 p.

"Sankara fights with the phantoms of his own creations." 131 p.

এইরূপ বিদ্রূপ উপহাস অবজ্ঞা, পণ্ডিত ইয়ামাকামী তাঁহার গ্রন্থে বহু স্থলেই করিয়াছেন। তিনি কি একবার ভাবিলেন না, যাঁহার যুক্তি অকাট্য বলিয়া অধিকাংশ পণ্ডিতকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তিনি যে সহজে খণ্ডনীয় মতটা বুঝিলেন না, তাহা বড় সম্ভবপর নহে। তিনি কি জানেন না যে, পুস্তকমধ্যে যুক্তিসহকারে কোন মত বর্ণন বা স্থাপনকালে যে সব কথা বলা হয়, আর প্রতিপক্ষের

সহিত সভাস্থলে বিচারকালে তাহার পরিবর্ত্তন ও পরিমার্জ্জন বহুল পরিমাণে হইয়া যায়; আর সেই মতের প্রবর্ত্তক ব্যক্তি যে "হেতু" ও "দৃষ্টান্ত" প্রদর্শন করিয়া নিজ মত স্থাপন করেন, কিছুদিন পরে প্রতিপক্ষের সহিত বিচারের মুখে—সে "হেতু" ও "দৃষ্টান্তের" অনেক পরিবর্ত্তন তাহাকে বা তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্ত আচার্য্যগণকে করিতে হয়। আর এইরূপ হইতে হইতে, অনেক সময় মতের আমূল পরিবর্ত্তনও হইয়া যায়। কুমারিল শঙ্কর প্রভৃতি যে সময় জীবিত ছিলেন, সে সময় প্রাচীন বৌদ্ধমতস্থাপনার্থ তৎকালের বৌদ্ধপণ্ডিত ধুরন্ধরগণকে সেই প্রাচীন মতের কতকটা যে পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল, তাহা কি খুব স্বাভাবিক কল্পনা নহে? আর সেই পরিবর্ত্তন অনুসারে হিন্দু প্রতিপক্ষগণ যদি বৌদ্ধমত নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, তাহা হইলে সেই বর্ণনা যে প্রাচীন বৌদ্ধমতের সহিত কতকটা অনৈক্য হইবে, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? বস্তুতঃ, হিন্দুগ্রন্থে বৌদ্ধমত যেরূপ ন্যায়াবয়ব প্রদর্শনসহকারে বর্ণিত হইতে দেখা যায়, সেরূপভাবের যে কোন বৌদ্ধগ্রন্থ আছে, তাহা তে দেখা বা শুনা যায় না। আর কোন গ্রন্থে থাকিলেও যে তাহা চীন ভাষায় অনুদিত হয় নাই, তাহাই ত এখনও পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। অতএব বৌদ্ধধর্ম্মের জীবিতকালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপক্ষগণের বর্ণিত বৌদ্ধমতকে সহসা অবৌদ্ধমত বলিতে সাহসী হওয়া পণ্ডিতব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় না। বস্তুতঃ শঙ্কর যে বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতেছেন, তাহা সৌত্রান্তিক বৌদ্ধমত। সৌত্রান্তিক মতে পরমাণু অনিত্য। বৈভাষিকমতে পরমাণু নিত্য, ধর্ম্মগুলি নিত্য, তাহাদের লক্ষণ ও কার্য্য অনিত্য। এই নিত্যতাপক্ষ, তিনি বৈশেষিকমতখণ্ডনকালে খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব এস্থলে তাহার খণ্ডন অনাবশ্যক। আমরা দেখিতেছি—পণ্ডিত ইয়ামাকামী সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মত মিশাইয়া ফেলিয়া শঙ্করের উপর অযথা আক্রমণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, পণ্ডিত ইয়ামাকামী শঙ্করের যে সব ভুল দেখাইয়াছেন, ইহা তাহাদের মধ্যে একটা। তিনি এতদ্ব্যতীত বহু বিষয়েই এইভাবে শঙ্করের বৌদ্ধমতানভিজ্ঞতাপ্রদর্শনে প্রয়াসী হইয়াছেন। আমরা কিন্তু যতটুকু আলোচনা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, পণ্ডিত ইয়ামাকামী সকল স্থলেই ভুল করিয়াছেন। পণ্ডিত ইয়ামাকামীই এখনও অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বৌদ্ধমত বুঝিতে পারেন নাই। কারণ, তিনি যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা প্রমাণই নহে; আরতাহার তিনি যে অর্থ করেন, তাহাও অর্থ নহে। তাহার সকল কথার উত্তর দেওয়া এরূপ প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে, এবং তিনি যেরূপ দার্শনিক চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা এবং পরিশেষে শিষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাহার কথার উত্তর দান আবশ্যক বলিয়াই বোধ হয় না। ইহা উন্মত্তের প্রলাপের ন্যায় উপেক্ষণীয়, তবে তাঁহার প্রলাপোক্তিতে যাঁহারা আত্মহারা হন, তাঁহাদের জন্যই ইহা লিখিত হইল। যে বৌদ্ধমতের উৎপত্তিস্থানে বৌদ্ধমতের জন্মদাতারা বিচারে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পরিশেষে বিতাড়িত হইয়াছেন, সেই বৌদ্ধমতের সমর্থনে কোন ব্যক্তিবিশেষ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রকাশক ভাষার সামান্য পরিচয় মাত্র লাভ করিয়া যখন অগ্রসর হয়, তখন মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া ভিক্ষুকশিশুর রাজশরীরে প্রহারোদ্যমবিশেষ মনে করিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। এক্ষেত্রে পণ্ডিত ইয়ামাকামী কি না বলিয়া ফেলিলেন—শঙ্কর একটা সংস্কৃত শব্দের সমাসটা বুঝিতে পারেন নাই। যে ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষার অতি অল্পও পরিচয় রাখে, সে যে সমাসটী বুঝিতে ভুল করে না, তাহাই কি না শঙ্করাচার্য্য বুঝিতে ভুল করিলেন, যে কুমারিল ভট্টের নিকট বৌদ্ধগণ বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন, সেই কুমারিল ভট্ট তাঁহার গুরু ও তৎকালে

বৌদ্ধসমাজের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ধর্ম্মপালেরই নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র, খুব সম্ভবতঃ, অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাই যে শঙ্করাদি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ মাত্রই জানেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের fundamental principle জানিলেন না একথা কি করিয়া পণ্ডিত ইয়াকামী বলিলেন? যে বৌদ্ধমত তাহার উৎপত্তির সহস্র বৎসর পরে নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া অচিরে নির্ব্বাপিত হয়, আর যে শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত মতই সেই নির্ব্বাণের প্রধানতম হেতু হইয়া সেই সহস্র বৎসর পরেও আজ পর্য্যন্ত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই শঙ্করাচার্য্যকে আজ সহস্র বৎসর পরে একজন বিদেশী, বিজাতীয় ভাষাভাষী, যৎসামান্য সংস্কৃতভাষার পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিজভাষায় অজ্ঞ বলা, তাঁহার সময়ে প্রধান প্রচলিত ধর্ম্মমতজ্ঞানে তাঁহাকে অনভিজ্ঞ বলা, যে কিরূপ হাস্যকর বিষয় তাহা সুধীগণেরই উপভোগ্য। যে দেশে সত্যের জন্য পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রাণান্তপণ করিয়া বিচার হইত, আর যাহার ফলে.কুমারিল ভট্টের বৌদ্ধগুরু কুমারিলের সঙ্গে বিচারে পরাজিত হইয়া তুষানলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আর সেই গুরুবধের হেতু হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তের জন্য পরিশেষে কুমারিলও স্বয়ং তুষানলে প্রবেশ করেন, যে দেশে রামানুজের সময় অনেক জৈন পণ্ডিত স্বমত ত্যাগ না করিয়া তৈলযন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াছিলেন, সেই দেশে আজ সত্যের আদর নাই! আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ভোগসুখেরই আদর, তাই আজ সে দেশে সবই শোভা পাইতেছে! আমরা জানিতাম—পণ্ডিতেই পণ্ডিতের সম্মান করিয়া থাকে। পণ্ডিত ইয়ামাকামী আচার্য্য শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় পণ্ডিত ইয়ামাকামীর দৃষ্টিতে শঙ্কর পণ্ডিত নামেরই যোগ্য নহেন, অথবা—।

যাহা হউক, পণ্ডিত ইয়ামাকামী, না হয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠাবুদ্ধির অভ্যাসবশতঃ এরূপ নানা অসঙ্গত কথা বলিলেন, কিন্তু হিন্দুসন্তান কেন যে তাহাতে সম্মতি দেন, কখন কখন স্বধর্ম্মাচার্য্যগণের প্রতি অবজ্ঞা বা উপেক্ষা প্রকাশ করেন, তাহাই দুঃখের বিষয়। বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরব, বৌদ্ধের গৌরব নহে, তাহা হিন্দুরই গৌরব। বৌদ্ধের সন্তান কেহ বড় বৌদ্ধ হইয়াছেন, কৈ তাহাত শুনা যায় না। আর অহিন্দু কেহ বৌদ্ধ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গপুষ্টি করিতেছেন তাহাও ত দেখা যায় না। কোন্ চীন, জাপানী বা তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম্মের কোন্ অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছেন? এ সব পণ্ডিতের কৈ একখানিও পালি বা সংস্কৃত গ্রন্থ দেখা যায় না। হিন্দুই বৌদ্ধ হইয়া বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়াছেন, হিন্দুই হিন্দুর দেশে বসিয়া বৌদ্ধমত প্রচার করিয়াছেন, হিন্দু পরের ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন, হিন্দু পরের ভাষা শিখিয়া তাহাকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, আর সেই হিন্দুই সেই বৌদ্ধমতের ধৃষ্টতা দেখিয়া তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিয়া শৈলসাগরপারে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। দুষ্ট ছেলে যৌবনে দিনকতক গৃহত্যাগ করিয়া দুষ্টামি করিয়া যেমন গৃহে ফিরিয়া আসে, তদ্রূপ হিন্দুর সন্তান দিনকতক বৌদ্ধ হইতেছিল, আজ তাহারা আর বৌদ্ধ হয় না, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধমতের সুসংস্কৃত দার্শনিক অংশ, বৌদ্ধমতের বিচারযোগ্য অংশ, বৌদ্ধমতের ন্যায়সঙ্গত অংশ, যদি জানিতে হয়,—শিখিতে হয়, তবে হিন্দুপণ্ডিতগণ বৌদ্ধমতখণ্ডনাবসরে যে বৌদ্ধমত বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই সংস্কৃতভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থের সহিত উত্তমরূপে আলোচনা করা আবশ্যক। বৌদ্ধমতের ইতিহাস, বৌদ্ধমতের আচারব্যবহার, বৌদ্ধমতের গল্পকথা, বৌদ্ধমতের কল্পনাভেদ—ইত্যাদি অবান্তর বিষয় যদি জানিতে হয়, তবে চীন, জাপানী, তিব্বতী ভাষায় অনূদিত বৌদ্ধগ্রন্থ দেখা আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু সুসংস্কৃত বিচারসহ দার্শনিক অংশের জন্য তাহার আবশ্যকতা খুব অল্পই মনে হয়।

যাহা হউক, শঙ্করকে তাঁহার ভাষ্যাদি দেখিয়া বৌদ্ধমতানভিজ্ঞ বলিতে হইলে আমাদের অনেক কথাই মনে আসে। সম্প্রদায়বিদ্ গুরুর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া শঙ্কর যে গ্রন্থের ভাষ্য করিয়া যে বৌদ্ধমত বর্ণন ও খণ্ডন করিলেন, সে বৌদ্ধমত যে সেই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বৌদ্ধমতই হইবে, তাহাই স্বাভাবিক মনে হয়। আর সেই গ্রন্থকার বর্ত্তমান বৌদ্ধমতের আচার্য্যগণ হইতে প্রাচীন কিনা—এই প্রশ্নও মনে উদয় হয়। তাহার পর শঙ্কর প্রাচীন বৌদ্ধমত যদি খণ্ডন করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান বৌদ্ধমতের সহিত তদুক্ত মতের অনৈক্য হইলে শঙ্করের বর্ত্তমান বৌদ্ধমতানভিজ্ঞতা সিদ্ধ হয় কি না, তাহাও সুতরাং ভাবিতে হয়। বুদ্ধের পূর্ব্বেও বুদ্ধ ছিলেন—ইহাত বৌদ্ধগণও বিশ্বাস করেন; সুতরাং শঙ্করোক্ত বৌদ্ধমত অপর বৌদ্ধমত হইতে পারে কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়। যদি বলা হয়, শঙ্করভাষ্যব্যাখ্যাকালে টীকাকারগণ বৌদ্ধমতের আচার্য্যগণের বাক্যাদি উদ্ধৃত করায় উহা প্রাচীন বৌদ্ধমত হইতে পারে না ; তাহাও কিন্তু বলা যায় না। কারণ, প্রাচীন বৌদ্ধমতের অনুরূপ মত বর্ত্তমানে দেখা গেলে তাহায় উদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যা করিলে যে কোন দোষ হয়, তাহা বলা যায় না। কারণ, পরবর্ত্তী মত যে প্রাচীন মতের নিকট একবারেই ঋণী হয় না, তাহা ত বলা যায় না। তাহার পর, বৌদ্ধমত হইতে প্রাচীন যে বেদ, সেই বেদমধ্যেও বৌদ্ধাদি বহু মতই আছে, এবং বৌদ্ধমতেও বহু প্রকারভেদ আছে, সুতরাং শঙ্করোক্ত বৌদ্ধমত কতিপয় ধ্বংসাবশিষ্ট বৌদ্ধগ্রন্থোক্ত মতের সহিত না মিলিলে যে শঙ্কর কথিত-প্রকারে অবজ্ঞাত হইবার পাত্র হইতে পারেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই সব কথা মীমাংসা না করিয়া সহসা কোন দেশপূজ্য আচার্য্যের নিন্দা করা পণ্ডিতের কার্য্য হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। যে বৌদ্ধমত লইয়া পণ্ডিত ইয়ামাকামী এত কথা বলিতেছেন, সেই বৌদ্ধমত যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা অভ্রান্ত হইতে পারেন কি না এ চিন্তা কতদূর তিনি করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। সর্ব্বজ্ঞ না হইলে অভ্রান্ত হওয়া যায় না। আর নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ এক ঈশ্বর ভিন্ন কাহাকেও স্বীকার করা যায় না। মানুষ যদি সর্ব্বজ্ঞ হয়, তবে সর্ব্বজ্ঞের প্রদর্শিত পথে চলিয়াই হইতে পারে, নচেৎ স্বয়ং বুদ্ধিবলে হইতে পারে না। অজ্ঞ কখনও সর্ব্বজ্ঞ হইবার পথ আবিষ্কার করিতে পারে না। আর তাহারও সে সর্ব্বজ্ঞতা তাঁহার শত শত কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলেও সিদ্ধ হয় না। কারণ, তাঁহার সহস্র কথা সত্য হইলেও যে তাঁহার সহস্র-এক কথাটী যে সত্য হইবে তাহার প্রমাণ কি? অতএব ভগবান্ বুদ্ধেরও কথায় উপর অভ্রান্ততা বুদ্ধি গুরুভক্তি বলিয়া আদরণীয়, কিন্তু তাহা অভ্রান্ত বা প্রামাণিক হয় না। ভগবান্ বুদ্ধের এই সর্ব্বজ্ঞত্ব লইয়াই কুমারিলের সহিত বৌদ্ধগণের যে বিচার হয়, তাহাতেই বৌদ্ধগণ এমন পরাজিত হন যে ভবিষ্যতে আর তাঁহারা মস্তক উত্তোলন করিতে পারেন নাই। এই বিচারের কথা পুণা ডেকান কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত কে বি.পাঠক ভিয়েনায় ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেসে ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রথমপ্রচার করেন। বস্তুতঃ, সর্ব্বজ্ঞ কাহাকেও স্বীকার করিতে হইলে ঈশ্বর স্বীকার করা প্রয়োজন। আর ঈশ্বর যদি স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে সত্যনির্ণয় বা সত্যলাভ কেবল কল্পনারই কথায় পরিণত হয়। সর্ব্বজ্ঞের বাণী উপেক্ষা করিয়া বা অবলম্বন না করিয়া—সত্যনির্ণয় চেষ্টা ব্যর্থ। তাহাতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। বৌদ্ধগণ বুদ্ধকে সর্ব্বজ্ঞ মানিয়াই সত্যান্বেষণে বা সত্যলাভে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বুদ্ধ কি করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হন তাহা

তাঁহারা সম্যক্ আলোচনা করেন নাই বলিয়া, অর্থাৎ বুদ্ধ যদ্দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ হন, তাহাকে সর্ব্বজ্ঞতা-লাভের উপায় না বলিয়া, বুদ্ধের কথাকে সর্ব্বজ্ঞ হইবার উপায় বলায় বৌদ্ধমত ভারত হইতে বিতাড়িত হয়—ভারতীয় পণ্ডিতগণের উপেক্ষার বিষয় হয়, আর এই জন্যই কুমারিল জয়ী হন। যাহা হউক্ এ ক্ষেত্রে পণ্ডিত ইয়ামাকামী মহাশয়ের গুরুভক্তিও ধর্ম্মানুরাগই প্রশংসনীয়, তাহার সত্যানুসন্ধিৎসা প্রশংসনীয় নহে। অমিতবুদ্ধি ভারতসন্তান, অতুলজ্ঞানগৌরবসম্পন্ন ভারত-সন্তান বিচারশীলতা বিসর্জ্জন না করেন—ইহাই প্রার্থনীয় বিষয়। পরের কথায়, শত্রুর কথায় নিজের অমূল্য নিধির প্রতি বিতশ্রদ্ধ না হন, ইহাই আবশ্যক। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সর্ব্বজ্ঞের অরচিত নিত্যবাণী বলিয়া আবহমানকাল প্রাণপণ যত্নে যাহা বক্ষে ধারণ করিয়া আসিতেছেন, তাহার প্রতি বিচারমূঢ়ের ন্যায় অবজ্ঞা প্রকাশ না করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। শত্রুপক্ষ আজ শিক্ষার সাহায্যে এই নিত্যবাণীকে সমাজকথা, চাষার গান, উপকথা বলিয়া বুঝাইয়া দিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের তাহার উপর যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা বিচলিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞের প্রদর্শিত পথে আজ কণ্টক আরোপিত হইয়াছে, সে সর্ব্বজ্ঞের প্রদর্শিত পথে না চলিতে নিঃশ্রেয়স অসম্ভব, সেই পথ আজ অরণ্যমধ্যে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে; এখনও প্রতিকারের সময় আছে।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ ও আলোচনা সাপেক্ষ]

কুম্ভমেলার সময় নির্ণয়।—'ভারতের সাধনা' পত্রিকায় কুম্ভমেলা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধের অনেকটা বঙ্গবাসী পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছিল—সেই পত্রিকায় উদ্ধৃত কুম্ভের বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধীয় অংশ পাঠ করিয়া বোধ হইয়াছিল যে সময় নির্ণয়ে কিছুটা প্রমাদ ঘটিয়াছে।

বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিতে অবস্থান সময়েই হরিদ্বারে কুম্ভমেলার অধিবেশন হয়—সূর্য্য মেষরাশিতে হওয়া চাই—তাই বৈশাখ মাসই ইহার ঠিক্ সময়, যদিও পূর্ব্ব হইতেই মেলা জমিতে আরম্ভ হয়।

তারপর তিন তিন বৎসর অন্তর প্রয়াগ, গোদাবরীতীরস্থ পঞ্চবটী এবং উজ্জয়িনীতে মেলা হইবার কথা। বৃহস্পতি তিন তিন বৎসর অন্তর যথাক্রমে বৃষ, সিংহ ও বৃশ্চিক রাশিতে গমন করেন—তাই প্রয়াগের মেলা বৃহস্পতি বৃষরাশিস্থ হইলে, পঞ্চবটীর মেলা বৃহস্পতি সিংহরাশিতে অবস্থান করিলে, এবং উজ্জয়িনীর মেলা বৃহস্পতি বৃশ্চিকরাশিতে থাকা সময়ে হইবার কথা।

কিন্তু ঐ প্রবন্ধে প্রয়াগের মেলার কাল সম্বন্ধে আছে যে বৃহস্পতি মেষরাশিস্থ হইলে (এবং সূর্য্য মকরে গেলে) কুম্ভের অধিবেশন হয়। এস্থানে বক্তব্য এই যে গত মাঘ মাসে বৃহস্পতি মেষরাশিতে ছিলেন না—ছিলেন বৃষরাশিতে—এবং তাহাই যে হওয়া উচিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এই গেল একটা সন্দিগ্ধ স্থান। অতঃপর প্রবন্ধে আছে—বৃহস্পতি সিংহরাশিস্থ (এবং সূর্য্য মেষ-রাশিস্থ হইলে) পঞ্চবটীতে কুম্ভমেলার অধিবেশন হইবে।

ইহাতে কোনও ভুল দেখা যায় না। বৃহস্পতি বৃষরাশি হইতে সিংহরাশিতে যাইতে তিন বৎসরই লাগে।

সর্ব্বশেষ উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলা সম্বন্ধে আছে, বৃহস্পতি সিংহরাশিস্থ হইলে (এবং সূর্য্য মেষরাশিতে থাকিলে উজ্জয়িনীতে কুম্ভ যোগ হয়। [ঠিক এই কথা পঞ্চবটী সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে; তাহা হইলে পঞ্চবটী ও উজ্জয়িনী এই দুই স্থলে কি যুগপৎ কুম্ভের অধিবেশন হয়!] ফলকথা এখানে বৃহস্পতি বৃশ্চিকস্থ হইলে উজ্জয়িনীতে কুম্ভ হইবে—ইহাই হওয়া উচিত—নচেৎ তিন বৎসরের ব্যবধান ঘটে না।

আশা করি প্রবন্ধলেখক মহাশয় এ সব কথা অনুধাবন করিয়া স্বীয় প্রবন্ধের সংশোধন করিবেন।

ইতি। কাশীনিবাসিনঃ কস্যচিৎ॥

মনসা মঙ্গল।—শ্রাবণ মাসে মনসা দেবীর পূজাবিধি এই দেশে প্রচলিত আছে। আষাঢ়ী কৃষ্ণা:পঞ্চমীতে মনসাদেবীর উৎসব হয়; উহাকে মনসাপঞ্চমী বা নাগপঞ্চমী কহে। শ্রাবণের সংক্রান্তি দিবসে মনসাপূজা ও নাগপূজার ব্যবস্থা আছে। জ্যৈষ্ঠমাসে দশহরার দিন

বঙ্গের অনেক স্থানে মনসার পূজা হইয়া থাকে। এই কাল মধ্যে বিভিন্ন পঞ্চমীতে মনসাপঞ্চমীর ব্রতানুষ্ঠানাদি হয়। এতদ্ব্যতীত বৎসরের সকল সময়ে বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে এদেশে মনসা বা বিষহরির পূজা হইয়া থাকে। এক সময়ে এদেশে এই পূজা মহাসমারোহে সমাহিত হইত, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন ঐ পূজার মাহাত্ম্য প্রচারের নিমিত্ত শত শত 'মনসামঙ্গল' প্রচারিত হইয়াছিল। অনুসন্ধান করিলে আজিও ৪০।৫০ প্রকারের মনসামঙ্গল পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে। কাণা হরি দত্ত মনসামঙ্গলের প্রথম রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ; পূর্ব্ববাঙ্গলায় বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল সবিশেষ প্রচলিত।

মনসামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও এতজ্জাতীয় গ্রন্থের সহিত এদেশের ধর্ম্মেতিহাসের বিশেষ সম্বন্ধ। সমাজতত্ত্বের ইতিবৃত্ত ও লোকচরিত্রের উচ্চ নীতি নির্দ্ধারক বলিয়াও ইহাদের মূল্য অত্যধিক। উচ্চ বৈদিকতত্ত্ব ও তদনুযায়ী যাগ যজ্ঞাদি উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলেও অতি প্রাচীনকাল হইতে সাধারণ জনতার জন্য এদেশে বিভিন্নপ্রকারে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসার লাভ একারণেই হইয়াছিল, তৎপ্রতিপক্ষে পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রতিপত্তিও ঐ ভাবে হয়—এবং উহা কালে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া দেশ মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বসে। পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও নানা দেবদেবীর পূজা• প্রচলন এই রূপেই হইয়াছিল। এবং কালক্রমে তাহা প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠান সমূহের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। স্মার্ত্ত ও পৌরাণিকগণ সংস্কৃত শাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের সহিত সঙ্গতি পরম্পরা সংহিতাবদ্ধ করিয়া ইহাদের আভিজাতিক মর্য্যাদা রাখিয়া গিয়াছেন। আর সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত রাখিবার জন্য কবি ও প্রতিভাবান ব্যক্তিরা দেশ ভাষায় গীতি, মঙ্গলাদি পুস্তক প্রণয়ন করতঃ দেবচরিত্র ও লীলাদি বর্ণন করিয়া এবং উপাখ্যানাদি লিখিয়া গিয়াছেন। অনুমান খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পরে বঙ্গভাষার নূতন বিকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গদেশে এইরূপ মঙ্গল সঙ্গীতের প্রসারলাভ হয়। চৈতন্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত এই মঙ্গল গীতির কালকেই বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান অধ্যায় বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

পূজা-পদ্ধতির কথা ছাড়িয়া দিলেও এইকালে বঙ্গদেশের সাধারণ অবস্থার এক উজ্জ্বল চিত্র এই সকল মঙ্গল গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোকের মধ্যে তখন সুখ-শান্তি বিরাজ করিত, স্বাধীন চিন্তার অবকাশ ছিল, দেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ, বাণিজ্যের অত্যধিক প্রসার ছিল। বিভিন্ন স্থানে—দেশ।বিদেশে—বাণিজ্যযাত্রা চলিত। সিংহলপাটনে বাণিজ্য যাত্রা, 'মধুকর' প্রভৃতি বিভিন্ন নামীয় পোতের বিবরণ, বাণিজ্যসম্ভার ও বাণিজ্যদ্রব্যজাত সজ্জীকরণ, বস্তুবিনিময়, বিভিন্ন রাজ্যের লোক ও রাজসরকারের সহিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সম্বন্ধ এবং নানা সমৃদ্ধ দেশের সমুজ্জ্বল বৃত্তান্তাদিতে এই সকল গ্রন্থ পরিপূর্ণ। ঐ কালে লোকের মনে এমন শান্তি ও সুখ বিরাজ করিত, যাহাতে তাহারা কাব্যামোদ ও সঙ্গীতসুখে দিনাতিপাত করিতে পারিত—এই সকল বহু মঙ্গল সঙ্গীতের প্রচলনে ইহাও প্রমাণিত হয়। মনে রাখিতে হইবে, ইহারা যে সময়ের সমাজের এইচিত্র দান করিতেছে, তখন বৈদেশিক মুসলমান শাসনই দেশমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছিল। চরিত্র অঙ্কণের বিশিষ্টতায়ও এই সকল মঙ্গল সঙ্গীত সমূহ পশ্চাদ্‌পদ নহে। সরলতা, স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতায় সেকালের বর্ণনা একালের অনেক রচনাকে অতিক্রম করিতে পারে। চরিত্রের

উৎকর্ষে এ সকল কাব্যের অনেক নায়ক নায়িকা প্রাচীন মহাকাব্য সমূহে বর্ণিত উৎকৃষ্ট চরিত্র অপেক্ষা হীন নহে। মনসা-মঙ্গলের বেহুলা-চরিত্রে সতীত্বপরীক্ষার তুলনা আর জগতে কোথাও আছে কি না সন্দেহ—"স্ফীত, গলিত, কীটকুলিত, পুতিগন্ধি মৃত পতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে ও নির্ভয় মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা ভাবিতে গেলে, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সতীগণের পতি নিমিত্ত সেই সেই ক্লেশ ভোগও সামান্য বলিয়া বোধ হয়; এবং বেহুলাকে পতিব্রতার পতাকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়। বেহুলাচরিত পাঠ করিলে, সতীর পতিভক্তি ও দেবদেবীর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও অনুরক্তি জন্মে। সাবিত্রী, দময়ন্তী হইতেও বেহুলার সতীত্ব জগতে অতুলনীয়। বেহুলা মানবী হইলেও দেবী, সুতরাং তাহার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রকৃতির বহির্ভূত হইয়া পড়িবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বস্তুতঃ বেহুলার ভাসান, দেবীর বিবিধ প্রকার রূপ গ্রহণ প্রভৃতি লোকাতীত ঘটনা সকল কবির স্বকপোল কল্পিত নহে। ধুবড়ী, বুড়া ধোপাঝীর ঘাট, বেহুলা নদী, চম্পক নগর এবং উজানী গ্রাম—ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।" (স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।)

আবার "একমাত্র সতীত্বের জোরে বেহুলা নানারূপ প্রলোভন ও বিভীষিকার হস্ত হইতে এড়াইয়া মহাদেবের পুরীতে উপস্থিত হন, এবং সেখানে দেবসভায় নৃত্যগীতাদি দ্বারা দেবতাগণকে মোহিত করিয়া, নিজ স্বামীর ও অন্যান্য সকলের জীবন রক্ষা করেন। পাঠক! পদ্মপুরাণখানা অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার পড়িবেন। ইহা কল্পনার কথা নহে; প্রতি পত্রে মর্ম্মের উক্তি—আমরা বেহুলার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে অশ্রু আকুলিত চক্ষে তাহার স্বামীর জীবন প্রার্থনা করিয়া অগ্রসর হইয়াছি। তাহার সৌম্যমূর্ত্তি, সদা হাস্যময় মুখখানা, সুখে সাম্য, দুঃখে সাম্য, মনোমুগ্ধকর স্বভাব, দৃঢ়ব্রত, চরিত্রের লাবণ্য ভুলিবার জিনিষ নহে। কবি স্বচক্ষে সতী দেখিয়া সতী আঁকিয়াছেন। হিন্দু গৃহলক্ষ্মীর চক্ষুলগ্ন জল গড়াইয়া গণ্ডে পড়িতে দেন নাই; ললাটের সিন্দুর-বিন্দু স্বামী বিয়োগের পর আরও উজ্জ্বল হইয়া স্বামীর শব সঙ্গে পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, সেই আগুনে কষিত সতীত্ব যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি বেহুলার চিত্র আঁকিতে পারিবেন না। এস্থলে শুধু ক্ষমতায় কুলাইবে না। মাইকেল এঞ্জেলো ও র‍্যাফিয়েল এখানে অপারগ হইবেন"—ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

ইহার সঙ্গে সম্প্রাণ্ আধুনিক বাঙ্গলার 'ঘরে বাইরে' ও চরিত্র হীনাদির বিভিন্ন চরিত্র সম্বন্ধে অন্তকার পাঠকগণ কি মত পোষণ করিলেন, তাহা আমরা জানি না। অন্ততঃ সেকালের ও একালের শিক্ষা দীক্ষা ও মনোবৃত্তির তুলনা করিয়া তাহারা না দেখিলে একদিন আসিবে, যখন লোকে তাহা করিবার সময় পাইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মনসা দেবীর পূজা উপলক্ষে মনসামঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছিল; তাহাতে মনসা দেবীর মাহাত্ম্য ও লোক চরিত্রের প্রকর্ষ পরিকীর্ত্তিত হইত। এই মনসাপূজা কি তাহা লইয়া আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যে গবেষণা চলিয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশিত মনসামঙ্গল গ্রন্থের এক খানি নূতন সংস্করণে' ঐ ভাবেই লিখিত হইয়াছে—'মনসা নূতন দেবতা নহে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের ইতিহাসে সর্পপূজার রীতি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নানা আকারে ইহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।......অনেকে বলেন, মনসা অনার্য্যের দেবতা, আর্য্যগণ ইহাকে তাহাদের

নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা অসম্ভব নহে; কিন্তু যেমন বৈদিক দেবতা রুদ্রগণ অনেক স্তর ভেদ করিয়া, এবং কতকটা অনার্য্যদিগের দেবতার আদর্শে পুরাণোক্ত মহাদেবে পরিণত হইয়াছেন, মনসা পরিকল্পনায়ও তদ্রূপ মনে হয় বিভিন্ন যুগের ও আর্য্য অনার্য্যের বিচ্ছিন্ন আদর্শের প্রভাব বর্ত্তমান।' এরূপ অসাবধান মন্তব্য প্রকাশ আধুনিক প্রাত্নতাত্ত্বিকতার সাধারণ। ইহার মূল খুঁজিতে গেলে পাশ্চাত্য মতের অনুকরণ ব্যতীত আর কিছু পাওয়া যায় না। ইহাদের স্বকপোলকল্পিত পরিকল্পন সমুদয়ই "বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নানা আকারে প্রচলিত" আবার "বৈদিক দেবতা রুদ্রগণ অনেক স্তর ভেদ করিয়া, এবং কতকটা অনার্য্যদিগের দেবতার আদর্শে পুরাণোক্ত মহাদেবে পরিণত হইয়াছেন"—ইহার কোন্ কথাটী কোন্ নির্দ্দিষ্ট অর্থ বা ভাব বহন করিয়া চলিয়াছে, আমরা তাহা খুঁজিয়া পাই না। 'কতকটা', 'অনেক স্তর' প্রভৃতি এই অনির্দ্দিষ্টতা ও অস্পষ্টতার স্পষ্টতঃ জ্ঞাপক। তথাপি একালের অনেক সিদ্ধান্ত ও উপপত্তিই এইরূপ!

যে মঙ্গল গীতিতে বেহুলা চরিত্রের বর্ণনা—বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পঠিত হইবে বলিয়া প্রচলিত—তাহাতে প্রত্নতত্ত্বের এরূপ প্রক্ষেপ না থাকিলে কোনও দোষের হয় বলিয়া মনে হয় না। প্রত্নতত্ত্বের নিজ ক্ষেত্র আছে। সেখানে ত বেহুলা, চান্দসওদাগর, মনসা প্রভৃতি সহ এ সমুদায়ই কাটিয়া সাগর জল পর্য্যন্ত ভাসাইয়া বিসর্জ্জন দেওয়া চলে। সেজন্য মনসামঙ্গলের সঙ্কলন সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া আবশ্যক, এবং সত্য সত্যই সমুদয় পুস্তকখানি সেই চক্ষেই দেখা সঙ্গত।

তারপর আর একটী কথা বলিতে হয়। মনসাপূজা ও সর্পপূজা এক কথা নহে। "পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের ইতিহাসে সর্প পূজার রীতি প্রচলিত" থাকিতে পারে, ভারতের অনার্য্যদিগের মধ্যেও তাহা থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান বৈদিকধর্ম্মসম্মত তাহাতে সর্পকে সর্পরূপেই পূজা করিবার ব্যবস্থা থাকিতে পারে না। বেদেতে প্রচলিত আকারের কোন পূজা পদ্ধতির পরিচয়ই নাই; প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ইহা খুব সাগ্রহেই মানিয়া লইয়া থাকেন। সুতরাং মনসাপূজাকে সর্পপূজা বলিতে যাইয়া বৈদিক নামের উল্লেখ করা সঙ্গত নহে। প্রচলিত পূজার আকারে মনসা যে সর্পের সহিত এক সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া 'ফেঁাস মনসা' হইয়াছেন, ইহা প্রকৃত ধর্ম্মভাব বিবর্জ্জিত সমাজের আর এক অবনতির কারণ বলিতে হইবে।

সর্প জগতের খল প্রকৃতির নিদর্শক—বিষের আকর—পাপের মূর্ত্তি। বাইবেলের সয়তান ও বেদোক্ত বৃত্রের সর্পরূপে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাপ ও পুণ্য, বিষ ও অমৃত, খল ও সৎ তুল্যরূপেই জগতের স্থিতির জন্য আবশ্যক। অপর অনেক ধর্ম্মেই বিষ বা পাপকে সম্পূর্ণ দুষ্ট বলিয়া বর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা আছে; এবং তাহাতে সংসার দুঃখভাণ্ডার বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুর বিচারে গরল অমৃতেরই পার্শ্বে স্থান পাইয়া থাকে—ক্ষুদ্র দেবতারা অমৃত লইয়া কাড়াকাড়ি করিলেও দেবাদিদেব মহাদেব গরলপানে পরিতৃপ্ত! শিব যিনি মঙ্গল-নিধান, তিনিই অমঙ্গলে দ্বিধাশূন্য—নিরুদ্বিগ্ন!

জাগতিক ব্যাপারের মৌলিক বা চরম তত্ত্ব বা নীতি সকল হিন্দুর বিচারে দেবতা বলিয়া গৃহীত, পূজিত ও দৈনন্দিন জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। এজন্য তাহাদের পূজাপার্ব্বণঅনুষ্ঠানাদির এত বাহুল্য। বিভিন্ন তত্ত্বের বা মৌলিক নিয়মের অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া বিভিন্ন দেবদেবীর

পরিকল্পনা। এ সমুদয় তত্ত্বই এক ঐশী শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র; এবং পরস্পর সম্পর্কিত। বৈদিক বিচারে যাহা সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত আছে, তাহাই পুরাণাদিতে স্থূলভাবে আখ্যায়িকাদিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিভিন্ন পুরাণ, দেবী ভাগবত ও মহাভারত আদি গ্রন্থে নাগমাতা মনসার কাহিনী বর্ণিত আছে। এই সকল কাহিনীর অবলম্বনে পরবর্তী কালে দেশ ভাষায় কথক ও কবিদিগের দ্বারা বিভিন্ন মঙ্গলসঙ্গীত, ব্রতকথা ইত্যাদি রচিত হইয়াছে। মৌলিক তত্ত্বের আভাস ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়; নচেৎ ইহাদের কোনও মূল্য নাই। তাহা হারাইয়াই বর্ত্তমান সময়ে পূজাও অনুষ্ঠানাদির এই দুর্গতি ঘটিয়াছে।

মনসার বর্ণনা এবং মনসা নামের ব্যুৎপত্তিও মাহাত্ম্য পূর্ণ। মনসা কশ্যপ মুনির মানস কন্যা, অথবা ইনি পরমাত্মাকে মনে মনে ধ্যান করেন বলিয়া মনসা নামে খ্যাত। অন্যত্র—মনঃ ভক্তাভীষ্ট-পূরণায় মননং অস্ত্যস্যা ইতি, যদ্বা মননমহঙ্কারমিতি শুতি নাশয়তীতি—দেবী বিশেষ ভক্তের অভীষ্ট পূরণ করেন বা অহঙ্কার নষ্ট করেন বলিয়া মনসা। সর্পের সহিত ইহার নামগন্ধ নাই। ইনি আত্মারামা, বৈষ্ণবী ও সিদ্ধযোগিনী বলিয়া খ্যাতা। এই দেবী জগতে অতিশয় গৌরবর্ণা, সুন্দরী ও মনোহরা, এইজন্য ইহার এক নাম 'জগদ্‌গৌরী,' শিবের শিষ্যা বলিয়া 'শৈবী,' অতিশয় বিষ্ণুভক্তা এই জন্য 'বৈষ্ণবী,' নাগ বা সর্প,কুলের প্রাণরক্ষা করেন বলিয়া 'নাগেশ্বরী,' বিষ সংহারে সমর্থ বলিয়া বিষহরি, এবং মহাদেবের নিকট সিদ্ধযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া 'সিদ্ধযোগিনী' নাম হইয়াছে।

ভৃশং জগৎসু গৌরী সা সুন্দরী চ মনোহরা।
জগদ্‌গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী॥
শিবশিষ্যা চ সা দেবী তেন শৈবেতি কীর্ত্তিতা।
বিষ্ণু ভক্তা ততো শশ্বদ্বৈষ্ণবী তেন নারদ॥
নাগানাং প্রাণ রক্ষিত্রী যজ্ঞে জন্মেজয়স্য চ।
নাগেশ্বরীতি বিখ্যাতা সা নাগ ভগিনীতি চ॥
বিষং সংহর্ত্তুমীশা সা তেন বিষহরীতি সা।
সিদ্ধং যোগঃ হরাৎ প্রাপ তেনাতিসিদ্ধযোগিনী॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ প্রকৃতি খ০ ৪৫ অ০॥

এইরূপ বহু বর্ণনা ও কাহিনী পুরাণাদিতে বিবৃত আছে। মোট কথা বিষধরদিগের রক্ষয়িত্রী ও বিষের হরণকর্ত্রী বলিয়া যে দেবতত্ত্বের পরিকল্পনা তাহা ভারতীয় আধ্যাত্মতত্ত্বেরই অনুকূল। ইহাতে মৌলিক জগৎ তত্ত্বেরই আভাস পাওয়া যায়; কেবল সাপ ধরা বা সর্পপূজা বলিয়া ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত নয়।—হে০ ব০ অ।

মাস-পঞ্জি—আষাঢ় ১৩৩৭

১লা আষাঢ় হইতে।—প্রস্তাবিত রৌণ্ড-টেবিল কনফারেন্সের খরচ পত্রের হিসাব স্থির হইল, ৬½ লক্ষ টাকা খরচ হইবে, ভারতও ব্রিটেন সমভাবে উহা বহন করিবে। ব্রিটিশ ভারতের ৬০ জন দেশী রাজ্যের ১২ জন প্রতিনিধি এই সভাতে স্থান পাইবেন। অক্টোবরের প্রথম ভাগে ইহারা যাত্রা করিবেন—জারমনী তাহার সমর জনিত ক্ষতিপুরণের টাকা পরিশোধ করিয়া ফেলিয়াছেন—কলিকাতাতে ১২৯ জন কংগ্রেস কর্ম্মী ও বোম্বাই সহরে ৮১ জন পিকেটার গ্রেপ্তার হইয়াছে—ঘাটাল মহকুমায় দানপুরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে পিউনিটিভ্ পুলিশ বসাইবার ব্যবস্থা হইল—ভারতীয় নির্ম্মাণ শিল্পের পুনরুদ্ধার কল্পে শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা রোটারী ক্লাবের এক বক্তৃতা দান করিয়াছেন—বিলাতের বেকার প্রশ্ন লইয়া সকল রাজনৈতিক দলের উৎকণ্ঠা বাড়িয়াছে—সার লেস্‌লী স্কটের মতে দেশীয় রাজ্যগুলি ছাড়িয়া কেবলমাত্র ব্রিটিশ ভারত লইয়া ডমিনিয়ান গঠন প্রস্তাব অভাবনীয় বিষয়—পণ্ডিত মালবীয় বলিতেছেন কংগ্রেসইমাত্র দেশের কল্যাণ দান করিতে পারে, গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবর্গকে ছাড়িয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না—পূর্ব্ব আফ্রিকায় একজন হাই-কমিশনার নিয়োগ করা স্থিরীকৃত হইয়াছে—কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণকামী ২৪৩৪০ ফিট পর্য্যন্ত একটি পর্ব্বত চূড়ায় পৌঁছিয়াছেন ; এ পর্য্যন্ত এতদূর লোক উঠিতে পারে নাই—বোম্বাই সহরে পুলিশের সহিত সংঘর্ষে পাঁচ শত লোক আহত হইয়াছে—কলিকাতাতে বহু কংগ্রেস সেবক গ্রেপ্তার হইয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে—রামপুরের নবাব সাহেবের মৃত্যু হইল—সারপুরুষোত্তম ঠাকুরদাস ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করিলেন—উল্টাদীর লবণ নির্ম্মাণকারী সত্যাগ্রহীদের খানা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল, তিনজন স্বেচ্ছাসেবক আহত ও ১১৮ জন ধৃত হইয়াছেন—৯৬ বৎসর বয়সে কর্ণেল বার্ণেসের মৃত্যু হইয়াছে, ইনিই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত সাম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষনা পত্র পাঠ করিয়াছিলেন—অনেক বিদেশীয় লোক মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভিড় করিতেছেন—ঢাকাতে পুনঃ উদ্বেগ বাড়িয়াছে, সরকার পক্ষ স্বীকার করিতেছেন যে উপযুক্ত পুলিশ ব্যবস্থা না থাকাতে পূর্ব্ব বারে হাঙ্গামা এত গুরুতর আকার গ্রহণ করে—পূর্ব্ব আফ্রিকায় শাসন সংস্কার প্রস্তাবে তত্রত্য ইউরোপীয় উপনিবেশিকগণ আপত্তি তুলিয়াছেন—সাইমন কমিশনের রিপোর্ট দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, উহা লইয়া সর্ব্বত্র তীব্র সমালোচনা হইতেছে, বিলাতের ডেলীনিউজ পত্র বলে যে, আসল কথা যে স্বায়ত্বশাসন কমিশন তাহাই ত্যাগ করিয়াছে—বঙ্গের সার্জ্জন জেনারেলের রিপোর্টে প্রকাশ কলিকাতাতে হাসপাতালব্যবস্থা অতি সঙ্কীর্ণ—কলিকাতায় মহিলা সত্যাগ্রহিনীগণ বিলাতী কাপড় বর্জ্জনে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন—পণ্ডিত মালবীয় বলিতেছেন যে রাউণ্ড টেবিলের সভা লণ্ডনে না হইয়া দিল্লীতে হওয়া আবশ্যক—বিভিন্ন স্থানের কংগ্রেস নেতৃগণ ধৃত ও দণ্ডিত হইতেছেন—বলীভিয়াতে রাষ্ট্রবিপ্লবে আহত হইয়াছে—টঙ্কের নায়ব ৮১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন—ঢাকার অবস্থা এখনও সঙ্কটময়—ভারতগভর্ণমেণ্ট সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে মত প্রচারে ব্যস্ত হইয়াছেন—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও ডাঃ মামুদ এলাহাবাদে গ্রেপ্তার হইয়াছেন—ইহাদের ছয় মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হইল—পূর্ব্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভুমিকম্প হইল—সুদৃঢ় পিকেটিংএর ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিলিমিনারী ল পরীক্ষা বন্ধ হইল—লণ্ডন সহরে ভারত দপ্তরের নূতন বাড়ী সম্রাট কর্ত্তৃক খোলা হইল—মৌলভী মহম্মদ ইয়াকুব ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি মনোনীত হইলেন—বিলাতের বর্ত্তমান বেকার সংখ্যা ১৮৯০০০০ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে—মিঃ জিন্না লণ্ডন কনফারেন্সে যোগদান করিতে সঙ্কল্প করিতেছেন—সার হরি সিং গৌর ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন—পিকেটিং ফলে কলিকাতা কলেজ সমূহে ছাত্রগণ উপস্থিত হইতেছে না—প্রসিদ্ধ জারম্যান লেখক জেনারেল ভন বার্ণহার্ডির মৃত্যু হইয়াছে—ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জে মুসলমানের দাঙ্গায় ৯ জন হিন্দুর প্রাণ নাশ ঘটিয়াছে—হিন্দুগন আতঙ্কে জেলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে—৩১শে আষাঢ় পর্য্যন্ত।

No. Regd.C—1789.

Printed at the B. P. M.'s Press, 22-5B Jhamapukur Lane by B. Dutt and published by him from, 64, Beohu Chatterjee Street, Calcutta

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনামূলক ভাব-ধারার বাহক সময়োপযোগী
মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম এ সম্পাদিত

বিষয়

প্রথম বর্ষ } ভাদ্র ১৩৩৭ { একাদশ সংখ্যা

ভারতের সাধনা—নিয়মাবলী

সাধারণ

১। প্রতি বাঙ্গলা মাসে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয়।

২। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র এবং বৈশাখ হইতে আশ্বিন—দুই ষাণ্মাসিক হিসাবে বৎসর গণনা হইয়া থাকে। গ্রাহকগণ ষণ্মাসের প্রথম হইতে অথবা বৎসরের যে কোনও সময় হইতে পত্রিকা লইতে পারেন। মূল্য বার্ষিক ৪৲, ষাণ্মাসিক ২॥০, প্রতি সংখ্যা ।৵০, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

৩। পত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন।

৪। টাকা-কড়ি ও চিঠি-পত্র ম্যানেজার বা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন

দেশের ধর্ম্ম, অর্থ, জ্ঞান ও স্বাস্থ্য সাধনার নির্দ্দেশক সমুদয় বিষয়ের বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে গৃহীত হয়; অশ্লীল ও সমাজের অনিষ্ট-কর বিষয়ের বিজ্ঞাপন পরিত্যাজ্য। বিজ্ঞাপনের হার সাধারণ—কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত স্থির করিবেন

এজেন্সী

মাসে অন্ততঃ ১০খানি পত্রিকা লইলে কেহ এজেন্ট হইতে পারেন। উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্টগণ নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশী বা কম দরে পত্রিকা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। প্রতি মাসের হিসাব ঐ মাস মধ্যে পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে; না করিলে পর মাসের পত্রিকা পাইবেন না। পার্শেল পাঠাইবার খরচ আমরা বহন করি; কিন্তু মনি-অর্ডার কমিশন বা পত্রাদি লিখিবার খরচ এজেন্টকে বহন করিতে হইবে।

৮৪নং বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ
ভারতের সাধনা কার্য্যালয়।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

প্রথম বর্ষ] ভাদ্র—১৩৩৭ [একাদশ সংখ্যা

সাধনার পথে

একটা কথা অনেক স্থানে শুনা গিয়াছে। ভাষণ তার নানা প্রকার হইলেও অর্থ এক।

একবার—সে নাকি আজ বিশ পঁচিশ বৎসরের কথা—পশ্চিম হইতে একদল সন্ন্যাসী আসিয়া ভাগীরথীর পারে আড্ডা করিয়া বসে। একদিন জোয়ার হইয়া গিয়াছে, গঙ্গার বেলাভূমি কর্দ্দমময়। সাধুরা অনেকে তীরে বসিয়া দাঁতন করিতেছে, শীঘ্রই স্নান করিবে। নিকটে ফেরী ষ্টিমারের ঘাট—জেটি বান্ধা রহিয়াছে। শীঘ্রই ষ্টিমার আসিয়া লাগিবে; অনেক লোক পরপারে যাইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। অনেকেই কাদা মাড়াইয়া গিয়া জেটিতে উঠিতেছে। একজন গোরা সবুট আসিয়া উপস্থিত, ওপারে যাইবে; কাদা দেখিয়া সে প্রমাদ গণিল; একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়াই তীরের দিকে ছুটিল এবং যেখানে সাধুরা কাদার উপরে বসিয়া দাঁতন করিতেছিল সেদিকে গিয়া তাহাদের কাঁধে পা ফেলিতে ফেলিতে জেটিতে গিয়া উঠিল। জুতার নালে সাধুদের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল! কিন্তু তাহাদিগের ভ্রূক্ষেপ নাই—অনেকে পূর্ব্বের ন্যায় দাঁতন করিতে লাগিল; কেহ বা গঙ্গার জলে রুধিরাক্ত কলেবর ধুইয়া ফেলিল।

দরবারে পৌছানা

দূরে গুরুজী বসিয়াছিলেন, ঘটনা দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন; চিমটা হাতে রোষে ছুটিয়া আসিলেন ও সাধুদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন—চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শালা লোগ্ সাধু হুয়া—সাধু হুয়া—দরবার মে পৌছা দিয়া!"

এদিকে ষ্টিমার আসিয়া জেটিতে লাগিল, গোরাপুঙ্গব সর্ব্বাগ্রে গিয়া তাহাতে উঠিলেন; অন্য সকল যাত্রী লইয়া ষ্টিমার অপর পারে ছুটিল। ওপারেও ঐরূপ এক জেটি; গোরাটী সর্ব্বাগ্রে গিয়া তাহাতে পৌছিতে উদ্‌গ্রীব—ঝুকিয়া পড়িলেন। ষ্টিমার গিয়া প্রথমে জেটিতে এক ধাক্কা মারিল, পর মুহূর্ত্তে ফিরিয়া খানিকদূর গঙ্গার দিকে চলিয়া, পুনঃ গিয়া জেটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে গোরা ফাঁকের মধ্যে পড়িয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহাকে আর পাওয়া গেল না।

উৎপীড়ন-নির্য্যাতন জীব মাত্রের সাধারণ অদৃষ্ট ফল। ইতর প্রাণীরা স্বভাবের হাতে যে দুঃখ ভোগ করে, সভ্যতাভিমানী মানব আপন সমাজ ব্যবস্থায়, স্বজনের হাতে, তদপেক্ষা তীব্রতর যাতনা পাইয়া আসিতেছে—মানুষ মানুষের হাতে যে দুঃখ যন্ত্রণা পায়—যে ঘৃণা দ্বেষ ও নৃশংসতার পরিচয় পাইয়া থাকে, ইতর প্রাণীর পক্ষে তাহার লেশ মাত্র নাই। দৈব-নিগ্রহ বা আধিদৈবিক দুঃখ,ব্যাঘ্র সর্পাদি জনিতযে আধিভৌতিক যন্ত্রণা,এবং আপন মনোগত অথবা মনেজাত

হেতু

আধ্যাত্মিক যে কষ্ট, পণ্ডিতেরা দুঃখ পর্য্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা গুরুতর দুঃখ রহিয়াছে, যাহা মানুষ মানুষের হাতে পায়—পরপীড়ন, পরস্বাপহরণ, হত্যা, লুণ্ঠন, নিষ্কাষণ, মিথ্যা, প্রতারণা, লাঠি-বন্দুক-কামান-বোমা ও বাক্যবাণ জনিত বিবিধ কষ্ট। আবার দৈবের হাতে মানুষ যে নিগ্রহ ভোগ করে অথবা নৈসর্গিক কারণে আকস্মিক যে সকল বিপদ ঘটে, তাহার ফল সহজেই নিঃশেষ হইয়া যায়—অদৃষ্ট বলিয়া মানুষ তাহা মাথা পাতিয়া লয়। কিন্তু মানুষের হাতে মানুষের যে কষ্ট বা যাতনা আইসে, তাহা সে ভুলিতে পারে না। প্রতিক্রিয়ায় তাহা নানারূপে বাড়িয়া চলে। তাহার ফলও আবহমান কাল চলিতে থাকে। কর্ম্ম-ফল বলিয়া যে জাগতিক নীতি মানবীয় ব্যাপারে এত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বসিয়াছে, তাহা মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারেই প্রধানতঃ প্রয়োগ করিতে হয়—কর্ম্মের বিনাশ হয় না।

মানুষ মানুষের হাতে নির্য্যাতিত হইয়া তার প্রতিকার চাহে। তুমি যখন ঘরে

অভিযোগ

বসিয়া আপন ধন প্রাণ লইয়া নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিলে না, স্ত্রী-কন্যা বা পুত্রগণ সহ বসতি করিতে নিরাপদ গণিতে পার না,—ধর্ম্মালয়ে, কর্ম্মশালায়, বিদ্যামন্দির, পথে, ঘাটে কোথাও নিষ্কৃতি নাই—আততায়ীর অত্যাচারে সন্ত্রস্ত ও বিহ্বল হইতে হইবে, তখন তার প্রতিকার খুঁজিতেই হইবে। রাষ্ট্রে ইহার ব্যবস্থা আছে—আইন-আদালত বিপন্ন ও অত্যাচারিতের পক্ষ সমর্থন করে। ন্যায়ের তুলাদণ্ডে পরিচালিত হইলে, তাহাতে রক্ষাও পায়। কিন্তু তাহাতে কোনরূপ খুঁত থাকিলে জঞ্জাল আরও বাড়িয়া চলে।

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চাহে, অত্যাচারে প্রতিহিংসা—পশু মানব, বর্ব্বর-মানব বহুদিন তাহাতে লাগু হইয়া ছিল—আপনার হাতে আপনি সমুদয় ব্যবস্থা করিত। এখনও কখন কখন তাহা করে। পরে ক্রম-বিবর্ত্তে সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র যখন সমাজ রক্ষার ভার গ্রহণ করিল,

প্রতিকার পথ
—বিভিন্ন দরবার

তখন সে বর্ব্বরতা হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রও ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র—সম্পূর্ণ বর্ব্বরতা-বর্জ্জিত নহে। অনেক সময়ে তাহা সমধিকরূপেই লক্ষিত হয়। নির্য্যাতিত মানবের সকল অভিযোগ রাষ্ট্রের দরবারে পৌছায় না—তখন তাহাকে আরও উচ্চতর দরবারের আশ্রয় লইতে হয়। এই দরবারে পৌছিতে পারা

মানবীয় সাধনার এক উচ্চ কথা—ধর্ম্মশাস্ত্রে উহা ভগবদ্‌নির্ভরতা, 'রিজিগ্‌নেশ্যান্' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে, অনেক ধর্ম্মের ইহাই চরম কথা। তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়; সে জন্য কোনও প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না—মুখের বাক্যটী পর্য্যন্ত নহে। গঙ্গাতীরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। অহিংস-নীতির ইহা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অহিংসার সহিত ঈশ্বরানুরক্তি সংমিশ্রিত থাকিলেই তাহার সফলতা দেখা যায়—স্থির ও নিশ্চিত

অহিংসা ও ধর্ম্ম

গতিতে তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকে। সক্রিয় অহিংসাকে ভগবদ্‌রসে সম্পৃক্ত থাকিতে হইবে—নাস্তিকের তাহাতে অধিকার নাই; নাস্তিকের পক্ষে উহা অবলম্বন করাও অসম্ভব। অহিংস্রের নীরব অভিযোগ দরবারে পৌঁছিলে তাহার ফলে বিশ্ব চমকিত হয়!

কিন্তু আর্য্য-সাধনা ইহা লইয়াই সন্তুষ্ট নহে। এখানেও তার পরিসমাপ্তি নাই। তাই শিষ্য-দিগের আচরণে গুরু চটিয়া আরক্ত হইলেন! শিষ্যদিগের ঈশ্বরানুরক্তি তাঁহার সবিশেষ জানা ছিল,

শেষ দরবার

দরবারের চিত্রও তাঁহার চক্ষে স্পষ্ট সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সাধনায় সিদ্ধি এত শীঘ্র সম্পন্ন হয়—খণ্ডেতে যার পরিসমাপ্তি, অনন্তের উপাসক, বিশুদ্ধ অহিংসার প্রতীক, অখণ্ড বিশ্ব-নীতির মর্ম্মজ্ঞ আর্য্য-সাধক সর্ব্ব প্রকার সসীম ও খণ্ডকে নিঃশেষিত হইতে দেখিতে পায় বলিয়া, শেষের দরবারে সকল প্রতিকার পাইতে চায়।

প্রাথমিক শিক্ষা বিল

এবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন কালে বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। 'শিক্ষার উন্নতি' একান্ত আবশ্যক, দেশের 'নিরক্ষরতা দূর' হওয়ার প্রয়োজন—ইহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। ইহার পূর্ব্বেও এ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতা-মূলক করিবার নিমিত্ত চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। বিগত ১৯১৯ অব্দে ব্যবস্থাপক সভার সভাসদ্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ রায় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে এক আইন বিধিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পান। তৎপর বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিয়োগক্রমে মিঃ বিস্ প্রাথমিক শিক্ষার একটী স্কীম' বা পরিকল্পনা দেন। সেই স্কীমে গভর্ণমেণ্টকে কোনও সহরে বা ইউনিয়ানের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের —এক কালীন ও পুনরাবর্ত্তিত খরচ উভয়ের— অর্দ্ধেক অংশ বহন করিবার কথা থাকে এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের অবশিষ্ট অর্দ্ধেক টাকা বহন করিবার কথা হয়। তখন সে স্কীম কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই, এতদুভয় পক্ষের টাকা দেওয়ার অভাবে। মোট কথা অর্থের অভাবেই এদেশের শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিয়া আসিতেছে। (অন্য দেশের তুলনাতে ভারতে শিক্ষার জন্য শাসন কর্ত্তৃপক্ষের কত ব্যয় হয়, তাহা দেখিবার জন্য বর্ত্তমান সংখ্যা "ভারতের সাধনা"তে প্রকাশিত 'অন্ধকার ভারত' নামক প্রবন্ধের প্রতি পাঠকগণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারেন:)

শিক্ষা এক্ষণে রাজসরকারের হস্তান্তরিত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত—দেশীয় মন্ত্রীর দপ্তরে। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ তাহাদের কার্য্যতৎপরতা দেখাইতে অবহেলা করিতে পারেন না। গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে আইনের এক পাণ্ডুলিপি বিগত সভায়ও উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। একটী সিলেক্ট কমিটীতে

তাহার বিশেষ আলোচনাও হইয়াছিল ; সে কমিটী তখন নানা সংশোধন প্রস্তাবসহ এক রিপোর্ট দান করেন। কিন্তু তখন মন্ত্রীমণ্ডলের পতন হওয়ায় ও মন্ত্রীগঠন লইয়া বিশৃঙ্খলা চলিতে থাকাতে, কোনও কাজই হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাতে পুনঃ একটী পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছিল এবং আর একটী সিলেক্ট কমিটীর হস্তে তাহা অর্পিত হইয়াছিল ; কমিটী যথা সময়ে সংশোধন প্রস্তাব সহ তাহার রিপোর্ট দিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই কমিটীর সংশোধিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে কার্য্য বরিতে সমর্থ হন নাই। উহা প্রত্যাহার করিয়া বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এক নূতন পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন। সরকারের ভাষাতে কোনও "অধিকতর কঠোর ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য—" ট্যাক্স কাহারও ইচ্ছাধীন রাখা যাইতে পারে না ; শিক্ষার ন্যায় উহাকেও বাধ্যতা-মূলক করিতে হইবে। আইনও পাশ হইয়া গিয়াছে।

মোট কথা বাধ্যতামূলক ট্যাকস্ আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে, বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহার কঠোর শাসনেরও সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা রহিয়াছে। তাহার কোনও আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল যে অবস্থায় এই আইন এত শীঘ্র পাশ হইয়া গেল, তাহার বিষয়ে দুই একটী কথা না বলিলে চলে না।— প্রথমতঃ, দেশে আজ যে দুর্দ্দিন উপস্থিত তাহাতে সার্ব্বজনীন শিক্ষার ন্যায় একটী বিশাল ও গুরুতর বিষয়ের সম্যক আলোচনা করা ও তাহাতে সুবিচারিত কোনও সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব ও লোকের নিতান্তই অনবকাশ। ব্যবস্থাপক সভায় এই 'নূতন' বিল লইয়া, ধরিতে গেলে, কোনও আলোচনাই হয় নাই। এইরূপ ছড়াছড়ি ও সাত তাড়াতাড়ি ব্যাপারে রুষ্ট হইয়া অন্যতম মন্ত্রী কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর রায়কে পর্য্যন্ত মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইয়াছে ; আর ব্যবস্থাপক সভায় উহার আলোচনাকালে প্রায় সমুদয় হিন্দু সভ্য গণ সভাস্থল ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসেন—অথচ ইহারা সকলেই অতি নরম, সহযোগপন্থী। প্রকৃত শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষা-তত্ত্বাভিজ্ঞ লোকের করস্পর্শ এই পাণ্ডুলিপিতে কত দূর আছে, তাহাও ভাবিবার বিষয়। দেশের প্রকৃত অবস্থা, লোক-প্রকৃতি ও প্রচলিত শিক্ষার দোষ গুণাদি বিষয়ে, এ পাণ্ডুলিপির অসংখ্য দফার মধ্যে কোথাও কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, পাঠবিধি বা শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরে কোথাও একটী কথা নাই ; অথচ এ শিক্ষার গুণে দেশের লোক এক্ষণে সকল দিকেই উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম-শিক্ষার একস্থানে উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু এ বিস্তৃত বিবরণে কোনও অধ্যায়ের কোনও প্রকরণই এত অল্প কথাই শেষ করা হয় নাই—উহা যে নিতান্তই অনভিপ্রেত তাহা সহজেই ধরা পরে। মোট কথা এ আইনের পাণ্ডুলিপি, উহার উদ্দেশ্য ও হেতুবাদ ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যার কোনও স্থানে তেমন মৌলিকতা বা স্বভাব-সরলতা দেখিতে পাওয়া যায় না, যেমন কোনও পুরাতন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আর্টিকল-অব-এসোসিয়েসন ও মেমরেণ্ডাম—মিকানিক্যাল্ বা কৃত্রিমতা-পরিপূর্ণ। শেষ কথা, বর্ত্তমান সময়ে এদেশের সর্ব্বাপেক্ষা যে দুরদৃষ্টের ফল—সাম্প্রদায়িকতা বা কমিউনেলিজ্‌মের পরিপোষণ ও সম্প্রসারণ, এ আইন সম্পূর্ণরূপেই সে দোষে দুষ্ট। যেমন ব্যবস্থাপরিষদ-নির্ব্বাচন ও চাকুরী বা পদোন্নতি প্রভৃতির ব্যবস্থায় এরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র আজ সম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া রহিয়াছে, এই নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহা হইতে মুক্ত নহে ; আর প্রথম হইতেই ইহা সম্প্রদায়বিশেষের হাতে রাখিয়া সে বিষ আরও তীব্রতর করা হইল।

কংগ্রেসে কোপ

যে দিন লাহোর কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছে, সেদিন হইতে যে শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টির ব্যতিক্রম ঘটিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। বিলাতে সাইমন কমিশনের অসম্ভব রকমের অভিমত প্রকাশ ও তাহার প্রস্তাবিত শাসন শৈলীর ব্যবস্থায় এবং এদেশের ইউরোপীয় সমাজের বাক্য ও আচরণে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ভারত গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস কার্য্যকারী সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং দেশনায়ক তাহার সদস্যগণের গ্রেপ্তার ও শাস্তি বিধান করিতেছেন। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজ তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন—তাহাদের মতে কংগ্রেস সম্পর্কিত যাবতীয় সম্পত্তি ও টাকা কড়ি সর্ব্বত্র বাজেয়াপ্ত করা এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতি গুলিকে বে-আইনী বলিয়াঘোষণা করিয়া তাহাদের তহবিলাদি সরকারের বাজেয়াপ্ত করা আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট হয়ত সে কথা শুনিবেন এবং আগামী করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনেরও আশঙ্কা আছে।

কিন্তু কংগ্রেসই যে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। আদর্শে ভুল থাকিতে পারে, জাতীয় সংস্কৃতির সকল বিষয় এখনও উহার প্রকৃতিতে না বসিয়া থাকিতে পারে, বিজাতীয় ভাব ও মনোবৃত্তি লইয়াই এখনও তার অঙ্গ পরিপুষ্ট, কিন্তু বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া আজ ভারত রাষ্ট্র ক্ষেত্রে যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহাতে কংগ্রেসেরই পূর্ণ কৃত-কৃত্যতা। রাষ্ট্রপরিষদ্‌, সাম্রাজ্যিক সভা বা গোলটেবিলের বৈঠক—এ সমুদায়ই ভারতের সেই রাজনৈতিক উৎকর্ষের আধারে পরিস্থিত; এক্ষণে কংগ্রেসকে অস্বীকার করিয়া কোনও আয়োজন করিতে যাওয়া, রামশূন্য রামায়ণ গাওয়া বা 'হ্যামলেট' চরিত্র-বিবর্জ্জিত হ্যামলেটের অভিনয় করার মতনই হইবে। বড় লাট লর্ড আরউইন্ বিলাতী ও এদেশীয় ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্যস্থলে থাকিয়া কংগ্রেসের এ মর্য্যাদা রক্ষার কতক চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সেজন্য স্থানবিশেষে তাহাকে 'দুর্ব্বল গভর্ণমেণ্ট' বলিয়া তিরস্কৃতও হইতে হইয়াছে। ফলে শক্তিসম্পন্ন গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস বিরোধ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিষয়ে ইহাতে সত্য সত্যই আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস আর কেবলমাত্র ব্যক্তি-সমষ্টি নহে; ক্রমে উহা জাতীয়তার প্রতীকে পরিণত হইয়াছে। উহার বাহ্যিক মূর্ত্তি বিনাশ পাইলেও জাতির অন্তরে উহা চিরকাল বিরাজ করিবে। আর উহার বাহিরের আচরণে এক্ষণে যতই দোষ থাকুক না কেন, মহাত্মা গান্ধির পৌরোহিত্যে কংগ্রেসে সত্য ও অহিংসা নীতির যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে সভ্য-জগতে নিশ্চয় উহা পূজা পাইবে। আর সত্য ও নীতির শক্তিই জগতে প্রবল হইলে, উহা বাঁচিয়াও থাকিবে।

মধ্যস্থতার ফল

ব্রিটিশ রাজশক্তি ও ভারতের স্বরাজ পন্থীদিগের মধ্যে এক্ষণে যে সংঘর্ষ চলিতেছে, তাহার যাহাতে আপোষ মীমাংসা হইয়া, প্রস্তাবিত গোলটেবিলে ইংরেজ ও ভারতীয়ের সম্মিলিত বৈঠকে

কোন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য যে অতি সাধু, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। এজন্য উত্তরপশ্চিম যুক্ত প্রদেশের শ্রীযুক্ত তেজ বাহাদুর সপ্রু ও মহারাষ্ট্রের মুকুন্দরাম জয়াকরের নাম খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইঁহারা প্রথমতঃ মহাত্মা গান্ধী ও পরে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও জহরলাল নেহেরুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, ইয়ারাবাদা জেলে মহাত্মা গান্ধীর সকাশে কারারুদ্ধ কংগ্রেস নেতাগণের এক সম্মিলন ঘটান। বহুদিন ধরিয়া নানাবিধ আশা-নিরাশার সংবাদ বহন করিয়া অবশেষে এ মধ্যস্থতা ব্যর্থ হইল। কোনও পক্ষ অপর পক্ষের দাবীর প্রতি কর্ণপাত করেন নাই। কোন্ পক্ষের দাবী কি ছিল তাহা স্পষ্টতঃ জানা যায় নাই। পত্রান্তরে প্রকাশ সরকার-পক্ষ নাকি বিনা সর্ত্তে সিভেল 'ডিসওবিডিয়ান্স' আন্দোলন প্রত্যাহার করিতে চাহিয়াছিলেন; অপরদিক স্বরাজী পক্ষের দাবী (১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদের অধিকার; (২) ভারতবর্ষের লোকের নিকট দায়িত্বসম্পন্ন শাসনতন্ত্র; (৩) ভারতবর্ষে যতপ্রকার ব্রিটিশের দাবী-দাওয়া আছে বা সুবিধা রহিয়াছে, রাষ্ট্রিয় ঋণ সহ, প্রয়োজন মত কোনও নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট তাহার বিচার বা মীমাংসার ভার অর্পণ করিবার অধিকার; (৪) কোনও হিংসা-কার্য্য করে নাই এমন রাজনৈতিক বন্দীগণের মুক্তিদান; (৫) সিভিল ডিসওবিডেন্স বা আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করায় স্বীকৃতি; কিন্তু মদ ও বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেট বন্ধ না করা, এবং লোকের নিজে নিজে লবণ তৈয়ারী করিবার অধিকার পাওয়া।

বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ

আজ দেশের সর্ব্বত্র যে তাণ্ডব চলিতেছে, তাহাতে যাঁহারা কোন প্রতিকার পাইতে চাহেন, তাঁহারা বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারে দিন দ্বিপ্রহরে কলিকাতা পুলিশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অধ্যয়ন-রত ছাত্রদিগের প্রতি যে মারপীট করিয়া গিয়াছে, তাহা হইতে কতকটা সোয়াস্তি লাভ করিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপকগণ ও রেজিষ্ট্রার, কনট্রলার প্রভৃতি উচ্চ দায়িত্ব-সম্পন্ন কর্ম্মচারীগণ তখন বিদ্যালয় মধ্যেই অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র না বলিয়া, রাস্তা ঘাটে ও লোকের বাড়ীর মধ্যে যেমন মারপীট হইয়া আসিতেছে, সেই ভাবেই পুলিস্ সার্জ্জেণ্টগণ দল বাঁধিয়া গিয়া বিদ্যালয়ের উচ্চমন্দিরে প্রবেশ করে। শুনিতে পাওয়া যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-নিযুক্ত ভাইস-চেনসেলার মহাশয় তখনই পুলিশ কমিশনারের স্থানে যান, এবং পুলিশ-কমিশনার তাহাকে কয়েকটী উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হইতে বলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবুধ মণ্ডলী তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই—সমুদয় সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ, পোষ্ট-গ্রেজুয়েট কৌন্সিলের কার্য্যপরিচালক-সমিতি ও আইন-কলেজের গভার্ণিং বডি একত্র হইয়া একটী আপৎ-কালিক সভার অধিবেশন করেন। প্রথমতঃ ভাইস-চেন্সেলার মহোদয় এই বিপদের কথা সকলকে জানান ও ছাত্র-প্রতিনিধি সভা এবিষয়ে যে আবেদন তাহাকে জানাইয়াছেন তাহাও পাঠ করেন; এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি মাননীয় এস, কে, ঘোষ মহাশয় তাঁহার পুত্র প্রহৃত হওয়াতে যে বর্ণনা-পত্র দিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করেন। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সম্মিলিত সভা পুলিশের এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রতি তীব্র ঘৃণাসূচক প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করেন—

নির্য্যাতিত ছাত্রদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন—পুলিশ কর্ম্মচারীগণের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত প্রতিবিধান করিতে মনস্থ করেন—এবং এবিষয়ে আবশ্যক তদন্তাদি করিবার নিমিত্ত সার নীলরতন সরকার, অধ্যাপক হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, ডাঃ আরকুহার্ট, শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সার সি, ভি, রমন, ও অধ্যাপক রাধাকিষণ প্রভৃতি প্রবীণ ও খ্যাতপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হওয়ার কথা হয়। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের কর্ণধার ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন্ সাহেব সিণ্ডিকেটের সভাষদ্‌রূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আপত্তি করিয়া বলেন, যে প্রস্তাবগুলি যখন গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের তিরস্কারব্যঞ্জক, তখন গভর্ণমেণ্টভৃত্যদিগের পক্ষে ইহার সকল প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া সম্ভবপর নহে। তখন ভাইস চেনসেলার মহোদয় বলিয়া দেন যে, প্রস্তাব সকল গভর্ণমেণ্টের তিরস্কার-ব্যঞ্জক নহে, পরন্তু পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের ঔদ্ধত্যের নিন্দাবাচক মাত্র। প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়।

এইরূপ প্রস্তাবের ফলাফল যাহাই হউক না কেন, ইহার একটি পরোক্ষ ফল (side issue) আছে। এদেশে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কাণ্ড চলিতেছে, তাহাতে দেশের পণ্ডিত সমাজের কোনও হাত বা দৃষ্টি নাই; তাঁহারা হয় ভীত, নয় উদাসীন, অথবা সাম্প্রদায়িকতা দোষে দূষিত। অবস্থার পীড়নে অনেকেই জড়সড় একথা স্বীকার করিতে হইবে—দারিদ্র্য ও উপায়হীনতা অনেক সময়ে স্বার্থপরতার নাম গ্রহণ করে। আর বর্ত্তমান ভারতের নানারূপ উপায়হীনতার মধ্যে যে তাহার প্রসার বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু আজ এদেশে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধার্ম্মিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে নানা বিশৃঙ্খলা ও বিরোধ চলিতেছে, তাহাতে সুধীমণ্ডলীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সকল সমস্যার মীমাংসা এক্ষণে একদিকে উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলনকারীগণের হস্তে ও অপরপক্ষে সংকীর্ণ রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতির মধ্যে নিবদ্ধ। ফলে গোলযোগ বাড়িয়াই চলিতেছে। এবং ইহার পরিণাম কতদূর শোচনীয় হইতে পারে, তাহারও সূচনা দেখা যাইতেছে। এইরূপ কথা বলিতে হইতেছে এই জন্য যে, ভারতের সকল প্রশ্নের ন্যায় এই সকল সমস্যার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এবং তাহার সমাধানেরও বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। যুগ যুগান্তর ধরিয়া ভারতে নিত্য নূতন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সমাধান হইয়াছে সর্ব্বোপরি এক উপায়ে—জ্ঞান-বিজ্ঞান (intellectual) ও আধ্যাত্মিক (spiritual) দৃষ্টিতে, অথবা এতদুভয়ের যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান ভারতের চির আচরিত সাধনায় হইয়াছে—তাহারই সেই (culture এর) শক্তিতে। ভারত চিরকাল সমুদয় অন্যায় ও বিপদের বিরুদ্ধে সেই শক্তিতেই এক প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থন ও সংরক্ষা (cultural defence) দিয়া আসিয়াছে। পণ্ডিতমণ্ডলীর তাহাতে বিশেষ অধিকার—সকল মানবের তাঁহাদিগের নিকট সে ভরসা ও প্রত্যাশা।

গোলটেবিলে গোল

আগামী মাসে লণ্ডনে 'রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স' বা গোল টেবিলের সভা বসিবে—কংগ্রেসকে বর্জ্জন করিয়াই এই সভার আয়োজন হইতেছে ও সে অনুসারে সভ্যগণ আমন্ত্রিত

হইয়াছেন। এই সভা সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছে। কেহ কেহ ইহা হইতে অতি উচ্চ সুফলের আশা করেন—একজন স্থিরমতি ইংরেজ লেখকের মত হইতে তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে—"The important point is that there shall be ample thought and discussion and that all well-wishers of India, whether European or Indian, whether prince or political leader, who are capable to speak with authority shall take their place at the Round Table Conference next October, when invited to do so. There must be no absentees. The building of India's new constitution requires and demands the self-sacrificing collaboration of all who are able to assist in any capacity in this. I myself, however, shall be surprised if, after the closest analysis and fullest discus.ion, those attending the Conference do not agree that the *Report* (of *Simon* Commission) *provided. the only practice able basis* of the next step in the Indian constitutional development" (I. Mackpherson.)
অর্থাৎ বিচারশীল ব্যক্তি মাত্রেরই নিমন্ত্রণ পাইলে রাউণ্ড টেবিলে যোগদান করা উচিত—কাহারও অনুপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য নহে। ……ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক উৎকর্ষ লাভের পক্ষে সাইমন রিপোর্টই একমাত্র কার্য্যকারী ভিত্তি—ইত্যাদি।

ভারতের শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহোদয় একজন অতি বড় ধীরমতি, ইংরেজ-শাসনের অনুরাগী, রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ বলিয়া খ্যাত। তিনি গোল টেবিলে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তিনি গত ৩১শে অক্টোবরের ভাইসরয় লর্ড আর উইন্ যে ঘোষণাবাণী দেন, তাহাকেই রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের মূল সূত্র ও ভিত্তি বলিয়া মনে করেন, এবং তাহার উপর প্রবল আশা রাখিয়া চলিয়াছেন। কনফারেন্স ও সাইমন রিপোর্ট সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

"What will the Indian deligates to the Round Table Conference full of the hopes raised by the Viceroy's Declaration think, when they find among the materials (of Simon Reports) placed before them the place of honour assigned to the document *which not merely ignores but runs contrany to the Declaration*"—

অর্থাৎ রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে ভারতবাসীর পক্ষে যাহা কিছু আশা ভরসা—ভাইসরয়ের ঘোষণা। আর সাইমন কমিশনের যে কিছু মাল মসলা—যাহা সামনে রাখিয়া করফারেন্সের আলোচনা করিতে হইবে, অথবা ম্যাকফারসানের ভাষাতে যাহা হইবে কন্‌ফারেন্সের একমাত্র কার্য্যকরী ভিত্তি—তাহা যে ঐ ঘোষণার বিরোধী ও পরিপন্থী! এ অবস্থায় যে গোল টেবিলে গোলের সৃষ্টি হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

কঃ পন্থা

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক—

ম্যাক্‌ল্যাগান এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, লাহোর

বিচারবুদ্ধি মানুষের জন্মগত হইলেও, শিক্ষার দ্বারা সেই বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ও তাহার শক্তি পরিপুষ্ট হয়। তখন সেই শক্তির যথাযথ পরিচালন করিয়া আমরা যে সকল সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হই, তাহা ব্যক্তিগত, সমাজগত ও ধর্ম্মগত—সর্ব্ববিধ শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। তাহাতেই শিক্ষার সার্থকতা। সে শিক্ষা যেমনই হউক, আর যে উৎস হইতেই তাহার উৎপত্তি হউক, তাহার ফল যদি এইরূপ হয়, তবেই সে শিক্ষা সার্থক, নচেৎ নহে। আবার শিক্ষা সার্থক হইয়াছে কিনা, তাহা বিচার করিবার শক্তিও সেই শিক্ষা হইতেই উদ্ভূত হয়। এই বিচারশক্তি শিক্ষা হইতে কতক পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও, উহা শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন;—উহা ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে। সেই ক্ষেত্র আবার সংস্কৃতি (culture) ভেদে বিভিন্ন। একই ভাণ্ডার হইতে রস আহরণ করিলেও প্রকৃতিভেদে সেই রস যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির পত্র, পুষ্প ও ফলভারে আত্ম-সম্পদ প্রকাশ করে, সেইরূপ শিক্ষার বিষয় ও উহার উৎস এক হইলেও, তাহা যদি সংস্কৃতি ভেদে তদনুযায়ী বিচারশক্তির বিকাশে সক্ষম না হয়, তবে বুঝিতে হইবে সে শিক্ষা বিফল হইয়াছে। অনুকরণই যদি শিক্ষার একমাত্র পরিণতি হয়, তবে তাহা ব্যর্থ। কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণ মানুষে এই বিচারশক্তির যথাযথ পরিচালনা করে না। শিক্ষা বিস্তারের অভাব বহু পরিমাণে উহার কারণ হইলেও, যাঁহাদিগকে সাধারণতঃ শিক্ষিত নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে, তাঁহাদের মধ্যেও বিচারশক্তির যথাযথ পরিচালনা অপেক্ষাকৃত অল্পাংশেই পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায় অনুকরণ প্রথার অনুসরণই ইঁহাদের মধ্যে অধিক।

যে কোন দেশে ও সমাজে তিনশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে যাঁহারা সর্ব্বদা বিচার শক্তির যথাযথ পরিচালনার দ্বারা নিয়তই আপনারা উন্নতির পথে অগ্রসর হন, ও অপরকেও সেই পথে লইতে চেষ্টা করেন,—এরূপ পূজ্যলোকের সংখ্যা সকল দেশেই অপেক্ষাকৃত কম; অপর দিকে পূর্ণ অজ্ঞ জনগণ, যাহারা অল্পাধিক পরিমাণে অজ্ঞ পশুজীবন যাপন করিয়া থাকে,—দেশভেদে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যার তারতম্য হইয়া থাকে; আর মধ্যস্থলে অর্দ্ধশিক্ষিত ও অর্দ্ধ অশিক্ষিত, তথাকথিত শিক্ষিত,—বিশাল জনসাধারণ, তাহারা শিক্ষার অভিমান করে, কিন্তু তদনুপযুক্ত কাজ করে না; তাহাদের বিচারশক্তি অল্পাধিক পরিমাণে উদ্বুদ্ধ, কিন্তু তাহার পরিচালনা করে না; উন্নতির আকাঙ্ক্ষা রাখে, কিন্তু তাহার যত্ন বা প্রচেষ্টা নাই;—ইহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শিক্ষার গর্ব্বে গর্ব্বিত বলিয়া ইহারা কাহারও যুক্তি মানিতে চাহে না, অথচ তাহাদের নিত্য আচরণ দেখিলে, তাহারা যে কোন বিশেষ যুক্তি মানিয়া চলে, তাহা মনে হয় না। নিজেদের কোন বিশিষ্ট

মত নাই, অথচ কোন বিশিষ্ট মতের পরিপোষণ করে না। দিবার মত তাহাদের কিছু নাই, অথচ তাহারা কিছু গ্রহণ করিতেও উদাসীন। তাহারা চাহে আপনার গর্ব্বে গর্ব্বিত থাকিতে, বিলাসের কোলে লালিত হইতে, সামান্য নিরাশায় হা-হুতাশ করিতে, শৃঙ্খলাশূন্য অলস জীবনযাপন করিতে,—আর সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করিতে যে, এইরূপ জীবনযাপন করাই বুঝি আদর্শ। অথবা তাহারা বোধ হয় তাহাও ভাবিয়া দেখে না। আমাদের দেশে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

*   *   *   *   *   *

যে কোন অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় উঠিবার প্রথম ও প্রধান লক্ষণ,—মনে প্রশ্ন উঠা। যাঁহার মনে কোন প্রকার প্রশ্ন উঠে না, প্রশ্নের সমাধানের জন্য যাঁহার মন তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া ব্যাকুল ভাবে ছুটাছুটি করে না, প্রশ্ন সমাধানের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করার কামনা যাঁহার নাই,—হউন তিনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, বলিতে বাধ্য, তাঁহার শিক্ষা বৃথা হইয়াছে। এ উদাসীনতাকে আত্মতৃপ্তি বলিয়া ভ্রম করিবার উপায় নাই।

জীবনে যে সকল জটীল প্রশ্ন মানবমন আলোড়িত করে, তাহাদের মধ্যে জটীলতম প্রশ্ন সেই এক সনাতন প্রশ্ন,—যুগাদি কাল হইতে যাহা মানব-হৃদয়-কন্দরে প্রতিনিয়ত কল্লোলিত হইতেছে। সেই প্রশ্নের সমাধানের প্রচেষ্টা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার উৎপত্তি, ও তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া তাহাদের বিকাশ ও পরিণতি। সেই সনাতন প্রশ্ন এই :—"মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি ?" অর্থাৎ কেন আমি এ সংসারে আসিলাম ? ভিন্ন ভিন্ন মন ইহার ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিবে ; ভারতীয় মন বলে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রণিধান,—মুক্তি ; তাই এই পথ তাহার নিকট "পরমার্থ"। সুতরাং পরমার্থই তাহার জীবনের মূল অবলম্বন ; আর তাহাকে ঘেরিয়াই তাহার দৈনন্দিন জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, সমাজ বর্দ্ধিত হইয়াছে ও সভ্যতা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতে সভ্যতা বিকাশের এই যে বিশিষ্ট ধারা, আজ তাহা কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছে। আজ সাধারণকে উপরোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় কেহই আর বলিতে পারিবে না যে, পরমার্থই তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতীয়ের কাছে তাহার প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের আজ আর আদর নাই,—তাহার নিকট এ সভ্যতা আজ কঠোর বিধি নিষেধ সম্বলিত, পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের স্তূপ মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মনে আজ বিদ্রোহের হাওয়া বহিতেছে। জগতে যেদিকে নেত্রপাত করে, সেই দিকেই সে দেখে, সম্ভোগসুখের মহাক্ষেত্র সংসারে মধুব্রতের মত মানব মধু আহরণ করিতেছে ; অথচ সেই জীর্ণ সংস্কার মানিয়া চলিতে হইলে তাহাকে সমস্ত হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। বঞ্চিত থাকিতেও হয় ত তাহার তত আপত্তি নাই ; কিন্তু তাহার কোন সার্থকতা সে খুঁজিয়া পায় না। সে ভাবে, জগৎশুদ্ধ লোকে যাহার যাহা প্রাণ চায় তাহা করিতেছে, অথচ আমার পক্ষেই বা সে বিষয়ে এত নিষেধ কেন ? গতিবিধিতে নিষেধ, আহারে নিষেধ, বিহারে নিষেধ,—সে বিরক্ত ও বিস্মিত হইয়া যতই ইহা লইয়া তোলাপাড়া করিতে থাকে, কেন্দ্রহারা মন ততই তিক্ত হইয়া উঠে, ও অতীতের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরিয়া যায়। এতদিন সে এই সকল বিধি নিষেধ অত্যাচারের অঙ্গবিশেষ ভাবিয়াও নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিল, আজ কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অপরে আবার তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছে, অপরে

বলিতেছে,—"তোমাদের জাতিভেদপ্রসূত আহার বিহারের বিধি-নিষেধ এ সাম্যের যুগে একেবারে অচল,—অতএব উহা ভাঙ্গিয়া দাও; উহা শ্রেণীবিশেষের সকল লোকের আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য গঠিত হইয়াছিল। এই দেখ, আমরা সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কেমন মনের সুখে আছি!" মন ভাবে,—সত্যই ত! শ্রেণীবিশেষের প্রাধান্যের জন্য যাহা সৃজিত হইয়াছিল, আজও আমরা সে বিধান মানিয়া চলিব কেন? আজ হইতে আমরা আহারে জাতি-ভেদ মানিব না; "স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি"—এ জ্ঞানগর্ভ বাক্য নিজমুখে উচ্চারণ করিয়া নিজেরাই তাহারা আবার বিবাহে একই জাতির মধ্যে মেল, থাক, গোত্র প্রভৃতি কাল্পনিক গণ্ডীর সৃজন করিয়া কূপমণ্ডূক সাজিয়া আত্ম-বিনাশের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে ও আমাদিগকে সঙ্গে টানিয়া লইয়া যাইতেছে; সে গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া "দুষ্কুল" হইতেই বা "স্ত্রীরত্ন" আমরা গ্রহণ করিব না কেন? আমরা যে কোন কুল হইতে স্ত্রীরত্ন আহরণ করিয়া প্রেমের মর্য্যাদা, স্বাধীন মনের মান রক্ষা করিবই করিব,—প্রেমের মিলনে মীনধ্বজকেই সারথী করিয়া মকরকেতন উড়াইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইব,—আত্মধ্বংসের পথে আর এক পাও চলিব না। সমস্ত জগৎ যখন একই কথা বলে, হৃদয়ের আকর্ষণ যখন নীতির গণ্ডী মানে না, তখন আমরা সেই সহস্র সহস্র বৎসরের জরাজীর্ণ বিধিকেই বা একমাত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভাবিয়া কেন মানিতে যাইব? অন্যদেশের বিধিও কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়? জাতির মতিগতি সেকালে যেরূপ ছিল, বিধি নিষেধও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া গঠিত হইয়াছিল; আজ সভ্যতার মধ্যদিনমানে সে আদিযুগের শিশুমানবের বিধান মাথা পাতিয়া লওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?—আজ সর্ব্বত্রই "তরুণের অভিযান" চলিতেছে।

এইরূপ কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সামাজিক জীবনে, অথবা কি ধর্ম্মজীবনে,—যেদিকেই দেখি, নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সংঘর্ষ দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। আর আমাদের মন প্রকৃষ্ট পথ দেখিতে না পাইয়া, প্রশ্নের কোন সদুত্তর না পাইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে; আর আপাতঃ মধুর যাহা কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, এবং তাহাই গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে সার্থকতার, তৃপ্তির অনুসন্ধান করিতেছে। এক্ষণে সকল সমস্যার উপর এই প্রশ্ন বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হইতেছে—"**কঃ পন্থা**"—আমরা কোন্ পথে চলিব?"

এ প্রশ্ন যে আপামর সাধারণের মনেই উঠিয়াছে, তাহা মনে করা চলে না; দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এখন পর্য্যন্ত জাতির অধিকাংশই স্রোতের প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে; তবে আজ এ প্রশ্ন অন্ততঃ অল্পাংশের মনেও উঠিয়াছে। শতাব্দী পূর্ব্বে এ প্রশ্ন কাহারও মনে জাগে নাই; কি ধর্ম্মে, কি সমাজে অথবা কি ব্যক্তিগত ভাবে সকল বিষয়ে নূতনকে বরণ করাই তখন পরম ও চরম লক্ষ্য ছিল, ও তাহাতেই আত্মতৃপ্তি অনুভূত হইত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। অন্ততঃ জাতির অল্পাংশও এখন ভাবিতে সুরু করিয়াছেন—"এই যে আমরা নূতনের বন্যায় পুরাতনকে ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছি ইহাতেই কি আমাদের জীবনের সার্থকতা লাভ হইবে,—না আমাদের যাহা আপনার, সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতায় যাহার অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে তাহারই পুনঃ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়?" এখন একদল বলিতেছেন—"modern হও"; অন্যদল বলিতেছেন, "নিজস্ব ত্যাগ করিও না।" এখন আমরা কোন্ পথে যাইব?

এই প্রথমদল যাহারা প্রায়ই নিজেদের তরুণ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা আজ উচ্চ কণ্ঠে বলিতেছেন,—"modern হও! দেখ জাপান, তুরস্ক, রুশিয়া প্রভৃতি দেশ সকল তাহাদের অতি পুরাতন জরাজীর্ণ সমাজ-ধর্ম্ম ও জীবনযাপন-নীতি পরিহার করিয়া নবীনের, সাজে সাজিয়া কি অপরূপ শোভার অধিকারী হইয়া তোমার সমক্ষে দাঁড়াইয়াছে। উঠ; জাগ! তাহাদের বরণ করিয়া লও। যদি মানুষ হইতে চাও, তাহাদের মত হও। তোমার ও সব অতি প্রাচীন ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও জীবন-যাবনপ্রণালী একালে আর চলিবে না; ওসব এককালে পরিহার কর।" দ্বিতীয় দল সংরক্ষণনীতির পরিপোষক; সনাতনপন্থী। তাঁহারা গম্ভীর ভাবে সতর্ক করিতেছেন,—"সাবধান! নিজের যাহা, পরের অনুকরণে তাহা হারাইওনা। মানবজীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে ওসকলের কোন আবশ্যক নাই। সনাতন প্রথার অনুসরণ কর। জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়াই আজ তোমরা লক্ষ্যহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ—বিপথে যাইতে উদ্যত হইয়াছ। নিজেদের হারা লক্ষ্য পুনর্ব্বার স্থির কর; তখন দেখিবে; যে সকলকে তোমরা আবর্জ্জনার স্তূপ মনে করিয়া পরিহার করিতেছ, প্রকৃত বর্জ্জনীয় তাহা নয়, বরং যাহার ঔজ্জ্বল্যে আজ তোমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যাইবার মত হইয়াছে, তাহাই বর্জ্জনীয়। উজ্জ্বল দেখিয়া যাহার দিকে আজ তোমরা ছুটিয়া চলিয়াছ, তাহা স্থিরজ্যোতিঃ শান্তরশ্মি চকোরমনোহর পূর্ণচন্দ্র নয়,—তাহা জ্বালাময় সর্ব্বদাহী বহ্নিশিখা;—উহার স্পর্শে পতঙ্গের মত নিমেষে দগ্ধ হইবে।"

এই দলের মধ্যস্থলে আর একদল আছেন, প্রকৃত নামের অভাবে তাঁহাদিগকে 'সংস্কারকপন্থী' নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। তাঁহারা এই দুই দলের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়া তাহার মধ্যে আপন অভিমত প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—"একেবারে ইহাও নয়, অথবা একেবারে উহাও নয়।" তাঁহারা তরুণের মত একেবারে আধুনিক হইতেও সম্পূর্ণ ইচ্ছুক নহেন, আবার সনাতনপন্থীদের মত একেবারে "স্থাণুর" ন্যায় বসিয়া থাকিতেও স্বীকৃত নহেন। তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম, সমাজ, ও ব্যক্তিগত জীবনের আবশ্যক মত সংস্কার সাধন করিয়া, অপরিহার্য্য অংশের গ্রহণ ও অব্যবহার্য্য অংশের পরিবর্জ্জন সাধনই বর্ত্তমান কালে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য। অধুনা শিক্ষিতগণের মধ্যে এশ্রেণীর ব্যক্তিদিগের সংখ্যা বড় কম নয়।

এই দল তিনটীর বাহিরে অবশিষ্টাংশের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাহারা অল্পবিস্তর বা একেবারেই নিরক্ষর, জীবনের উদ্দেশ্য ও তাহা সিদ্ধ করিবার উপায় জ্ঞান বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বিশাল জনসাধারণ—প্রধানতঃ অল্পাধিক পরিমাণে অপরের অনুকরণ করিয়া ইহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহাদিগের উপর সনাতন পন্থীর প্রভাবই সমধিক পরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে; অধুনা উপরি উক্ত তৃতীয় শ্রেণীর প্রভাবও ইহাদের পরে কথঞ্চিৎ পরিমাণে অনুভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। "তরুণের" প্রভাব ইহাদের উপর একেবারেই নাই!

এই আমাদের অবস্থা; এখন প্রশ্ন এই,—আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করিব?

এতদিন সে কথা উঠে নাই, কেন না তাহার প্রয়োজন হয় নাই। আজ প্রয়োজন হইয়াছে। যখন প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে, তখন উহার আলোচনা ও বিচার অবিলম্বে কর্ত্তব্য; নচেৎ কে বলিতে পারে আমরা বিপথে পতিত হইতেছিনা? বিচার করিয়া যদি জাতির এ সিদ্ধান্ত হয় যে, আমরা ঠিকই করিতেছি, তবে ত কোন কথাই নাই; আর যদি কোন বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তবে ইহার দ্বারা সময় থাকিতে আমরা সতর্ক হইয়া প্রকৃত পন্থা অন্বেষণ করিয়া লইতে পারিব, এবং ধর্ম্মগত, সমাজগত ও ব্যক্তিগত অধঃপতন রোধ করিতে সক্ষম হইব।

"জীবন" বলিতে আমরা যাহা কিছু বুঝি, তাহাকে ব্যক্তিগতজীবন, সমাজগত জীবন ও ধর্ম্ম-জীবন,—এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করা চলে। এই তিন প্রধান ভাগের আবার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে; এবং ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রত্যেকটীর অল্পাধিক সার্থকতাই সমষ্টিগত ভাবে জীবনের সার্থকতা বলিয়া স্বীকৃত। সেই সার্থকতা আবার জীবনের উদ্দেশ্য ভেদে বিভিন্ন, ও উদ্দেশ্য ভেদে আদর্শও বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই এ অবস্থায় আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ স্থির করাই এক্ষণে আমাদের সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য; সেই জন্য সবিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

ভাবের দু'ধারা

অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত সঞ্জীবকুমার চৌধুরী, এম-এ-বি-এল

(নেপাল)

ভাবের সংখ্যা অনন্ত। ভাবরাজ্য-সমুদ্রের বুদবুদ্ অসংখ্য। মুহূর্ত্তে যে কত বুদবুদ্ উঠিতেছে ও পড়িতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ কোন দিন উহাদিগকে গণিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন কিনা তাহাও আমাদের জানা নাই। কিন্তু তবুও চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ভাবের ধারা বেশী নহে—মাত্র দুটি। এই দুই মহানদীতে অসংখ্য ক্ষুদ্র নদী আসিয়া মিলিত হয়। তাহাদের উৎপত্তিস্থল কোনও মহাশৈল নহে। উহাদের উৎপত্তিস্থান অন্তরের অন্তঃস্থলে।

পুনরায় বলি, ভাবের ধারা মাত্র দু'টি। একটি অন্তঃমুখী এবং অপরটি বহির্ম্মুখী। দু'টির পরস্পরের কোনও মিলন নাই; কোনও সম্বন্ধ নাই। একটি যতই দুর্ব্বল হয়, তাহার শক্তি যতই কমে, প্রভুত্ব যতই ক্ষীণ হয়, অপরটি ততই পুষ্ট হইতে থাকে এবং তাহার সৌষ্ঠব ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অন্তঃসলিলা ধারা ক্ষীণ হইলে বহিস্‌লিলা ধারার গতি খরতরা হয়; আবার বহিস্‌লিলা ধারা ক্ষীণ হইলে অন্তঃসলিলা তীব্রবেগে

মধুর বীচিমালার মধুর তরঙ্গে প্রবাহিত হইতে থাকে। কারণ উহার একটি পুণ্য অপরটি পাপ; একটি স্বর্গ, অপরটি নরক; একটি শান্তি, অপরটি শুধু চঞ্চল ব্যাত্যার ক্ষণিকের অভিব্যক্তি। ভারতের সাধনা অন্তঃসলিলা ধারার উপাসক ছিল, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সাধনা বহির্ম্মুখী ধারাকে খরতরা বেগে কোন একটি অনির্দ্দিষ্ট প্রলয়ের পথে ছুটাইয়া লইতেছে।

পাশ্চাত্যের Evolution বা ক্রমোন্নতির ধারাটি নিতান্ত নূতন। উহা অন্তরের বহির্ম্মুখী ধারার একটি উপনদী—কিছু কালের জন্য সমুদয় বহির্ম্মুখী ধারার প্রস্রবণ। উহা তোলপাড় করিয়া উঠাইতেছে তাহাদের মধ্যে একটি তুফানের সৃষ্টি করিতেছে। পাশ্চাত্যের দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও আইন, Evolution এর ধাক্কায় ঝঞ্ঝায় সমুদ্রবক্ষের ক্ষুদ্র তরুণীর মত অবিরত হাবুডুবু খাইতেছে। কোনটির তীরে পৌঁছিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তিগুলি আপাতমধুর। নর্ত্তন শিক্ষা করাইলে উহারা বেশ নাচিতেও পারে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্যের জগতে Evolution এর তাড়নায় ইহাদের নর্ত্তনের বেশ সুবিধা হইয়াছে।

পাশ্চাত্যের আইন মানবের বহির্ম্মুখী শক্তিগুলির সংযম পথ; অনবরত উহার পরিবর্ত্তন হইতেছে; পাশ্চাত্যের ইতিহাস লোভবৃত্তির বিরাট দৃশ্য; লেখকের মনের আবেগের শতধারায় উহা সহস্র রকম রূপ ধারণ করিতেছে। পাশ্চাত্যের সাহিত্য আপাত মধুর ভাব নিয়া লীলা করিয়া সুখ পাইতেছে; পাশ্চাত্যের দর্শন relative অর্থাৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান তেমনই আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গারণের ন্যায় কতগুলি সংযমহীন প্রবলশক্তি প্রসব করিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে বহির্ম্মুখী শক্তির যত প্রকার প্রকাশ, বিকাশ এবং প্রবহন সম্ভব, পাশ্চাত্য উহাকে তত রকম ভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে।

প্রাচ্যের তথা ভারতের সাধনার রকম ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতের বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান, —ভাবের অন্তর্ম্মুখী ধারার একটি স্রোত। ভারত বিশ্বাস করে না যে, বানর হইতে কোনও বাহ্যিক Evolutionএ মানুষ তাহার বর্ত্তমানরূপ ধারণ করিয়াছে। পাশ্চাত্য Evolution-পন্থীদের ন্যায় ভারত বিশ্বাস করে না যে শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানুষ কোন দিন পশুদের ন্যায় নিতান্ত সাধারণ প্রবৃত্তি নিয়া চলিত এবং ক্রমশঃ সে প্রবৃত্তিগুলি ক্রমোন্নত হইয়া এবং জটিলতা প্রাপ্ত হইয়া মানুষকে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত করাইয়াছে। পাশ্চাত্যের নিকট পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা অতীতের তুলনায় একটি দেবত্ব; প্রাচ্যের নিকট উহা এক রকমের পশুত্ব। পাশ্চাত্যের ক্রমবিকাশের ধারণা ভুল নহে—তাহার ক্রমোন্নতির ধারণাটিই ভুল। সত্যত্রেতায় ভাবধারা অন্তঃসলিলা ছিল; উহার দিব্য রূপ মানুষের বাহ্য শক্তিকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া সত্যের, ধর্ম্মের ও পুণ্যের পথে অগ্রসর করাইত। কালবশে মানুষের দৃষ্টি আপাত মধুর বহির্সলিলার দিকে আকৃষ্ট হওয়াতে পৃথিবীর ভাবের এই উৎকট পরিবর্ত্তন এবং মানুষের বহির্সলিলা ধারার ক্রমবিকাশ এবং জটিলতা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাকে যাহারা ক্রমোধোগতি না বলিয়া ক্রমোন্নতি বলে তাহারা সত্যদর্শী নহে। তাহারা বহির্সলিলা ভাবধারার তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গে আকৃষ্ট অতিমুগ্ধ জীব; তাহারা অজ্ঞাতে সত্যকে পশ্চাতে রাখিয়া অনবরত মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া এবং মিথ্যাকে সত্যের আসনে বসাইয়া তাহার পূজা করিয়া চলিতেছে মাত্র।

গৃহ দগ্ধ হইলেও ভিটি থাকে ; প্রবল অনাবৃষ্টির দিনেও বহুশতাব্দীর সঞ্চিত তুষার নদী-বক্ষের প্রস্রবণগুলিকে সঞ্জীবিত রাখে। তেমনই বহির্ম্মুখী ভাবের রাজ্যে বর্ত্তমানে ভীষণ বাত্যা উপস্থিত হইয়া থাকিলেও মানুষ মানুষ বলিয়া অন্তঃসলিলা ধারাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে নাই। সময় সময় তাহার আভাষ এবং উদ্বেলন আসিতেছে। সাম্য, মৈত্রী, দয়া, ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস, ত্যাগ, প্রভৃতি ভাব হৃদয়স্থ অন্তঃসলিলা চির প্রবাহমানা ধারার বিকাশ। উহারা চিরকাল ছিল, চিরকাল আছে ও থাকিবে। ভগবান উহাদের শক্তিকে অসীম করিয়া সঙ্গত করিয়া এবং অমর করিয়া দিয়াছেন ; তাই মানুষ এখনো সমাজবদ্ধ হইয়া পরস্পরের দিকে তাকাইয়া চলিতেছে। তাই শাস্ত্রে আছে কলিতেও একচতুর্থাংশ পুণ্য পৃথিবীতে অবস্থান করিবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা বলে,—ইহারা অতি নূতন ভাব ; Evolution হইতেই ইহাদের উৎপত্তি। প্রাচ্য বলে, ভারতের সাধনা বলে,—ইহারা অতি পুরাতন এবং সনাতন।

শুধু তাহাই নহে ; প্রাচ্যের সত্যদৃষ্টি গভীরতম উপলব্ধি বলে স্পষ্ট দেখিতেছে যে বর্ত্তমানের বাহ্য সাধনাকে সংযত করিবার একমাত্র শক্তি ভারতের সাধনা বল। একের অন্যকে সহায়তা করিবার কথা আমরা বলিনা—শুধু সংযত রাখিবার কথা বলি। কারণ বাহ্যের বিরাট নৃত্যের সংযম এখন বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। আরও বেশী নাচিবার তেমন প্রয়োজন নাই—বিপথে যেটুকু অগ্রসর হওয়া গিয়াছে তাহার সংযমই প্রয়োজন। অন্তর্ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সাধনা যুগে যুগে বহু বাহ্যশক্তি ও বাহ্য ভাবধারাকে হজম করিয়া নিয়াছে। এখনো সমস্ত জগতের চক্ষের সামনে ভারতের এই বর্ত্তমান গান্ধিশক্তি তাহাই করিতেছে। আমাদের আশা আছে যে বর্ত্তমানের বিচ্ছিন্ন, শতছিন্ন বহিঃসলিলা ধারা, ভারতের সাধনার পুনরুদ্ধারের বলে, ক্রমশঃ সংযত হইয়া আসিবে এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত ভারতের মন পুনরায় সত্যের পথে, অন্তর্পথে প্রবাহিত হইয়া আপনার আদর্শ বলে জগতকে বহিঃসলিলার শত সহস্র উপনদীর করাল মুখ হইতে রক্ষা করিবে।

গীতা কথা

উত্তরার্দ্ধ

("ও-পারের কথা"র লেখক)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচিত হ'য়েছে যে অর্জ্জুনের মারফৎ শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে এই স্থূল দেহটাকে আমি ব'লে ধর্ত্তব্য করা ও জাগতিক যা-কিছু আমায় নিয়ে থাকতে হয়েছে সেগুলাকে আমার ব'লে ধারণা করা যত অনর্থের মূল। এই দুই বুদ্ধির নাম স্থূল দেহবুদ্ধি ও অহংবুদ্ধি। যে জীবের যে মাত্রায় এই দুই বুদ্ধির সম্বল, তাঁকে সেই মাত্রায় শোক, তাপ,

অসচ্ছলতা ও অসচ্ছন্দতার প্রভাবে 'হায় হায়' ক'রে ইহজীবনের খেলা সাধতেই হবে। শক্তি, শান্তি, জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ ও লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত হয়ে যিনি আপনাতেই আপনি পরিতৃপ্ত, যিনি সকল কালে সকল উপাদানে থেকেও আপনাকে জানতে দেন না ও যাঁকে জানলে চিনলে, যিনি জানবেন চিনবেন তাঁর অস্তিত্বটুকু তাঁতে উপে যায়, তিনিই আত্মা। টুন্-টুনে পাখীর সহিত হাতির মিলা-মিশা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সূক্ষ্মতম আত্মার সহিত স্থূল দেহও অহংবুদ্ধিযুক্ত জীবের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ পাতানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং এই দুই বুদ্ধিকে সম্বল ক'রে 'হরি' 'কৃষ্ণ', 'কালী', 'গড্', 'আল্লা' বা 'ব্রহ্ম' নাম সাধা আগাছা-পূর্ণ ক্ষেত্রে বারি সেবনের সামিল! পূজার, উপাসনার বা প্রার্থনার এত আড়ম্বর সত্ত্বেও জীবের প্রকৃত শক্তি, শান্তি প্রভৃতি গুণাবলীর বিশেষ অভাব। কার্য্যকারিণী শক্তিরও সম্বল সাধারণতঃ নিতান্ত ক্ষীণ ও হীন। সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য জীব সাধারণ সুকর্ম্ম সাধন বোধে মহা ভ্রান্তিকে আশ্রয় ক'রে বিকৃত কর্ম্মেরই বিশিষ্ট উপাসক-উপাসিকা।

আত্মার আত্মস্থ অবস্থা—সোহং (একমাত্র আমি)। আত্মার সামান্য স্পন্দনে অহং (টুকরা টুকরা আমির) উৎপত্তি। প্রাণ মণ সংযুক্তা বোধশক্তি আত্মার অধঃগামী প্রকাশ। ইহাই বোধ ক্ষেত্র। ইহাই জীবের মৌলিক অবস্থা। এই অবস্থার নিথর ভাবের নাম মুক্তি, নির্ব্বাণ, নিবৃত্তি বা নিবিকল্প সমাধি। এই নিথর অবস্থার অত্যল্প স্পন্দনের ফলে বুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি ও ইচ্ছার উৎপত্তি। ইহাই মনোময় ক্ষেত্র। নিথর অবস্থার অপেক্ষাকৃত বেশী স্পন্দনের ফল ভ্রান্তি ও প্রবৃত্তি। অত্যন্ত স্পন্দনকালীন বোধশক্তি নিবৃত্তিগতা হয়ে সূক্ষ্ম অহং ও দেহবুদ্ধিভাবে যথাসম্ভব প্রকটা। পরে অপেক্ষাকৃত বেশী স্পন্দনে বোধশক্তি ভ্রান্তি ও প্রবৃত্তগতা হ'য়ে স্থূল অহং ও দেহবুদ্ধিভাবে কর্ম্মে নিরতা। ইহাই প্রাণ মন সংযুক্তা বোধশক্তির কূলহীন অবস্থা। এই অবস্থায় বোধশক্তিই খণ্ড বুদ্ধিভাবে অস্থির পিঞ্জরে চর্ম্মের ওড়নায় ভূষিতা। ইহাই জীব ভাব। ভ্রান্তি, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির স্পন্দনে বাসনা, ভাবনা, ভয় প্রভৃতির উৎপত্তি। স্থূল বুদ্ধিদ্বয়ের অবসাদে সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বয় কখন কখন প্রভাসিত হয়। তখন সেই বুদ্ধি প্রাণের ও মনের সহায়তায় ঊর্দ্ধগামিনী হয়। এই অবস্থায় বোধক্ষেত্রে উপনীত হ'য়ে অল্পক্ষণ স্থিতিলাভ ক'রলে উহা সবিকল্প সমাধি বাচ্য। এই ক্ষেত্রে উপনীত হ'লে বিবেকের বাণী শুনা সম্ভব। পরে অধিকক্ষণ ব্যাপী স্থিতি লাভ ক'রলে উহা নির্বিকল্প সমাধি বাচ্য।

কানা-মাছি খেলার তুলনায় জীব নিকৃষ্টতর খেলায় প্রবৃত্ত—এ অবস্থা কয়জন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেন বা এ খপরের প্রয়াসী? ব্যাপারটা এই:—রাজকুমারী বোধশক্তির ভাল লাগলো না বাপের—বিরাট আত্মার—এক ঘেঁয়ে গোছের সাড়া শব্দহীন ভাবটা। তাই যেই জননীর—বিরাট প্রকৃতির—সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল, মায়ের রাজ্য দেখবার সাধটা তিনি গর্ভধারিণীকে জানালেন। গিন্নি কর্ত্তার কাছে গিয়ে মেয়ের সাধের কথা জানিয়ে কি ফুস্ ফুস্, গুজ্ গুজ্ ক'রলেন তাঁরাই জানেন। পরে দেখা গেল যে মেয়ের আব্দার রক্ষা ক'রতে বাপ মা দু জনেই রাজি। তবে মা সোমত্ত মেয়েকে একলা ও অনাথিনী বেশে এদেশ ওদেশ ক'রতে দিতে বিশেষ গররাজি। অমনি এসে গেল—প্রাণ-রথ, মন-পথ প্রদর্শক ও নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি দুই সহচরী। তারপর মেয়ের কপালে স্মৃতির টিপ পরায়ে, মা তার হাতে দিলেন ধৃতির (ধারণা শক্তির) শ্রীচুপড়ি।

মেয়েকে বিদায় দেবার সময় মা বল্লেন "ছাখ্ বাছা—কর্ত্তা ও আমি তোর কাছে কাছেই থাকবো; কিন্তু তোর চেয়েও ছদ্মবেশ ধ'রে। তবে বাছা, জেনে রাখ্ তোর ওরাজ্যে চোখ্ কান খুলে রেখে যা দেখ্‌বার দেখা ও যা শুনবার শুনা ছাড়া অন্য কাজ নেই—কারণ তোর হ'য়ে সব কাজ সাধবে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি একজুটী হয়ে"। গিন্নী প্রবৃত্তিকে বল্লেন "ছাখ্ আমার মেয়ের যখন যা দরকার হবে তুই বাইরে থেকে যোগাড় ক'রে নিবৃত্তির হাতে দিস।" নিবৃত্তিকে বল্লেন "তুই প্রবৃত্তির কাছ থেকে যখন যা পাবি, প্রাণ—মনকে ডেকে সেগুলাকে ঝেড়েঝুড়ে বা কুটে পিশে এমন ক'রে তাংড়াস যে আমার মেয়ের বিবাহে সেগুলা কাজে লাগে।" গিন্নী নিবৃত্তিকে আরো বল্লেন "মেয়ে আমার বড় অল্‌বড্ডে, দেখিস্ সে যেন স্মৃতি টিপটা না মুছে ফেলে ও ধৃতি শ্রীচুপড়িটা না হারায়"। এই ব্যবস্থা ক'রে গিন্নী আবার দেখা দিলেন কর্ত্তার শ্রীমন্দিরে। অমনি ডাক প'ড়লো টুকরা আমি কে। ইনি কর্ত্তা গিন্নীর ভাবী জামাই। নাম জীবাত্মা। এঁর উপর হুকুম পাশ করা হ'ল তাঁকেও তাঁদের মেয়ের খুব কাছেকাছেই থাকতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি ভাবী জামাইকে বল্লেন "দেখ বাছা, আমাদের মেয়ে যখন এদেশ ওদেশ ক'রবে সে যেন কোন রকমে টের না পায় তুমি তার সঙ্গে আছ, কিন্তু তোমায় লুকিয়ে ছাপিয়ে এমন কৌশল ক'রতে হবে যাতে মেয়ের ওরাজ্যে থাকবার সাধটা চিরকালের মত ধুয়ে মুচে যায়। এই কাজটা ঠিক ঠাক সাধতে পারলেই আমাদের মেয়েকে ও-রাজ্য হ'তে এ মুখো হ'তেই হবে। পরে যে শুভ মুহূর্ত্তে তোমাদের দু জনের চার চোখ এক হবে, আমরা মেয়ে জামাই দুইই এক সঙ্গে ফিরে পাব।" এই ব'লেই মা অন্তর্দ্ধান হ'লেন।

রাজকুমারী বোধশক্তি বোধ-ক্ষেত্র হ'তে নেমে এলেন মনোময় ক্ষেত্রে। তখন তাঁহার নাম হ'ল সূক্ষ্ম অহংবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম দেহবুদ্ধি। সে রাজ্যে নিবৃত্তির খেলাগুলোর মাত্রা বেশী দেখে তাঁর সে রাজ্যে থাকবার সাধটা ঘুচে গেল। অমনি সেখানকার ঘর বাড়ী খালি ক'রে তিনি নেমে এলেন এ-রাজ্যে। এখানে এসে ভ্রান্তি ও প্রবৃত্তির পাল্লায় প'ড়ে নিবৃত্তিকে কাঠ-কুড়ুনী ক'রলেন। শুধু তাই নয়, ভ্রান্তির হাতের খ্যালনা পুতুল হ'য়ে হারিয়ে ফেল্‌লেন ধৃতি শ্রীচুপড়ি ও মুছে ফেল্‌লেন স্মৃতি সিঁদুর টিপটী। তিনি যে রাজরাজ্যেশ্বরের মেয়ে ও তাঁর বিবাহ ঠিক ঠাক হয়ে আছে এ কথাগুলো তিনি বেমালুম হজম ক'রলেন। হজম বলে হজম—মেয়ে পুরুষ দুইই সাজ্‌চেন। তা আবার কখনও রাজরাণী, আবার কখনও ভিখারিণী; কখনও রাজবেশ প'রে, আবার কখনও ছেঁড়া কাঁথা সম্বল ক'রে। এই ভাবে দেহ বাড়ী ও সংসার জমিদারী নিয়ে নানা ধরণের খেলার পর তিনি এবারে শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর বাবু সাজে রশি-যুদ্ধ খেলায় (tug-of-war এ) প্রবৃত্ত। তাঁর পক্ষে সারি সারি দাঁড়ালো প্রাণ, মন, ভ্রান্তি, ও প্রবৃত্তি সদলে। কিন্তু তিনি নিজে রইলেন মুখপাতে বাসনা, ভাবনা ও ভয় যুক্ত "আমি—আমার" বুদ্ধি সেজে। অন্য পক্ষে দাঁড়ালো অদৃশ্য বিধান—তা আবার বুক ফুলিয়ে। খেলতে খেলতে রাধাকিশোর প্রৌঢ়াবস্থার প্রায় সীমান্তে এসে গেছেন। সেই সময় তিনি এমন হ্যাঁচকা খেলেন জাগতিক মান অপমান নিয়ে, যে তাঁর খেলবার রশিটা নেহাৎ যা-তা গোছের না হ'লেও সেটা গুলি-সুতোর মত পট্ ক'রে উঠলো। অপমানের বোঝা প্রাণে মনে গেঁথে তাঁর শয্যা হ'ল—বসৎ বাটীর খোলা ছাদ। সময়—চৈত্র মাসের অমাবস্যার রাত। তিনি আনমনা হ'য়ে দেখতে

লাগলেন আকাশকে। এই মহা সুযোগ পেয়ে তাঁর প্রাণ-মন একজুটি হ'য়ে ও তাঁকে কাঁদার তাল বানিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল অজানা রাজ্যের দিকে। কালী ঠাকুরুণ শিবের বুকে একটা পা রেখেই তাঁর বেবাক কাজ সাধচেন, আর কর্ত্তা মহাশয় পিট্‌ পিট্ ক'রে চেয়ে আছেন। রাধাকিশোরের অবস্থা শিবঠাকুরের মত হ'লেও, খাপ খেলে না প্রাণ—মনের ছুট দেবার ব্যবস্থায়। এই সময় তাঁর চোখ দুটো দেখে ফেললে যে তাঁর প্রাণ-মন খানা, ডোবা, আঁস্তাকুড়, কাঁটাবন পেরিয়ে টপ্‌কাচ্চে পাহাড় পর্ব্বত! তিনি আজীবন জবরদস্তি গোছের লোক। তাই তাঁর কাছে সরকার লোক জনদের কা কথা স্ত্রীপুত্রাদিরও ট্যাঁ ফোঁ করবার যো ছিল না। বিনা হুকুমে প্রাণ-মনের ছুট দেওয়ার জন্যে তিনিত চোটে লাল। এ-তা মতলব আঁট্‌চেন এমন সময় প্রাণ-মন মাতালের মত ট'লতে ট'লতে আবার এসে হাজির তাঁর দেহ বাড়ীতে। বেজায় বেইমান মন—প্রাণকে দেহ আশ্রয় দিয়েছে ব'লে তিনি স্মৃতি হিসাব খাতাটা খুলে টপ্‌ ক'রে দেখে নিলেন তিনি—রাধাকিশোর বাবু—তিন বেইমানদের তুষ্টির জন্যে কখন কি কাজ বিনা ওজরে এতকাল ধরে সেধে আসচেন। স্বয়ং বাবু মহাশয় তাদেরকে সময় অসময়ে বান্দাবাঁদির মত নাকে দড়ি দিয়ে কত কর্ম্ম সাধিয়েছেন সে হিসাবগুলো সে খাতায় স্থান পায়নি! দেহটার প্রতি যৌবনের গোড়া হ'তে এতাবৎকাল ধ'রে তিনি যে কত অত্যাচার ক'রেছেন সে সব কথা টুকা ছিল তাঁর ভ্রান্তি খাতায়। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে ব'সলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তখনকার মত হারিয়ে ফেল্‌লেন এতকালের পোষা "আমি—আমার" স্বত্বটুকুকে। কর্ত্তা গিন্নীর দোষে কত শত ছোট বড় সংসার ও নায়কের দোষে কত রাজত্ব রসাতলে গেছে, চিন্তাশীলতা সেই সেই ছবি তাঁর মানসপটে জাগিয়ে দিতে লাগলো। এই দেহ বাড়ীর মধ্যে ছোট বড় যারা যারা আছে, প্রবৃত্তি হোক বা নিবৃত্তি হ'ক, মায়া হ'ক বা বৈরাগ্য হ'ক, তাদের সকলকে নিয়ে ও সুব্যবস্থা ক'রে এবারকার খেলা শেষ খেলায় দাঁড় করাতে হবে—চিন্তাশীলতা তাঁকে বুঝাতে লাগলো। তাঁর কর্ম্মকুশল সুব্যবস্থার অভাবে তাঁকে বার বার কত ঘা খেতে হয়েছে তাঁর বিচার বুদ্ধি যতটা পারলে, তাঁকে বুঝাতে লাগলো। আপনাকে ক'সে ধিৎকার দিয়ে রাধাকিশোর বাবু সুদৃঢ় সঙ্কল্প ক'রলেন আপনাকে আপনি গ'ড়ে তুলতে। এ অবস্থায় নিদ্রাদেবী নিজ ক্রোড়ে তাঁকে স্থান দিলেন।

এই ঘটনার অল্পকাল মধ্যে রাধাকিশোর বাবুর বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তাঁর সঙ্কল্প আত্মপাঠ ও আত্ম সংস্কারভাবে দিন দিন ফুটে উঠতে লাগলো। আত্মপাঠ ফলে তাঁর ইহজীবনে চিন্তা, কার্য্য, সময়, সুযোগ ও অর্থের অসদ্ব্যবহারের ইতিহাস ছোড়্ ভাঙ্গা ভাবে তাঁর মানস পটে ভাসতে লাগলো। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝলেন যে মুখস্থ বন্ধুত্ব বা আত্মীয়ত্ব হিসাবে দেঁতোর হাসি তিনি হেসেছেন কত শত বার। কিন্তু স্বীয় গর্ভধারিণীকে বিসর্জ্জন দিবার পর তিনি যখন যখন প্রাণের হাসি হেসেছেন তা তাঁর ডান হাতের আঙুলের পাপড়িগুলিও সহজে নির্দ্দেশ ক'রতে পারে। সুতরাং তাঁর নিজের হাসির অভাবে, তিনি হাসায়েছেন খুবই কম। কিন্তু স্ত্রীপুত্রকন্যাদি সহ একে তাকে চোখের জলে ভাসাবার ব্যবস্থা করেছেন কতকটা আকাশের তারার মত। যার প্রাণের হাসির বিশেষ অভাব, তার ভাগ্যে প্রাণের জ্বালাগুলা সেই মাত্রায় মাপে। এই চিন্তাগুলা তাঁর মানস চক্ষে ফুটতে লাগলো প্রতিপদ হ'তে পঞ্চমী-ষষ্ঠী চাঁদের মত। সেই সময় তিনি উপবিষ্ট ছিলেন শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত স্বর্গীয় মাতৃদেবীর

অয়েল পেণ্টিংয়ের সম্মুখে। আহা মরি মরি! কি মনোলোভা মূর্ত্তি! যেন সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ঠাকুরাণী। রাধাকিশোর সেই সময় আপন চিন্তা তার সেই মূর্ত্তির শ্রীচরণে অর্পণ ক'রে প্রশ্ন কল্লেন "এ সব চিন্তা এতদিন কোথা লুকানো ছিল"? উত্তর—"তোমারই স্মৃতির কাছে"। তিনি প্রশ্ন ক'রলেন "এতদিন বিস্মৃতি আমার স্মৃতিকে কোন্ জেলখানায় আবদ্ধ ক'রেছিল"? উত্তর—"তোমারই বিশৃঙ্খলা অন্ধকূপে।" তিনি আবার প্রশ্ন ক'রলেন "কোন্ বলে বলবতী হ'য়ে বিশৃঙ্খলা এই দেহে, প্রাণে, মনেও সংসারে আসন পেতেছে?" উত্তর—"তোমারই ভ্রান্তির প্রভাবে"। সামান্য রুষ্টভাবে রাধাকিশোর প্রশ্ন ক'রলেন "ভ্রান্তি পেত্নীর এত প্রভাব কেন?" উত্তর—"মায়ার প্রভাবে"। এবার তিনি কথঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন ক'রলেন "আমি মায়ার কি বাদ্ সেধেছি যে সে তার যা ইচ্ছা আমায় কাজ সাধিয়েছে ও সাধবে"? উত্তর (কতকটা দৃঢ়ভাবে) "তোমার, তোমারই বাসনা"। রাধাকিশোর কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন "আমার আমারই বাসনা আমার দফা রফা ক'রেছে"? উত্তর—"নিঃসন্দেহ"। এবার তিনি ভয়াকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা ক'রলেন "কি উপায়ে বাসনার হাত হ'তে রেহাই পাওয়া সম্ভব"? উত্তর—"হরদম 'মা মা' ক'রে বাসনাকে তাড়া করা"। প্রশ্ন—"সে আবার কি?" উত্তর-"বাসনা জাগলেই—"মা এসেছিস" 'মা এসেছিস" বলা—তা কিন্তু মন-প্রাণ এক ক'রে"। প্রশ্ন—"এই সাধনার ফল কি"? উত্তর—"বাসনা ক্ষীণ, ক্ষীণতর ও ক্ষীণতম হবে"। রাধাকিশোর আবার প্রশ্ন ক'রলেন—"তাতেই বা কি লাভ হবে"? উত্তর—"যা শুননি-শুনবে! যা দেখনি-দেখবে; ও যা পাওনি-পাবে"। এই কথাগুলি শুনিবা মাত্র রাধাকিশোর বাষ্প পূরিত নেত্রে জননী দেবীর শ্রীচরণোদ্দেশে লুটায়ে প'ড়লেন ও "মা" 'মা" রবে কক্ষ আলোড়িত কল্লেন। তাঁর স্মৃতি পটে জাগরুক হ'ল তাঁর যজ্ঞোপবীত ধারণের পর তাঁর মাতৃদেবী মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে একদিন বলেছিলেন "মনে রাখিস-বাবা, বাসনাই জীবকে ও এমন কি দেব-দেবীদেরকেও ঘুর পাক খাওয়াচ্চে। প্রকৃত মানুষের, প্রকৃত ব্রাহ্মনের ও প্রকৃত বৈরাগীর প্রধান কর্ম্ম স্ব স্ব বাসনাকে ক্ষীণ-ক্ষীণতর করা। তবে তিনি রেহাই পান।"

রাধাকিশোর সংজ্ঞা লাভ ক'রে দেখলেন তাঁর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী উমা দেবী তাঁর পদ সেবায় নিযুক্তা। তখনি তিনি উপবিষ্ট হয়ে ও বালকের ন্যায় রোদন ক'রতে ক'রতে বল্লেন "দেবী! আমায় ক্ষমা কর। আজ গর্ভধারিণীর প্রসাদে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি যে তুমি কেবল মাত্র আমারই দোষে যাবতীয় জ্বালায় জ্বলেছ। তবুও যে এ বাটীতে অলক্ষ্মী সগর্ব্বে আসন পাৎতে পারেনি সে কেবল তোমার মত লক্ষ্মীর প্রতাপে। গর্ভধারিণীর কৃপা পাবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হ'লেও তিনি এ অধমকে অভয় দান ক'রেছেন। এখন তোমার ক্ষমার ভিখারী"। উমা দেবী কথঞ্চিৎ গম্ভীর ভাবে বল্লেন "তুমি পাগল হ'লে না-কি? চল খাবে চল"। পরে তিনি জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন "সিন্দুরের টিপ কে তোমায় পরালেন"? এই প্রশ্নের উত্তরে—নিঃশব্দে সাড়া দিল তাঁর আকুল প্রাণের ব্যথা-ঝর ঝর বারি পাতে। পরে তিনি স্বীয় মাতৃদেবীর চিত্র দেখতে ২ বল্লেন "তুমিত বল্লে এ অধমের জন্যে মাতুলের কাছে গচ্ছিত আছে এক অমূল্য ধন। কিন্তু তুমিই বল—মা-কোন্ মুখে, কোন্ সাহসে সেই নর দেবতার শ্রীচরণ প্রান্তে উপনীত হই?" উমা দেবী ঈষৎ হাসি মুখে ব'ল্লেন "তুমি

কি মামা-বাবুকে চিন না? তিনি যে মানব দেহ ধারী গঙ্গা। তাঁর কোল আমাদেরইত প্রাপ্য। জান না কি তিনি দেবকিশোর ও বৌমাকে কত স্নেহচক্ষে দেখেন"?

দুই মাস কাল অতীত হ'ল। রাধাকিশোর বাবু এখন অল্পভাষী, কিন্তু স্বীয় করণীয় কর্ম্ম সাধনে বিশেষ তৎপর। প্রত্যহ উন্মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গগুণে তাঁর প্রাণে ও মনে দেখা দিল সজীবতা. প্রফুল্লতা ও চিন্তাশীলতা। গৃহিনীর গুণপনায় কর্ত্তার উচ্ছৃঙ্খলতা নিঃশেষ প্রাপ্ত হ'য়েছে এ কথা উমা দেবীর কাছে কেহ কেহ উত্থাপন ক'রলে তিনি ব'লতেন "আমার যা-কিছু জ্বালার এক ছিটে ফোটাও আমায় বহন ক'রতে দেননি আমার পরমারাধ্যা প্রেমময়ী শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর শিক্ষার কৌশলগুলি"। তিনি ব'লতেন "মা, প্রাণে গেঁথে রেখো যে আপদ-বিপদ বা অভাব-অশান্তিগুলিকে জ্বালা ঠাউরে প্রাণ-মনের সঙ্গে বুদ্ধিতে তাদের আসনে বিছালে সেই জ্বালা ঘট-ঘটির আকার হ'তে জ্বালা আকার ধরে। পরে তাতেও তাদেরকে তাংড়ানো দায় হয়। লাভের ফল লোকসান ও লোকসানের ফল লাভ—এই কথা মর্ম্মে মর্ম্মে গেঁথে প্রত্যেক জ্বালার সময় পূর্ব্ব কু-কর্ম্ম ক্ষয় হ'চ্চে এই ধারণা করা চাই। তারপর 'মা তুই এই ভাবে এসেছিস' ব'লে গোপনে হাসতে নাচতে পাল্লেই সব জ্বালাকে বা বিপদকে কুয়াসার মত উপে যেতে হবেই হবে। যতদিন-না তা হয়, বুঝতে হবে "আমি-আমার" গুলা পাটে পাটে সেই সেই জ্বালার স্মৃতি লুকিয়ে-ছাপিয়ে রেখেছে।" তিনি আরো ব'লতেন "একে তাকে দোষী দোষিণী না ক'রে, নিজের ছিটে ফোটা দোষ থাকলে নিজের দোষটা স্বীকার ক'রে যতটা পেরো প্রাণে প্রাণে ঠাণ্ডা হবে, যতটা পারবে সত্যবাদিণী ও নিরলসা হবে"। বাসনা-ভাবনা প্রাণে গেঁথে জপ-ধ্যান ক'রতে বা দেব মন্দিরে যেতে তিনি বার বার নিষেধ ক'রতেন। গৃহিণী-ঠাকুরাণীর আদর্শে পুত্র শ্রীমান দেবকিশোর উচ্চ শিক্ষা লাভ ক'রেও পিতা মাতার বিশেষ বাধ্য। এই সময় রাধাকিশোর তাঁর মাতুলের নিকট হ'তে চিঠি পেলেন মাতুলালয়ে সপরিবারে যাবার জন্ম। মাতুল শ্রীমৎ রামকমল চৌধুরী মহাশয় কি উপাদানে গঠিত পুরাতন 'নোনাখালি' গ্রাম আধুনিক 'দেবনগর' নামে বিকাশই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। কোন্ কোন্ কৌশলে বা কি অভিনব শক্তিতে তিনি গ্রামের একতা সাধন ক'রে সকলের সুখ সচ্ছন্দতা দানে সক্ষম হ'য়েছেন তাঁর সহকর্ম্মীরাও সে তত্ত্ব সম্যকভাবে অবগত নন। এ সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু জানেন, তা তাঁর ভাগীনেয়-পুত্র শ্রীমান দেবকিশোর।

জাগতিক স্বার্থ রক্তের টানটাকে রক্তাক্ত-আত্মীয়তায় (bloody relationshipএ) দাঁড় করায়। রাম কমলের ও দেবকিশোরের আত্মীয়তা ছোট্ট-কথা 'দাদা ভাই'য়েতেই সম্পূর্ণ। এক জন তাঁর দাদাভাইকে এত বড়, এত উচ্চ ও এত মহান্ দেখেন যে তাঁর এই আত্মপ্রসাদটুকুই তাঁর হিসাবে যথেষ্ট সম্বল। আর এক জনের প্রাণের প্রবল-কিন্তু নীরব-সাধ আপন ছাঁচের চেয়ে উচ্চতর ছাঁচে তাঁর দাদা-ভাইকে গ'ড়ে তুলেন। তাই বড় দাদা ভাইয়ের প্রাণের তার-যন্ত্রটা রিং রিংয়ে উঠলেই ছোট দাদা ভাই অমনি হাজির হন "দেব-নগর" গ্রামে। অমনি ফুটে উঠে নিরব হাসির আধ-ফুটন্ত নেবু-ফুল। অমনি এক জন আর জনের যা-কিছু কথা প্রাণের তারে গাঁথতে থাকেন। এক জনের সাধ শুনতে, আর জনের সাধ শুনাতে। এক জনের সাধ সাজাতে, আর জনের সাধ তাঁর প্রিয়জনের সাধে নিজের সাধটাকে মিশিয়ে দিতে।

রাধাকিশোর বাবুই রাম কমলের যাবতীয় সম্পত্তির এক মাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু তাঁর

উচ্ছৃঙ্খলতার স্মৃতি সরমের-ডানা কাটা পায়রা হওয়াতে তাঁকে "দেব-নগর" মুখো হ'তে দেয় নাই। এখন কিন্তু মাতুলের ডাকে তিনি অল্প কাল মধ্যে সহরের বাটী ভাড়া দিবার ব্যবস্থা ক'রে মাতুলালয়ে সপরিবারে উপনীত হলেন। এই মিলনে মানব হৃদয়ের বালির চড়াগুলা তলিয়ে গেল প্রেম বন্যার তুফানে। সাত-আট দিন ধ'রে রাম কমলের সকল কাজের সহকর্ম্মী হ'লেন পিতা-পুত্র উভয়েই। পরে একদিন তাঁর সমুদয় সহকর্ম্মীদের সহিত ভোজন কার্য্য সমাধা ক'রে, চৌধুরী মহাশয় সকলের সহিত স্বীয় হল ঘরে উপবেশন ক'রলেন। এই সময় দেব কিশোরকে স্বীয় পার্শ্বে বসায়ে প্রশ্ন ক'রলেন "দাদা ভাই, বলত এ—কদিন এখানে যা যা দেখ্‌লে বা শুনলে তা থেকে কি কি শিক্ষা পেলে?" দেবকিশোর সহাস্য বদনে বল্লেন "দাদাভাইয়ের এত কালের অভিজ্ঞতা লুট-পাট করি সে কৌশলত বই পড়া বিদ্যা শেখায় নি। তবে অবশ্য মানতে হবে যে আদর্শ কর্ম্মীর সংযত ও নিঃস্বার্থ সাধন হতশ্রীকে লক্ষ্মীশ্রীতে দাঁড় করাবেই করাবে।" রাম কমল প্রসন্ন বদনে বল্লেন "দাদা ভাইয়ের কলেজ উজাড় করা বিদ্যা ভাষায় ভরা-গঙ্গা। তাই ভায়া উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাবার ব্যবস্থা ক'রলেন। যা-কিছুর যৎসামান্য সম্বল লয়ে যদি এত কাজ সাধা এই চৌধুরীর দ্বারা সম্ভব হ'ত তা হ'লে এই ভারতের গ্রামে গ্রামে অন্ততঃ এক জন ক'রে নর-নারী দেখা দিতেন। প্রাণ-মনে ভাল ক'রে গেঁট বেধো—ভাই—যে মানুষের বাহাদুরী লবার অভ্যাসের দরুণ তাদের কর্ম্ম শক্তি জাগছে না। তাই নিস্ফলতাই জীবের প্রাপ্য হ'চ্চে। আর এক কথা শুন ভাই দেখা শুনায় অভিজ্ঞতা লাভ হ'লেও ধোপে টঁ্যাক সই হয় পোড় খাওয়া শিক্ষায়।" এবার রামকমল রাধাকিশোর বাবুকে প্রশ্ন ক'ল্লেন "বলত বাবাজী সাফল্য লাভের সহজ সাধ্য উপায় কি?"

রাধাকিশোর উত্তরে বল্লেন-"মামা বাবু আপনার সামনে কোন কথা বলা পাগলামো করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তা ছাড়া যে জীবন লক্ষ্মী ছাড়ামো ক'রেই কেটেছে সে জীবের মুখ খুলবার সাহসটা বেজায় মুর্খতা! এই কথার রামকমল বল্লেন "তবে মন দিয়ে শুন।"

"জাগতিক বা পরমার্থিক কর্ম্ম দ্বারা আবশ্যকীয় যা-কিছু অর্জ্জণ ক'রে শান্তি ও আনন্দ উপভোগ করাই প্রকৃত সাফল্য বাচ্য। অর্থ উপার্জ্জণ বা শাস্ত্রালোচনা বা সাধন-ভজনের প্রকৃত উদ্দেশ্য শান্তি ও আনন্দের স্বাদ পাওয়া। যে কর্ম্মদ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত না হয় উহা ভ্রষ্ট সাধন বাচ্য। এই প্রকার ভ্রষ্ট-সাধন, জীবকে দশ জনের 'বাহাবা' প্রত্যাশী করে। ফলে, সেই জীব আপন "আমি-আমার" বুদ্ধিকে দানাভুষি সেবিত ছাগম্যাড়াতে পরিণত করে। পরে সেই জীব বিষম দাম্ভিক ও স্বেচ্ছাচারী হয়। তবুও তার প্রাণ-মন সংযুক্ত বুদ্ধি, শান্তি ও আনন্দের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়—তা কিন্তু অতীব গোপনে। জীব যে অবস্থায় অবস্থিত থাকুন না কেন তাঁকে শান্তি ও আনন্দ অনুসন্ধান ক'রতেই হবে; কারণ তাঁর স্মৃতি ও ধারণাশক্তি ক্ষীণ, ক্ষীণতর ও এমন কি ক্ষীণতম হ'লেও অদৃশ্য বিধান সেই জীবের শান্তি ও আনন্দের তৃষ্ণা একেবারে লোপ করে না। জীবের এই শান্তি ও আনন্দের পিপাসাই তাঁকে শান্তি ও আনন্দ ধামে ফিরায়ে ল'য়ে যাবার একমাত্র ব্যবস্থা। শান্তি ও আনন্দ চাওত, শান্তি ও আনন্দ দাও—ইহাই বিধানের বিধান। ফল-ফুল-ওলা গাছ হ'তে বড় বা ভাল ফল-ফুল লাভের আশা পুষলে নিতান্ত আবশ্যক উহাদের সেবা করা—গোড়া খুঁড়ে, ছাঁট ছোট ক'রে, সার দিয়ে ও পরে বারি সেচন ক'রে। এই জন্য শান্তি

ও আনন্দ প্রত্যাশী জীবের মৌলিক ধর্ম্ম কর্ম্ম—সেবা। এই সেবাধর্ম্মের সুফল (১) আত্মপ্রসাদ অর্থাৎ অযাচিতভাবে শান্তি ও আনন্দলাভ; (২) একতা সাধন; (৩) সূক্ষ্মতম অদৃশ্য শক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন; ও (৪) জীবের নিদ্রিত শক্তি জাগ্রত করণের সুমহান ব্যবস্থা। তবে স্ব স্ব "আমি-আমার"গুলাকে যথাসম্ভব ক্ষীণ না ক'রে সেবা, পূজা বা আরাধনা কার্য্য সাধিত হ'লে জীব ব্যক্তিগত হ'তে বংশগত বা সমাজগত বা জাতিগত ভাবে কার্য্যকারিণী শক্তি হারায়। সেই বিকৃত কর্ম্মফলে সেই জীবকে রোগ, শোক, তাপ, অভাব ও অশান্তি ল'য়ে থাকতে হয়। "বিশাল আমি—আমার" জীবের ক্ষুদ্র "আমি—আমার"গুলাকে কোন-না-কোন কালে বেমালুম হজম ক'রবেনই ক'রবেন। এই হচ্ছে মার্কা মারা ব্যবস্থা। জীবের কিন্তু বিশেষ চেষ্টা স্ব স্ব "আমি আমার"গুলাকে অটুট বজায় রাখা। এই খেয়ালের ব্যবস্থা—ডাব চিনি দেওয়া, ফুল,ফল বা বাতাসা চড়ানো, মুরগি, হাঁস, ছাগ প্রভৃতি বলিদান দেওয়া, অষ্টপ্রহর মোচ্ছব (মহোৎসব) করা, "ব্যোম ভোলা" ব'লে গঞ্জিকার শ্রাদ্ধ করা বা তাস পেটা বা ছুট দেওয়া—কোন মন্দিরে। এত ঘুস্ ঘাস পেয়েও 'ভবি' কিন্তু নিজের ব্যবস্থা বজায় রাখেন। সেই ব্যবস্থা হ'চ্ছে জীবের "আমি—আমার" গুলার সঙ্গে খণ্ড লড়াই করা ও শেষে রোগ, শোক, তাপ, অভাব, অশান্তি প্রভৃতির দ্বারা হার স্বীকার করানো। সুতরাং জীব অকর্ম্মকে পুণ্যকর্ম্মবাচ্য ক'রে ও সূক্ষ্মত্ব অর্জ্জন না ক'রে স্থূলত্বের মাত্রা বৃদ্ধি ক'রচে। ফলে, কার্য্যকারিণী শক্তি হ্রাসের জন্য সাফল্য হ'তে অনেক দূরে গিয়ে প'ড়চে। শান্তি ও আনন্দ অর্জ্জন করবার সাধ পুষলে, বিশেষ আবশ্যক দিন থাকতে থাকতে স্ব স্ব ছোট "আমি—আমার"গুলাকে বড় "আমি—আমার"সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। জীব দেহস্থিত আত্মা—শক্তি, শান্তি, জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ ও লক্ষ্মীশ্রীর আকর। এই আত্মায় যে মাত্রায় শক্তি, শান্তি,আনন্দ প্রভৃতি বিদ্যমান, উহাই অর্জ্জন ক'রতে সক্ষম হ'লে প্রত্যেক জীব একূলে ওকূলে যথা-বিহিত সাফল্যলাভ ক'রতে নিশ্চিত পারেন। কিন্তু "আমি-আমার" রূপ ভীষণতর ভ্রান্তির দৌলতে জীবের সাধন ভজন দ্বারা অর্জ্জিত সূক্ষ্মশক্তিই স্ব স্ব বাসনা-ডাকিনী, ভাবনা-পেত্নী ও ভয় ভূতকে বিষম শক্তিশালী-শালিনী করে। তাই জীব কার্য্যকারিণী-শক্তি ক্ষীণতম ক'রে হায়-হায়গুলাকে জপমালা ক'রেছে। এই "আমি—আমার" ভ্রান্তির নাম **মায়া**। এই মায়াই **বিশ্বজননী**। এই মায়ার হাতেই বিকাশ-রাজ্যের চাবি। জীবের "আমি—আমার"গুলাই মায়াকে পর ক'রে রেখে "মা—আয়া" এই বুলি সাধতে দিচ্চে না। যে কোনও উপাদান বা মূর্ত্তি বা "আমি—আমার" বুলি সাধাতে বেজায় মজবুদ উহার প্রতি "মা আয়া" "মা—আয়া" এই ভাব গোপনে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে, আরোপ করা মায়ার খেলা হ'তে নিস্তার পাবার অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য উপায়। মা ভীষণা হ'লেও তাঁর স্বাভাবিক কোমলতা সন্তানের জন্য বক্ষ হ'তে নিঃসরণ হয়। আবার সেই জননীকে পর-ব'লে-পর, মহাশত্রু, ঠাউরালে তিনি অন্তরে না হ'ন চাক্ষস ভাবে ভীষণা হ'ন। মায়াকে 'মা' 'মা' বলার ফলে ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর ও ক্ষীণতম হয় "আমি—আমার" ভ্রান্তি। পরে সেই সন্তানের বুদ্ধির রেখাটুকু ক্রমশঃ মাত্রায় বৃদ্ধি হ'য়ে, উঠে বসে মনোময় ক্ষেত্র হ'তে বোধ ক্ষেত্রে। রবির কিরণজাল কালিমাবরণ চন্দ্রিমায় পতিত হওয়াতে সেই শশীই প্রতিপদের শশাঙ্ক হ'তে পূর্ণিমার সুধাকর হ'য়ে পড়ে। মায়ার মাতৃত্ব শিশু-সন্তানের মত জীব কর্ত্তৃক স্বীকৃত হ'লে মায়াই সেই জীবরূপী প্রাণ-মন সংযুক্ত বুদ্ধিকে বোধক্ষেত্রে স্থিতি করান। পরে সেই বোধশক্তিতে

প্রভাসিত হয় আত্মা-রবির জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, শান্তি, আনন্দ ও লক্ষ্মীশ্রী। তখন তখনই সেই জীব প্রকৃত সাফল্য লাভ করেন। এই আসল স্বরাজের অধিকারী হ'লে, নকল স্বরাজ লাভ করা সহজ সাধ্য হয়। এই ব্যাখ্যার পর রামকমল দেবকিশোরকে সস্নেহে চুম্বন ক'রে মৃদুস্বরে গাহিলেন :—

"তোর বদনে ঐ হাসিটি বড় ভাল লাগেরে,
মনে হয় তাঁরি হাসি নিলি তুই চুরি ক'রে
চুপি চাপি তাই দেখি; আড়ালে দাঁড়ায়ে থাকি,
কিন্তু তোর রীতি একি, ঢেকে নিস সে হাসিরে।
হেসে একা সুখ কিবা, ক'রে নে দশের সেবা,
মিলবে তবে বাহবা আরো হেসে ভাসাবি রে।

অতঃপর রাধাকিশোরকে সম্বোধন ক'রে বল্লেন "ইহাই আত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা প্রাণ-মন সংযুক্ত বুদ্ধিরূপিনী জীবকে।

দেবকিশোর সহাস্যবদনে বল্লেন "দাদাভাই নিজের প্যালাটা পাবার উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত না বিচার ক'রেই বিনা অনুমতিতে তা আদায় কল্লেন। তা কিন্তু ঠিক ঠাক আদায় করা হ'ল বুঝবো মায়ার উৎপত্তি কোথা হ'তে ও লয়ই বা কি ভাবে সাধিত হচ্চে এই তত্ত্ব ঐ শ্রীমুখ হ'তে শুনলে।"

রামকমল প্রফুল্লবদনে বল্লেন "দাদাভাইয়ের কাছে হার স্বীকার করাই জিৎ—তা হ'লেই দিলে নিলে, বদন পেলে, ফুরিয়ে গেল প্রেম-পিপাসা কাজটা সাঙ্গ হ'বে।"

আবার বল্লেন—"তুমি যখন না-ছোড় বন্দা, ব'লে ফেলে রেহাই পাওয়া যাক।"

কোন এক কালে সৃষ্টিছাড়া একটা কি চুপ চাপ ব'সে ছিলেন—ভোমা-গঙ্গারাম ভাবে। সেই সময় তাঁর সর্ব্বশরীরটা ভর্ত্তি ছিল এই ছোট খাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটাকে দিয়ে। সেই কালের কোনও এক কালে তাঁর সাধ হ'ল তাঁর দেহ-গুদামটাকে একদম খালি করবার। সাধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধ পূর্ণ হ'ল। তখন পরা-প্রকৃতি বা আত্মাশক্তি বা মহামায়া ভাবে জানাজানি হ'ল কর্ত্তার গুদামের এককাট্টা করা মালগুলাকে। নিজেকে একদম ফাঁকা ক'রে, কর্ত্তা নিজেকে জানান দিলেন যে তিনিই পরমাত্মা। তারপর উভয়ে মেতে আছেন সম্ভোগ-আনন্দে। এই সম্ভোগ-আনন্দের নাম সচ্চিদানন্দময়—সচ্চিদানন্দময়ী অবস্থা। সূক্ষ্ম সম্ভোগের নাম—বিহার। স্থূল সম্ভোগের নাম—রমন। স্থূল সম্ভোগে মত্ততা—শূদ্রাবস্থা। স্থূল হ'তে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাবস্থায় উপনীত হওয়ার ব্যবস্থার নাম—বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব। সূক্ষ্ম বিহারের ব্যবস্থা—ধ্যান ও সমাধি।

তা হ'লে বুঝা গেল, পরমাত্মার আত্মপ্রকাশের নাম মহামায়া। জীবে আছে পরমাত্মার তিল প্রমাণ অংশ—রশ্মি আকারে। এঁকেই বলে জীবাত্মা। সূক্ষ্ম ও স্থূল আর আর যা-কিছু উপাদানে আমাদেরকে মানুষ সাজতে হয়েছে সবই মহামায়া হতে পাওয়া। মহামায়ার যাবতীয় দান হ'তে সূক্ষ্মটুকুকে নিংড়ে বের করা ও শেষে সেই সূক্ষ্ম অরিষ্টটুকু আত্মার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়াই শেষ খেলা। এই খেলা সাঙ্গ করবার ভার মহামায়ারই উপর। ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীত্বে বরণ করাতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁরা আদিষ্টা হয়েছিলেন ৺কাত্যায়িণী দেবীর (অর্থাৎ মহামায়ার) তৃপ্তি সাধন ক'রতে। জননীই বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাকে সাজ-সজ্জা করায়ে ও যথাবিহিত শিক্ষা প্রদান ক'রে তাকে স্বামীগৃহে পাঠান। মন-প্রাণ সংযুক্ত বুদ্ধিই নর নারী আকারে ভবের খেলা সাধছে।

এই বুদ্ধির মায়াবরণ ঘুচলেই উহা বোধশক্তিতে পরিণত হয়। তখন তার আত্মার সহিত মিলন কর্ম্ম সাধিত হয়। মায়া অর্থে আবরণ, যথা—ফলের খোসা বা ডিমের খোলা। নর-নারীর খোলা বা খোসা (১) দেহ; (২) স্থূলদেহ বুদ্ধি ও (৩) স্থূল অহং বুদ্ধি। এই ধরণের সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর খোসা বা খোলা ল'য়ে আছেন দেব-দেবীরা। মানুষকে বা দেব-দেবীদেরকে যে দিন সূক্ষ্মতম সাজ-সজ্জায় মহামায়া সাজিয়ে দেবেন তখনই সেই জীবের বা দেব-দেবীর বিবাহের বাজনা বেজে উঠে। দেহস্থিত আত্মা ছাড়া, এই দেহ ও দেহের অণুর অণু পর্য্যন্ত সকলেই মায়ের দান। জীবের আদৎ বাবা ও মায়ের দান সবই ভাল—খুব ভাল—এই সংস্কার যখন হতশ্রী বুদ্ধির হবে—তখন তখনই জীব প্রকৃত আস্তিক হন। এই সংস্কার প্রভাবে দূষিত সংস্কার যে মাত্রায় যে জীবের ঘুচবে তিনি ভাল-মন্দ মিশ্রিত এ রাজ্য হ'তে মনোময় রাজ্যে ও তৎপরে বোধক্ষেত্রে উপনীত হবেন। তখন প্রাণ মন নিজ ২ ধারা মত এই সমুন্নত বুদ্ধিরই সহায়তায় তৎপর হওয়াতে জাগ্রত হয়, নিবৃত্তি অর্থাৎ নিস্তেজ বা নিদ্রিত বৃত্তিও জাগ্রত হয়, প্রবৃত্তি (অর্থাৎ প্রবুদ্ধ বা জাগ্রত বৃত্তি) সেই সময় অনন্য গতি হ'য়ে নিবৃত্তির সহিত এক জুটী হ'য়ে যাবতীয় কর্ম্ম সুসম্পন্ন করে। এই অবস্থায় প্রাণের ও মনের সাহায্যে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি সমজুটী হ'য়ে সর্ব্ব কর্ম্ম সাধন করাতে বোধ শক্তি কেবল মাত্র দর্শক ও শ্রোতা ভাবে অবস্থিতি করে। এই বোধ শক্তিতে স্থিত জীবই প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও বৈরাগী। বাবার বা মায়ের প্রদত্ত দেহস্থিত ও জাগতিক যাহা কিছু দানকে ভাল খুব ভাল ব'লে ধারণা করার ফলে, জীব দেহস্থিত ভালর-ভাল যিনি (অর্থাৎ আত্মা) তাঁর আলো সেই জীবের বোধ শক্তিতে প্রভাসিত হয়। এই আলোকই জ্ঞান। মহামায়ার যাবতীয় দানকে-বিশেষতঃ দেহস্থিত যাহা কিছুকে ভাল ব'লে আদর করাই মায়ের প্রকৃত পূজা বা আরাধনা করা। সে সুসন্তানের সেই পূজাই মহামায়ার বিশেষ তৃপ্তি সাধন করে। পরে সেই জীব মহামায়ার প্রসাদে ভাল বাসা, শক্তি, শান্তি, বিজ্ঞান আনন্দ ও লক্ষ্মীশ্রী লাভ ক'রে ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিকারী হন। সেই সুসন্তানের পূজায় তিনি-তিনিই পূজারী হন, তিনি-তিনিই কর্ম্মকর্ত্তা হন ও পরে সর্ব্ব সাফল্যদাত্রী শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী ভাবে সেই সুসন্তানের বাক্যে, কার্য্যে ও চিন্তায় বিরাজিতা থাকেন।"

এই কথাগুলি ব'লতে না ব'লতে চৌধুরী মহাশয়ের ভাবান্তর হ'ল। তখন তিনি বাষ্পপূরিত নেত্রে ও কথঞ্চিৎ উচ্চ কণ্ঠে বল্লেন "মা-মা-মা-আমার-আজ তুমি এ দীন সন্তানের মারফৎ যৎ-সামান্য ভাবে আত্ম প্রকাশ ক'রলে। ইহাই এ অধমের পক্ষে যথেষ্ট"। অতঃপর তিনি রাধা কিশোরকে পার্শ্বস্থিত প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া তাঁর হস্তে একটি শ্রীচুপড়ি অর্পণ ক'রলেন। রাধা-কিশোর সেই দান স্বীয় মস্তকে ধারণ ক'রে মাতুলের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রলেন। পরে স্বীয় মাতৃদেবীর শ্রীচরণোদ্দেশে বার বার প্রণিপাত ক'রে উপস্থিত হ'লেন সেই প্রকোষ্ঠে যথায় তাঁর আরাধ্য দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝলেন, "তিনি কে," ও তাঁর ইহজীবনের বাকি কটা দিন কোন্ কোন্ কর্ম্ম সাধতে হবে।

ভিক্ষুকের ঝুলি

(২)

ত্রিদণ্ডী ভার্গব

শ্রীশঙ্কর। ভারতের একটা সভ্যতা ছিল, কিন্তু জাতি-বিচার থাকায় তাহা উন্নত অবস্থায় পৌঁছাইতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রফেসার কেয়ার্ড সাহেব বলিয়াছেন, এই জাতি বিচার ভারতের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছে।

মুখোপাধ্যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে কত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা না জানিয়া তোমার মত শিক্ষিত যুবকের একটা কথা বলা উচিত নহে। কেয়ার্ড সাহেবের একখানা পুস্তক পড়িয়া তুমি একটা ধারণা করিয়া বসিয়াছ। কিন্তু দেখ নাই আরও কত বড় বড় পণ্ডিত হিন্দুদের এই জাতি বিভাগ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। অগস্ত কোম্‌তে তাঁহার কোর্স-ডি-ফিলোজফিপজিটিভে এই জাতি বিভাগ সম্বন্ধে বলিতে-গিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা প্রত্যেক প্রধান জাতিই প্রথমে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যদিও তাঁহার মতে এই বিভাগ স্থায়ী হইতে পারে না।

"The system (Caste system) is a universal *Sine qua non* of political progress adopted at a certain stage by the ancient nations, though its permanence, every where, was impossible because the political rule of intelligence is hostile to humau progress"

মহীশূরের বিখ্যাত পাদরী ডুবয় (Dubois) সাহেব বলিয়াছেন যে জাতি-বিচার ছিল বলিয়াই ভারতবর্ষ পদার্থ-বিদ্যা, কলাবিদ্যা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে এত উন্নত হইয়াছিল। এই মহাত্মার মতে এই চারি জাতি বিভাগ ছিল বলিয়াই সামাজিক অতুল শান্তি ও সুখ ভারত দীর্ঘকাল ভোগ করিয়াছিল। কোলব্রুক, রবার্টসন, টড, এলফিনষ্টোন প্রভৃতি সকলেই জাতি বিভাগকে নিন্দা করেন নাই। তোমাকে তাঁহাদের গ্রন্থাবলী যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

জাতি বিভাগে এখন বহুল দোষ আসিয়া পড়িয়াছে বটে, তথাপি উহার যে কোন উপকারিতা বা উপযুক্ততা ছিল না এরূপ ভাবা অত্যন্ত অন্যায়। পুরাতন প্রাসাদে জঙ্গল গজাইয়াছে বলিয়া প্রাসাদে শিল্প চাতুরী বা তাহার ভিতরে বহু মূল্য দ্রব্য ছিল না—একথা উপহাসের।

শ্রীশ। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে সবই কল্পনা—কেবল অসম্ভব উপন্যাসে পূর্ণ, তাই পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় না।

মু। তুমি ইংরাজী শিক্ষায় খুব পারদর্শী বলিয়া শুনিয়াছি। বুঝিতে চেষ্টা কর। কল্পনা অলীক নহে। কল্পনা আগে তার পর বাস্তব জিনিষ। আগে রামায়ণ তাহার পর শ্রীরামচন্দ্রের অবতার। কল্পনা সূক্ষ্ম শরীর—কার্য্য স্থূল দেহ। জ্যামিতির আগা-গোড়া কল্পনা; বীজগণিত কল্পনার প্রত্যক্ষ শাস্ত্র। অথচ জ্যামিতি ও বীজগণিত কি সত্য না প্রকাশ করিয়াছে! স্থিরবুদ্ধি হইয়া চিন্তা করিতে শিক্ষা কর।

সৃষ্টি কি করিয়া হইয়াছে তাহা কেহই দেখাইয়া দিতে পারে না। বেদ বল কোরাণ বল বা বাইবেল বল—সকল গ্রন্থই এক অবস্থায় অবস্থিত। সেই জন্যই "আপ্ত বাক্যে"র উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিলে চির দিন গোলে হরিবোল দিতে থাকিবে। আগে সৃষ্টির বিষয় না জানিলে সমাজ ও সভ্যতার কিছুই বুঝিবে না। যখন অনুমান ভিন্ন সৃষ্টি বুঝা যায় না, তখন তোমার অনুমান পরিমলের অনুমান বা বিনয়ের অনুমানের উপর একটা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আপ্ত বাক্যে একনিষ্ঠ বিশ্বাস করিতে হইবেই।

জড় বিজ্ঞান জড়তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া কত কি তত্ত্ব পরিস্ফুট করিতেছে। এটমিক তত্ত্ব কল্পনা ভিন্ন কিছুই নহে। কোন জড়বাদী তোমাকে এটম দেখাইয়া দিতে পারেন না। অথচ এটম ছেড়ে দিলে, সমস্ত জড় বিজ্ঞান ভাসিয়া যাইবে। আবার আজ কাল শুনিতেছি রেডিয়াম তত্ত্ব বাহির হইয়াছে। অর্থাৎ রামের কথা ছাড়িয়া শ্যামের কথা ধর। এই ভাবে চলিলে কখনই একটা পরম সত্য বাহির করা যায় না। কেবল কচ কচি সার মাত্র। আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস কর—সকল বুদ্ধি আপনি জুটিতে থাকিবে।

শ্রী। আপ্ত বাক্যগুলি যে অভ্রান্ত তাহা কেমন করিয়া বুঝিব, বলুন।

মু। ঠিক যেমন করিয়া জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতির স্বীকার্য্য ও থিওরিগুলি অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইবার বিদ্যালাভ করিয়াছ, ঠিক সেই ভাবেই আপ্ত বাক্যগুলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া বিচার করিতে থাক। যদি পরব্রহ্মকে সকলের মূল ইহা ধারণা করিতে পার এবং যদি তিনি সর্ব্ব শক্তিমান পরম পবিত্র পরম মঙ্গলময় ও পরম দয়ালু বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে আপ্ত বাক্য অভ্রান্ত ইহা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। আপ্তবাক্য কাহারও মুখের কথা নহে। আপ্তবাক্য বা বেদ ব্রহ্মস্বরূপ, মহাপ্রলয়ে লীন হয় আবার সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়। সৃষ্টির তত্ত্বে আকাশই প্রথম জড় পদার্থ। আকাশের অস্তিত্বের অভিব্যক্তি শব্দে। শব্দও জড় পদার্থ। আপ্তবাক্য আর কিছুই নহে—সেই শব্দ-ব্রহ্ম, পিতামহগণের দ্বারা উচ্চারিত মাত্র। নিরুক্তকার যাস্ক বলেন—"যস্য বাক্যং স ঋষিঃ" অর্থাৎ যিনি বাক্য ধরিয়াছেন তিনিই সেই শ্রুতির ঋষি। "বেদ প্রাপ্ত্যর্থং তপোঽনুতিষ্ঠতঃ পুরুষান্ স্বয়ম্ভুর্ব্বেদপুরুষঃ প্রাপ্নোৎ॥" তথাচ "শ্রূয়তে অজান ন বৈ পৃশ্নীংস্তপস্য মানান স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষত্ত দৃষয়রো ঽভবন্নিতি।" (ঋক্‌বেদ সংহিতায় ১ম মন্ত্রের ভাষ্য ভূমিকা) সুতরাং যদি ব্রহ্ম পদার্থ সত্য হয়েন, তবে তাহা হইতে যাহা উদ্ভূত তাহাই সত্য। আপ্তবাক্য সত্য উহা ভগবদ্বাক্য। বেদ বাক্য কোন অলৌকিক শক্তি লাভের ফল নহে। পিতামহগণের কোন শক্তির প্রয়োজন ছিল না। সত্যের প্রথমপুত্রগণ সত্য প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু করিতে পারেন নাই। এই জন্যই আপ্তবাক্যে কুত্রাপি ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই।

শ্রী। আপ্তবাক্য আর্য্যবংশধরের পক্ষে সত্য হইতে পারে—মুসলমান বা খ্রীষ্টধর্ম্মে তাহার আদর কেন করিবে? তাহা ছাড়া বেদে ঈশ্বরের নাম নাই—তবে তেত্রিশ কোটী দেবতার নাম ত আছে।

মু। অন্য জাতির পক্ষে আপ্তবাক্য সত্য কেন তাহা যথাসময়ে বিচার করিব। আপাততঃ তেত্রিশ কোটী দেবতার প্রয়োজন কেন ও বেদে সেই বিষয় কেন আলোচনা করিয়াছেন তাহার বিচার করা যাক।

দুইটি বীজ এক মাটিতে এক টবে রোপন করিয়া এক আধার হইতে তাহাতে জল সেচন করিতে থাক। পরে গাছ হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি মিষ্ট ফল দিল আর একটি তিক্ত ফল প্রসব করিল। এখন এই দুই গাছকে কি করে বুঝাইবে বল দেখি।

শ্রী। কেন একটা তিক্ত বা নীম গাছ আর একটা মিষ্ট বা আম গাছ।

মু। অর্থাৎ পৃথক পৃথক জাতির নাম সংজ্ঞা প্রয়োজন, নতুবা অসীম সৃষ্ট পদার্থে গোলমাল হইয়া পড়ে। আমগাছের যেখানে দরকার তথায় নীমগাছ এনে দিলে তুমি কখনই সুখী হইতে পার না। আমের যায়গায় নীমফল খেতে দিলে তোমার তৃপ্তি সাধন হইবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল জগৎ ছাড়া সূক্ষ্ম জগৎ যে বর্ত্তমান - তাহা তুমি অবশ্যই বোঝ। মূলে যে এক শক্তি কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার বিভিন্ন ফলদায়িকা শাখা আছে। নীমের গুঁড়ি দিয়া যে জল—তিক্তরস প্রদান করে—সেই জল আমের গুঁড়ি দিয়া মিষ্ট রস দেয়। আলোক যে শক্তি, মূলতঃ তাড়িতও সেই শক্তি। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আলোক ও তাড়িত পৃথক পদার্থ। আলোক যে কম্পনরূপ গুঁড়ি দিয়া সৃষ্ট হয়—তাড়িত অন্য কম্পনে প্রস্তুত হয়। যদি আলোক ও তাড়িতকে পৃথক সংজ্ঞা না দাও তবে গোলমাল হইয়া যাইবে। যে শক্তির উৎকর্ষ সাধনে বৃষ্টির সৃষ্টি হয়—ঠিক সেই শক্তি বৃষ্টি নিবারণ করিতে পারে না। যে শক্তি মৃত্যু আনয়ন করে—ঠিক সেই শক্তি জীবন দান করিতে পারে না। হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবতা বালকের উপন্যাস নহে—বাহ্য ও অন্তর শক্তির সুন্দর সামঞ্জস্য মাত্র। এই সূত্রে তোমাকে চলিত আচরণগুলির বিষয় চিন্তা করিতে উপদেশ দিতেছি। ঔষধ খাবার সময় বিষ্ণু, ভোজনকালে জনার্দ্দন, বসন্তরোগে শীতলা, শূলরোগে বৈদ্যনাথ, বিদ্যার জন্য সরস্বতী, বিপদে মধুসূদন, ধনের জন্য লক্ষ্মী, ইত্যাদি। এই বিভাগের মূলে—উপরোক্ত সংজ্ঞা-তত্ত্ব।

শ্রী। আচ্ছা, নাম সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়োজন না হয় বুঝিলাম। কিন্তু প্রত্যেক শক্তির অসম্ভব রূপ কল্পনা কেন? পরমেশ্বরের ত কোন রূপ নাই?

মু। বেদের প্রত্যেক স্থানেই বলা হইয়াছে যে পরব্রহ্মের কোন রূপ নাই। তিনি অব্যক্ত—অবাঙমনসোগোচর। তাঁহাকে জানা অতিশয় কঠিন, এমন কি প্রায় অসম্ভব।

ন তং বিদাথ যইমা জজানান্যদ্ যুষ্মাক মন্তরং বভূব।
নীহারেন প্রবৃতাজল্প্যা চাসু তৃপ উক্থ শাসশ্চরন্তি॥

অর্থাৎ হে মানবগণ! তুমি তাঁহাকে জান না তোমরা যাহা জানিয়াছ—তাহা অন্য। অজ্ঞানরূপ কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইয়া তিনি এমন, তিনি তেমন ইত্যাদি কল্পনা করিতেছ। বৃথা জল্পনা কল্পনা ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যে প্রাণ তোমাদের দিয়াছেন—তাহার তর্পণ কর। যাহাতে ইহ ও পরকালের মঙ্গল সাধন হয় তাহাই কর। ব্যাসদেব বেদ গ্রন্থিত করিয়া, অষ্টাদশ পুরাণ গ্রন্থিত করিয়া, শেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—ওহো! এত করিলাম তবুও তোমার "নাগাইল পেলাম" না—অনেক রূপ কল্পনা করিলাম—তজ্জন্য ক্ষমা করিও॥ বুঝিবার সৌকার্য্যার্থে ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা।

উপযুক্ত শাস্ত্রবাক্যে ইহা বুঝিতে হইবে না যে—রূপ ও ধ্যান বৃথা। নাম ও রূপবিহীন সেই এক শক্তিকে যেরূপে যে নামে চাহিবে - তিনি সেইরূপে সেই নামে তোমার নিকট অভিব্যক্ত হইবেন। দেবতা তত্ত্ব অতি মহৎ ও অতি গুরুতর তত্ত্ব। ভাব তরঙ্গের বিভিন্নতায় বিভিন্ন ধ্যান

হইবে যদি তুমি জান যে উহা তোমার পিতার বা পূর্ব্ব পুরুষের অন্ননলব্ধ জিনিষ। পৈতৃক ভিটার উপর যে প্রেম—যে টান—তাহা অন্তের নিকট কাড়িয়া লওয়া জিনিষে হইতে পারে না। সেইরূপ যদি শ্রুতি বা শাস্ত্রবাক্য সত্য ভাবিয়া আমরা আর্য্যাবর্ত্তের জন্মগত অধিবাসী এই শিক্ষা পাই তবে আমাদের পৈতৃক সম্পত্তিতে যে টান হইবে তাহা যাহাতে ক্ষীণবল হইয়া যায় তজ্জন্যই আমরা এখানের নহি—অন্যত্র হইতে আসিয়া কাড়িয়া লইয়াছি, ইত্যাদি শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে। জানিয়া রাখ শাস্ত্র মিথ্যা নহে—আমাদের পিতৃগণ কোথাও হইতে আসেন নাই। হিমালয় ও তৎসংলগ্ন ভূভাগই পুরাতন ভূখণ্ড এবং তথায় পিতামহগণ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রী। এত জল প্লাবন—এত যুগ প্রলয় হইয়া গেল, তবুও কি হিমালয় প্রদেশ জল প্লাবনে ডুবে নাই?

মু। বৃদ্ধ হইয়াছি—সব কথা মনে হয় না। তোমাকে হেলি, ওয়ালেস, ড্রেসন, সার রবার্ট বল ও গীকী প্রভৃতি ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিতে বলি। গস্‌লিং সাহেব বলিয়াছেন—চক্রধুরের দুইদিকে এই পৃথিবীর দুই মেরু বর্ত্তমান। ইহা ছাড়া অপর মেরু আছে। উহাকে "ম্যাগনেটিক পোল্‌" বলে। আমাদের পুরাণে আছে ধরিত্রীর একটা তদ্রূপ শক্তি আছে। এই শক্তি—এই পৃথিবীর ব্রহ্মরন্ধ্রে সঞ্চিত থাকে। ইহা চক্রাকারে সাপের গতিতে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বত্র বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। যখন ধরার ভার অসহ্য হয় অর্থাৎ শক্তি সামঞ্জস্যের ব্যাঘাত হয় তখন অনন্ত নাগের মাথা নড়ে। তদ্রূপ শক্তি তখন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠে অর্থাৎ যাহাকে অরোরা বলিয়া আমরা জানি। হাজার বৎসর পরে বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ বিকৃত হয়—তাহার ফলে দুই দিকে শৈত্যের তারতম্য হইয়া থাকে। গস্‌লিংর মতে গত ১২৪৮ খৃঃ অঃ উত্তর দিকে পূর্ণ আট দিন অধিক গরম ছিল। ১২০৪,৫ খৃঃ অঃ সেই স্থিতি সাড়ে সাত দিনেরও অধিক নহে। চার শ' বছর পরে উত্তরে শীতাধিক্য হইবে। পৃথিবীর মেরুদণ্ড সূর্য্যের চারিদিকে conical motion এ ঘুরিয়া থাকে (Precession cycle); এই আবর্ত্তন ২৬০০০ বৎসরে পূর্ণ হয়। এই গতির ফলে ২৪০০০ বৎসরে আবহ বিপর্য্যয় ঘটে। পুরাণ শাস্ত্রে আছে একটা কল্প ৮৬৪০০০০ বৎসর স্থায়ী। একটা মহাকল্প তাহার সহস্রগুণ অধিক স্থায়ী। ইহাকে যদি ৩৬০ চান্দ্র দিনে ভাগ দাও, তবে ২৪০০০ বৎসরে এক কল্প প্রলয় হয়। গসলিং যাহা বলেন—শাস্ত্রেও ঠিক তাহা বলে। তবে আর পঞ্জিকাদিকে ঘৃণা কেন করি। পৃথিবী সৃষ্ট হওয়া থেকে কত যুগ, কত কল্প চলিয়া গিয়াছে তাহা জ্যোতিষের বিষয়—অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে। মহা প্রলয় হইতে অনেক বাকী। ক্ষুদ্র প্রলয়ে হিমালয় ডুবে নাই।

এখন দেখা যাক—কিরূপে এই পিতামহগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক কথা বলিয়াছেন ও এখন বলিবার চেষ্টা করিতেছেন। মানুষের স্বভাব একত্রে থাকিবার প্রবল চেষ্টা। পিতামহগণ গুণকর্ম্মের তারতম্য অনুসারে স্ব-ইচ্ছায় তিনভাগে সমাজকে ভাগ করিয়া লয়েন। এই সমাজ বন্ধনের ফলে ক্রমোন্নতির পথে সমাজ অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমশঃ জল গর্ভোত্থিত অন্যান্য ভূভাগের লোকের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ হইতে থাকে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের গ্রন্থে তাহা বিশেষ দেখিতে পাইবে। পারস্য, আরব, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি দেশে

এই আর্য্য পিতামহগণের প্রভাব সংসর্গ ফলে ক্রমশঃ প্রচারিত হয়। ইহা অতি বিস্তৃত বিষয়—আমি সংক্ষেপে তাহার আভাষ দিলাম মাত্র। তোমাকে পূর্ব্বোক্ত মহা পণ্ডিতগণের গ্রন্থাবলী বিশেষ ভাবে পড়িতে উপদেশ দিতেছি। অধুনা শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় "Indian civilisation and its antiquity" নামে যে পুস্তিকা লিখিয়াছেন তাহাও পড়িতে বলি। মনস্বী শ্রীযুক্ত পি, এন্, বসু মহাশয় লিখিত Epochs of civilisation পাঠ করিতে পার।

শ্রী। আপনার কথায় এই বোঝা যায়—যে মানুষের সকল বিষয়ের মূল এই আর্য্য-পিতামহগণ। ইহা কি বিশ্বাস যোগ্য ?

মু। বিস্তৃতির আশঙ্কায় তোমাকে দু একটি প্রমাণ শুনাইতেছি :—

After having carefully examined all the traces of supposed foreign influences, that have been brought forward by various scholars, I think, I may say, that there real'y is no trace whatever of any foreign influence in the language,the religion or the ceremonials of the ancient vedic literature of India. As it stands before us now, so it has grown up, protected by the mountain ramparts in the North, the Indus and the Desert (1) in the West, the Indus or what was called the sea in the south and the Ganges in the east. It presents us with a home-grown poetry, and a home-grown religion ; and history has preserved to us at least this one relic in order to reach us what the human mind can achieve if left to itself surrounded by a scenery and by conditions of life that might have made man's life on earth a paradise if man did not possess the strange art of turning even paradise unto a place of misery (Lectures by Maxmuller.) Cole-brooke says:—Hindoos had undoubtedly made some progress at an early period in the astronomy etc. which is a much more correct one than the Greeks ever achieved. All were certainly borrowed by the Arabians."

"Take any burning question of the the day—popular education, higher education, parliamentary representation, codification of laws, finance,emigration, poor-law and whether you have anything to teach or try or anything to observe and to learn., India will supply you with a laboratory such as exists nowhere else. (Max-muller's lectures).

The Aryans of India (were) the framers of the most wonderful language the fellow workers (promoters ?) in the construction of our fundamental concepts, the fathers of the most natural of natural religions the makers of the

---

(1) The Deserts of Rajputana were not in existence at the time of the Rigvedas. All land was under water. The present day researches prove this.

most transparent of mythologies, the inventors of the most subtle philosophy and the framers of the most elaborate laws. (Max-muller's lectures).

Plinny says :—In no year does India draw our Empire of less than fifty-five millions of sesterces giving back her own wares in exchange which are sold at one hundred times their prime cost.

Sir. J. C. Bose says:—Indeed a capacity to endure through infinite transformation must be latent in that mighty civilisation which has seen the intellectual culture of the Nile valley, of Assyria and of Babylon, wax and wane and disappear and today gazes on the future, with the same invincible faith with which it met the past. (Address given to the students of the Calcutta Presy. College in Jany 1925.)

এই সকলের বঙ্গানুবাদ দেওয়ার আবশ্যক নাই, কেননা তোমার ইংরাজী নবীস। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না—তাঁহাদের ইহা না বুঝিলেও ক্ষতি নাই।

আর্য্য প্রণীত সমাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মহান মৈনাক স্বরূপ চারিস্তম্ভ আজ চূর্ণ বিচূর্ণ প্রায়। এবং সেই অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য সমাজ আজ শতধা বিচ্ছিন্ন। জাতি বিচার ছেলের খেলা নহে। তুমি পাশ্চাত্য মতেও দেখিতে পাইবে ব্লুমেন ব্যাক ও হক্সলী মানুষকে জাতিতে বিভাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই বিষয়ে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া আজকার মত বিদায় হইতেছি :—

If there is a gigantic array against a criminal there must be some show in favour of it. The evils of the caste system are many and various but we would not do our duty, if we do not say all that can be said in favor of it. Among native scholars, Rai. Sarat Chandra Das Bahadur of Tibetan fame says in his "Indian Pundits in the land of snow"—"The caste system was wisely instituted by our ancestors to preserve the integrity of our aryan character and origin. Had it not been for this we would have lost the traditions of our ancestors, become moslemised like Afgans and Eastern Tartars. It will not savour of presumption of my part to say that of all nations of the world, the Indian aryans alone have preserved there institutions which insure the preserva ion of the purity of blood"

Pandit Haro Prosad Shastri says :—"The wonderful organisation of the Brahmans was no where displayed to greater advantage than in the organisation and development of the caste system making all its parts work harmoniously with the sole object of rendering the people happy and contended. (History of India P. 63). বঙ্গানুবাদ প্রয়োজন নাই।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইবার বিদায় লইলেন। শ্রীশঙ্কর ও তাঁহার বন্ধুদ্বয় কুটীর হইতে বাহিরে আসিয়া এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।—

পরিমল। ইতিহাস-বেত্তা রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার Ancient India গ্রন্থে জাতি বিভাগ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে জাতি বিভাগ অনেক কাজ করিয়াছে।

বিনয়। রমেশ দত্ত বলিয়াছেন:—"However much therefore the Historian of ancient India may deplore the remains of the caste system, he should never forget that the worst results of that system were unknown in India until the Pauranic times (after the Mahomedan conquest). Let us see what are the worst results that the system has presented after the Mahomedan conquests. It has served to divide the nation and create mutual ill-feeling and it has served to degrade the nation in order to exalt the priests".

শ্রীশঙ্কর। But throughout his great work, Mr. Dutt does neither record a single instance of mutual ill-feeling nor explains how caste system has degraded the nation. There is division no doubt; and where there is division there must be some ill-feeling is a mental *bias* and has no value as long as it is not founded on facts. Mr. Dutt like many others who judge every thing from a distance by inference has fallen a prey to this prejudice and his extreme liking for inter-caste marriage is killed by his extreme dislike for 'Hybrid caste". It is pleasing to find him denouncing the caste division as un-wise, but it is puzzling to find him un-willing to be called a *Sudra*. We expected from his pen cases of misunderstanding, at least similar to those between priest-craft and science, priesthood and laity, Lords and commons, capitalists and labourers, free man and serfs prevailing in countries where there is no caste distinction. But we are too weak here to face the Hindoos who conclude from the remarks of Al-Beruni (1)—that the Vaisyas after the revolution of the 9th and 10th centuries and the Khatriyas after the 12th century gave up, of their own accord, their national language and literature in order to learn what was more profitable viz, the language, manners, customs and arts of their conquerors for their very existence, while Brahmans starved, yet held fast to their ancient heritage, as they still do and promise to do till their extincion from the creation. তবেই দেখ—জাতিবিভাগের বিরুদ্ধে বা পক্ষে নানা প্রকার যুক্তি তর্ক থাকিলেও এটা ঠিক যে হিন্দু-সমাজ was a compact body with an order, concord and Govt. The

(1) Mahomedon historian who lived about 100 years prior to Prithwiraj's time—the last ক্ষত্রিয় emperor of India.

thousand and one castes instead of being so many jarring sections are but inter-dependent bodies, each having both local as well as an intrinsic value, living peacefully together, none having any complaints against another, against God, against man. So even the lowest ডোম is proud of his caste and can part with all—his sons, daughters, wife and even his life but cannot part with his caste. Seven hundred years of Mahomedan mission and two hundred years of Christian influence could not induce even the *dome* to prefer the freedom and happiness offered by the missionneries to their own unfortunate position.

বিনয়। ভাববার বিষয় বটে। Jarring interests, mutual jealousies, perpetual discontent and un-governable elements mark the every day progress of western civilisation.

শ্রীশ। Only a few hundred years ago trade in slaves, burning of witches and heretics, bloody feuds between seculiarism and religion were the prominent feature of that civilisation. But now instead of the right of might there is free competition for the commom desideratum, open to all classes and protection by laws. There is now the ascendency of capital, the falling of one section at the cost of another, there are hostilities between upper and lower classes, pauperism and poor laws. While there is smile and luxury on one side, there is the frown of poverty on the others ; the evils of free competition are too many to be enumerated here. তোমরা ভাই Karl, Mar, Engilis প্রভৃতি বড় বড় গ্রন্থকারদের পুস্তক পড়িলে সব দেখিতে পাইবে।

বিনয়। দেখছি আজকালকার Progress is a move from frying pan to fire.

শ্রী। তা'হলেই দেখ সমাজের object has not yet been gained and the civilisation is still in its infancy. The agent of destruction of the prevailing state of things is already out to work and we must not lose sight of the progress of socialism in its various phases.

বিনয়। It seems that it is growing in bulk and proportion day after day and threatening to bury the Herculianism and Pompianism of modern civilisation under its lava as soon as it finds a crater.

শ্রী। তা'হলে ভাই আমাদের বুঝা উচিত আমরা কতদূর justified to force this great civilisation in place of one which shows perpetual peace and tranquillity together with a steady progress in science, arts and industries—a progress, which has amazed the greatest heads of the modern world. (ক্রমশঃ)

অদ্যকার ভারত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বি-এ, কাব্যতীর্থ

৯। যেদিন হইতে আমরা চাকুরীকেই ধনাগমের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি এবং যেদিন হইতে গোলামী শিখিয়াছি, সেই দিন হইতেই ভারতের সজীবতা নষ্ট হইল এবং ভারতীয়গণ উদ্যম, ঐক্য, সাহস, অধ্যবসায় ও তৎসঙ্গে শারীরিক বলের অভাব প্রযুক্ত বাণিজ্যের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে নারাজ হইয়া পড়িল এবং ক্রমে ক্রমে তুলার ব্যবসায়, নীলের চাষ, চিনির কারবার, ও তৎসঙ্গে কুটীরশিল্প নষ্ট হইতে লাগিল। আমরা এখন এমনই পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছি যে, যে দেশ হইতে একসময়ে নিম্নলিখিত বাণী প্রচারিত হইয়াছিল—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈবচ",

এবং যে দেশ অর্থাগম বিষয়ে বাণিজ্যের প্রথম স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল, সেই বাণিজ্য আমাদের হস্তচ্যুত হওয়ায় আমরা লক্ষ্মীছাড়া হইয়া পড়িয়াছি এবং চাকুরীবৃত্তি বা 'শ্ব'বৃত্তিকেই আমরা শ্রেষ্ঠ বৃত্তি মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। ফলে আমাদের এমন অবস্থা হইয়াছে যে, এখন দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতেও পাই না।

১০। যদি পেটে ভাত না থাকে তবে রক্তে জোর আসিতে পারে না। আবার রক্তের জোর না থাকিলে রোগ আসিয়া জীবকে সহজেই কাবু করিয়া ফেলে। সুতরাং রোগের সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তির অভাবে নানাদিক হইতে নানাপ্রকার ব্যাধি আসিয়া জীবদেহ আক্রমণ করে। এই যে ম্যালেরিয়া আমাদের দেশকে উচ্ছন্ন করিতেছে, উহার অন্য নাম Hunger disease—অর্থাৎ খাওয়ার অভাবে এই জ্বরের আবির্ভাব। ঔষধের চেয়ে পথ্যের উপর রোগের আরোগ্য অধিকতর পরিমাণে নির্ভর করে। কারণ জীবনীশক্তি থাকে খাদ্যে এবং খাদ্যের অভাবেই রোগের সূচনা ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

১১। এখন আমাদের দেশের মত অস্বাস্থ্যকর দেশ বোধ হয় আর নাই। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ক্ষয়রোগ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ আমাদের নিত্য সহচর। ১৯১৮-১৯১৯ সালে একমাত্র ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে ৮৫ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়াতে প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে দশলক্ষ লোকের জীবলীলা সাঙ্গ হয়। এই ভীষণ মৃত্যুহারের ফলে আমাদের আয়ুষ্কাল দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু অন্যান্য দেশের লোকের আয়ু দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

বিভিন্ন দেশের লোকের আয়ুষ্কালের তুলনা (বৎসর হিসাবে) :—

দেশ	১৯০০	১৯১০	১৯২৫
আমেরিকা	৪৭	৫৪	৫৬.২
ইংলণ্ড	৪৪.২	৪৭	৫১.৩
জাপান	৩৬	৩৯	৪৪.১
ভারতবর্ষ	৩২.৪	২৭.৯	২২.৩

১২। এক্ষণে শিক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সমস্ত ভারতবর্ষে শতকরা ৫.২ লোক লেখা পড়া জানে। এই লেখাপড়া জানার অর্থ কোন মতে চিঠি লেখা ও পড়া মাত্র। অবশ্য বেশী লেখাপড়া জানা লোকও এই সংখ্যার মধ্যে আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে ব্রহ্মদেশেই শিক্ষার বিস্তার বেশী। কারণ ব্রহ্মদেশে বহু বৌদ্ধ মন্দির আছে। সেই সব মন্দিরে পুরোহিত-গণ বৌদ্ধ বালক বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দেন। তৎপরে ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন (দেশীয় রাজ্যে) শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক। তাহার কারণ এই রাজ্যে খৃষ্টানদের সংখ্যা খুব বেশী। অনেকটা দেশীয় রাজের চেষ্টায় এবং কতকটা খৃষ্টান্ পাদরীদের চেষ্টায় এই দুই রাজ্যে শিক্ষার বৃদ্ধি হইয়াছে। সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে বরোদাতেই লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা সব চেয়ে ভাল। তাহার কারণ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরোদা রাজ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন হয়।

১৩। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অক্ষর-পরিচিত লোকের সংখ্যা :—

প্রদেশ	১০০০ পুরুষে	১০০০ স্ত্রীলোকে
ব্রহ্মদেশ ...	৫১০ ...	১১২
ত্রিবাঙ্কুর ...	৩৮০ ...	১৭৩
বরোদা ...	২৪০ ..	৪৭
বাঙ্গলা ...	১৮১ ...	২১
মাদ্রাজ ...	১৭৩ ...	২৪
বোম্বে ...	১৫৭ ...	২৭
মহীশূর ...	১৪৩ ...	২৭
আসাম ...	১২৪ ...	১৪
বিহার ও উড়িষ্যা ...	৯৬ ...	৬
মধ্য প্রদেশ ও বেরার ...	৮৭ ...	৯
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ...	৮০ ...	১০

পঞ্জাব ও দিল্লী	...	৭৬	...	৯
রাজপুতানা ও আজমীর	...	৭৪	...	৬
মধ্য ভারত	...	৬৫	...	৭
হায়দ্রাবাদ	...	৫৭	...	৮
কাশ্মীর	...	৪৬	...	৩

১৪। জগতের প্রায় সকল সভ্য দেশেই বাধ্যতামূলক শিক্ষার আইন আছে, তাহার ফলে সেই সব দেশে প্রায় সকল লোকই লেখাপড়া জানে আর সেই সব দেশে বিনা বেতনে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সেইজন্য সেই সকল দেশে তৎ তৎ দেশীয় সরকারকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। শিক্ষার জন্য প্রতি বৎসর কোন্ দেশে জন প্রতি সরকারের কত ব্যয় হয়, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

ডেনমার্ক	...	১০ টাকা
আমেরিকা	...	১৬।০ টাকা
ইংলণ্ড	...	৯৷৵০ টাকা
ফ্রান্স	...	৯ টাকা
জাপান	...	৯ টাকা
ফিলিপাইন	...	৮ টাকা
ভারতবর্ষ	...	৷০ আনারও কম।

অর্থাৎ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে দশকোটি লোকের শিক্ষার জন্য সেখানকার সরকার ১৬৭ কোটি টাকা ব্যয় করেন, আর ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ২৫ কোটী লোকের শিক্ষার জন্য সরকার ১১৷০ কোটী টাকা খরচ করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে আমাদের বাঙ্গলা দেশেই ৮০ (আশি) হাজার টোল এবং ২১ (একুশ) হাজার মক্তাব ছিল। আজকাল বাঙ্গলায় তাহার অর্দ্ধেক বিদ্যালয় আছে কিনা সন্দেহ।

১৫। এই পর্য্যন্ত গেল শিক্ষার আয় ব্যয় ও স্কুলের সংখ্যার কথা। এক্ষণে জগতের বিভিন্ন দেশের লেখা পড়া জানা লোকের শতকরা হিসাব দিতেছি :—

দেশ	...	১৯০১	...	১৯১১	...	১৯২১
হল্যাণ্ড	...	৮৬	...	৯৪	...	১০০
নরওয়ে	...	৮৭	...	৯৫	...	১০০
জার্ম্মানী	...	৮৮	...	৯৬	...	১০০
যুক্তরাষ্ট্র	...	৮৬	...	৯৯	...	৯৫'৪
ইংলণ্ড	...	৮৬	...	৯৭	...	৯৩
জাপান	...	৮০	...	৯৫	...	৯৭
ফ্রান্স	...	৮৮	...	৯২	...	৯৪
ভারতবর্ষ	...	৩'৮	...	৪'৫	...	৫'২

ত্রিবাঙ্কুর	...	১১	...	১৯	...	২৪
বরোদা	...	৬'৫	...	১৩	...	২১

দেখা গেল ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত ইংরাজ শাসিত ভারতে শত করা মাত্র কিঞ্চিৎ অধিক পাঁচ জন লোক লেখা পড়া জানে।

১৬। এখন যেটুকু শিক্ষা ভারতবর্ষ প্রাপ্ত হয় তাহা যদি জাতি গঠনোপযোগী হইত তাহা হইলেও ভারতবাসীরা কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত হইতে পারিত। কিন্তু যে শিক্ষা তাহারা পাইয়া থাকে, তাহাকে কুশিক্ষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্কুল ও পাঠ্য পুস্তক এমন হাতে তৈয়ারী করা হইতেছে, যাহার ফলে তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি ক্রমশঃ ঘটিতেছে এবং তাহাদের প্রকৃত জাতীয়তা উদ্বোধনের ভাব ও স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি ক্রমান্বয়ে লুপ্ত হইয়া দলের পর দল মেরুদণ্ডহীন, ব্যক্তিত্বহীন গোলামে পরিণত হইতেছে। ফলে ভারতবাসীর জাতীয়তা বোধ নাই বলিলেই হয়।

১৭। জগতের কোন জাতিরই আমাদের ন্যায় এমন দুর্দ্দশা হয় নাই। দেশে আমরা খাইতে পাইনা—আমাদের ধন গেল, মান গেল, প্রাণ গেল,—মনুষ্যত্বেরও লোপ হইল। নিজেদের দেশে আমরা গোলামের মত থাকি, আর বিদেশীয়েরা আমাদিগকে দেখিয়া ঘৃণা করে। সকলেই আমাদের অতীত গৌরব ও সভ্যতা দেখিয়া যেমন বিস্মিত হয়, আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতন দেখিয়া তেমনই ঘৃণা ও উপহাস করে।

১৮। এই প্রকারে আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া দিন কাটাইতেছি এবং ক্রমশঃ মরণের পথে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু দুঃখ চিরকাল থাকে না; দুঃখের পর সুখ অবশ্যম্ভাবী। চিরকাল এক ভাবে কখনও দিন যায় না। উত্থানের পর পতন, পতনের পর উত্থান—ইহা চিরন্তন রীতি। তাই আজ দেশনায়কগণ দেশের নামে, জাতির নামে ডাকিতেছেন—বলিতেছে, 'ওঠো জাগ, অভ্যুদয়ের উষালোকে অভিনব পরিবর্ত্তন সন্দর্শন কর'।

১৯। কিন্তু ভারতের ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ নিবিড় নিশিতে আত্মবিস্মৃত মোহাচ্ছন্ন জাতিকে জাগরণের পথে কাহারা অধিকতর সাহায্য করিতে পারে? কাহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া শিক্ষা ও কার্য্যদ্বারা ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন শতকরা ৯০ জন পল্লীবাসীর প্রাণে 'নূতন পরাণ—নূতন প্রভাত' আনিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত ভাবে মনুষ্যপদবাচ্য করিয়া তুলিতে পারে? যাহারা পারে তাহারাই শিক্ষক নামের যোগ্য হইবে। এই জন্যই শিক্ষকের কাজ এত কঠিন এবং এই জন্যই সমাজে তাহাদের এত সম্মান, এত প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি সহরে চাকুরী, ওকালতী, মোক্তারী, ডাক্তারী, মাষ্টারী করিয়া নিজেদের স্বার্থের এক একটা ছোট ছোট গণ্ডী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ভাবিতেছেন—দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছে—তাহাদের দ্বারা দেশের কতদূর কল্যাণ সাধিত হইবে তাহাও জন সাধারণ একবার ভাবিয়া দেখুন। অলমতি বিস্তরেণ!

দিগ্ দর্শন।

ভবিষ্য-চিকিৎসা

'পূর্ণ সৌষ্ঠবসম্পন্ন সুস্থ দেহই জীবনের প্রকৃত ও স্বাভাবিক অবস্থা; তদ্বিপরীত অবস্থা বিকৃত ও অস্বাভাবিক। ব্যভিচার দ্বারাই এই বিকৃত অবস্থার সৃষ্টি হয়। পরমেশ্বর কখনও রোগসৃষ্টি করেন নাই—যাতনা ও পীড়া মানুষের আপন কর্ম্ম-কৃত ফল। যে ঐশী নিয়মে মানুষকে বস বাস করিতে হইবে, তাহা ভঙ্গ করাতেই রোগের উদ্ভব হয়।

এমনদিন আসিবে, যখন চিকিৎসকগণ আর লোকের দেহের চিকিৎসায় রত থাকিবেন না, শরীর চিকিৎসার চেষ্টাও করিবেন না। তখন মনের চিকিৎসা তাহাদের কর্ম্ম হইবে, আর তাহাতেই দেহের ব্যারাম উপশম হইবে। অর্থাৎ তখন প্রকৃত চিকিৎসক হইবেন শিক্ষকেরা; তাঁহারা লোকদিগের ব্যারাম-পীড়া হইতে আরোগ্য বিধানে সচেষ্ট হইবেন না, পরন্তু তাহাদিগকে সতত সুস্থ রাখাতেই যত্নপর হইবেন।

আরও পরে, একদিন আসিবে—যখন প্রত্যেক লোক তাহার নিজ চিকিৎসক-পদবীতে উন্নীত হইবেন। আমাদের জীবসত্তার উচ্চতর নিয়মগুলির সহিত যখনই আমরা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে শিখিব—অর্থাৎ আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহের সহিত যতই আমরা অধিক পরিচয় রাখিয়া চলিব, ততই আমাদের এই বাহ্যিক জড়দেহের প্রতি কম মনোযোগী হইলে চলিবে। কিন্তু তাহাতে যে দেহের প্রতি কম যত্ন লইয়া হইবে, এমন নয়। আজ হাজার হাজার লোক দেহ লইয়া অতিমাত্র ব্যস্ত হওয়াতেই তাহারা অধিক অসুস্থ ভাবে কাল যাপন করিতেছে। যাহারা প্রকৃত সুস্থ-দেহ তাহারা কখনও দেহের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে না।'—ওয়াল্ডো ট্রাইন।

পুরাতন কথা

"আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই, একবারে ইংরাজের জিনিস হইয়া যাইতে চাহি না।.. তোমাদের মনে (জনৈক আইরিসের প্রতি) যেমন জাতীয় ভাবের উদ্রেক হয়, অমনি তোমরা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বৈস। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের উদ্রেকে আমরা রাজ-বিদ্রোহ করিতে চাই না।—আমরা বেশী করিয়া ইংরাজী শিখি, বেশী করিয়া সংস্কৃতের সমাদর করি, কাজ কর্ম্ম এমন যত্ন এবং শ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করি, যাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষেরাও আমাদিগের দ্বারা পরাস্ত হয়েন। স্বজাতীয় কোন মনিবের অধীনে থাকিয়া যদি চাকুরি করিতে হয়, তাহা বিশেষ যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করি। মুসলমানকে নেড়ে বলিয়া, পশ্চিমে লোককে মেড়ুয়া বলিয়া, দক্ষিণাঞ্চল বাসীদিগকে কদাকার বলিয়া অশ্রদ্ধা করা অতিশয় দূষ্য মনে করি—আর সন্তান সন্ততিকে দৃঢ়কায়, পরিশ্রমী, বিদ্বান এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও স্বজাতির মুখাপেক্ষী করিবার নিমিত্ত নিরন্তর প্রাণপণে যত্ন করি।"—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

হইয়াছে, অসাধুকেও হইয়াছে; কেহ এড়াইতে পারে নাই; কেবল দুঃভার্গ্যের প্রকার ভেদ ঘটিয়াছে মাত্র।

পাপের শোচনীয় পরিণাম হওয়া উচিত। নহিলে জগৎ নরক হইয়া ওঠে। কিন্তু পাপের সঙ্গে সাধুও কেন পীড়িত হয়? পীড়ন মাত্রেই শাস্তি; সাধু, অসাধু সমভাবে দুঃখ পাইলে পাপে পুণ্যে প্রভেদ থাকে কোথায়? পুণ্যের পুরস্কার কি থাকে!

এইখানে দুইটী সত্যের নির্দ্দেশ আছে। প্রথমটী মানব সাধারণের উপর অভয় বাণী। দুঃখে বিপদে ভাগ্যবিপর্য্যয়ে অবিচল রহিবার উপদেশ। সুখ যত বেশী, দুঃখের কাছে আত্ম-সমর্পণ, দুঃখের আঘাতে পরাজিত হওয়া তাহার অপেক্ষা লক্ষ গুণে কষ্টকর। দুঃখকে স্বীকার করিয়া লওয়াই দুঃখ। দুঃখ তখন তিক্ত ও সত্য, যখন মানুষ দুঃখের প্রভাবে অভিভূত হয়। সংসারে দেখা যায়, কেহ একটী আঘাতকে হাস্য মুখে সহ্য করিয়া চলিয়াছে; আবার অপরে হয়তো সেই আঘাতেই বিলুণ্ঠিত বিচূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। বিপদ দুই জনের কাছেই বিপদ; একজন তাহাকে জয় করিয়াছে, স্বীকার করে নাই; অন্যে সেই বিপদের দ্বারা বিজিত হইয়াছে, সেই পরাভূতিই দুঃখের অনুভূতি। স্বীকার করিলেই দুঃখ, অস্বীকার করিলে কিছুই নহে। মানুষের একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, যাহাতে সে সমস্ত বিপদকে জয় করিতে পারে। চরম দুঃখকেও অক্লেশে অগ্রাহ্য করিতে পারে; দুঃখে পীড়িত হওয়া মানসিক দুর্ব্বলতা এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাস মাত্র।

দুঃখ দুর্ভাগ্য নহে, দুঃখে পরাজিত হওয়াই যথার্থ দুর্ভাগ্য। দারিদ্র্য আসিলে যে দুঃখ হয়, অথবা নির্য্যাতিত হইলে যে বেদনা হয়, অপমানে যে মর্ম্মদাহ উপস্থিত হয়, তাহা দারিদ্র্য, নির্য্যাতন, অপমান প্রভৃতি কে অনর্থক অনুভব করা। ইহাদের স্বীকার করিলেই ক্লেশ, না করিলেই কিছু না।

পাপের দুঃখ স্বেচ্ছাকৃত; কুরুকুল তাহাতে দগ্ধ হইয়াছিল। পাণ্ডবদের দুর্ভাগ্য আত্মকৃত অপরাধের ফল নহে: তাহা অনিচ্ছায় ঘটিয়াছিল। আর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা চরম। রাজপুত্র হইয়া ভিক্ষাজীবী, অবিচারে বারম্বার নির্ব্বাসন, রজঃস্বলা ধর্ম্মপত্নীর অপমান, অন্যায় যুদ্ধে কিশোর বংশধরের প্রাণনাশ, গোপনে বংশনাশ; যত প্রকার উৎকট দুঃখ হইতে পারে, পাণ্ডবদের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। যাহা ঘটিলে মানুষ উন্মাদ হয়, পিশাচ হইয়া পড়ে, ঈশ্বরদ্রোহী ও অবিশ্বাসী হয়, মানব-বিদ্বেষী এবং ব্যভিচারী হয়, পাণ্ডবদের সে সমস্তই সহিতে হইয়াছিল। তবু পাণ্ডুপুত্রেরা দেবতাই ছিল, পুণ্যশ্লোক পবিত্রাত্মাই ছিল। কোন দুঃখে পাণ্ডবদের পরাভূত করিতে পারে নাই। পাণ্ডবদের চরিত্র কখনও কলুষিত হয় নাই, আদর্শ ত্যাগ করে নাই, সত্যভ্রষ্ট হয় নাই, কখনও অধঃপতনের দাসত্ব করে নাই। এইটাই মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

জগতে অপরিমেয় দুঃখ আছে; কেন আছে তাহা লইয়া কথা নয়। আছে ইহা সত্য। যুক্তি তর্কের দ্বারা ইহার বিলোপ করিতে পারা যায় না। জীবিত রহিলে, বাঁচিলে, জন্মগ্রহণ করিলে দুঃখ পাওয়া অপরিহার্য্য। মানুষের জ্ঞাত এমন কোন উপায় নাই, যাহা হইতে দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। একটী মাত্র পন্থা আছে, তাহা আত্মশক্তির দ্বারা দুঃখকে জয় করা; এবং তাহাই অমোঘ পন্থা। দুঃখ বড় নয়, আত্মাই মহীয়ান্। আত্মা অজেয়। দুঃখ তাহাকে পরাজয় করিতে পারে না।

পাণ্ডবদের জীবনব্যাপী দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়া এই তত্ত্বই সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আত্মা অজেয়; দুঃখ ক্লেশের নহে, ক্লেশ হইতেছে বিপদে অভিভূত হওয়া। এমন কোন বিপদ নাই, যাহাতে আত্মাকে পরাজিত করিতে পারে। মানব আত্মা অপরাজেয়; কোন বিপদই দুর্ভাগ্যের নহে, দুঃখের কাছে পরাজয়ই সত্যকার দুর্ভাগ্য।

পাণ্ডুপুত্রদের জীবনব্যাপী বিড়ম্বনার সহিত আর একটী সত্যের পরিচয় প্রত্যক্ষ হইয়াছে। তাহা ধর্ম্মের—"ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয়।"

"জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রানাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ"। সারা মহাভারতের ঘটনায় পাণ্ডুপুত্রদের অদৃষ্টে এ জয়ের কোন লক্ষণই নাই। পাণ্ডবদের আবাল্য সহচর জনার্দ্দন, আমরণের সাথী শ্রীকৃষ্ণ, তবু পাণ্ডবদের জয় কোথায়? যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া যাহা লাভ হইয়াছিল, তাহা তো একটা বিধবার রাজ্য। হাহাকার বিক্ষুব্ধ, নরকঙ্কাল সমাকীর্ণ একটী মহা শ্মশান মাত্র। এ জয় একটা প্রকাণ্ড উপহাস।

মহাভারতে দেখা যায় পাপকর্ম্মা দুর্য্যোধনও চরম দুর্ভাগ্য ভোগ করিয়াছে। পাণ্ডবেরাও গণনায় তুলনায় তাহার অপেক্ষা কম নহে। তবে আর পুণ্যের জয় কিসে? ভগবানকে পক্ষে রাখিয়া লাভ কি?

মানুষ বহির্মুখীন। বস্তু দিয়া তাহার লাভ ক্ষতির বিচার। সিংহাসনে তাহার বিজয়, বৃক্ষতলে তাহার পরাভব। মস্তকে স্বর্ণ মুকুট দেখিলে, পদমর্য্যাদা ঐশ্বর্য্যসম্ভ্রম দেখিলে, বিলাস ব্যসন লক্ষ্য করিলে, সে মনে করে ইহা সুখ। যে হিংসা করিয়া, হত্যা করিয়া, অত্যাচার করিয়া মিথ্যার সেবা করিয়া চলিয়াছে, সে যদি বিলাসের মধ্যে পালিত হয়, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নিমগ্ন থাকে, তাহার যদি মণি মাণিক্য বসন ভূষণ থাকে, সে যদি তাহার পাশব শক্তিকে কিছুকাল ধরিয়া অব্যাহত রাখিতে পারে, তবে সাধারণ বিচারে তাহাকেই জয় বলা হয়।

ইহাতে কাহারই কিছু আপত্তি থাকিত না,—যদি এই জয়ে অন্তঃকরণের মধ্যে অখণ্ড প্রশান্তি রহিত। কিন্তু তাহা রহে না—তাহা বিশ্বনীতির বিরুদ্ধ। অগ্নিতে দগ্ধ হইলে যন্ত্রনা হয়, বিষ খাইলে মৃত্যু হয়। হিংসা করিলে, ব্যভিচার করিলে, পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত-গ্লানি ঘটে; এ সব মানসিক দুষ্ট ক্ষত মনকে ক্ষয় করে, যন্ত্রনায় জর্জ্জরিত করে। এই যন্ত্রনাই পরাভূতি। যে সুখ শান্তির জন্য অন্যায়ের অনুষ্ঠান, সেই সুখ শান্তি না হইয়া যদি অশান্তিই বাড়িল বা থাকিল, তবে তাহা পরাজয় নহে তো কি?

পাপ আচরণে অর্জ্জিত রাজ্য ঐশ্বর্য্য, জয় গৌরব যে তৃপ্ত করে না, তাহার প্রমাণ কি? এমন একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। সে প্রশ্নের উত্তর দানও দুরূহ নহে।

তৃপ্তি আসিলে আর কেহ অতৃপ্তির কাজ করে না। তৃষ্ণার্ত্ত জল পাইবার পর আর জলের জন্য ছুটাছুটি করে না। ছুটাছুটি করিলে বুঝিতে হইবে তখনো তাহার পিপাসা রহিয়াছে। আরও অন্যায় করিলে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, তাহার পরিতৃপ্তি আর নাই। আরও পাওয়ার অর্থ আরও অভাব। অধিক অভাব এবং অধিক জ্বালা একই বস্তু।

এই বাহিরের দিক দিয়া বিশ্লেষণ। আর একটা কথা—হিংসা, খলতা, শঠতা, নির্দ্দয়তা ইহাদের নিজস্ব প্রকৃতিই যে জ্বালা দেওয়া; হিংসা চিত্তের একটা অস্বস্তিকর অবস্থা। শঠতাও তাই।

ব্যভিচারও তাহাই। যতক্ষণ অন্তরে এ সব জঘন্য প্রবৃত্তির উত্তেজনা রহিবে, ততক্ষণ শান্তির সম্ভাবনা মাত্র নাই। বিশ্বভূদেশব্যাপী সিংহাসন পাইয়া, সুপ্রচুর ভোগ বিলাসের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াও যদি প্রাণের প্রশান্তি না থাকে, তবে তাহাকে কে জয় বলিবে? যে বলে, সে বাতুল। বৈশাখের মধ্যাহ্ন সূর্য্যতাপে দাঁড়াইয়া যে শীতলতার আশা করে, সে ক্ষিপ্ত।

তৃপ্তির আর একটী লক্ষণ আছে। যে তৃপ্তকাম, সে শান্ত, সংযত ও সুশীতল হয়, তাহার আচারে ব্যবহারে গভীর সহৃদয়তার ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠে। আলোক যে আপনি প্রদীপ্ত এবং অন্যকেও প্রভাবিত করে। শান্ত চিত্তও তেমনি আপনার অগাধ সন্তোষের কিরণসম্পাতে অন্যকেও সমুদ্ভাসিত করে। তৃপ্তির ইহাই ধর্ম্ম। তৃপ্তি পরিমলের মত, আশীর্ব্বাদের মত, মাতার বক্ষের মত, বরষার ধারা সম্পাতের মত। ইংরাজিতে একটী কথা আছে—he himself became a poem; তৃপ্তাত্মা ঠিক তাহাই হইয়া উঠেন। তিনি একটি কাব্যের মত, একটী ঝঙ্কারিত প্রভাতী সঙ্গীতের মত।

কিন্তু অতৃপ্ত জগৎ কাহাকেও শান্তি দেয় নাই। বরং অশান্তিই করিয়া তুলিয়াছে। যে যেখানে সুখী আছে, তাহার কাছ হইতেই সুখ কাড়িয়া লইয়া নিজকে ভরাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে। ফলে, অতৃপ্ত নিজেও জ্বলিয়াছে,—অপরকেও জ্বালাইয়াছে।

তাহার পর দুষ্কৃতের অন্তরের কথা জানিলে, জানা যাইবে যে, তাহা একটী শোচনীয় পরাজয়েরই ইতিহাস। ইহার পরোক্ষ প্রমাণের প্রয়োজন নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণেই ইহা জানা যাইবে। অন্যায় করিয়া কেহ কোন দিন চিত্ত প্রসাদ লাভ করে নাই। ইহা প্রত্যেকের জীবনে প্রত্যেক দিনকার ঘটনা।

যাহা চাওয়া তাহা যদি না পাওয়া যায়, তবে তো তাহাই পরাজয়। তাহার উপর ক্রূরতার, লোভের, পরশ্রীকাতরতার দ্বারা পীড়িত হওয়ার জ্বালা আছে।

ইহারই নাম পরাজয়।

অন্যপক্ষে নির্য্যাতিত, নিপীড়িত, অন্নহীন, গৃহহীন, অবমানিত যদি অনুদ্বিগ্ন, অচঞ্চল, অক্ষুব্ধ, থাকে, তবে তাহার অপেক্ষা গৌরবময় বিজয় আর কি হইতে পারে? যে কাহারও কাছে আত্মবিক্রয় করিল না, যে সুখ দুঃখ উভয়কেই অতিক্রম করিয়াছে, যে আঘাতে উল্লাসে অনুদ্বিগ্ন রহিয়াছে—তাহার মত বিশ্ববিজয়ী আর কে?

সত্যনিষ্ঠ রহিলে এই নিরুদ্বিগ্নতা,—এই প্রশান্তি আসে। সত্যেই ঈশ্বর, সত্যনিষ্ঠের পক্ষেই শ্রীজনার্দ্দন। ইহাই "জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রানাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।" দুর্য্যোধনের যুদ্ধে পরাজয় হইয়াছিল, যুধিষ্ঠিরদের আজীবন পরাজয়, বংশনাশ, তারপর বিধবার অধীশ্বরত্ব। ইহাও পরাজয়ের মত। অথচ ইহাই জয়শ্রীর মধ্যাহ্ন দীপ্তি।

পাণ্ডুপুত্রদের নিরন্তর নির্য্যাতনের মধ্যে ফেলিয়া দুঃখ দুর্ভাগ্যের ভৈরব আবর্ত্তের উপর প্রক্ষেপ করিয়া, মহাভারত মানবের কাছে সত্যকার জয়ের আলোক জ্বালাইয়া দিয়াছে। এই পাণ্ডবদের ইতিহাস অমৃতমন্ত্র, অভয়বাণী—ভরসার অরুণ প্রকাশ, আশার উচ্ছ্বসিত উৎসধারা। নিগৃহীত নিপীড়িত মানব জাতির নিকট এই কাহিনী যেন সঞ্জীবনী ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে ভয় নাই—দুঃখ নাই—নিরাশার কিছুই নাই! দুর্ভাগ্য মিথ্যা, দুঃখ তুচ্ছ; উৎপীড়ন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর!! আত্মা অজেয়, আত্মা আনন্দময়।

সুখের সময় যেমন কাহাকেও নিকটবর্ত্তী দেখিলে, সুখটা পরিপূর্ণ বোধ হয়, দুঃখের কালেও তেমনি কাহাকেও পাশে দেখিলে কষ্টের যেন কিছু লাঘব হয়; যেন কিছু ভরসা পাওয়া যায়। এ নিরাশার আশ্বাস দুঃখের নিরবচ্ছিন্নতার মাঝে একটা ছেদ। এ যেন দীর্ঘ পথ চলিতে চলিতে একটু থমকিয়া যাওয়া। এমনি হয়, এমনি সহানুভূতির ধর্ম্ম; ইহা মানুষের প্রকৃতিগত। একা কিছু করিলে উৎসাহ আসেনা, ধৈর্য্য থাকে না। সমরে সৈনিক মরিতে যায়, কেবলই সৎ ইচ্ছার প্রণোদনায় নহে, তাহার পাশে, সম্মুখে ও পশ্চাতে আরও অনেকে মরণের মুখে ঝাঁপ দিতেছে, ইহাও একটা বলবত্তম প্রেরণা। সুখও একা ভাল লাগেনা, দুঃখও একাকী সহ্য হয় না। দশের পক্ষেই দুর্ভাগ্য ভোগে উহার তীক্ষ্ণতা যেন কমিয়া যায়। মানুষের কাছে পঞ্চপাণ্ডব সেই সমদুঃখী দশজন। এমন মর্ম্মান্তিক দুঃখ আর কে ভোগ করিয়াছে? আজীবন বিড়ম্বিত পঞ্চপাণ্ডবের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস মানুষের দুঃখের প্রচণ্ডতা হ্রাস করিয়া দেয়।

পাণ্ডবদের দুঃখদুর্ভর জীবনকথায় মানবের ঈশ্বরকে কতখানি চাই, কেমন করিয়া চাই তাহা সুস্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। আদৌ ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, সে কথা নহে। প্রয়োজনীয়তা থাকিলে কতখানি থাকা উচিত? সে প্রয়োজন কিসের জন্য? স্বর্গ বা মুক্তি? ভগবানে বিশ্বাস কেমন করা?

পাণ্ডবদের বনে সিংহাসনে, জীবনে মরণে, আশীর্ব্বাদে অভিসম্পাতে সর্ব্বত্রই নারায়ণ। নারায়ণ তাঁহাদের সারথি, তাঁহাদের জীবনরথের সারথী। গীতার সমর্পণ যোগের "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইহার জাগ্রত দৃষ্টান্ত পঞ্চপাণ্ডব। সব কিছু ত্যাগ করিয়া পাঁচটী ভাই সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যে ভগবানের প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি। যুদ্ধ জয়ের জন্য সৈন্য সামন্তের উপযোগিতা অবিসংবাদিতরূপে সত্য। কিন্তু যখন একদিকে নিরস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যদিকে সুশিক্ষিত রণদুর্দ্ধর্ষ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনার নির্ব্বাচন পরীক্ষা সমুপস্থিত হইল, তখন পার্থ নিরস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকেই বরণ করিলেন। ইহার নাম সমর্পণ, ইহারই নাম ঈশ্বরবিশ্বাস। ঈশ্বর বিশ্বাসীর কাছে ঈশ্বরই সম্পূর্ণ সত্য। আর যা কিছু, সবই মিথ্যা। সেইজন্য রণজয়ের উপর যাহাদের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, তাহারা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমরপ্রাজ্ঞ সৈন্যকে অবহেলা করিয়া কেবল ভগবানকেই প্রার্থনা করিল। ঈশ্বর বিশ্বাসী জানে—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং যৎ কৃপা—

ঈশ্বর ভক্ত বিশ্বাস করে "অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।"

সম্পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে এইটী হইতে পারে না। দ্বিধা আসে, সংশয় উপস্থিত হয়, মানুষ তখন দুই নৌকায় পা দেয়; মুখে বলে ভগবান, মনে আঁকড়াইয়া ধরে বাস্তবকে। প্রবাদ আছে "রামও বল কাপড়ও তোল।" অবিশ্বাসের লক্ষণই এই দ্বিধা। রাম বলিলে যে কাপড় তুলিতে হয় না, অবিশ্বাসী ইহা কিছুতেই ভরসা করিতে পারে না। কাপড় তুলিলে তাহা আর ভিজিবে না, সে জানে। তাই সে তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে, তাহার অহংকারকে বর্জ্জন করিতে পারে না। ভগবানের কৃপায় যে "পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং" হয়, ইহা তাহার একান্তই সন্দেহের। তাই সে "রামও বলে—কাপড়ও তোলে।"

নিত্যকার সংসারে ইহাই ঘটিতেছে। সকলেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা, ধন মান, রাজ্য

সিংহাসনকে গ্রহণ করিতেছে। নিরস্ত্র ভগবানকে অসমর্থ রিক্ত ভাবিয়া কেহই অর্ঘ্য দিতেছে না। দুর্য্যোধনও তাহা করে নাই। তিনি নারায়ণকে ছাড়িয়া নারায়ণী সেনাকেই বরণ করিয়া ছিলেন। অবিশ্বাসের ইহাই ধারা।

আর ঈশ্বর বিশ্বাসের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পঞ্চপাণ্ডব তথা পার্থ। সমর যজ্ঞে অবতীর্ণ হইয়াও নিরস্ত্র নারায়ণকে বরণ করিয়া হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভগবানকে এমন করিয়া সর্ব্বস্বের বিনিময়েই পাইতে হয়। "মামেকং শরণং ব্রজ''—বাহিরের আর কিছু নাই, শুধু ঈশ্বর। নির্ব্বাসন কালে শ্রীকৃষ্ণ একবার কুন্তী দেবীকে বলিয়াছিলেন 'পিসিমা, এত দুঃখ পাইতেছ, কখনও তো আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করিলে না'? উক্ত পাণ্ডব জননী বলিলেন :—'দুঃখের মাঝেই তোমায় অহরহ মনে পড়ে, সুখে যে তোমায় ভুলিয়া যাই।' ইহাই দুঃখের সার্থকতা।

ভগবান মঙ্গলময়, ইহা কোন্ দিক দিয়া সত্য, তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না। অথচ তিনি শুভ-বিধাতা এবং শুভনিদান। কুন্তিদেবীর বাক্যে ইহাই প্রমাণ হইয়াছে। সুখে দম্ভ ও মোহ আসে, অহঙ্কার উদ্দীপ্ত হয়, ভগবানকে ভুলিয়া যাইতে হয়। তাহাই অধঃপতন। দুঃখে ইহা হয় না। মানুষের অন্তরে বিনয় থাকে, সে তাহার ক্ষুদ্রতা বুঝিতে পারে। তাহার ফলে পবিত্রতা রক্ষা হয়, ঈশ্বর শরণ অব্যাহত চলিতে থাকে। সমর্পণের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। পাণ্ডবদের চির দুঃখী করিয়া চিত্রিত করিবার ইহা আর একটা কারণ।

মানুষ হিসাবী জীব। লাভ ক্ষতি গণনাবুদ্ধি তাহার চরিত্রের সাধারণ ধর্ম্ম। ঈশ্বরকে চাই, কিন্তু কেন চাই এই হিসাবী বুদ্ধিটাও তাহার মনের কোণে উঁকি দেয়। ঈশ্বরকে প্রয়োজন ঈশ্বরেরই জন্য। ঈশ্বরই মনুষ্যত্বের স্বরূপ। ঈশ্বর লাভ করিলে—

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে।"

গুরু দুঃখে ও বিচলিত করিতে পারে না, লাভের মধ্যে যাহা পরম লাভ, তাহাই লভ্য হয়। ভগবানকে সম্পূর্ণভাবে পাইলে এই হয়। কিঞ্চিৎমাত্র পাওয়াও ব্যর্থ নয়। কারণ "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

ঈশ্বরাভিমুখীন হওয়ার এই পুরস্কার। পাণ্ডবেরাও তাই নারায়ণকে সথারূপে অঙ্গীকার করিয়া এমন পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন যে, উন্মুক্ত রাজসভাতলে ধর্ম্মপত্নীকে বিবসনা করিবার নিষ্ঠুর আয়োজনেও অচ্যুত ধৈর্য্যে অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই শৌর্য্য, ইহাই বীর্য্য, ইহাই শক্তি।

একদিন ভারতবর্ষের অরণ্য বক্ষে ভারতের মর্ম্মগাথা উদ্গীত হইয়াছিল

"যেনাহং নামৃতা স্যাম ?—কিমহং তেন কুর্য্যাম।"

এই অমৃতত্ব ঈশ্বর ছাড়া আর কোথাও নাই। এই অমৃতত্ব লাভ করিলে ধর্ম্মপত্নীর নির্য্যাতন, অবৈধ অত্যাচার উৎপীড়ন, সিংহাসন বা বন সবই সমান তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। শক্তিধর পাণ্ডবেরা সেই অমৃতের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন; তাই অকুণ্ঠিত চিত্তে এ সব সহিতে পারিয়াছিলেন।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে ইহা ক্লৈব্য। অশক্তও যাহা সহিতে পারে না, তাহা অপ্রতিবাদে সহিয়া যাওয়া অধঃপাতের নিম্নতম স্তর। এই নিতান্ত ভাসাভাসা ধারণা আছে বলিয়াই সংসারে এত অশান্তি উপদ্রব, এমন অহর্নিশি মারামারি কাটাকাটি, এত শাসন ও বাঁধন।

পাণ্ডবদের নির্য্যাতনে তিনটী মহান তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সে-ই ত্রয়ী হইতেছে— সমর্পণ যোগ, দুঃখ জয় এবং শক্তিমত্তা। যুধিষ্ঠির প্রভৃতির এই অপ্রতীকার প্রবৃত্তিতে সেই তিনটি তত্ত্বই পরিস্ফুট। ভগবান প্রভু পাতা নিয়ন্তা হইলে মানুষের হাতে বিচারের ভার আর থাকে না, সে মাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যায়। তাহার পর অস্ত্রশক্তির অপেক্ষা আত্মশক্তিই যে গরিষ্ঠ, এই তিতিক্ষা তাহারই উজ্জ্বল প্রমাণ এবং কতখানি দুর্ভাগ্যকে মানুষ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে, তাহার ভাস্বর দৃষ্টান্ত। আর একটী কথা 'সত্যের' পথে দ্বিধা নাই,—সর্ব্বস্বের বিনিময়ে সত্যের সমীপবর্ত্তী হইতে পারা যায় ও তাহাই পারিতে হয়। পাণ্ডবদের এই অতি নির্য্যাতন সেই সর্ব্বস্বের বিনিময়; সহধর্ম্মিণীকে প্রকাশ্য সভায় উলঙ্গ করার চেষ্টা দেখিয়াও পঞ্চভ্রাতা সত্যভ্রষ্ট হন নাই, বিশ্ববিজয়ী সামর্থ্য সত্ত্বেও।

পঞ্চ পাণ্ডব শক্তিমান ছিলেন, যুদ্ধে হারিয়া তাঁহারা সিংহাসন হারান নাই, সত্য রক্ষার জন্য রাজ্য ছাড়িতে হইয়াছিল। তাঁহারা দুর্ব্বল ছিলেন বলিয়া দ্রৌপদীর উপর অত্যাচার হয় নাই, সত্যবদ্ধ ছিলেন বলিয়াই উহা ঘটিয়াছিল। পাণ্ডবেরা অচ্যুত সত্যশীল জানিয়াই কৌরবপক্ষ এ সব অসহনীয় অবিচার করিতে সাহসী হইয়াছিল।

পাণ্ডুতনয়েরা সিংহাসন না ও ছাড়িতে পারিতেন। দ্রৌপদীর অপমানের কঠিন প্রতিশোধ তখনই লইতে পারিতেন; অর্থাৎ তাঁহারা সত্যবন্ধন অস্বীকার করিলেই পারিতেন; তাহা করেন নাই। তাঁহাদের মাথায় দুর্ভাগ্যের বজ্রবর্ষণ চলিয়াছে, তবু তাঁহারা নিশ্চল।

এই নিশ্চলতা অসাড়তা নহে, মহাশক্তিমত্তা। বিক্ষুব্ধতা শক্তি নহে, অক্ষুব্ধতাই বীর্য্যবত্তা। পাহাড় প্রবল ভূমিকম্পেও কাঁপে না, তরুশীর্ষে পত্র পল্লবগুলি একটু বায়ুহিল্লোলেই কাঁপিয়া ওঠে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে বা বিপুল বর্ষা প্লাবনে সমুদ্রের জল বাড়েও না কমেও না। ইহা প্রাচুর্য্যের লক্ষণ, শক্তির পরিচয়। অলস নির্বীর্য্য যে, সে আচরণে অবশতা দেখায়, বাধ্য হইয়া অন্তরে সে গুমরিয়া মরে। সামর্থ্য রহিলে সে চুপ করিয়া থাকিত না।

প্রকৃত শক্তি কিন্তু এমন নহে, উহা অন্তরে বাহিরে অনুদ্বেল, উহা চির প্রশান্ত। আত্মার অপূর্ণত্বই অশান্তি, আত্মার খর্ব্বতাই ক্ষোভের কারণ। অতিবড় আঘাতেও যে অবিচল, বুঝিতে হইবে তাহার অপরিমেয় শক্তি। এই শক্তিই মহাভারতের আদর্শ শক্তি। হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা নহে,—ক্রোধের পরিবর্ত্তে ক্রোধ নহে,—অন্যায়ের প্রতিকারে অন্যায় নহে—অন্তরের অশান্ত ভাব নহে।

"সুখেদুঃখে সমেকৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।" এই অক্ষুব্ধ প্রশান্তিই ভারতবর্ষের শক্তির আদর্শ। পঞ্চ পাণ্ডবের সত্যব্রত পালনে তাহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র !

পাণ্ডবদের দুঃখধারা এবং কৌরবদের সুখপ্রবাহ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজশক্তি যেন বিচিত্র নদী প্রবাহের মত বহিতে বহিতে কুরুক্ষেত্রের মহা বারিধি বিস্তারে আসিয়া আপনাদের প্রবাহবেগকে পরিসমাপ্ত করিয়াছে। এখানে হিংসা বিদ্বেষ, এখানে ঘৃণা ও খলতা, এখানে শৌর্য্য ও সাহস—আবার এই রণ-প্রাঙ্গণেই পরমজ্ঞান, পরম ভক্তি, পরম শান্তি একত্র সম্মিলিত। এখানে দুই পক্ষ হানাহানি করিতেছে, সেই ভয়াল মৃত্যুকোলাহলের মাঝে—নররূপী নারায়ণ

গীতাগীতি গাহিতেছেন। যাহা নিখিল মানবের অমৃত আশ্রয়; কুরুক্ষেত্রেই শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব শান্তি-পর্ব্ব-কীর্ত্তন করিতেছেন,—যাহা একাধারে ঐশ্বর্য্য ও শান্তির আকর।

অন্যায় যে তাহার অন্তিম আছে, ইহা বুঝিতে পারে না। অন্যায়কারী ভাবিতেই পারে না যে এত শক্তি, এত দম্ভ ইহা ফুরাইতে পারে—অথবা ইহাকে কেহ পরাজিত করিতে পারে।

অন্যে পরাজিত করিতে পারুক বা নাই পারুক, পাপ আপনার বিষে আপনি মরিয়া যায়, আপনার কাছে আপনি বিজিত হয়। সৃষ্টি রক্ষার জন্য ইহা বিধাতার অমোঘ বিধান। দুর্য্যোধনেরও তাহাই হইল, আপনার বিষে আত্মহনন করিল।

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের পর দুর্য্যোধন তাহাদের রাজ্য ফিরাইয়া দিল না—শ্রীকৃষ্ণ তখন পাঁচ ভায়ের জন্য পাঁচখানি গ্রাম চাহিলেন। দুর্য্যোধন উত্তর করিলেন, "সূচ্যগ্র ভূমিও" নহে। দুর্য্যোধন আপনার চিতা চুল্লী সাজাইলেন। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল।

পাঁচখানি মাত্র গ্রাম দিলে ভারতের সম্রাটের কিছুমাত্র ক্ষতি হইত না; যুদ্ধের কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। সত্যনিষ্ঠ পঞ্চ ভ্রাতা পাঁচখানি গ্রাম লইয়াই সন্তুষ্ট রহিতেন। কিন্তু তাহা হইলে তো অধর্ম্মের পরাজয় ঘটে না। সেই জন্যই দুর্য্যোধনের এই দুর্ম্মতি হইল—বলিল, "বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও দিব না।"

ইহা শকুনির পরামর্শ। দুর্য্যোধনের মুখ দিয়া ঠিক এ কথাটী বাহির হইত না। সারা মহাভারতে এই একটা চরিত্র আছে, যাহার ভিতর একটু মাত্র মনুষ্যত্ব নাই, যে একবারে মূর্ত্তিমন্ত পাপ, একবারে সাক্ষাৎ অধঃপতন। যাহার আশ্রয় লইলে অভ্যুদয় পরাজয়ে পরিণত হয়। মহাভারতে পাপের মূর্ত্তিমন্ত চিত্র শকুনি। পাপের পরামর্শ লইলে যাহা হয়, পাপকে আশ্রয় করিলে কোন্ খানে গিয়া তাহার পরিসমাপ্তি হয়, শকুনিকে আঁকিয়া ও দুর্য্যোধনকে তাহার পরামর্শের অধীন করিয়া তাহাই দেখান হইয়াছে।

দুর্য্যোধন পাঁচখানি গ্রাম দিলে শত ভ্রাতা এবং সিংহাসন কিছুই হারাইতে হইত না। কিন্তু তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। পাপের আশ্রয় লইলে এই সামান্য সৎবুদ্ধি টুকুও হইতে পারে না। দুর্য্যোধনের ও হইল না।

শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টায় সন্ধি যখন কিছুতেই সম্ভব হইল না, তখন সংগ্রামের আয়োজন। দুই দল কুরু প্রাঙ্গনে উদ্যতআয়ুধ; এমন সময় অর্জ্জুন বলিলেন—"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ।"

পাণ্ডবেরা প্রথমে যুদ্ধ করে নাই; তাঁহাদের বিশিষ্ট চক্ষু ছিল, তাঁহারা সত্যবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু পরিশেষে যুদ্ধ করিতেই হইল, কারণ ন্যায্য অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া অন্যায়। সেও একটা অধর্ম্ম-সৃষ্টির ও স্রষ্টার বিরোধী কার্য্য।

সৃষ্টির মাঝে বিভিন্ন প্রকৃতি আছে। তাঁহার উপর সৃষ্টির একটা নিজস্ব সার্থকতা আছে, সৃষ্টিটা ভগবানের। এই সৃষ্টিটা রক্ষার কতকগুলি শাশ্বত নিয়ম আছে। সে নিয়মও ভাগবত। সেই নিয়ম প্রতিপালন করাই ঈশ্বর নিষ্ঠা এবং তাহাই স্বধর্ম্মপালন।

মিথ্যা কহা, চুরি করা, অত্যাচার করাই কেবল ভগবদ্রোহিতা নহে, স্বধর্ম্ম প্রতিপালন না করাও পাপেরই মত—অন্যায়। উহা পাপেরই একটা প্রকার মাত্র। [ক্রমশঃ

কতকগুলি নিয়ম আছে, কতকগুলি কর্ম্ম আছে, যাহা সৃষ্টিরক্ষার অনুকূল। সেই গুলিই স্বধর্ম্ম। সেইগুলি মনুষ্য সাধারণের অবশ্য করণীয় কর্ম্ম। না করিলে প্রত্যবায় আছে। করার কিছু মহত্ব নাই। স্বধর্ম্মই হইতেছে একমাত্র বিধাতৃবিহিত কর্ম্ম, একমাত্র ভাগবত কর্ম্ম।

সৃষ্টিরক্ষার জন্য দণ্ডনীতির প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রীতির দ্বারা দুষ্টের দমন হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় নাই, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। অহিংসা সকল সময়ে হিংসাকে বিশুদ্ধ করিতে পারে না; তাই দণ্ডের আবশ্যকতা। অনেক সময় দুষ্কৃতকে পরিশুদ্ধ না করিয়া বিনাশ করিতে হয়। কেন হয়, ইহা লইয়া অনর্থক দার্শনিক গবেষণা নিষ্প্রোয়জন। ভাগবত বিধান মানববুদ্ধির অগম্য; কিন্তু সৃষ্টির সব কিছুই বুদ্ধির মুটিতে ধরা যায় না। মৃত্যু যেমন আছে, দুষ্কৃত দমনের জন্য সংগ্রাম ও অস্ত্রের আবশ্যকতা ঠিক তেমনই আছে। এই যুদ্ধ জিগীষা নহে, আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা ইহাতে নাই। ইহাতে "লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ" সমানই।

অর্জ্জুন যে কুলে, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বধর্ম্মই হইতেছে যুদ্ধ। যুদ্ধ তাঁহাকে করিতেই হইবে। ইচ্ছা না হইলেও করিতে হইবে, প্রিয়বিয়োগ হইলেও করিতে হইবে। অতি বড় বিপদ হইলেও করিতে হইবে। মায়া মমতা স্নেহ করুণা ক্ষমা সব বিসর্জ্জন দিয়াও করিতে হইবে।

মহত্বের আকারে, পুণ্যের রূপ ধরিয়া, কল্যাণের ছদ্মবেশে ক্লীবতা মানুষকে ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত করে। কারুণ্য পবিত্রতা ক্ষমা মহত্ব অপ্রতিকার ঐশ্বরিক, কিন্তু ইহা সকল সময়ে নহে, কখন কখন ইহা একেবারেই অভাগবত। পার্থ যখন বলিলেন যে, "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ"। তখন উহা ক্লীবতা—অনার্য্য জনোচিত ক্লীবতা।

অর্জ্জুন বিজয় ও রাজ্য সুখের উপর বীতরাগ হইয়া যে অস্ত্রত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন তাহা নহে; তিনি আপনার অন্তরের সুকুমার অনুভূতির দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন না, তাঁহার পিতামহ, আচার্য্য, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র নিখিল মানবের অশান্তির হেতু। তাহাদের অত্যাচারে উৎপাতে সারা সংসার পুড়িয়া যাইতেছে। পার্থ বুঝিলেন না যে, তাহাদের দমন না করিলে ভগবানের রাজ্য শ্মশান হইয়া ওঠে; তিনি নিতান্ত সাধারণ মানুষের মত মমতায় অভিভূত হইয়া বলিলেন—"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ!"

মমতা নিন্দনীয় নহে, ক্ষমা অমহত্ব নহে, বৈরাগ্য নিকৃষ্ট ভাব নহে, বরং ইহাতেই মানবের মহত্ব। এক দিন এই ক্ষমাই পাণ্ডবের শিরে মহিমার বিজয় মাল্য পরাইয়া দিয়াছিল; আজ এক-মুহূর্ত্তে তাহা অনার্য্যোচিত ক্লীবতায় পরিণত হইল।

এইখানেই গীতার চরম ও পরম শিক্ষা। পাপ পুণ্য ভালমন্দ বলিয়া বিশেষ কিছুই নাই। যাহা স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত তাহাই পাপ। যাহা ভগবদ্দেশে সাধিত তাহাই পুণ্য। ক্ষমা বৃত্তি—যাহা পরম মহিমাময়, তাহা যে মুহূর্ত্তে স্বার্থাভিমুখী হইয়া অভিব্যক্ত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই কদর্য্যতায় পরিণত হইয়া গেল। আর হত্যা হইল—পরম পুণ্য।

কুরুক্ষেত্র একটা মহা বিসর্জ্জনের যজ্ঞক্ষেত্র। এখানে বিবেককে বলি দিতে হইয়াছে, পুণ্যকে উৎসর্গ করিতে হইয়াছে, বৈরাগ্যকে ডুবাইয়া দিতে হইয়াছে; এক কথায় মানুষের আত্ম বলিয়া যে অহংবুদ্ধিটী আছে, তাহাকে নির্ম্মূল করিয়া উৎপাটিত করিতে হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রে মানব কর্ম্মের

শিক্ষা পাইয়াছে, ভাগবত কর্ম্মের শিক্ষা পাইয়াছে—আপনাকে ভগবানের চরণে উৎসর্গ করিতে শিখিয়াছে।

ভগবানের পূজা করিবে, সৎ আচরণ করিবে, ইহা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। ভগবনের পূজা মানুষের কাছে সুস্পষ্ট নহে। অনেক সময় উহা আত্মপূজা হইয়া দাঁড়ায়। অধিকাংশ স্থলে ঈশ্বরের সেবা করিতে গিয়া মানুষ অহঙ্কারেরই সেবা করে। অর্জ্জুন তাহাই করিলেন। সাধারণ দৃষ্টিতে এ ছলাটুকু ধরা পড়ে না—অশুভকে শুভ বলিয়াই জ্ঞান হয়। ঈশ্বর সেবার নামে মহত্বের পরিচয়, বৈরাগ্যের ছদ্মসাজে পার্থ সেই অহঙ্কারেরই পূজা করিলেন।

এ করুণাকে নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ অনার্য্যোচিত ক্লীবতা বলিয়া নিষ্ঠুর সমালোচনা করিলেন। ক্ষমা করুণা আত্মীয়ের প্রতি কৃপা যদি ক্লীবতা হয়, তবে মানবতা কি? ভাগবত কার্য্য কোন্‌গুলি? ঈশ্বরের পূজা কেমন ধারা!

কুরুক্ষেত্রের শ্মশান প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কুরুক্ষেত্রের নিয়ন্তা মুখেও সে কথা বলিয়াছে, কুরুক্ষেত্রকেও তাহা বলাইয়াছেন! কুরুক্ষেত্র আত্মবলিদানের মহাপীঠ। সকলকে এখানে সর্ব্বস্ব দিতে হইয়াছে। আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের কাছে সমর্পণ করা—ভগবচ্চরণে অঞ্জলি দেওয়াই ঈশ্বর আরাধনা। ভগবান মুখে বলিয়াছেন

"যৎকরোসি যদশ্নসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্"

কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, অর্জ্জুনের অহঙ্কারকে বলি দিয়া সেই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভাগবত কর্ম্ম অহঙ্কারশূন্য, তাহাতে কোথাও আমি বলিয়া কিছু নাই। তাহাতে পুণ্য নাই, পাপ নাই, আশা নাই, নিরাশা নাই, অহঙ্কারের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। আত্ম বিসর্জ্জনই ভগবানের পূজা। এই শিক্ষার জন্যই—আত্ম বিলয়ের শিক্ষার জন্যই—মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের অবতারণা। কুরুক্ষেত্রই মহাভারতের কেন্দ্রস্থল। এখানে পাপের অন্তিম, পুণ্যের প্রতিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তির দীক্ষা।

কুরুক্ষেত্র মৃত্যুভৈরব। অথচ এই খানেই জগতের সারাৎসার শিক্ষা বিঘোষিত হইয়াছে। ইহা কি অস্বাভাবিক? মহা রুদ্র দ্বন্দ্বের মাঝে নির্দ্বন্দ্বের কথা, হিংসার ঝঞ্ঝা প্রবাহে মৈত্রির উপদেশ, মোহ মদের পঙ্ক কর্দ্দমে জ্ঞানের দীপ্তি! একটা বিরাট অস্বাভাবিকতা। জ্ঞানের সাধনবেদী তপোবনে যাহা হয় নাই, শান্তির শুভ্র দিনে যাহা হয় নাই, উৎসবের আনন্দময় বাসরে যাহা হইল না, এই মৃত্যুমথিত অশান্তির দিনে তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইল!

তাহাই সম্ভব, তাহাই একমাত্র সম্ভব। সত্যকে লাভ করিতে হইলে সত্যের সম্মুখিন হইতে হয়। আরামে বিরামে শান্তিতে সম্পদে পরিপূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎ ঘটে না। তখন মানুষ যাহা বোঝে, যাহা শেখে, যাহা জানে, যাহা উপদেশ পায়, সে সকলই অনেকটা বুদ্ধি জগতের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে; তাহা অর্দ্ধাঙ্গ, তাহা বিকৃত, তাহা অপূর্ণ, তাহা শিশুর মত অসমর্থ। অন্তিম মূল্য দিয়া না লইলে চরম লাভ হয় না। সেই অন্তীম মূল্য আত্ম বিসর্জ্জন। উদ্বেলিত কর্ম্ম প্রবাহেই কেবল আত্ম বিসর্জ্জন সম্ভব। কর্ম্ম ব্যতিত আত্ম উৎসর্গের স্থান নাই। আত্ম-উৎসর্গকারীই সত্য গ্রহণে একমাত্র অধিকারী। চিত্তের অবস্থা ঐ সময়েই সত্য লাভ করিবার জন্য উন্মুখ হয় এবং সমর্থ হয়। সেই জন্যই কুরুক্ষেত্র সমরপ্রাঙ্গণে গীতার ঘোষণা।

কর্ম্মেই জ্ঞানের সিদ্ধি। অর্জ্জুন ভগবানের ভক্ত এবং প্রিয় সখা। মহত্বের আধার, মহৎ কর্ম্মের আদর্শ অনুষ্ঠাতা। পার্থের জ্ঞানের অভাব ছিল না, ভক্তির অভাব ছিল না; সত্যনিষ্ঠা বীর্য্য ঈশ্বরানুরক্তি কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু সে সব এক নিমিষে ব্যর্থ হইয়া গেল। আত্ম বিসর্জ্জনের মুহূর্ত্তে অহঙ্কারের সেবা ছাড়িয়া কঠোর সত্যের সম্মুখীন হইয়া, অর্জ্জুন অনায়াসেই বলিয়া ফেলিলেন—

"ন কাঙ্খে বিজয়ং কৃষ্ণ"।

পরিপূর্ণ সত্যের দ্বারা তাঁহার জ্ঞান সিদ্ধান্ত সংশোধিত হয় নাই বলিয়াই অর্জ্জুনের এই ক্লীবতা। কর্ম্মবিহীন জ্ঞান প্রায় বিলাসের সমতুল্য; এ জানা প্রায় না জানার মত; এ সত্য অসত্যই; এ ধর্ম্ম ক্লীবোচিত অধর্ম্ম।

মানুষ ঈশ্বরের, সৃষ্টি ঈশ্বরের। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা মানব কিন্তু এ কথা মুখে কহিলেও অন্তর দিয়া স্বীকার করে না; সত্যের সম্মুখিন হইয়া ঈশ্বর হইতে ভ্রষ্ট হয়, সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণ লইতে চাহে না। অর্জ্জুন জগজ্জয়ী বীর, ঈশ্বরের প্রিয়তম সখা, অথচ ঈশ্বরের কার্য্যের সময় পশ্চাদ্পদ। সকল মনুষ্যই ভগবানের সেবায় পার্থের মতই দোলুনচিত্ত।

ইহা সহসা চক্ষে পড়ে না; অহমিকার অন্ধকারে আত্মবিশ্লেষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। মানুষের ত্রুটী কোথায়, ঈশ্বরে মানুষে বিরোধ কোন খানে, অর্জ্জুনের এই যুদ্ধে অপ্রবৃত্তিতে তাহাই স্পষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরের বলিয়া মানুষ যাহা করে তাহা মানুষেরই নিজের। ত্যাগেও অনেক সময় ভগবদন্নিষ্ঠার প্রমাণ হয় না। ঈশ্বরের মুখ চাহিয়া যে ত্যাগ, সে ত্যাগ কেবল বৈরাগ্যে মৈত্রিতে শুভ আচরণেই সিদ্ধ নহে। ভোগে, ক্রূর কর্ম্মে, নিন্দনীয় আচারেও ত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। পুণ্যের উদ্দীপনা অথবা পাপ বিমুখতা ইহা আত্মসর্ব্বস্ব। ভক্তি বা ভালবাসা এমন নহে। ইহাতে আপনা বলিয়া কিছুই নাই। ভক্ত দেখিয়া যান কেবল উপাস্যকে; প্রেমিক বিচার করিয়া চলেন শুধু প্রেমপাত্রের তুষ্টি বিরক্তির পরিমাপ করিয়া। স্বর্গ নরক পাপ পুণ্য শুভ অশুভ তাঁহার কাছে কিছুই নহে। আকারে কর্ম্মের বিচার নহে, ভাবেই তাহার বিচার। এই জন্যই বলা হইয়াছে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন!

তাহার পর পাপের কথাই ধরা যাউক্। কোন কর্ম্ম যদি যথার্থই নিন্দনীয় ও অকল্যাণের হেতু হয়; প্রিয়তমের জন্য তাহাও অঙ্গীকার করাই প্রিয় পূজা, তাহাই প্রেম। এই জন্যই কুরুক্ষেত্রে ভগবান গাহিয়াছেন

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"

এই সর্ব্ব ধর্ম্ম বিভিন্ন ধর্ম্মমত, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি, উপাসনার বিচিত্র প্রকার নহে, এই সর্ব্ব ধর্ম্ম সর্ব্ব প্রকার আত্ম ধর্ম্ম, মনের ধর্ম্ম, সংস্কারের ধর্ম্ম, অহমিকার ধর্ম্ম, এমন কি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রখ্যাত তাহাও। ধর্ম্ম তো মানুষের অহংকারের, তাহাতেও একটা স্বার্থের ছায়া লাগিয়া আছে। সে ধর্ম্ম-ধর্ম্মাধর্ম্ম সবই পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের কাছে পৌঁছিতে হইবে। কুরুক্ষেত্রের ইহাই চরম কথা—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ॥"

মহাত্মার অহিংসানীতি

শ্রীযুক্তা রমা দেবী

"দুঃখ" মানুষের কাছে অনেক রকম সাজে দেখা দেয়, সে তার বেশ নানা ভাবে পরিবর্ত্তন করে আসে। কখন মরণরূপে, কখন অভাব দৈন্যরূপে, কখনও বা সুখের বেশে। আজ যে দুঃখ আমাদের সকল সমাজের মধ্যে দেখা দিয়েছে, তা, অভাব দৈন্য দুঃখ; এই দুঃখের ভিতরই মানুষ তার গন্তব্য পথের সন্ধান পাবার চেষ্টা করছে। যখনই একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়, দেশের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা আসে, তখনই এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে সেই অশান্তিকে শান্তিররূপে রূপান্তরিত করবার জন্য। ধর্ম্মের দিক হতে আমরা দেখ্‌তে পাই শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য, কবীর, রামানুজ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা ধর্ম্মকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবার সমাজকে শান্তি ও সুখ দেবার জন্য, রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, ঝান্সীর রাণী প্রভৃতি দেশভক্তদের আবির্ভাব। মহাত্মা গান্ধীও সেই গুরুতর দায়িত্ব ভার নিয়ে আমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি তাঁর সমস্ত দেহ মনকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে চলার পথে অগ্রসর হয়েছেন, এই চলার মধ্যেই সেই পাওয়ার অঙ্কুর নিহিত হয়ে রয়েছে। সেই অঙ্কুর তাঁর প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ধূলিকণার ভিতর ফুটে উঠে, মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়ে যাবে, যুগ যুগান্তর হতে এই চলার স্রোতে জীব বেয়ে চলেছে—তার শেষ নাই, সীমা নাই, সে আদি অন্তহীন।

জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের এইখানে প্রভেদ রয়েছে, তারা অজ্ঞান অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তাদের জীবনকে গড়ে তোলে এবং তার ভিতর দিয়েই তাদের জন্ম ও মৃত্যু। এই জন্ম-মৃত্যুর ভিতর তারা যুগে যুগে একই অবস্থায় কাটায়, কিন্তু মানুষ ঠিক্ তার বিপরীত ভাবে চলেছে, জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাদের ক্রমাগত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়েই জীবনের বিকাশ। মানুষ চায় জ্ঞান, মানুষ চায় মুক্তি, এই মুক্তি পাবার বাধার কারণও আমাদের মধ্যে যথেষ্ট রয়েছে, অর্থাভাব হতে মুক্তি, অন্ন-বস্ত্রাভাব হতে মুক্তি, রোগ শোক হতে মুক্তি, অজ্ঞানতার অন্ধকার হতে মুক্তি, সর্ব্বশেষ মৃত্যু হতে মুক্তি পাবার চেষ্টা অহরহ চলেছে। যে অভাবদৈন্য দুঃখরূপে এসে বার বার আমাদের মনকে জাগিয়ে তুলেও জাগাতে পারছে না—মিলিয়ে যাচ্ছে, সেই ভারতের অতি কঠোর দুঃখকে মহাত্মা আজ তাঁর নিজের মাথার মুকুট মণি করে নিয়েছেন, শুধু তাই নয়—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত এই দুঃখের বেদনা দিয়েই ভারতের চির-পরাধীনতার অবসান করতে চেয়েছেন।

গীতায় আমরা দেখতে পাই, যখন অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অবতরণ করেছেন, তখন তাঁর মন বিষাদ পূর্ণ; যদিও কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁকে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল, তবুও মনের বিষাদ ভাবকে সহজে দূর করতে পারেন নি। যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণই একমাত্র জয়ের পন্থা হয়ে এসেছে; কিন্তু বিনা অস্ত্রে সকলের মনকে জয় করে দুঃখ দৈন্যের আবরণ ঘুচিয়ে দেওয়াই হোল মহাত্মার প্রধান অস্ত্র, এই শিক্ষাই সমগ্রজাতির সাধনার বিশেষত্ব। অস্ত্র সাহায্যে মারামারি, কাটাকাটি করে মানুষের ভিতরের পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করা ও অত্যাচার নিবারণ করা সহজ মনে হয় বটে,

কিন্তু যারা সমাজের কল্যাণের জন্ম অস্ত্র ধারণ করে তাদেরও মধ্যে অত্যাচারীদের ভাবগুলি প্রবেশ করে থাকে। যদিও সময়ের মত সেই অত্যাচার ও অনাচারের প্রতিকার হয়, কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায় যারা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে, তাহারাই আবার নিজেরা অত্যাচারীর রূপ ধরে দেখা দিয়েছে। তা হ'লেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, যুগে যুগে যতগুলি অত্যাচার নিবারণের জন্ম পন্থা হয়ে এসেছে তার ভিতর দিয়ে এই একই দোষ ও দুর্ব্বলতা জেগে উঠে মানুষের চির-কল্যাণের পথে বিঘ্ন এনে দিয়েছে।

আধুনিক ইতিহাসে রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্ম যে সকল বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান করাসী-বিপ্লব। এই করাসী জাতি সমগ্র ইয়ুরোপের মধ্যে প্রথম স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর (Liberty, Equality, Fraternity) বাণীপ্রচার করে। মানব সমাজ এই ভাবে যাতে গঠিত হতে পারে, তারই জন্ম করাসী জাতি অগ্রসর হয়েছিল। তখন ভীষণ নরহত্যা ও নানারূপ অত্যাচারের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কঠোরতম নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। রাজা, ধনী ও জমীদার শ্রেণীরা তাদের, নিজ নিজ স্বার্থের হানির আশঙ্কায় বিচলিত হ'য়ে উঠে ধর্ম্মযাজক, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের এই সাম্যবাণীর বিরুদ্ধে নিযোজিত করে অন্তের ভিতর হিংসা ও নৃশংসতার ভাবকে জাগিয়ে তুলেছিল। যারা এই ভাব সমাজের মধ্যে প্রচার করবার চেষ্টা করেছিল তারাও ঐ একই নিষ্ঠুরাচরণের পথ অবলম্বন করে মানবকল্যাণ সাধনে নিজেদের নিয়োগ করেছিল। এই রক্তস্রোতের ভিতর রাজতন্ত্র ছিন্ন হ'য়ে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হোল। ইয়ুরোপে এই ঘটনার সুত্রপাত যদিও খুবই একটা অভাবনীয় ঘটনা ও স্মরণীয় ব্যাপার, কিন্তু এর ফলে তারা যে সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে সমস্ত সমাজকে বাঁধবার আশা করেছিল, তা আর সম্ভবপর হোল না। দেখা গেল, রাজা রাণী ও তাঁদের সাহায্যে যে সকল অভিজাত্য সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছিল যথা—ডিউক ও মার্কুইস শ্রেণীরা, তারা গেল বটে; কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আবার আর এক শ্রেণীর ধনী ও বণিকদের সৃজন হয়ে সমাজে সেই একই দোষ দেখা দিল যা নিবারণ করবার জন্য পরবর্ত্তী কালে নানা অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা, যদি অহিংসা পন্থার দ্বারা স্থাপন করবার চেষ্টা হোত, তাহলে এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ যেতনা। ইহাই শেষ নয়, আবার আমরা আমেরিকার ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে সেই একই অবস্থা দেখতে পাই—সেখানেও রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়, কিন্তু তার ফলে আমেরিকাতেও যুদ্ধাদি নৃশংসতার সাহায্যে সংঘটিত হয়েছিল, যার জন্ম ফ্রান্সের মত তাদেরও দুর্দ্দশা ভোগ হচ্ছে, এখনও শেষ হয়নি! আমেরিকায় রাজা গেল কিন্তু প্রত্যেক পণ্যদ্রব্যে এক একজন রাজা সৃষ্টি হয়ে সমাজের সকল ব্যক্তির উপরে সেই রাজ-কর্ত্তৃত্ব বজায় রেখে চলেছে, যথা—Oil King, Steel King, Coal King ইত্যাদি। এই নিয়মে সমাজের ভিতর আজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মানুষের জীবনধারণের প্রত্যেক উপাদানটিকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করে পরে নিজেদের সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হচ্ছে।

১৮৭৮ সালে ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়; বিজয়ী জার্ম্মান জাতির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন হওয়া সত্বেও দেখা যায় যে করাসীদিগের উপর জার্ম্মাণ, এবং জার্ম্মাণদিগের উপর করাসীদিগের বিদ্বেষ বহ্নি জার্ম্মাণ ও করাসী সাহিত্যে, শিল্পে ও বাণিজ্যের ভিতর খুব প্রচণ্ডভাবে রয়েছে। অর্দ্ধ শতাব্দী যেতে-না-যেতে সেই ধূমায়িত বহ্নি পুনরায় জ্বলে উঠে ১৯১৪ সালে সমস্ত

পৃথিবী দগ্ধ করতে চেয়েছিল। সেই অগ্নিশিখা কিরূপে নিঃশেষে নির্ব্বাপিত হবে তা এখন জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমেরিকাতে ১৮৩৩ সালে দাসত্ব শৃঙ্খল হতে মুক্তি দেবার জন্ম যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, সেই সময় দাস ব্যবসায় উচ্ছেদ করবার জন্ম মহাত্মা গান্ধীর মতনই William Loyd Garrison এই নিরস্ত্র যুদ্ধের ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "একজাতির অন্ত জাতিকে বা এক মনুষ্য শ্রেণীর অন্য মনুষ্য শ্রেণীকে পরাধীন বা দাসরূপে ব্যবহার করাই হ'ল পশুবৃত্তি এবং এই পশুবৃত্তির বশবর্তী হ'য়ে একজাতি অন্ত জাতিকে পরাধীন রাখবার জন্ত যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করে, তা পৈশাচিক শক্তির সাহায্যে। আবার যখন সেই পরাধীন জাতি নিজের মুক্তির পথ অন্বেষণ করে তখন তাকেও সেই একই শক্তির সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।"

William Loyd Garrison বলেন, "Our principles forbid the doing of evil that good may come, and lead us reject and to entreat the oppressed to reject the use of all carnal weapons for deliverance from bondage.

"Our measures shall be such only as an opposition of moral purity to moral corruption, the destruction of error by the potency of truth, the overthrow of prejudice by the power of love and the abolition of slavery by the spirit of repentence."

"মঙ্গলকে আনবার জন্ম অমঙ্গল উপায় অবলম্বন করা আমাদের নীতি-বিরুদ্ধ, সেই জন্ম অস্ত্র ধারণাদি উপায় হতে আমাদের নিজেদের বিরত হতে হবে, এবং যাহারা অত্যাচার ও অত্যাচারীর বন্ধন হতে মুক্ত হতে চায় তাদেরও এই পথ হতে সরে দাঁড়াবার জন্ম আমরা অনুনয় করি। আমাদের উপায় অপবিত্রকে পবিত্রতার দ্বারা ও অসত্যকে সত্যের দ্বারা জয় এবং দাসত্ব প্রথার অনুতাপে, দাসত্বের উচ্ছেদ সাধন।"

বর্ব্বরতায় মানুষের শক্তিকে কখনও সৎপথের সহায়তা করে না। বনের হিংস্র জন্তুকেও ভালবাসার গুণে মুগ্ধ হয়ে বশ্যতা স্বীকার করতে দেখা যায়। এই ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তুর দ্বারা যদি ইহা সম্ভবপর হয়ে থাকে; তবে সভ্য মানব জাতির পক্ষে ইহা অসম্ভব ব'লে মনে হয় না। এইখানেই আমাদের মানব জাতির সংযম ও সৎসাহসের অভাব রয়েছে। যদ্ধ বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝে থাকি, নিজের জাতির, সমাজ ও দেশের সুখের জন্ম অন্য জাতির নিকট প্রবলভাবে দাবি করা। ইহা ছাড়াও, এক জাতির জ্ঞান বুদ্ধিকে অন্য জাতির মধ্যে প্রসারণ করবার চেষ্টাকেও যুদ্ধের আর একটি কারণ দেখা গিয়াছে। আজিকের দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি মহাত্মা গান্ধী সেই দাবির জন্তই সংগ্রামে উপস্থিত, কিন্তু তাঁর সংগ্রামের পন্থা অন্যরূপ। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধের আবির্ভাব ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার মনুষ্য সমাজকে মনুষ্যত্ব লাভ ও জ্ঞান বৃদ্ধির পথে যে সব সহায়তা করেছিল, তার ফলে সমাজে যুদ্ধাদির প্রকটতা প্রশমিত হয়। এই মনুষ্য সমাজের গতির মধ্য দিয়েই তাঁর জীবনে প্রথম সমস্তার উদয় হয়েছিল। তাঁর ধর্ম্ম প্রচারের সময় কিম্বা বৌদ্ধ যুগের প্রারম্ভে দেখতে পাই ভারতবর্ষে তখনকার সামাজিক অবস্থা ঘোর বৈষম্যে পরিপূর্ণ। এই বৈষম্যের জন্ম হিংসাবৃত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করাতে বুদ্ধদেব অহিংসা নীতি

প্রচার করলেন এবং তারই ফলে ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপন ও সকল বিষয় উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছিল। বুদ্ধদেবের এই মহামন্ত্র জীবনে উপলব্ধি করবার জন্য, হিমালয় হতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। খুব কম করেও হাজার বৎসর এই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ভারতবর্ষ শান্তির রাজ্য ছিল। সেই হাজার বৎসর ভারতের সৌভাগ্যের দিন। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, প্রভৃতি যে যে রাজারা রাজত্ব করেছিলেন সেই সময় তাঁদের আবির্ভাব হয়। ইতিহাসে দেখা যায় পৃথিবীর অর্দ্ধেকের বেশীরভাগ লোক সেই সময় এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে নিজেদের মধ্যে সখ্য বন্ধন করতে সমর্থ হয়েছিল। এই সৎ উপায়ের দ্বারা শিল্প বিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞান সাহিত্যেরও বিশেষ উন্নতি লাভ হয়; ও ভারতবর্ষ, রোমক গ্রীক প্রভৃতি ইয়ুরোপীয়ও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প ব্যবসাধের স্থান বলিয়া গণ্য হয়। শিল্প বাণিজ্যের মধ্য দিয়া বৌদ্ধ সাধনার প্রভাব বিস্তারে পাশ্চত্য রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতিগুলির মধ্যেও সামঞ্জস্য দেখা দিয়াছিল। তদানীন্তন মানব সমাজে নানাপ্রকার বৈষম্য প্রকটতার জন্য ক্রমাগত যুদ্ধাদির আয়োজনে, যতরকমই সৎ উপায় ও আদর্শ সম্মুখে এসেছে, তার ভিতর দিয়ে তাদের হিংসার প্রভাবই বেশী লক্ষিত হোত। কাজেই সেই হিংসা বৃত্তির জন্য তারা ভাল জিনিষকে মনে স্থান দিতে সক্ষম হোত না, সব নষ্ট হয়ে যেত। বৌদ্ধধর্ম্ম, সেই হিংসাবৃত্তি দমনে ও অহিংসভাব প্রসারণে বিরুদ্ধ জাতিদের মধ্যেও এমন একটা প্রচণ্ড শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল যাতে সমস্ত বিরুদ্ধভাব কেটে গিয়ে বিভিন্ন দেশে পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়ে শিল্প, বাণিজ্য ও সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক ঔৎকর্ষ সম্ভব হয়েছিল। অসামঞ্জস্য যতক্ষণ সমাজে থাকে ততক্ষণই হিংসাপ্রবৃত্তিগুলি নানারকমে বৃদ্ধি পায়, অসামঞ্জস্যকে সামঞ্জস্যের মধ্যে এনে তার সদ্ব্যবহার করাই হোল ধর্ম্ম এবং জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ। সভ্য জগতের ইহাই এক মাত্র মিলনের পথ এবং আদর্শ স্থল।

ব্যক্তির উন্নতি বা প্রসারতা সমাজের মধ্য দিয়ে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এক ব্যক্তি অন্যকে হিংসা প্রবৃত্তির দ্বারা দমন করে কখনও নিজের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে না, এই তথ্যটিরই যুগ-যুগান্তর ধরে মানব জাতির ইতিহাসে পরিচয় পাওয়া যায়। যখনই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তি বা কোনও সমগ্রজাতি বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে, তখনই সমাজে বিপ্লব ও যুদ্ধাদির নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে, তাতে করে সমাজের ভিতর এবং ব্যক্তিগত হিসাবেও হিংসা বৃত্তিরই প্রভাব বেড়ে উঠেছে বই কমেনি। শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সহায়তা করবার জন্য অনেকের ধারণা গীতার উদ্দেশ্য যুদ্ধের ন্যায় নৃশংস ব্যাপারে মনুষ্যের প্রবৃত্তিকে নিয়োগ করা। অনেকে সেই যুদ্ধই মানব সমাজের মুক্তির পথ বলে মনে করেন। কিন্তু মহাভারতে ইহাও আমরা দেখতে পাই যে, যুদ্ধ যাতে না হয় তাহার জন্যও শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করেছিলেন, পরে যখন যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়ে উঠ্‌লো তখন তিনি যুদ্ধে, কোনও পক্ষেই ব্রতী হতে স্বীকার না পেয়ে, কেবল অর্জ্জুনের সারথি পদে আপনাকে নিয়োগ করেছিলেন। এই যুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করেও তিনি প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত, অর্জ্জুন যাতে ধর্ম্ম পথ হ'তে বিচ্যুত না হন্ তার জন্য বরাবর তাঁকে সহায়তা করে এসেছেন। এই মহাসমরে ধর্ম্মের হানি হ'তে পাছে কর্ত্তব্যের অবহেলা হয়—সেইটিই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং তা'রই জন্য গীতার সৃষ্টি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উপদেশের একস্থানে অর্জ্জুনকে বলেছেন, "যদি একান্তই যুদ্ধ করতে বাধ্য হতে হয় তবে কর্‌তে হবে, কিন্তু তার ভিতর নিজের কাম, ক্রোধ, মোহকে বর্জ্জন

করে যুদ্ধে অগ্রসর হও। নিজের স্বার্থের জন্য, ভোগের জন্য, সুখের জন্য যুদ্ধ নয়, এই যুদ্ধের মাঝখান দিয়ে তোমার মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তোল। যদি তাই পারো তবেই তোমার এই যুদ্ধের নৃশংসতার পাপ ধুয়ে যাবে, নিজের মনের কোণে যদি কণামাত্রও স্বার্থপরতার ভাব থেকে থাকে তবে এই যুদ্ধ করা ব্যর্থ জান্‌বে।"

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"

—আত্মা (বিবেকযুক্তবুদ্ধি) দ্বারা আত্মাকে সংসার হতে উদ্ধার করবে, কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু॥

"বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥"

—যে আত্মা আত্মাকে জয় করেছে সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু আর যে আত্মা আত্মাকে জয় করতে সমর্থ হয়নি, সে আত্মাই আত্মার শত্রুর মত অপকারে প্রবৃত্ত হয়॥ নিজের চরিত্রবল, আদর্শ এবং প্রীতির বন্ধনের দ্বারাই মানুষ মানুষের মনকে জয় করে, নিজের ভিতর যে সৎগুণ আছে অপরের মধ্যে তাকে প্রকাশ করাই হোল প্রকৃত জয়লাভ। নিজেকে মেরে অন্যের আত্মাকে সেই তেজে, ত্যাগে, ধর্ম্মে বলীয়ান করতে পারাই হোল জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, এ দানের তুলনায় সকল দান নিষ্প্রভ হয়। যদিও ইহা খুবই কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ তবুও হতাশ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিলে চল্‌বে না। যারা মনকে আত্মাকে স্নেহের দ্বারা, সৎ-বিবেকবুদ্ধির দ্বারা জয়ী করতে পেরেছে সেই সমাজ, সেই ব্যক্তি, সেই জাতি চিরদিনই পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করেছে। যে পারেনি কেবল অত্যাচার ও নৃশংসতার কুপ্রবৃত্তির লোভে পড়ে ক্রমাগত পরাভূত করতে চেষ্টা করেছে সেই জাতি কখনও সম্পূর্ণভাবে জয়ী হতে পারেনি, বার বার তাকে ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলে আসতে হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের বাণীর মধ্যেও দেখা যায় যে, তিনিও অহিংসার নির্দ্দেশ দেখিয়ে গিয়েছেন। মহাত্মার এই অহিংসাবাণী আজ তাঁর নূতন কথা নয়, এই বাণীই একদিন ভারতবর্ষের বুকের ভিতর দিয়ে নানা ভাবে উত্থিত হয়ে উঠেছিল, সেই বাণীকে পুনর্জ্জীবিত করে তোলবার জন্যই মহাত্মার শেষ ইচ্ছা এবং ভিক্ষা। হয়ত বা নানা বাধা পেয়ে তাঁর এই ইচ্ছা সর্ব্বাঙ্গীনরূপে সফল না হতেও পারে, কিন্তু এমন দিন আসা সম্ভব যখন এই বাণীর মন্ত্র সকল সমাজের মধ্যে উপলব্ধি করতে তাদের বাধ্য করবে। অহিংসা নীতি প্রকৃতির মিলনের ধারা, অহিংসার ধারাতেই প্রকৃতির মঙ্গলের গতি, এই অহিংসাই মানবসমাজে সমাজশক্তিরূপেও জীবজন্তুর ভিতর স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় ব্যাপক ভাবে রয়েছে। প্রকৃতির অফুরন্ত শক্তি অহিংসার রীতি ও ভঙ্গীতে ফুটে চলেছে; হিংসাবৃত্তির ভাব ক্ষণস্থায়ীরূপে দেখা দেয় সুতরাং ইহা অনিত্য; অহিংসা নিত্য জাগরূক, কারণ ইহার প্রভাব মানব সমাজে, জীব জন্তুর মধ্যে, বহুক্ষণ ও বহু আকারে স্থায়ীভাবে দেখতে পাওয়া যায়। মানব সমাজে যারা হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করে নিজেদের জীবিকা উপার্জ্জনের একটি পথ করেছে, যাদের আমরা দস্যু, চোর নাম দিয়া থাকি, তারাও তাদের আত্মীয় স্বজন প্রতিপালন, দান ধর্ম্মাদি চেষ্টাতে এই প্রমাণ করে দেয় যে, মানবের সকল রকম চেষ্টার মধ্যে এই প্রকৃতিগত অহিংসানীতিরই বিস্তার হচ্ছে। সমাজ সৃষ্টির মূল

উদ্দেশ্য হোল অহিংসা প্রথার দ্বারা শান্তি স্থাপন করা। যে সময় হতে সমাজে আইন সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, তখনই দেখা গিয়েছে মানব জাতি হিংসানীতিকে বর্জ্জন করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। সহস্র সহস্র আইন কানুনের মধ্যে হিংসার ভাবকে দমন করে, অহিংসা স্থাপন করবার নির্দ্দেশ বহুদিন ধরে চলেছে; এই চেষ্টার জন্য বহুশক্তি, বহুদিন ধরে নিয়োজিত হয়ে রয়েছে। তার তুলনায় হিংসাদি-বৃত্তির পথ, যতটুকু মানবজাতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে, তাহা খুবই কম। ভারতের সাধনার বৈশিষ্ট্যের দাবি হচ্ছে, হিংসাবর্জ্জিত নীতি-শিক্ষার দ্বারা মানুষের মনকে ধৌত করে, উচ্চ হতে উচ্চতর অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। এই সাধনার ধারাতেই ভারত বহুদিন ধরে নানাপ্রকার বিভিন্ন জাতির অত্যাচার সত্বেও, আপনার সাধনার মহত্ব বজায় রেখে এসেছে; ভিন্ন ভিন্ন জাতির আক্রমণের ফলে, বাহ্যিক শত রকমের পরিবর্ত্তনের ভিতরেও নিজের সত্বাকে জাগিয়ে রেখে, নিজের দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছে।

মহাত্মার কারাবরণে সমস্ত দেশ বিচলিত, কিন্তু এই দুর্দ্দিনের মাঝখানে যাঁর পূজার আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠেছে, তাঁরি আহ্বানে সকলের তনু মন কর্ম্ম-দেবতার পদে আজ ডালি দিতে হবে।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচনা সাপেক্ষ]

সমস্যা কিসের ?

পত্রান্তরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ "বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি আরম্ভ করিয়াছেন—

"এখন বাঙ্গালী জাতির অন্নসমস্যাই প্রধান সমস্যা। কি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, কি কৃষক, কি শ্রমজীবী, সকলেরই এখন অন্নসঙ্কট উপস্থিত। বাঙ্গালীকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই অন্ন সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে।"

এবং তাহার উপসংহার এই :—

"এইরূপে একজন উদ্যমশীল ও শ্রমসহিষ্ণু যুবকের পল্লীগ্রামে অনেক প্রকার অর্থোপার্জ্জনের পথ রহিয়াছে। তাঁহাকে কেবল চাকুরীর মোহ ও সহরের মায়া ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ পল্লীগ্রামে বাস করিলে তাঁহারা পল্লীগ্রামে ও পল্লীবাসিগণের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার চেয়ে বড় কাজ আর নাই।"

অথচ এই বঙ্গদেশে শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাউল ছিল। এই বঙ্গদেশই প্রাচ্য দেশের খামার (granary) বলিয়া পরিচিত ছিল। সার টমাস রো যখন সম্রাট জাহাঙ্গীরকে দেখিতে আসেন, তখন এই বঙ্গদেশ হইতে সমস্ত ভারতের চাউল সরবরাহ হইত, ভারতের সর্ব্বত্র

চিনি পাঠাইত এবং যথেষ্ট পরিমাণ গম পাঠাইত। তখন এই বঙ্গদেশ পেগুদেশের সহিত বাণিজ্য করিত। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গলার চিক্কণ বস্ত্রশিল্প সমগ্র পৃথিবীখ্যাত ছিল। আজ দুঃখ দুর্দ্দশা ও অন্নকষ্ট। ভাবের ঘরে অভাব বলিয়া দুঃখের কথা কহিতেছি না। তবে সমস্যার কথা তুলিতে গেলেই বস্তু যেখানে বর্ত্তমান ছিল সেই বস্তুর অভাবের কারণ পর্য্যবেক্ষণে অতীত অবস্থার যথাযথ জ্ঞান আবশ্যক।

সিংহ মহাশয় ফরিদপুর জেলার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে তথ্য পান, সেই তথ্য সমগ্র বঙ্গদেশের সাধারণ তথ্য ধরিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "ফরিদপুর জেলার একশ'টি কৃষক পরিবারের মাত্র পঁয়ত্রিশটী পরিবার কেবল জমির উৎপন্ন হইতে বাঁচিতে পারে, পঁচিশটী পরিবারকে জমির আয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়; বাকী চল্লিশটী পরিবারকে সারা বছর ধান কিনিয়া খাইতে হয়।"

"ভদ্র পরিবারের মধ্যে অর্দ্ধেক লোকের জমিজমা আছে, সিকি লোক চাকুরী দ্বারা অবশিষ্ট সিকি লোক ব্যবসায় বাণিজ্য, ওকালতী, মোক্তারী, ডাক্তারি, তেজারতী প্রভৃতি উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। শতকরা আটজন লোক শিল্প কার্য্য (তাঁত বোনা ইত্যাদি) দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে।"

সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন যে "কৃষক শ্রেণীর শতকরা ৩৯ জন ও অপর শ্রেণীর শতকরা ২৭ ঋণগ্রস্ত।"

সম্প্রতি ব্যাংকিং সমিতি নামে এক সরকারী সমিতি সমগ্র বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামের আর্থিক অবস্থার একটা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের মন্তব্য ছাপাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে বাঙ্গলার শতকরা ৮৩ জন কৃষিজীবী; বাঙ্গলার জমির শতকরা ৮৬ অংশ কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত আছে। ৬০ লক্ষ চাষী ৯ কোটি ৩০ লক্ষ বিঘা জমি লইয়া চাষ করিতেছে। জমি হইতে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহাতে চাষীর ভরণ পোষণ হওয়া সম্ভব নয়। কেবল মাত্র চাষীর হাতে টাকার যোগান দিলেই যে চাষীর অবস্থার উন্নতি সম্ভব তাহা নহে, তবে যদি উৎপন্ন শস্যের রকম ও পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারা যায় ও চাষীর হাতে সঞ্চিত শস্যের পরিমাণও বাড়াইতে পারা যায় তবে আশা আছে। ঐ সমিতির উদ্দেশ্য হইল যে চাষীর শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার উপায় নির্দ্ধারণ করা ও শস্য ভোক্তার ও শস্যকর্ত্তার মধ্যে যে সকল লোক দুপয়সা গুজরান করিয়া লইতেছে তাহাদের লভ্যাংশ কমান।

দারিদ্র্য যে বাঙ্গলার চাষীকে অত্যন্ত হীন করিয়া রাখিয়াছে সে কথা ঐ সমিতিকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। (৯৮ ও ৯৯ অনুচ্ছেদ)

বলাবাহুল্য এই সমিতির সদস্য সকলেই বাঙ্গালী।

সিংহ মহাশয় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন কি কি উপায়ে পল্লীগ্রামবাসী শিক্ষিত যুবক দিন গুজরাণ করিতে পারে। তাহার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিলে সুফল আশা করা যায় একথা স্বীকার্য্য, তবে সর্ব্বক্ষেত্রে সুফল ফলিবে তাহা নাও হইতে পারে। কিন্তু ব্যাংকিং সমিতির সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয় যে বাঙ্গলার চাষীর হাতেই বাঙ্গলার শতকরা ৮৬ ভাগ জমি আছে তবে পল্লীগ্রামে চাষের জমি পাওয়া সুলভ হইবে কি? উৎপন্ন শস্য হইতে যদি চাষীর

ভরণপোষণ হওয়া সুবিধাজনক না হয় তবে পল্লীবাসী শিক্ষিত যুবকের ভরণ পোষণের উপযুক্ত শস্য উৎপন্নের সুবিধা হইবে কি? আবার, কি চাষী কি ভদ্রগৃহস্থ সকলেরই ঋণভার যদি দৈনন্দিন অবস্থা দাঁড়াইয়া থাকে তবে সেই ঋণভার প্রপীড়িত অবস্থা জাতির পক্ষে, দেশের পক্ষে, সমাজের পক্ষে, স্বস্তির অবস্থা কি? অপর পক্ষে intensive cultivation অর্থাৎ শস্যের রকম ও পরিমাণ বৃদ্ধিই যদি একমাত্র উপায় হয়, তবে যাহাদিগকে আমরা শিক্ষিত যুবক বলি তাহারা সেই রকম ও পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য কি শিক্ষাই বা পাইতেছে আর তাহারা কি সাহায্য ও সামাজিক সহযোগিতার আশাই বা করিতে পারে?

সিংহ মহাশয় বা তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল সামাজিকগণের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন মনে না করেন যে পল্লীগ্রামে শিক্ষিত যুবকের অবস্থানের প্রতিকূলে কোনও কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা সিংহ মহাশয়ের সমস্যা সমাধান কার্য্যকরী করিবার যে সকল বাধা বর্ত্তমান সেই সকল বাধা আলোচনা করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। স্বনামধন্য দাদাভাই নৌরজী যখন ভারতের দারিদ্র্যের কথা লইয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক লিখেন, তখন হইতে ভারতের দারিদ্র্যের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াতে ও এই বিরাট দেশের বিরাট দারিদ্র্যের কোনই প্রতিকার উদ্ভাবন হইতেছে না। অথচ, এই ভারতের ধনরত্নের লোভেই সহস্র সহস্র বৎসর নানা বিদেশী পর্য্যটক এই দেশে আসিয়াছে আর এই দেশের ঐশ্বর্য্যের কথা শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছে। সে সব ঐতিহাসিক কথার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান ইংরাজী বৎসরের ২০ এ মে তারিখে বিলাতে ক্যাক্সটন হলে একটী সভা হয়। মদ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব শ্রমশিল্পাধ্যক্ষ সার আলফ্রেড চ্যাটারটন "ভারতের উন্নতি ও ভারতের দারিদ্র্য" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বোম্বাইএর পার্শী বণিক সার মানেকজী দাদাভাই সভাপতি ছিলেন। বহু অবসর-প্রাপ্ত সিভিলিয়ান উপস্থিত থাকিয়া আন্দোলন আলোচনায় যোগ দেন।

সার আলফ্রেড চ্যাট্যারটন বলেন—১৯০৩-৪ হইতে ২৫ বৎসর পরে দেখা যায় যে ভারতের শ্রমশিল্প তিনগুণ বাড়িয়াছে। তিনি হিসাব ধরিয়াছেন কয়লার কাট্‌তি দেখিয়া। তিনি দেখান যে এটা পাটকলের টাকুর তিনগুণ বৃদ্ধি দ্বারা প্রমাণিত হয়। ২৫ বৎসরে ৮৹ আনা পরিমাণ সূতা ভারতে বেশী হইতেছে ও চারিগুণ তাঁত বাড়িয়াছে। রেল কোম্পানির আয় তিনগুণ বাড়িয়াছে। তবে মোট শতকরা একজন লোক এই সকল কার্য্যে লাভবান। পাট ও তুলার চাষ দেড়া হইয়াছে।

সহরে জমির দর অত্যন্ত বাড়িয়াছে। The unearned increments accruing to the land-holders of Calcutta, Bombay, Madras, and other towns are a burden on industry * * * over the whole of rural Indla, with its teeming millions of apathetic and poverty-stricken people." কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও অন্যান্য সহরের জমিদারগণের জমির অনর্জ্জিত মূল্য বৃদ্ধিতে উদাসীন ও দরিদ্র কোটি কোটি গ্রামবাসীর শ্রমশিল্পের অর্জ্জনের হন্তারক সৃষ্টি হইয়াছে।

আমদানি রপ্তানির হিসাবে চ্যাটারটন সাহেব দেখান যে ১৯০৩-৪ সালে আমদানি ছিল

৯২½ কোটি টাকার ও রপ্তানি হইয়াছে ১৫০ কোটি টাকার; ১৯২৮-৯ সালে আমদানি ২৬৩½ কোটি টাকার ও রপ্তানি ৩৩০ কোটি টাকার। সুতরাং বিলাতী অর্থনীতি হিসাবে ভারতের অর্থাগম বেশী হইয়াছে। তবে বক্তা স্বীকার করেন যে আধুনিক কয়েক বৎসরে দেখা যাইতেছে যে মটর গাড়ী, এলুমিনিয়ম, কৃত্রিম রেশমের আমদানি বাড়িয়াছে ও সুতি থানের দাম দ্বিগুণ হইয়াছে; গ্যাল্‌ভানাইসড লোহের দর বাড়িয়াছে প্রায় সিকি পরিমাণ; টিন দেড়া হইয়াছে; সিসাও দেড়া হইয়াছে। এই সব হিসাব করিয়া বক্তা দেখাইতেছেন যে আমদানি রপ্তানির দামের হিসাব বাদ দিয়াও যখন দেখা যায় যে ১৯০০ সাল হইতে গত তিরিশ বৎসরে ভারতে ৬০০ কোটি টাকার সোনা ও ৫০০ কোটি টাকার রূপা গ্রাস করিয়াছে তখন ঐ সোনা ও রূপা যথাযথ ভাবে ব্যবহার হইতে পায় না বলিয়া ইহা ভারতের পক্ষে একটা ভয়ের কথা। সেই কারণে বক্তা বলেন যে ভারতবাসীর গহনা গড়ান প্রবৃত্তি কমাইয়া দাও ও স্ত্রীধনের জন্য সরকারী কোম্পানীর কাগজ ব্যবস্থা সমীচীন।

এতদ্ব্যতীত আমদানির হিসাবে দেখা যায় যে ১৯২৭-২৮ সালে এই কৃষি প্রধান ভারতে ১০৬ লক্ষ টাকার চাউল আসিয়াছে ও ১৯২৮-২৯ সালে ২২৮ লক্ষ টাকার চাউল আসিয়াছে। লোহালক্কড়ের কল কারখানার আমদানি চারি গুণ বাড়িয়াছে। মটর গাড়ীই আসিয়াছে ১০দশ ক্রোড় টাকার; তৈরি বস্ত্র ৩৬ ক্রোড় হইতে ৮২ ক্রোড়ে পৌঁছিয়াছে। কৃত্রিম রেশম ও চিকণ বস্ত্র আমদানি দ্বারা প্রমাণ হয় যে কি ভারতে কি অন্য দেশে নারীর চক্ষে বাহিরের চাকচিক্যই বেশী ধরে (in India as elsewhere their superfircial attractiveness appeals to feminine tastes).

ভারতের বহির্বাণিজ্যের বিস্তৃতির এই নিদর্শন দিয়াও বক্তা বলেন যে তথাপি ভারতের জনগণের মধ্যে সাধারণতঃ ঘোর দারিদ্র্যও বর্ত্তমান। তাঁহার মতে ভারতের জীবন যাত্রায় ভোগের আদর্শ বাড়াইতে হইবে এবং সন্তান জন্মের প্রবৃত্তি কমাইতে হইবে। (A great change in the mentality of the people is necessary—a change leading to a desire for a higher standard of life and capable of effectively restricting their reproductive instincts).

বক্তা ইহাও বলেন যে বহির্বাণিজ্যের বিস্তৃতির জন্য ভারতে ভিতরের উন্নতির একান্ত আবশ্যক এবং যে নীতিতে ভারতের টাকা ও ভারতের মস্তিষ্ক কাজে লাগিতে পারে সেই নীতিতেই অন্য দেশের জিনিষের চাহিদা বাড়িয়া যাইবার কথা। (Internal progress is essential to the expansion of external trade, and that the policy which offers the greatest scope to the employment of Indian capital and brains is that best calculated to create extended demand for the products of other lands).

ভারতের আভ্যন্তরিক উন্নতির বিষয় আলোচনা করিতে বক্তা বলেন যে বৎসরের ছয়মাস চাষীর কোনই কাজ নাই। এখনও এমন কোনও কার্য্যের উদ্ভব হয় নাই যাহাতে চাষীর কোনও উপরি আয় হইতে পারে। কাজেই জনসঙ্ঘের দারিদ্র্য অত্যন্ত অধিক। তবে তাহাদের প্রয়োজনও অতি সামান্য বলিয়া তাহারা অন্যান্য দেশের দরিদ্র অপেক্ষা মন্দ থাকে না।

ছোট খাট শ্রমশিল্পে উন্নতির অন্তরায় হিসাবে বক্তা বলেন যে ভারতের বড় বড় বন্দরের সাহায্যে বাহিরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবাসীর জিনিষ ভারতবাসীর কাজে কমই লাগে এবং বাহিরের আমদানি-কারকের কাছে সকল দেশটাতেই হাত বাড়াইবার এতটা সুবিধা আছে যে ভারতের কারখানায় ততটা সুবিধা নাই। (Nearly every part of the country is more accessible to the importers than would be centrally situated Factories such as India might support). বক্তা না বলিলেও আমরা বলিতেছি রেলওয়ের ভাড়ায় মালের রপ্তানির সুবিধার জন্য এই অবস্থা ঘটিয়াছে।

এইখানে বক্তা ভারতে অশান্তির কথা তুলিয়া বলেন যে শিক্ষিত সমাজের লাভজনক বৃত্তির অভাবেই দেশব্যাপী এতটা চাঞ্চল্য ও অশান্তি। তিনি বলেন ভারতবাসীর কেমন একটা দুর্ম্মতি এই যে স্মরণাতীত কাল হইতে তাহারা রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ ও সাহায্য প্রত্যাশা করিয়া আছে।

বক্তা উপসংহারে বলেন যে ভারত সম্ভবতঃ কোনও কালে একটা বড় শ্রমশিল্পের দেশ হইয়া উঠিবে না। তাহাকে কৃষির উন্নতির দ্বারাই দেশের অবস্থা ফিরাইতে হইবে। (That India can ever become a great industrial country is not possible and it must look to the improvement of agriculture for any great amelioration in the condition of its many millions.)

বক্তার বক্তৃতার পর সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন ভারত শ্রমশিল্পেই বা বড় হইতে পারে না কেন? ভারতের শাসন নীতির দোষে তাহা হইতেছে না। শ্রমশিল্প-বিভাগের দ্বারা কিছুই হইতেছে না। করভার অত্যন্ত বাড়িয়াছে।

লাট ল্যামিংটন ভারতে লাটগিরি করিয়া গিয়াছেন। ভারতের দারিদ্র্যের কথা তিনি স্বীকার করিতে চান না। গত কয়েক বৎসরের ব্যবসার উন্নতির দ্বারাই ভারতের উন্নতি সূচিত হয়।

সার আর্ণেষ্ট লো একটা কথা বলেন যে ভারতে টাকা সঞ্চয়ের অপেক্ষা ও সহরে ফট্‌কা খেলা অপেক্ষা কৃষির উন্নতির জন্য টাকা মাঠে ছড়ান আরও আবশ্যক।

এইখানেই বিলাতের বক্তৃতার কথা শেষ করি। অনেক হয়ত বলিবেন যে আমি ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিতে বসিয়াছি। কিন্তু সত্যই কি তাই?

আমি সিংহ মহাশয়ের প্রবন্ধ লইয়া এত কথা পাড়িতেছি কেন? বাঙ্গলার অন্নসমস্যা যে কেবল বাঙ্গলার নহে এটা জানাও যেমন দরকার, সেই অন্নসমস্যার মূলে অন্য যে সমস্ত সমস্যা আছে তাহা জানাও তেমনি দরকার। আবার সেই সকল সমস্যা মীমাংসার পথে যে সকল ঘটনা পরম্পরার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ কার্য্য করিতেছে তাহা জানাও তেমনি দরকার। রোগের নিদান না জানিয়া যেমন ঔষধ প্রয়োগ অসম্ভব, সামাজিক রোগের নিদান তথ্যানুসন্ধান না করিয়া সামাজিক ব্যবস্থা করাও তেমনি অসম্ভব। এই বর্ত্তমান ইংরাজী সনের ভিতরে ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বহুজ্ঞ ও অভিজ্ঞ রাজপুরুষদিগের মতের একটা আংশিক পরিচয় দিবার জন্য ঐ বিলাতে বক্তৃতার কথা উত্থাপিত করিয়াছি। ঐ সকল মত যে সমীচীন ও যথার্থ সিদ্ধান্ত তাহা মনে

করিবার কোনই কারণ নাই। বরং উহা এত ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ যে তাহারও দুই একটা উদাহরণ দেওয়া উচিত মনে করি।

চ্যাটারটন সাহেব বলেন যে মটর বাস দ্বারা গ্রামের সহিত সহরের সম্বন্ধ খুব নিকটবর্ত্তী করিয়া দিয়াছে, এবং বর্ত্তমান অশান্তিরও কতকটা প্রশ্রয় দিয়াছে। ফলে মানুষকে আরও চলচ্ছক্তিবান করিয়া তুলিবে। অর্থাৎ মোটের উপর সাহেব মটর গাড়ীর দ্বারা উপকার আশা করেন।

এই মত বিলাতের সকল চিন্তাশীল লোকে অনুমোদন করিতে পারে না। সার্জ্জেন্ট সলিভান বিলাতের একজন শ্রেষ্ঠ মনিষী। তিনি মটর গাড়ী ও সিনেমাকে বিলাসের অঙ্গ বলিয়া ঘৃণা করেন ও ঐ দুটীকে "শ্রমশিল্প" বলিয়া স্বীকার করিতেও রাজি নহেন।

চ্যাটারটন সাহেব বলেন যে জমির দাম বাড়িয়া যাওয়াতে গ্রামের লোকের যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গতিতে টান ধরিতেছে (The increase in land values imposes a tax on their limited resources) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিতেই যে এইরূপ ঘটিতেছে তাহা নহে, যেখানে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত আছে সেখানেও জমিহীন লোকের উপর কুফল সমান ভাবেই ফলিতেছে, তবে জমিওয়ালার সংখ্যা বেশী হওয়াতে তাহা ততটা চোখে পড়ে না।

অপর দিকে বর্ত্তমান আগষ্ট মাসের চতুর্থ সপ্তাহে ভারতের অর্থ সচিব সার জর্জ্জ সুষ্টার সিমলার বিভিন্ন প্রদেশের অর্থ সচিবদিগের বৈঠকে বলেন যে বর্ত্তমানের ভূমিকর বর্ত্তমানের দ্রব্য মূল্যের হারের সঙ্গে সঙ্গতই আছে (land revenue as it stood to-day was not out of adjustment with lower levels to which prices had now fallen) অর্থাৎ জমির করের দ্বারা ভারতের প্রজার দারিদ্র্যের কোনই তারতম্য হওয়া সম্ভব নহে।

উপরি উক্ত দুইটী মতান্তরের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই বলিতে চাই যে নাহসৌ মুনির্যস্য মতং নভিন্নং। এখন অপর কয়েকটী বিষয় একে একে উল্লেখ করিতেছি।

১। বিলাতের অর্থনীতির একটা মূল কথা এই যে চাহিদার রকম বাড়িলেই সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হয়। তাহা যথেষ্ট বাড়িয়াছে, তবে কৃষকের ঋণভার বাড়েই বা কেন আর ভদ্রলোকের অধিকাংশেরই বা হাতে আনিতে পাতে কুলায় নাই বা কেন ? আবার যদি সাধারণ সহুরে বাবুর আয় ব্যয় হিসাব খতাইয়া দেখা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে যাহার যত আয় তাহার ব্যয় ততোধিক। বর্ত্তমানে ভারতের দৈন্য এতই একরকমের যে সর্ব্বাবস্থায় বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি দাঁড়াইয়াছে। অবস্থা যখন ইহাই প্রকৃত তখন চাহিদা বাড়িলে আর্থিক অবস্থার সাধারণতঃ উন্নতি হয় এই তথ্য ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় খাটে না।

২। আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশী হইলে দেশের অর্থাগম বেশী হইল ধরিতেই হইবে সুতরাং তাহা দেশের উন্নতির লক্ষণ। চ্যাটারটন সাহেব সেই তথ্যানুসারে ভারতের গত পঁচিশ বৎসরের খতিয়ানে কৈফিয়ৎ কাটিয়া ভারতের উন্নতির গান গাহিয়াছেন। অথচ চাষী যে দিন-দিন দরিদ্র হইতেছে তাহা চ্যাটারটন সাহেব ও ব্যাংকিং সমিতি উভয়ই স্বীকার করিতেছেন। তবে রপ্তানির মূল্য বাবত যে টাকাটা দেশে আসে বা আসা উচিত তাহা যায় কোথায় ? আমরা জানি কোথায় যায়। ঐ গত পঁচিশ বৎসরের ভিতরই দেশে যে সকল পাটকল হইয়াছে তাহার শতকরা একশত, দুইশত,

তিনশত টাকা ডিভিডেণ্ড বা সুদ কোথা হইতে আসে? দেশের লোকের ঋণভার বৃদ্ধির সুদ কোথা হইতে আসে? সরকারী মোটা মাহিনার কর্ম্মচারীবৃন্দ যে হারে বাড়িয়া গিয়াছে তাহাদের বেতন কোথা হইতে আসে? মটর গাড়ী, ডবল দামের সুতির থান, লোহা লক্কড় কলকারখানা কোথা হইতে আসে? মদের ডবল দাম কে যোগায়! এ সব কথা আলোচনা করিলে বিলাতী অর্থ নীতির ঐ তথ্যও ভারতের জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি সূচক বলা চলে না।

৩। ভারতের কৃষকের সন্তান সংখ্যা কি হারে বাড়িয়াছে তাহা হিসাব না করিয়া অন্নহার বৃদ্ধির কথা বলা চলে না। আর কৃষকের ঘরে পুঁইচে বা হার বা গোট লইয়া তাহাদের অলঙ্কার-প্রিয়তার নিন্দা যাহারা করে তাহারা এই নিরন্ন দেশের চিরাচরিত সঞ্চয়ের প্রথা ও দুঃখদৈন্যের দিনের একমাত্র অবলম্বনের কথা হয় নির্দ্দয় ভাবে অবহেলা করিতে চায় নতুবা তাহাতেও তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি খরভাবে ফেলিতে চায়।

৪। সহরের জমির দাম বাড়িয়া গিয়াছে কেন? কেবলই কি জমির টানে? জমির টান কেন! এই বাঙ্গলা দেশে গ্রামের বাস বাসের অযোগ্য করিয়াছে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, খাবার জিনিষের রপ্তানি ও গ্রামবাসীর শ্রমের যথাযোগ্য পারিশ্রমিকের অভাব। আমরা সহরের লোক। যে বাড়ীর জন্য এক বৎসর পূর্ব্বে মাসিক ৮৲ টাকা ট্যাক্স দিতাম আজ সেই বাড়ীর জন্যই মাসিক ৪০ টাকা ট্যাক্স দিতেছি। কেন? পিচমোড়া রাস্তা, সিমেণ্ট করা ফুটপাথ, পাথর বাঁধন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ট্রাম, বাস, মটর গাড়ী, সিনেমা, থিয়েটার, নাচের মজলিস ও সভাসমিতির বক্তৃতার ফোয়ারা কেবল কি এই সবের মোহের জন্য নহে? আবার সেই সব মোহ কি জন্য? বিলাতী সভ্যতার নকলে আমরা সভ্য হইতেছি তাহার সাধ মিটাইবার জন্য।

সিংহ মহাশয় ব্যবস্থা করিয়াছেন যে শিক্ষিত যুবককে "চাকুরীর মোহ ও সহরের মায়া ত্যাগ করিতে হইবে।" সমস্ত রোগের নিদান যে ঐ খানেই। বহুদিন হইতে শোনা যাইতেছে Back to the villages গ্রামে ফের, কিন্তু যতই চীৎকার বাড়িতেছে ততই অবস্থা দাঁড়াইতেছে Back to the villages but front to the cities, পৃষ্ঠ দেশ গ্রামের দিকে, দৃষ্টি সহরের দিকে। গ্রাম হইতে বাহির হইয়া সুখে পাঠাভ্যাস, স্কুল হইতে বাহির হইয়া সহরের কলেজে ও কলেজের মেসে বাস, কলেজের মেস ছাড়িয়া কর্ম্মচারীর মেসে থাকিয়া চাকরীর মোহে ভ্রমণ, চাকরীর মোহে সহরের মায়া বাড়িয়া যায়, হল এণ্ডারসনের পোষাক লইয়া পূজার ছুটীতে সহরে সহরে সফর, পয়সা হইলে বিলাতে কল্পবাস, টাইটেল খানায় মোক্ষ লাভ।

আজ সিংহ মহাশয় যে ব্যবস্থা করিতে চান, তাহাতে ঠিক ঘুরিয়া দাঁড়াইতে হয়! Back to the cities and front to the villages সহরের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া গ্রামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। চপ কাটলেট আমলেটের বদলে নারিকেল মুড়ি ফুলুরি বেগুনি চাই, সুইচটেপা বিজলী বাতির বদলে সাঁঝের প্রদীপের তুলসীতলা চাই, শ্রেণীবিন্যস্ত রঙ্গ-মঞ্চের প্রেক্ষাগৃহের বদলে গাছ তলার যাত্রার আসরে চাষা মালীর সহিত একাসন চাই, বিজ্ঞাপিত সুন্দরীর চটুল-চরণধ্বনির পরিবর্ত্তে পুকুর ঘাটের কঙ্কণ নিক্কণ ভাল লাগা চাই, তিন লক্ষ টাকার বাঁধান রাস্তায় প্রমত্তা প্রমদার বিভঙ্গলীলায়িত মটর বিলাসের প্রতি ঘৃণার সহিত অশ্বত্থচূতচ্ছায়া-বিধূনিত জ্যোৎস্নাকণায় শান্তি-সুধা-সেবিনী গৃহলক্ষ্মীর নিবেদনে শ্রদ্ধা চাই, আর চাই ভণ্ডামির করতালি

লোলুপতার স্থলে শ্রমশীলতার যথাযথ ফলে তৃপ্তি, নেতৃত্বের মানুষ লইয়া খেলার অবহেলায় মানুষের সেবা পরায়ণতায় সদ্ভাবের আদান প্রদান, ও বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির ভোটাভুটির সাফল্যের মায়াত্যাগে সমাজ সংগঠনের সৃষ্টির আনন্দ বুঝিবার সাধনা। সিংহ মহাশয়ের ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক অনুপান এতগুলি।

ইহার মূলসূত্র বহুযুগ পূর্ব্বে ভগবান মনু নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বন্ত সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা
শ্রুতি প্রামাণ্যতো বিদ্বান স্বধর্ম্মেন নিবিশেত বৈ।

বৈ—অনুনয়ে। এত বড় বিধানটা ভগবান্ মনু অনুনয় করিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইদং অর্থাৎ মানুষের অন্তর্জগতের বহিরস্থ এই বহির্জগৎটা নিখিলং সমগ্র সর্ব্বং সবটাই তু অবধারণে জ্ঞান চক্ষুষা জ্ঞানচক্ষুদ্বারা অর্থাৎ যে চক্ষুদ্বারা শ্রদ্ধা পূর্ণ ভাবে বস্তুর যাথার্থ্য অবগত হওয়া যায় তাহা দ্বারা সমবেক্ষ্য সম্যক প্রকারে দেখিয়া বিদ্বান শ্রুতিপ্রামাণ্যতো অর্থাৎ বেদ প্রমাণে যে স্বধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে নিবিশেত নিবিষ্ট থাকিবে। মানুষের সামাজিক কর্ত্তব্যের ইহাই মৌলিক নির্দ্দেশ।

এই নির্দ্দেশ অনুসারে বাঙ্গালীর:তথা ভারতের অন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য আবশ্যক প্রথম—বিশ্বাস করিতে প্রাণ অন্নগত। দ্বিতীয়—যে বিদেশী অর্থনীতিতে অর্থবস্তুকে ধরিয়া অর্থোপার্জ্জনের তথ্য নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহাতে অর্থকেই প্রাণ ধরিয়া লইয়া একটা তথাকথিত বিজ্ঞান গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার পক্ষে তাহা যতই আবশ্যক হউক, আমাদের দেশের যে স্বপ্রতিষ্ঠ গ্রামজীবনে সভ্যতা হাজার হাজার বৎসর নিবদ্ধ ছিল তাহার অর্থনীতি ঐরূপ অর্থবস্তুতান্ত্রিক না হইয়া প্রাণতান্ত্রিক ছিল। কাজেই ভারতের প্রাণতান্ত্রিক অর্থনীতি-বিজ্ঞান ভারত সন্তানের দ্বারা লিখিত পঠিত ও আলোচিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ বিলাতী শ্রমশিল্পমূলক অর্থনীতির (industrial economics) সাহায্যে আমাদের দেশের অন্ন বা অর্থ কোনও সমস্যার মীমাংসা হওয়া সম্ভব হইবে না। বিলাতে সম্প্রতি বেকার সমস্যার অতিচারে ও অনূঢ়া সমস্যার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তায় Economics of Welfare বা কল্যাণের অর্থনীতির উদ্ভব হইয়াছে। ভারতের একটা কল্যাণাদর্শ ভারতের সামাজিক বিন্যাসে এতদিন ভারতের অর্থনীতিকে সামাজিক আচার ব্যবহারের ভিতর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। পারিবারিক সংস্থানে তাহা পিতৃপিতামহগত পারম্পর্য্যধারায় স্বপ্রকৃতিকে রক্ষা করিয়াছে ও আচারে তাহা আয়ুষ্মান্ করিয়াছে, অভীপ্সিত সন্তান সন্ততি দান করিয়াছে, অক্ষয় ধনাগমের পথ দেখাইয়াছে ও অলক্ষণ হনন করিয়াছে। আজ যদি ঘুরিয়া দাঁড়াইতে হয় তবে এই সমগ্র ভাবের প্রেরণা লইয়া ঘুরিতে হইবে। অর্থ জীবনের একটা ক্ষুদ্র অংশ; তাহার নীতি একটা খণ্ড সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং মিথ্যা—এই ধারণা লইয়া ফিরিতে হইবে। তাহা যদি পারি তবেই কবির আক্ষেপ সার্থক হইবে—

পুণ্য কুটীরে বিষণ্ণ
কে বসি সাজা'য়ে অন্ন,
সে স্নেহ উপহার রুচে না মুখে আর
সে যে আমার জননীরে।

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ।

মাস-পঞ্জি—শ্রাবণ ১৩৩৭

১লা শ্রাবণ হইতে—সরকারী হিসাবে প্রকাশ এ বৎসর বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বিগত বৎসর অপেক্ষা ৯১৭০০ একর জমি অধিক পাটের চাষে নিয়োজিত হইয়াছে—নৌ-যান নির্ম্মাণে ব্রিটেন এবার পশ্চাদ্‌পদ আছে—বড় লাট লর্ড আরউইনের অনুমোদনক্রমে শ্রীযুক্ত তেজবাহাদুর সপ্রু ও মুকুন্দরামজয়াকর মহাত্মাগান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, উদ্দেশ্য জাতীয় শক্তির সহিত শান্তিস্থাপনা—লণ্ডনের সেণ্ট জেমস্ রাজপ্রাসাদে প্রস্তাবিত গোল টেবিলের সভা বসিবার সম্ভাবনা—শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেকে লণ্ডনের এক সভাতে সাইমন রিপোর্টের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন—শাস্ত্রী মহাশয় বলেন ডমিনিয়ান ষ্টেটাসের সহিত স্বতন্ত্রীকরণ আপনিই আসিয়া যায়, এবং সেই স্বতন্ত্রীকরণ হইলেই ভারত প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের অংশরূপে বর্ত্তিতে পারে, লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন—মান্দ্রাজ গণ্টুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ গান্ধীটুপী পরিধানে নিষেধ আজ্ঞা জারি করিয়াছেন, মান্দ্রাজ হাইকোর্ট সেই আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন গ্রহণ করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত জয়াকর ও সপ্রু মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎকারান্তে একটী লিখিত সমাচার লইয়া পণ্ডিত মতিলাল ও জহরলাল নেহরুর নিকট নাইনী জেলে যাইতেছেন—কলিকাতা কলেজ সমূহে ছাত্র-পিকেটিং চলিতেছে; পুলিস তাহা রদ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে—সিমলা শৈলে প্রাদেশিক গভর্ণরগণের এক বৈঠক চলিতেছে—১১ বৎসর পর জারমন ফ্লীটের নিমজ্জিত হিণ্ডেনবার্গ নামক যুদ্ধ জাহাজখানিকে উত্তোলিত করা হইয়াছে—ষাট জন মহিলা-ভলাণ্টিয়ার কলিকাতা গড়পার রোড্ দিয়া মিছিলে বাহির হইয়া আটক হয়; তাহাদের অধিনেত্রীর গ্রেপ্তারে তাহারা এই বিক্ষোভ প্রকাশ করে; গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ইহারা রাস্তাতে থাকে, অনাহারে থাকিয়া অবশেষে প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হয়—বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী কুমার শিবশেখরেশ্বর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ভারতের জন্য চাই অর্থ-নৈতিক স্বাতন্ত্র্য—প্রতীচ্যে ব্রিটিশ বাণিজ্যের হ্রাস দেখিয়া উৎকণ্ঠায় একটী বাণিজ্য কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ফর্ড নামক একজন পুলিস সার্জ্জেণ্ট কলিকাতায় ছুরিকাঘাতে আহত হইয়াছে—সপ্রু-জয়াকর নাইনী জেলে নেহেরু পিতাপুত্রের সহিত আলাপ করিতেছেন—ব্রাজিল রাজ্যের পারাহিবার রাষ্ট্রনায়ক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছেন—সপ্রু জয়াকারের শান্তি-প্রচেষ্টায় জাইয়ারবেদা জেলের গান্ধী-আলয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একটী সভা বসিবে—কাবুল সহরের মেয়র আবদুল রহমান খাঁ এক ষড়যন্ত্র সংশ্রবে নিহত হইয়াছেন—সরকারের কৃষি-বিভাগ বাংলার ও আসামের ধান্যের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত পরিকল্পনা করিতেছেন—বিলাতে এক ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স বসিতেছে—গোল টেবিলের সভায় সাইমন সদস্যের স্থান হইবে না—চট্টগ্রামের নৈশ অভিযানের মকর্দ্দমা চলিতেছে—বোম্বেতে তিলক বার্ষিকী উপলক্ষে মহা গোলযোগ উপস্থিত—পণ্ডিত মদনমোহন মালবিয়া, বল্লভভাই পেটাল, মিষ্টার সেরবানি প্রভৃতি দেশপূজ্যদিগকে গ্রেপ্তার হইতে হইল—সারজন সাইমন আমেরিকা ভ্রমণে যাইতেছেন, তথায় তিনি ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিবেন আশা করা যায়—পেশোয়ারে নূতন আফ্রিদি আক্রমনের সংবাদ আসিল—চীনে নানকিন সহরে বৈদেশিক ও জাতীয় শক্তিতে সংঘর্ষ উপস্থিত একজন ইংরাজ মহিলা আহত হইয়াছেন—বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত পুলিসের ব্যয়ভার নিমিত্ত নয় লক্ষ টাকা মঞ্জুর পাইলেন—প্রাথমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে বাংলার স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রী কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিতেছেন—উত্তর পশ্চিমের সীমান্তে গোলযোগ গুরুতর হইতেছে—বঙ্গীয় কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষার মন্ত্রীর আচরণে হিন্দুসভাসদ্‌গণ বাহির হইয়া আসিলেন—দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় কলিকাতায় ও অন্যত্র ইউরোপীয় সম্প্রদায় বড় উত্তেজনা দেখাইতেছেন—৩২শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত।